॥ সূচীপত্র ॥

চিত্রপট

[১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত]

শ্রীমতী নির্ঝরিণী

কল্যাণীয়াসু—

ঝুনুনি,

মা আমার, অনন্ত মহাসাগরের কত ঊর্মিবালুকাময় সংসার-সৈকতে তাদের খেলার চিহ্ন রেখে যায়, আবার নূতন তরঙ্গ এসে সে চিহ্ন ধুয়ে নিয়ে যায়। সংসারে কেবল এই খেলা! গোধূলির আকাশে নানা বর্ণে মেঘের চিত্র একটির পর একটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, আবার মুছে যায়। চিত্রকর আকাশের সেই বর্ণ-বৈচিত্র্যের কোন একটি তার তুলি দিয়ে পটে এঁকে ধ'রে রাখে; সে যেন অসীমকে সীমার বন্ধনে বন্ধ ক'রে রাখবার চেষ্টা। মানুষ মন দিয়ে সে সসীম ছবি আঁকছে, আবার মনকেই তাতে ডুবিয়ে দিয়ে অসীমে লয় পেয়ে যাচ্ছে। মন দিয়ে এই জগৎ গড়ছে, আবার নিজের গড়া জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে জগদাতীত ভাবে মগ্ন হয়ে যাচ্ছে। কল্পনা-বায়ুতে ঊর্মিহীন অপার সমুদ্রে সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তুলছে, আবার সেই সুখ-দুঃখের অনুভূতির পথে চলতে গিয়েই সুখ-দুঃখ-বোধাতীত অসীম আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলছে।

মা আমার, সংসার-সমুদ্রের তীরে ব'সে অনন্তের লীলা-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ আমারও ছবি আঁকতে সাধ হয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে আঁকতে না পারলে ছবিও সম্পূর্ণ হয় না, প্রাণের রঙে রঞ্জিত করতে না পারলে চিত্র পরিস্ফুট হয় না, তাই আঁকা হ'লে দেখলাম যে, অপটু হস্তে অঙ্কিত কতকগুলি কেবল অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ রেখাচিত্র হয়েছে। কিন্তু এ তোমার মায়ের আঁকা ব'লে তবুও তোমার ভাল লাগবে, তাই তোমার হাতে দিলাম। ইতি

কলিকাতা
সন ১৩২৩, ১৩ই আশ্বিন

চিত্র

ত্রয়োদশ বৎসর পরে পার্বতী শ্বশুরগৃহ হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই তাহার বিবাহের দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। বিবাহের পরদিনই সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, এইজন্য তাহার পিতৃগৃহের স্মৃতির সহিত বিবাহ-রাত্রির স্মৃতি এমনভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, একটির কথা মনে করিতে গেলেই আর একটি মনে পড়িয়া যাইত। এইস্থানে দেবদারুর তোরণ হইয়াছিল, এইস্থানে নহবৎ বসিয়াছিল, এই সমস্ত থাম ফুলের মালা দিয়া ঘেরা হইয়াছিল। সেই দীপের মালা, সেই লোকের কোলাহল, সেই শঙ্খের ধ্বনি, সে সমস্ত যেন এখন স্বপ্ন! সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে বিবাহের অন্য সমস্ত চিহ্নই মুছিয়া গিয়াছে, কেবল পাঁচ বৎসরের শিশু অমরেশ এখন শেষ চিহ্ন। বিবাহসভায় যখন সে সর্বাভরণে ভূষিতা হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তখন সকলে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, "যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!"—সে কথা এখনও কানে বাজিতেছে। তখন কে জানিত যে, সেই লক্ষ্মী আবার অলক্ষ্মীর বেশে ত্রয়োদশ বৎসর পরে তাহার শৈশবনিকেতনে ফিরিয়া আসিবে!

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহার দুই চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল, মূর্ছিতের মত পার্বতী ধুলায় বসিয়া পড়িল। অমরেশ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পার্বতীর মনে পড়িল, কন্যা-বিদায়ের দিন তাহার ভাই নরেনও এমনি ব্যাকুলভাবে "দিদি, দিদি" বলিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানিয়াছিল। নরেনের সেই শৈশবের সুন্দর মুখ ত্রয়োদশ বর্ষ একইভাবে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, কালে তাহার উজ্জ্বল রেখা বিন্দুমাত্রও মুছিতে পারে নাই।

হরশঙ্করবাবুর বাড়ীর পাশেই তাঁহার ভ্রাতার বাড়ী, প্রাচীরে একটি ছোট দুয়ার কাটানো ছিল, তাহাতেই উভয় বাড়ীতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইত। পার্বতী আসিয়াছে শুনিয়া খুড়িমা তাহাকে দেখিতে আসিলেন।

নরেনের স্ত্রী সুহাসিনী আসন পাতিয়া দিয়া দেয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া অপ্রসন্নভাবে নখ খুঁটিতে লাগিল।

সুহাসিনীর অপ্রসন্নতার কারণ যথেষ্টই ছিল। যদিও তাহার বয়স কেবল চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার সাংসারিক জ্ঞান ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। পার্বতী ছেলে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ ছেলে ও পার্বতীর জন্য মাসে মাসে কত খরচ

পড়িবে সে বিষয়ের একটা মুখে মুখে হিসাব ঠিক করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে আবার রাঁধুনীকে বিদায় করিয়া দিবার কল্পনা তাহার মনে উদয় হওয়ায় কতকটা আশ্বাসেরও সঞ্চার হইয়াছিল। আজ আবার খুড়িমাকে অযাচিতভাবে আত্মীয়তা করিতে আসিতে দেখিয়া তাহার মনটা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।

খুড়িমা পার্বতীকে কোলের কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এ কি আমাদের সেই বুড়ি? তোর এ কি চেহারা হয়েছে রে!" খুড়িমার চোখের জল পার্বতীর রুক্ষ কেশের উপর আর পার্বতীর চোখের জল খুড়িমার পায়ের উপর পড়িতে লাগিল।

অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া খুড়িমা পার্বতীকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্বতীর পিতা পার্বতীকে রাজার ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন, তবু তাহার জীবনে কি সুখ ছিল? স্বামীর প্রেম?—তাহা সে কখনও পায় নাই। বিলাসে উন্মত্ত স্বামী পত্নীর দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া শ্বশুরালয়ে সম্মান ছিল না, ধনীর পুত্রবধূর দরিদ্র পিতৃগৃহে আসিবার পথও ছিল না। তিনটি সন্তান হারাইয়া কেবল অমরেশ তাহার শেষ সান্ত্বনার উপায়। স্বামী যেদিন সঙ্গী বন্ধুবর্গ লইয়া শিবরাত্রির উৎসব আমোদে কাটাইবার জন্য কাশীতে গিয়াছিলেন, সেদিন পার্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একবার তাহাকে বলিয়াও যান নাই। সেই তাঁহার শেষ বিদায়। সাঁতার দিতে গিয়া তাঁহার শরীর গঙ্গার স্রোতে যে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই. এই সংবাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরালয়ে পার্বতীর সকল অধিকার শেষ হইয়া গেল, দরিদ্রের কন্যা ভিখারিণী-বেশে সন্তান-ক্রোড়ে দরিদ্র পিতৃগৃহেই ফিরিয়া আসিল, তাহার ত্রয়োদশ বর্ষের এইমাত্র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

খুড়িমা বলিলেন, "দিদি যদি এসময় এখানে থাকতেন, তাহ'লে বড় ভাল হ'ত। দিদি কাশী গিয়ে অবধি এদিকটা যেন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে, সেই অবধি আমি আর এদিকে আসতেও পারি না।"

পার্বতী চোখের জল মুছিয়া বলিল, "বাবা তো আর দেশে আসবেন না, মা বাবাকে একলা রেখে কেমন ক'রে আসবেন!"

"তবে না হয় তুই একবার কাশীতেই যা, তাঁরা কখন আছেন, কখন নাই। হয়তো আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না। আমাদের পণ্টু শিগ্‌গির কাশী যাবে সেই সঙ্গে যেতে চাস তো আমি সব ঠিক ক'রে দিতে পারি।"

বৈঠকখানায় হরশঙ্করবাবুর একখানি তৈলচিত্র ছিল। অনেক দিন ধূলি পড়িয়া পড়িয়া সেখানি ভাল করিয়া দেখা যাইত না। পার্বতী দ্বিপ্রহরে বাহিরে গিয়া একমনে ছবিখানি পরিষ্কার করিতেছিল।

সুহাসিনী বিরক্ত হইয়া বলিল, "নেই কাজ তো খই ভাজ, ঠাকুরঝির হয়েছে তাই। যদি ততক্ষণ কাঁথাগুলো সেলাই করেন তো কাজ হয়।"

ছবি পরিষ্কার করিতে করিতে পার্বতীর মন এতই একাগ্র হইয়াছিল যে, তাহার সময়ের জ্ঞান ছিল না। হাতের কাপড়খানি চোখের জলে ভিজিয়া যাইতেছিল।

নরেন আপিস হইতে সাহেবের বকুনি খাইয়া আসিয়াছিল, তাহার মেজাজটি সপ্তমে চড়িয়াছিল। আসিয়াই প্রথমে পার্বতীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল,—রুক্ষস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "দিদি, বাইরে এসে কি হচ্ছে?"

দিদি নরেনের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তখনও তাহার চোখে জল ছিল। "নরু!" বলিয়া ডাকিতে গিয়া মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "বাবার ছবিখানি বড় অপরিষ্কার হয়েছিল তাই পরিষ্কার করছিলাম।"

সুহাসিনী দুয়ারের পাশে আসিয়া বলিল, "আজ বুঝি খাবার তৈরী হয় নি?"

পার্বতী খাবার করিবার কথা ভুলিয়াছিল, ভ্রাতার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। "এই আমি যাচ্ছি" বলিয়া পার্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আর কাজ নাই, থাক্।"– বলিয়া ক্রুদ্ধ নরেন ছবিখানি পাশে সরাইয়া রাখিতে গেল, কিন্তু তাহার অস্থির হস্তচালনায় ছবিখানির উপর কপাটের ধাক্কা লাগিয়া ছবির এক পাশের ফ্রেম ভাঙিয়া গেল।

এমন সময় নীচের দরজায় হাঁক পড়িল, "বাবু, তার আয়া।"

নরেন ব্যস্ত হইয়া নীচে গেল। পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, কাশীতে বাবার বড় অসুখ, টেলিগ্রাম এসেছে।" বলিয়াই ভগ্ন তৈলচিত্রের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

পার্বতী ব্যস্ত হইয়া নরেনের হাত ধরিল, বলিল, "নরেন, অত অস্থির হ'য়ো না, আগে হাতে মুখে জল দাও।"

কাশীতে কে যাইবে ইহা লইয়া দুই ভাই বোনে অনেক পরামর্শ হইল। নরেনের ছুটি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর সুহাসিনী সন্তান-সম্ভাবিতা, তাহাকেই বা কোথায় রাখিয়া যাওয়া যায়! এক, খুড়ামহাশয়ের বাটী নিকটে আছে, কিন্তু সুহাসিনী সেখানে থাকিতে কোন মতেই রাজী নহে।

অবশেষে পার্বতী বলিল, "তবে তুমি থাক। আমি পণ্ডুর সঙ্গে রাত্রের মেলে চ'লে যাই। তারপর তুমি যাতে ছুটি পাও সে চেষ্টা ক'রো।

নরেন বলিল, "অমরকে তো সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

পার্বতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, "কাশীতে? না না, কাশীতে আমি অমরকে নিয়ে যেতে পারব না।"

অমর সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া গিয়াছিল, পার্বতী ঘুমন্ত অমরের মুখচুম্বন করিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় পার্বতী সুহাসিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "রাণি, অমরকে একটু ভাল ক'রে দেখিস্ দিদি!"

অমর সকালে উঠিয়া মাকে দেখিতে না পাইয়া ঘরের চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও মায়ের কোন সন্ধান না পাইয়া বাহিরের দুয়ারের পাশে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বড় বড় চোখ দুটি ক্রমেই লাল হইয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। সুহাসিনী জ্বালাতন হইয়া উঠিল, বলিল, "ভাল এক বিপদে পড়েছি যা হোক্!"

নরেন সকালে প্রাইভেট টিউশনে বাহির হইয়াছিল। অমরেশকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "কি হয়েছে অমর?"

অমর "মা কই!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

নরেন আদর করিয়া বলিল, "মা আসবে এখন, আয় আমার সঙ্গে। রাণি, অমরকে কিছু খাবার দাও তো।"

সুহাসিনী খাবার লইয়া আসিল, বলিল, "নিজে কিছু মুখে দেবে, না, ভাগ্নেকে আদর ক'রেই পেট ভরবে?"

এই রকম করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল, ইহার মধ্যে খবর পাওয়া গেল, হরশঙ্করবাবু কিছু ভাল আছেন।

পার্বতীর অন্য কোন দিকে মন ছিল না, ধ্যানমগ্না পার্বতীর ন্যায় পার্বতী একমনে পিতৃসেবায় মগ্ন ছিল। ক্রমে হরশঙ্করবাবু একটু ভাল হইলে পার্বতী বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে গেল।

মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া পার্বতী গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া একমনে গঙ্গার স্রোতের দিকে চাহিয়া ছিল। এই স্রোতে তাহার জীবনের যথাসর্বস্ব ভাসিয়া গিয়াছে। পার্বতী ভাবিতেছিল, "আমি যদি এই স্রোতে ভাসিয়া যাইতাম!" নিকটেই একটা চিতার আয়োজন হইতেছিল, পার্বতী ভাবিল, "আমার চিতা যদি এইখানে জ্বলিত!"

গঙ্গাস্নান করিয়া যাহারা ঘরে ফিরিতেছিল, যাহারা স্নানে আসিতেছিল— সকলেই বিস্মিত হইয়া পার্বতীর মুখের দিকে চাহিতেছিল; পার্বতী তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টি কেবল গঙ্গার বারিরাশিতে নিবদ্ধ ছিল। কেবল তাহার মনে হইতেছিল, এখানে তাহার যে অমূল্য মাণিক হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিলে হয়তো তাহা পাওয়া যাইবে।

এমন সময় একটি বালকের ক্রন্দনে তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, একজন

রমণী গঙ্গাস্নানে নামিয়াছেন, তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার আঁচল ধরিয়া চলিয়াছে, হঠাৎ কাদায় পা পিছ্‌লাইয়া ছেলে পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

পার্বতীর অমরের কথা মনে পড়িল, অমর যে মা-ছাড়া এক মুহূর্ত থাকিতে পারে না। পার্বতী আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিল, "এখনও আমার মরিবার সময় হয় নাই।"

পূজা শেষ করিয়া ঘরে আসিতেই অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার স্বভাব-প্রসন্ন মুখখানিতে কালিমার সঞ্চার হইয়াছে।

পার্বতী ভীতা হইয়া বলিল, "কি হয়েছে মা?"

"বুড়ি, তোর দেরি দেখে উনি ভারি ব্যস্ত হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন, তুই বুঝি গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিস।"

"তাই তুমি এত ভয় পেয়েছ মা?"

"না মা, তা নয়, কলকাতা থেকে তার এসেছে, অমরের কলেরা হয়েছে।"

শুনিবামাত্র পার্বতী সেইখানেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

হরশঙ্করবাবুর বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া পার্বতীর গাড়ী লাগিল। পার্বতী নামিয়াই উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া উপরে গেল। নরেন পঞ্চুর সহিত বৈঠকখানায় দাঁড়াইয়া ছিল—পার্বতী তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "অমর, আমার অমর কোথায়?"

নরেনের দিদির মুখের দিকে চাহিবার সাহস হইল না। অবনতনেত্রে ভূমিতলের দিকে চাহিয়া রহিল।

পার্বতী বলিল, "অমর কি নাই?" এই শব্দ কয়টি যে স্বরে পার্বতীর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিয়া নরেন ও পঞ্চু শিহরিয়া উঠিল।

নরেন রুদ্ধস্বরে বলিল, "অমর হাসপাতালে।"

"বাঁচিয়া আছে?"

"আছে।"

পার্বতী আপনার অসংযত বস্ত্র সংযত করিয়া লইল। দেয়ালের দিকে আঙ্গুল হেলাইয়া বলিল, "নরেন, দেয়ালের দিকে চাহিয়া দেখ, এ কাহার ছবি? যাঁর ছবি, তুমি তাঁর সন্তান। মুমূর্ষু রোগী পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তিনি কুড়াইয়া কোলে করিয়া গৃহে আনিতেন। আর তুমি—আমি তোমার নিকট আমার সর্বস্ব ধন অর্পণ করিয়া গিয়াছিলাম, তুমি সেই অসহায় রুগ্ন মুমূর্ষু শিশুকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছ। তাই বুঝি ও-ছবি যেন দেখিতে না হয় বলিয়া ধূলায় ঢাকিয়া রাখিয়াছিলে! আমি চলিলাম। পঞ্চু, তুমি হাসপাতালের রাস্তা চেন?"

পঞ্চু বলিল, "দিদি তোমার ভাবনা নাই, আমার এক বন্ধু সেখানে কাজ করেন, আমি তোমাকে অমরের কাছে নিয়া যাইতে পারিব।"

নরেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল, ঘরে আসিয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল। সেদিন রবিবার, আপিস ছিল না। কতবার ইচ্ছা হইতেছিল যে, অমর কেমন আছে একবার দেখিয়া আসে, কিন্তু লজ্জার গুরুভার পর্বতের মত তাহার মাথায় চাপিয়াছিল, সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। কি বলিয়া সে অমরকে হাসপাতালে দিয়া আসিল! তখন এ বিষয়ে কত অনুকূল যুক্তিই তাহার মাথায় আসিয়াছিল। এখন তাহার একটি যুক্তিও সে মনে করিতে পারিল না। কেবল আত্মগ্লানি আসিয়া বার বার তাহাকে কষাঘাত করিতে লাগিল।

সুহাসিনী যখন তাহাকে আহার করিবার জন্য ডাকিতে আসিল, তখন আর তাহার সুহাসিনীর মুখের দিকেও চাহিতে ইচ্ছা হইল না। সুহাসিনীর পরামর্শেই সে এই অতি গর্হিত কাজ করিয়াছে; কিন্তু সুহাসিনীর দোষ কি? তাহার নিজের মন কেমন করিয়া এ কাজে সায় দিল!

সমস্ত দিন অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় ছটফট করিয়া সন্ধ্যার সময় নরেন আর শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিল না। শয্যাকণ্টকী রোগীর ন্যায় শয্যা ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিল। আসিয়াই দেখিল, সুহাসিনী ভূমিতলে পড়িয়া আছে, তাহার দিকে চাহিয়া সে যে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা আর নরেনের বুঝিতে বাকি রহিল না।

নরেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রাণি, অসুখ করেছে, আমাকে কেন বল নাই?"

ভগ্নস্বরে সুহাসিনী বলিল, "ব'লে কি হবে? তুমি বিছানায় শুয়ে আরাম কর গিয়ে।"

মরিতে বসিয়াও রমণী অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না।

নরেন আর বিলম্ব না করিয়া ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইল।

ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিয়াই নরেন দেখিল, তাহার ঘর লোকে পরিপূর্ণ। তাহার খুড়িমা, ভজু, পচু প্রভৃতি খুড়া মহাশয়ের বাটীর সকলেই প্রায় উপস্থিত। সুহাসিনী শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, পার্বতী তাহার মাথার কাছে বসিয়া।

নরেন দিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখ প্রশান্ত, কোন বিকারের চিহ্নমাত্রও তথায় নাই। হস্ত-সঙ্কেতে নরেনকে নিকটে ডাকিয়া পার্বতী বলিল, "অমর ভাল আছে।"

সমস্ত রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। সুহাসিনী বিকারের ঘোরে "মা, মা" করিয়া যখনই ছটফট করিতেছে, তখনই পার্বতী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এদিকে দ্রুত ও নিপুণ হস্তে ডাক্তারের সমস্ত আদেশ সুশৃঙ্খলায় পালন করিতেছে; যখন যাহা প্রয়োজন তাহাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। সেই অমৃতময়ী মূর্তি দেখিয়া মৃত্যুও যেন সুহাসিনীর শয্যার নিকট আসিতে সাহস করিল না।

প্রভাতে সুহাসিনী একটু ভাল বোধ করিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, "এখন তবু আশা হইতেছে।"

পার্বতী তখন কোথায়? নরেন পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, পার্বতী ভূপতিতা। দারুণ রোগের আক্রমণে সংজ্ঞাশূন্য। "দিদি" বলিয়া নরেন তাহার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ পার্বতীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। "নরু, ভাই" বলিয়া পার্বতী তাহাকে কোলে লইবার জন্য দুর্বল হস্ত বাড়াইয়া দিল।

ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বে ভাইবোনে ছাড়াছাড়ি হইবার সময় এমনি স্নেহে দিদি ভাইকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছিল। এক মুহূর্তের মধ্যে মধ্যবর্তী ত্রয়োদশ বর্ষ কোথায় মিলাইয়া গেল!

নরেন কাঁদিয়া বলিল, "দিদি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। দিদি, তোমাকে বাঁচতে হবে।"

দিদি ক্ষীণহাস্যের সঙ্গে বলিল, "তোর মুখে আবার সেই 'দিদি' ডাক শুনে আমি জীবন পেয়েছি। নরু, ভাই আমার, আজ আবার আমার হারানো ভাইটিকে আমি ফিরে পেলাম। ছবির কথা মনে আছে? বাবার ছবি ভাল ক'রে বাঁধিয়ে সম্মুখে রাখবি। বাবার ছবি দেখে মনে করবি, বাবার মত হ'তে হবে। তাঁর পাশে একখানি মায়ের ছবি, রাণী যেন মায়ের মত অন্নপূর্ণা—"

দিদির মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, মূর্ছা আসিয়া তাহার সংজ্ঞা হরণ করিয়া লইল।

('জাহ্নবী', আশ্বিন ১৩১৩)

স্মৃতি

সমস্ত দিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গম্ভীর নিস্তব্ধ। আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ডাক্তার সাহেবের গম্ভীর মুখশ্রীর সহিত আকাশের গাম্ভীর্যের তুলনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে খাস কামরা হইতে আমার ডাক পড়িল।

অনেক চেষ্টায় চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকরিটি জুটাইয়াছিলাম—সে চেষ্টার বর্ণনা করিতে গেলে কাহারও ধৈর্য থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। এত কষ্টে যে চাকরি-রত্ন লাভ করিয়াছি, নবীনমেঘে বিদ্যুদ্বিকাশবৎ ডাক্তার সাহেবের মেঘাচ্ছন্ন বদনে দন্তপংক্তির বিকাশ দেখিলে, মুহূর্তের মধ্যে সেই 'সাতরাজার ধন এক মাণিক'কেও বিসর্জন দিবার স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিত। তথাপি পোষ্যবর্গের কথা স্মরণ করিয়া বহুকষ্টে আত্মসংযম করিতাম।

আমি দরিদ্রের সন্তান। পিতা ধনীর পুত্র হইয়াও ভাগ্যদোষে আজ নিঃস্ব। আমার বিদ্যালয়ের বেতনের জন্য, আমার একখানি পাঠ্যপুস্তকের জন্য বাবা যখন ম্লানমুখে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন, তখন তাঁহার সেই ক্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যদি বাঁচিয়া থাকি, পরিবারের এ দুঃখ দূর করিব। সেই প্রতিজ্ঞা চল্লিশ টাকার চাকরিটিতে পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'অদৃষ্ট' বলিয়া একটা কথা আছে। স্মৃতি ক্যাম্বেল হইতে বাহির হইয়াই বিনা কষ্টে পঞ্চাশ মুদ্রার চাকরিটি লাভ করিয়াছিল। এই দুর্লভ চাকরি ও তদুপরি অতি দুর্লভ ডাক্তার সাহেবের অনুগ্রহ, উভয়ই তাহার 'অদৃষ্টে' ছিল বলিতে হইবে। আমিও ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে প্রায়ই যাহা লাভ করিতাম, তাহাও আমার 'অদৃষ্ট'। অতএব অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া পোর্টম্যাণ্টো হইতে আর্য-মিশনের গীতাখানি বাহির করিয়া মনকে নির্বিকার করিবার চেষ্টা করিতাম। তাহার ফলে, মনের বিকার উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিত। আজ তাহা বিষম-বিকারে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় খাস কামরার আহ্বান আমার নিকট উপস্থিত হইল।

দেখিলাম, সাহেবের গলায় গলবন্ধ বেষ্টিত হইয়াছে এবং পদতলে ফোমেণ্ট হইতেছে। এ দৃশ্য আমার চক্ষে নিতান্ত নূতন নহে। যদি এই ঘোরতর বর্ষার সময়েও অসুখ না হয়, তবে বিধাতার অসুখ-সৃষ্টিটাই মিথ্যা হইয়া যায়। বিশেষত সেই স্যাঁতসেঁতে দেশে, যে দেশে রাস্তায় টমটম বাহির হইলেই গাড়ীর চাকা আধ হাত কাদার ভিতর ডুবিয়া যায়, সেই দেশে বিনা পয়সার "কল" আসিলে সেই সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের শরীরে রোগও আসিতে বাধ্য। অতএব বর্ষা ও ডাক্তার সাহেবের পীড়া এবং এ অধীনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ,

এ সমস্তই পঠিত পুস্তকের চির-পরিচিত পংক্তির মত পূর্ব হইতেই আমার বিদিত ছিল। সুতরাং ব্যাপার বুঝিতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না।

আমার প্রভু নাকের উপর হইতে চশমাখানি একটু ঊর্ধ্বে তুলিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; স্বরে ও দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কোমলতা-প্রকাশের জন্য অনর্থক চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার! এই পত্র পড়িয়া দেখ। কেস বড় কঠিন। মিস সেনকে লইয়া শীঘ্র যাও, বিলম্ব করিও না; আমার শরীর যে নিতান্ত অসুস্থ, একথাও জানাইও। এরূপ অসুস্থ শরীরে বাহিরের ঠান্ডা লাগিলে নিউমোনিয়া হইতে পারে, এ জন্য আজ আমি যাইতে পারিলাম না। যদি কোন পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন মনে কর, লিখিয়া পাঠাইও।"

স্মৃতির সংগে 'কলে' যাইবার সুযোগ পরিত্যাগ ডাক্তার সাহেবের পক্ষে এই প্রথম। তাই আমার মনে হইল, আজিকার অসুস্থতার মূলে কিঞ্চিৎ সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। যাহা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া স্মৃতির সন্ধানে চলিলাম।

হাসপাতালের অতি নিকটেই স্মৃতির আবাস। স্মৃতির একজন দাসী ছিল, কিন্তু শনিবারের সন্ধ্যায় কখনই তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইত না। দুই-একবার ঘণ্টা বাজাইয়াও যখন কোনও উত্তর পাইলাম না, তখন আর অধিক বিলম্ব করা সংগত মনে না করিয়া আমি পর্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

স্মৃতি নতজানু হইয়া কার্পেটের উপর বসিয়া ছিল। হাত দু'খানি অঞ্জলি-বন্ধ, দৃষ্টি ঊর্ধ্বে, চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। আমার উপস্থিতি সে বুঝিতেও পারিল না।

লোকের সহিত লোকের সর্বদাই দেখাশুনা ও আলাপ হয়, তথাপি কেহ কাহারও পরিচয় পায় না। এতদিন আমি স্মৃতিকে কেবল একজন ধাত্রী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু আজ তাহার নূতন পরিচয় পাইলাম।

বর্ষা ও ডাক্তার সাহেবের অসুখ বাড়িয়াই চলিল; আমাকে ও স্মৃতিকে তিন রাত্রি রোগীর কক্ষে রাত্রি জাগরণ করিতে হইল।

তিন দিনের পর আকাশ মেঘমুক্ত হইল। সূর্যের প্রসন্ন মুখচ্ছবি প্রকাশ পাইল। সূর্যের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, একটা দীর্ঘ সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যেন সহসা জাগিয়া উঠিলাম। এই তিন দিনে জগতে যেন কতই পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, যেন এই তিন রাত্রির মধ্যে আমার নীরস জীবনের পরিবর্তে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছি; পুরাতন জীবনের সহিত আর কোনও মতেই তাহার মিল হইতেছে না।

হাসপাতালে ফিরিয়া আসিয়া ডায়েরী খুলিলাম। খুলিবামাত্র একখানি অর্ধলিখিত পত্রে আমার দৃষ্টি পতিত হইল। তিন দিন পূর্বে পত্রখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিতে পারি নাই। পাঁচ মাস পূর্বে আমি

আট দিনের ছুটিতে বাড়ি গিয়া বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলাম। পত্রখানি আমার নববিবাহিতা পত্নীর প্রতি প্রথম সম্ভাষণ। ডায়েরী হইতে বাহির করিয়া পত্রখানি একবার পড়িয়া দেখিলাম, তাহার পর দেশলাই জ্বালিয়া তাহার অগ্নিকৃত্য সম্পন্ন করিলাম।

মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনের অস্থিরাবস্থায় ঘন ঘন পাদচারণটা অতিশয় স্বাভাবিক। আমি ছাদে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

নানারূপ তত্ত্বকথার মীমাংসা করিতে করিতে ক্রমশ তন্ময় হইয়া পড়িলাম। সহসা আমার দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী হইয়া পদযুগলকে যেন আকর্ষণ করিয়া বাগানের দিকে লইয়া গেল।

স্মৃতি ঝাউগাছের তলায় দাঁড়াইয়া ছিল। তিন রাত্রি জাগরণের পরও এমন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যে তাহার শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া ঝাউগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য বোধ হইল।

স্মৃতিরও সেইরূপ আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বোধ হইল, তাহার মনে বিস্ময় অপেক্ষা আনন্দের মাত্রাটাই অধিক।

ডাক্তার সাহেব সময়ে অসময়ে স্মৃতির সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেন, স্মৃতিকে তখন বড়ই অল্পভাষিণী বলিয়া বোধ হইত। আমি পূর্বে কখনও তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করি নাই, দূর হইতে উভয়ের সম্ভাষণ দেখিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইতাম। কিন্তু এই তিন দিনে বুঝিলাম, স্মৃতি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল বকিয়া যাইতে পারে।

স্মৃতি বলিল, "আমার বাবার সমাধির উপর ঠিক এইরকম একটি ঝাউগাছ আছে। এই ঝাউগাছটি দেখিলেই আমার সেই গাছটির কথা মনে পড়ে। আমার এখানে আসিতে বড় ভাল লাগে। বাড়ীতে আমি যখনই অবসর পাইতাম, তখনই বাবার সমাধির কাছে সেই ঝাউগাছের নীচে বসিয়া থাকিতাম।"

আমি ঝাউগাছটির দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। কি জানি, কেন বাবার সেই বিদায়কালের অশ্রুনিরুদ্ধ দৃষ্টি সহসা মনে পড়িয়া গেল।

স্মৃতি বলিতে লাগিল, "বাবার সমাধির পাশেই আমার মার সমাধি। মার সমাধির পাশে একটি যুঁইগাছ আছে, গ্রীষ্মকালে রাশি রাশি সাদা যুঁই সাদা পাথরের উপর পড়িয়া থাকে। মায়ের কথা আমার ভাল মনে পড়ে না; তিনি যখন স্বর্গে যান, তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। তাঁর একখানি ক্রুস ছিল, সেই ক্রুসখানি তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর বাবা সেখানি সর্বদা কাছে রাখিতেন, বাবা মৃত্যুকালে সেখানি আমাকে দিয়া গিয়াছেন। সেই ক্রুস আর বাবার ছোট ফটোখানি, বাবা ও মার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সর্বদা আমার কাছে কাছে থাকে।"

এই বলিয়া স্মৃতি তাহার লকেটটি খুলিয়া আমার হাতে দিল। লকেটের

সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র হাতীর দাঁতের ক্রস ছিল। লকেটটি খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর ছোট একখানি ফটো। সেইটি তাহার পিতার প্রতিকৃতি।

স্মৃতি তখন অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। স্মৃতির অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে অশ্রুর সঙ্গে কি মুক্তার তুলনা হইতে পারে? আমার মনে হইল, পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য অপেক্ষা এই অশ্রুবিন্দু দুইটির মূল্য অধিক।

আমি বলিলাম, "এই তিন দিনের পরিশ্রমের পর বাগানে না আসিয়া তোমার একটু বিশ্রাম করা উচিত ছিল।"

তিন দিনের মধ্যে—শিষ্টাচার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং আত্মীয়তার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল।

স্মৃতি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া বলিল, "বিশ্রামের কথা বলিতেছেন? আপনি ব্যবস্থা দিতেছেন, কিন্তু নিজে তাহা পালন করিতেছেন না কেন?"

আমি উত্তর দিবার উপক্রম করিতেই স্মৃতি আরও বলিল, "আমার বাবা দিনরাত যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, সেকথা মনে করিলে এ সামান্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়াই মনে হয় না। কি আশ্চর্য! এত পরিশ্রমের পরেও তাঁহাকে কখনও ক্লান্ত কি বিরক্ত হইতে দেখি নাই, তাঁহার মুখ সর্বদাই প্রসন্ন ও হাস্যময় থাকিত। ধর্মে তাঁহার কি শ্রদ্ধা—যীশুর প্রতি তাঁহার কি প্রবল প্রেমই ছিল!" বলিতে বলিতে স্মৃতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"ওঃ! সে চিঠির কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বাবার কথা মনে হইলে আর আমার কিছুই মনে থাকে না। আমার ধর্মপিতাকে ডাক্তার সাহেবের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা জানাইয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তিনি আমাকে এখানকার কাজ ছাড়িয়া দিতে লিখিয়াছেন।"

"চিঠি পড়িয়া তুমি কি স্থির করিলে?"

"এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। আপনি কি বলেন?"

"আমি—" বলিয়া আমি কয়েক মিনিট নীরব হইয়া রহিলাম। এই কয়েক মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কে প্রবলবেগে এক সঙ্গে এত চিন্তার উদয় হইতে লাগিল যে, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এই রকম করিয়াই মানুষ পাগল হইয়া যায়। সহসা উন্মত্তের মত স্মৃতির হাত ধরিয়া বলিলাম, "স্মৃতি, স্মৃতি, বল, আমি যদি তোমাকে জীবনসঙ্গিনী সহধর্মিণী করিতে চাই, তাহাতে কি তুমি সম্মতি দিবে না?"

আমার নিয়ম ছিল, বাবাকে নিয়মমত দুই দিন অন্তর পত্র লিখিতাম। শত কাজের ভিড়েও এ নিয়ম চিরদিন পালন করিয়া আসিয়াছি। যখন মনে হইত, বাবা কত ব্যাকুলতার সহিত সেই কয়েকটি কালির অক্ষর দেখিবার জন্য পিয়নের

পথ চাহিয়া আছেন, তখন অসময়ের মধ্যেই সময় পাইতাম। কিন্তু এবার আমার দুই সপ্তাহ বাবাকে পত্র লেখা হইল না।

এই দুই সপ্তাহ যে আমার কি ভাবে কাটিয়াছিল, আমি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেও, তাহা স্মরণ করিতে পারি না। ডাক্তার সাহেব তিন সপ্তাহের ছুটি লইয়া গিয়াছেন, আমার উপরেই সমস্ত কাজের ভার ছিল। স্মৃতি সর্বদা আমাকে সাবধান করিয়া না দিলে রোগীদের অবস্থা যে কি হইত, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, সুখের মধ্যে এই, কাজকর্মের বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু ডেস্কের ভিতর বাবার দুখানি চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে, সে দুখানি খুলিয়া পড়াও হয় নাই।

অনুতপ্ত চিত্তে চিঠি খুলিলাম। এমন সময়ে হাস্যময়ী স্মৃতি আসিয়া আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "চিঠিখানি কার?"

"আমার বাবার চিঠি।"

দেখিলাম, স্মৃতির প্রফুল্লবদনে একটু অন্ধকারচ্ছায়া পড়িল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি খৃষ্টান হইলে তোমার বাবার মনে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হইবে।" স্মৃতি মৌখিক হাস্যে তাহার আন্তরিক বিষাদ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি কেন খৃষ্টান হইব? তুমিই তো হিন্দু হইতেছ।"

স্মৃতি ভাবিতে ভাবিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হিন্দু হইলে তো আর যীশুকে ভালবাসিতে পারিব না, সে কেমন করিয়া হইবে?"

"কেন, হিন্দু হইলে কি যীশুকে ভালবাসা যায় না? আমি তো যীশুকে কত ভালবাসি।"

"সত্য, তুমি যীশুকে ভালবাস?" বলিতে বলিতে স্মৃতির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রত্যূষেই স্মৃতি বলিল, "কাল ভাবিতে ভাবিতে আমার সারা রাত্রি ঘুম হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "এত ভাবনা কিসের?"

"আচ্ছা, আমাকে বিবাহ করিতে তোমার বাবা কি মত দিবেন? যদি তিনি মত না দেন, তুমি কেমন করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দিয়া বিবাহ করিবে?"

এ কথাটা যে আমিও না ভাবিয়াছি এমন নয়; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

স্মৃতি ডেস্কের ধারে আসিয়া বাবার চিঠিখানি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। বলিল, "কি সুন্দর হাতের লেখা! আমার তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমি তাঁহাকে খুব ভালবাসিব, খুব ভক্তি করিব, তিনি আমাকে যেমন ভাবে

থাকিতে বলিবেন, সেই রকমই থাকিব। তবুও কি তিনি আমাকে ভালবাসিবেন না?"

আমি অন্যমনস্কভাবে স্মৃতির কথাগুলি শুনিতেছিলাম, এমন সময় স্মৃতি বলিয়া উঠিল, "তিনি যে লিখিয়াছেন, 'বধূমাতাকে আনিতে হইবে,' বধূমাতা কে?"

আমি কাপুরুষ, এ পর্যন্ত বিবাহের কথা স্মৃতিকে বলিতে সাহস করি নাই, কিন্তু এখন আর না বলিলে চলে না।

আমি বলিলাম, "বধূমাতা কে শুনিতে চাও স্মৃতি? তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু সে বিবাহ নামমাত্র, আমি তাহাকে স্ত্রী বলিয়া মনে করি না।"

"সে কি?" বলিয়া স্মৃতি চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। অতিকষ্টে বলিল, "এতদিন এ কথা কেন আমাকে বল নাই?"

আমি বলিলাম, "একবার ভ্রম করিলে আর কি তাহার সংশোধন নাই? এই সামান্য ভ্রমের জন্য কি আমার জীবনের সুখ বিসর্জন দিব?"

স্মৃতি মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কি খেলার ঘর যে, একবার ভাঙ্গিয়া আবার গড়িবে?"

এই কথা বলিয়া স্মৃতি মৃদু পাদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার প্রতি পদক্ষেপ যেন আমার বুকে আসিয়া বাজিতে লাগিল। আমি অনেকক্ষণ নিশ্বাস ফেলিতে পারিলাম না।

সে দিন সমস্ত দিন স্মৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না। স্মৃতির দাসীর নিকট শুনিলাম, তাহার মাথার যন্ত্রণা বড়ই বাড়িয়াছে, সে জন্য সে শয্যা হইতে উঠিতে পারে নাই। স্মৃতির মাঝে মাঝে মাথার অসুখ হইত।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলাম। দীর্ঘ রাত্রি। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, ঘড়ি বুঝি খারাপ হইয়া গিয়াছে।

পূর্বদিনের মত অতি প্রত্যুষেই স্মৃতির দেখা পাইলাম। কিন্তু একদিনে তাহার আকৃতিতে কি পরিবর্তনই হইয়াছে!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্মৃতি, মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমিয়াছে?"

স্মৃতি আমার মুখের দিকে চাহিল না। নতনেত্রে আমার পদতলে জানু পাতিয়া বসিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল, "আপনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন। আমি আজ আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, বলুন, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।"

আমি পাষাণ, তবু চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। স্মৃতির হাত ধরিয়া তুলিতে সাহস হইল না। গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম, "ওঠ স্মৃতি, ওঠ, তোমাকে দিব না, এমন আমার কি আছে?"

"তবে আমার নিকট এই অঙ্গীকার করুন যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া সংসারী হইবেন। আর—" বলিয়া স্মৃতি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কাল আমি কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আমার একখানি ফটো ও একগোছা চুল আপনার কাছে আছে, ফিরাইয়া দিন। বলুন, আপনি আমার উপর রাগ করেন নাই?"

আমরা এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সিঁড়ির উপরে জুতার শব্দ পর্যন্ত শুনিতে পাই নাই; এখন সশরীরে ডাক্তার সাহেবকে গৃহ-মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলাম। সাহেব ক্রোধকুটিল নেত্রে আমাদের উভয়ের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত বলিলেন, "এ ব্যবহার অতি উত্তম।"

ইহার ফলে এই হইল যে, আমার বেতন চল্লিশটি মুদ্রার স্থলে রূপান্তরিত ও সঙ্কুচিত হইয়া বিংশতি মুদ্রায় পরিণত হইল। সে আজ দশ বৎসরের কথা।

এখন বহুকষ্টে বেতন কিছু বাড়িয়াছে; সেই সঙ্গে পরিবারও বাড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীর যত্নে এই সামান্য আয়েও সংসারে বিশেষ কষ্ট নাই। এখন আমার তিনটি সন্তান। স্মৃতির সহিত আর দেখা হয় নাই। শুনিয়াছি, সে এখন চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী। অনেক সময় আমি একটি কথা মনে করি, "সব যায়, স্মৃতি কখনও যায় না।"

('সাহিত্য', চৈত্র ১৩১১)

পথের দেখা

ন্যায়রত্ন মহাশয় অনেক ছাত্র প্রতিপালন করিতেন। আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য না হওয়াতে গৃহিণীর সহিত এ বিষয়ে অনেক বিচারবিতর্ক হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়ের পথ ধরিয়া বিচার করিতেন, গৃহিণীও যে অন্যায়ের পথ ধরিয়া অবিচার করিতেন, এ কথা বলিতে সাহস করা সুকঠিন। ফলটা শেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হইত। ন্যায়রত্ন নিজের উত্তরীয়ের অগ্রভাগে গৃহিণীর গলদশ্রুলোচন মুছাইতে মুছাইতে বলিতেন, "গৃহিণি, সংসারচিন্তা ত্যাগ কর। এ জগতে কে কার, কেবল পথের দেখা। সংসার তোমারও নয় আমারও নয়, যাঁর সংসারের ভার, তিনিই বহিবেন।"

সংসার-চিন্তা যে গৃহিণীর বড় অধিক ছিল, তাহা নয়। পতির দেবতুল্য কান্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া থাকিত, সংসার-চিন্তার সেখানে স্থান বেশী ছিল না। তবে শুভানুধ্যায়িনী প্রতিবেশিনীগণ যখন তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "হ্যাঁলা বউ, তোর আক্কেলটা কি? পণ্ডিতই না হয় পাগ্‌লা মানুষ; তা ব'লে তোর বুদ্ধিলোপ হ'ল নাকি? মানুষটা যে এত টাকা রোজগার ক'রে আনে সে কি কেবল বারোভূতকে খাওয়াতে? না হ'ল তোর হাতে দু' পয়সার সংস্থান, না হ'ল তোর গায়ে দু' তোলা সোনা। শেষের উপায় কিছু ভাবছিস কি?'—এই সমস্ত উপদেশে যখন ব্রাহ্মণকন্যার সংসার-চিন্তা সহসা সচেতন হইয়া উঠিত, তখনই স্বামীর দেখা পাইলে এ বিষয়ে একটু বোঝাপড়া হইত। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখা হইলে গৃহিণীর অত কথা মনে থাকিত না।

যাহা হউক, অবশেষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'পথের দেখা' শেষ হইয়া গেল। একদিন কোন্ অজানা নূতন পথে তিনি কোন্ দেশে চলিয়া গেলেন, তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি এত দিন যে সকল ছাত্রকে বিদ্যা, অন্ন ও স্নেহ দান করিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন, তাহারাও 'পথের দেখা'র সার্থকতা অনুভব করিয়া যে যাহার পথ দেখিতে লাগিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাধের চতুষ্পাঠী শূন্য পড়িয়া রহিল। যে গৃহ ছাত্রদিগের পাঠকলরবে মুখরিত হইত, সেখানে অতি কঠিন নিস্তব্ধতা গাম্ভীর্যের সিংহাসনে বসিয়া নীরব ভাষায় সংসারের অনিত্যতা প্রচার করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া শুভানুধ্যায়ী ও শুভানুধ্যায়িনীগণ বলিলেন, "আমরা তো তখনই বলেছিলাম, কাঙালের কথা বাসি হ'লে খাটে।"

ন্যায়রত্নতনয় রমানাথের শাস্ত্রচর্চায় তাদৃশ অনুরাগ ছিল না, সে গ্রাম্য ডিস্পেন্সরীতে বিনা মাহিনায় কম্পাউণ্ডারী করিত, লোকের সামান্য অসুখে চিকিৎসাও করিত। আহারের সময় ভিন্ন তাহার গৃহের সহিত সম্বন্ধ অতি

অল্পই ছিল। অতএব তাহার সংসারবুদ্ধি যে পিতা ও মাতা অপেক্ষা কোন বিষয়ে বা কোন ক্রমে অধিক হইবে, আশা করা অন্যায়।

যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেলে রমানাথ শূন্যহৃদয় লইয়া শূন্যগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহে তণ্ডুলমুষ্টি পর্যন্ত নাই। মাতা, বিধবা ভগ্নী, তাঁহার দুইটি শিশুসন্তান, শালগ্রামশিলা এবং একটি গাভী, স্থাবর ও অস্থাবরের মধ্যে ইহাই কেবল অবশিষ্ট আছে। ধূলিশায়িনী মাতা ও ভগ্নীর দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, সে পুরুষ; মাতা, ভগ্নী ও ভগ্নীর শিশু দুইটির ভার তাহারই উপর। তখন কি জানি, কোথা হইতে সেই সপ্তদশবর্ষীয় বালকের মনে অপরিসীম সাহস ও বলের সঞ্চার হইল; সেই সঙ্গে মনে মনে সঙ্কল্পও স্থির হইয়া গেল। তাহার পরদিনই রমানাথ বিদেশযাত্রা করিল, জননী ও ভগিনীর অশ্রু-স্রোত ও করুণ বিলাপ কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিল না।

"বাছা আমার ক্ষিদে সইতে পারে না, কে তার মুখের দিকে চেয়ে দুটি খেতে দেবে?" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জননীর ক্ষুধাতৃষ্ণা চলিয়া গেল। অনিদ্র জননী সারা রাত্রি ভূমিতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেন; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, "ওরে, আমি কি রাক্ষসী, পেটের দায়ে আমার দুধের বাছাকে বনবাসে দিলাম।"

এলাহাবাদে মিত্র মহাশয়ের সহিত ন্যায়রত্নের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, সেই ভরসায় রমানাথ তাঁহার গৃহদ্বারে গিয়া অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দারিদ্র্য যেমন আত্মীয়তা নষ্ট করে, এমন আর অন্য কিছুতেই নয়; কাজেই এখন আত্মীয়তার আশা করা দুরাশা, দুর্দশায় পড়িয়া রমানাথের এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। তবে এই ব্যবস্থা হইল যে, রমানাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্রকে দুই বেলা পড়াইবে এবং বেতনের পরিবর্তে আহার পাইবে।

ইহার পর রমানাথের ভাগ্য আরও একটু প্রসন্ন হইল, একজন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী কাজ তাহার ভাগ্যে জুটিয়া গেল।

চৈত্র মাস, বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। কালটা বসন্তকালই বটে, কিন্তু আম্রমুকুলের গন্ধ, ভ্রমরঝঙ্কার কি কুহুধ্বনির কোন উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না,—বর্ণনীয় বস্তুর মধ্যে রৌদ্র ও ধূলাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মলয়-সমীরণের পরিবর্তে 'লু' চলিতে আরম্ভ হইয়াছিল।

ঠিক এই সময় রমানাথ আতর সুঁইয়ার গলির একতলা বাড়ীখানির দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

'কড়া নাড়িল' না বলিয়া 'কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিল,' এ কথাটায় ভাবটা ঠিক বুঝা গেল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু 'আরম্ভ' 'শেষ'রূপে পরিণত হইতে যে অনেক বিলম্ব হইল, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

গলির সম্মুখের দ্বিতল বাটির জানালায় বসিয়া একটি বালিকা একমনে সেই দুয়ারের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার ব্যগ্রভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তাহার ক্ষমতা থাকিলে সে এখনই গিয়া দরজা খুলিয়া দিত।

অবশেষে বহুক্ষণের পর দরজা খুলিল। কড়ানাড়ার শব্দ থামিয়া যে গর্জন শব্দ শুনা গেল, তাহা এইরূপ—

"আর বাপু, তোমার জ্বালায় পারি না। বাবু ভাল এক আপদ জুটিয়েছে যা হোক। দুপুরবেলা মানুষ খেটেখুটে দুটা ভাত মুখে দিয়ে যে একটু ঘরে গিয়ে শোবে তার যো নেই। এই একটু শুয়েছি, আর তোমার কড়ার ঝন্‌ঝনানিতে ঘুম ভেঙে মাথা ধ'রে গেল।"

"ঝি, আজ একটু বেশী কাজ ছিল ব'লে দেরী হয়ে গিয়েছে—"

"কোন্ দিন বা তোমার সকাল সকাল হয়, তাই আজ দেরী হয়ে গেছে! ভাত নিয়ে ব'সে থাকতে থাকতে আমার যে প্রাণটা গেল।"

দ্বিতলের জানালায় বসিয়া উমা এই সমস্ত কথা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। রৌদ্রক্লিষ্ট, ক্ষুধা-পিপাসায় অবসন্ন প্রবাসীর ম্লান মুখ দেখিয়া হয়তো তাহার মনে করুণা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। রমানাথ ও ঝি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেও সে শূন্যদৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু ঝির সুমধুর গর্জন আবার শুনা গেল, এবার সুর মুদারা হইতে তারায় উঠিয়াছে।

"বিড়ালে ভাত খেয়ে গেছে, আমি তার কি করব বাপু? নিত্যি নিত্যি কে তোমার ভাত পাহারা দেবে? মাইনা দিয়ে কটা লোক রেখেছ?"

বিড়ালের এবং কাকের ভাত খাইয়া যাওয়া আজিকার নূতন ঘটনা নহে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত, এবং উমা তাহার সমস্ত ইতিহাসই জানিত।

ঝিয়ের কথা শেষ হইবার পরেই রৌদ্রক্লিষ্ট অনাহারী রমানাথ শুষ্কমুখে বাটী হইতে বাহির হইল, একতলা বাড়ীর দরজা আবার বন্ধ হইয়া গেল।

উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়া মুক্তার মত অশ্রুবিন্দুগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, উমা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, সে যে কাঁদিতেছিল, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। যখন তাহার দিদি আসিয়া বলিলেন, "জানালায় ব'সে মুখ ঢেকে কি হচ্ছে? তোর সেই ছোট ছেলের ছেলেটি মারা গেছে বুঝি? তাই কাঁদছিস?" তখন তাহার চমক ভাঙিল।

দিদির এই সম্ভাষণে উমা যখন মুখ তুলিয়া একটু হাসিল, তখন দিদি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, সত্যই যে কাঁদছিস্!"

উমাদের বাড়ী বাঙালীপাড়ায়। মধ্য দিয়া সরু সরু গলি গিয়াছে, গলির

দুই পাশেই বাঙালীর বাড়ী। অধিকাংশ বাঙালীই বহুদিনের প্রবাসী। দেশের কথা তাঁহারা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন।

উমার পিতাও বহুদিন হইতে কর্মসূত্রে এলাহাবাদ প্রবাসী হইয়াছেন। এলাহাবাদেই রমা ও উমার জন্ম হয়। পত্নী পরলোকগতা। কেবল এক পুরাতন দাসী ক্ষান্তকালীই দেশের স্মৃতির অবশিষ্টস্বরূপ ছিল।

পশ্চিমে বাঙালীর মেয়ের স্বভাবটা ঠিক বাঙালীর মেয়ের মত থাকে না। উমারও ছিল না।

প্রতিবাসিনী প্রবীণারা উমার নিন্দা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "বাপে আর বোনে আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়ে দিয়েছে। অমন আদুরে মেয়ে শ্বশুর-ঘর করবে কেমন ক'রে?"

কেহ কেহ বলিতেন, "শ্বশুর-ঘর কি আর করতে হবে? বাপ একটা ছেলে ধ'রে এনে বড় জামায়ের মত ঘর-জামাই ক'রে রাখবে।"

"হোক্ বাপু, তা ব'লে মেয়েছেলের এতটা আহ্লাদ ভাল নয়। আমাদের ঘরে কি আর মেয়ে নাই?"

উমার নামে যে এই সমস্ত অপবাদ, ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সন্তানহীনা রমাসুন্দরীর হৃদয়ের যত সঞ্চিত স্নেহ, উমাই সে সমস্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সেই যে দিন উমা ও রমা মাতৃহীনা হইয়াছিল, তখন রমা আট বৎসরের বালিকা, উমার বয়স আড়াই বৎসর মাত্র। সেই আট বৎসর বয়সেই রমা ভগিনীর প্রতিপালন, পিতার তত্ত্বাবধান ও গৃহিণীপনার ভার—সমস্তই লইয়াছিল; সে আজ দশ বৎসরের কথা। এই দশ বৎসরের ভিতর কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত ভাঙ্গা, কত গড়া হইয়াছে, কিন্তু উমা ও রমা এক সূতায় গাঁথা দুইটি ফুলের মত তেমনি স্নেহবন্ধনে বাঁধা আছে; এ স্নেহে দ্বেষ ও হিংসার ছায়া মুহূর্তের জন্যও পড়িতে পায় নাই।

মায়ের কথা উমার কিছুই মনে ছিল না। হরিহরবাবুর শয়নগৃহে তাঁহার চন্দনচর্চিত দুখানি খড়ম আছে, সেই খড়ম দুখানি উমার জননী নিত্যপূজার সময় প্রত্যহ পূজা করিতেন। এখনও হরিহরবাবু স্নানান্তে একবার সেই খড়ম দুখানির নিকট গিয়া দাঁড়ান, গৃহিণীর একখানি পুরাতন গাত্রমার্জনী সেখানে সযত্নে ভাঁজ করা আছে, কখনও বা সেইখানি লইয়া কপালের উপর চাপিয়া ধরেন। তাহার পর সেখানি ধীরে ধীরে যথাস্থানে রাখিয়া গৃহের বাহিরে আসেন। উমা সেই খড়ম দুখানি দেখিয়া মায়ের মুখ মনে করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু মায়ের মুখ মনে করিতে গেলে তাহার দিদির সেই সদাপ্রফুল্ল মুখখানি মনে পড়িত।

দিদির উপর উমার কথায় কথায় রাগ হইত, তখন দিদিকে কত সাধ্যসাধনা করিয়া মানভঞ্জন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন উমার আরও অনেক দোষ ছিল। শিশুকাল হইতে দিদি আর ক্ষান্ত ঝি ভিন্ন তাহার কোন সঙ্গী ছিল না, এজন্য সে লৌকিক লজ্জা শিক্ষা করিতে পারে নাই। বিবাহের কথায় যে কেন লজ্জা

করিতে হয়, তাহা তাহার বুদ্ধিতে কোনমতেই প্রবেশ করিত না। কাজেই প্রতিবাসিনী রমণীরা নাক তুলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, "মেয়েটা কি বেহায়া!"

নাতির শোকে উমা জানালায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, এ সংবাদ পিতার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। পিতার আহ্বানে উমা ঘরের কোণে লুকাইলে, রমা তাহাকে পিতার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিতা তাহাদের খেলার সাথী। পিতার নিকট তাহাদের কোন ভয় কি লজ্জা ছিল না। আজ সহসা উমাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া হরিহরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "রমা, একটা নূতন খবর শোন্, বুলবুল রাণীর আজকাল লজ্জা হয়েছে।" তাহার পরে দুই হাতে উমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রমা, উমার বিয়ে তো আর না দিলে নয়।"

রমা হাসিয়া বলিল, "এই যে বলেছিলে উমার বিয়ে দেবে না!"

"দিতে তো এখনও ইচ্ছা নাই।" বলিয়া হরিহরবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। খড়ম দুখানির নিকট অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, হয়তো সেই দুখানি কাষ্ঠপাদুকায় কত ভক্তি, কত প্রীতি, কত স্নেহ ও সেবার ইতিহাস লিখিত ছিল, হরিহরবাবু প্রতিদিন তাহাই পাঠ করিতেন, নহিলে খড়মের গায়ে এমন কিছু কারুকার্য ছিল না যে, প্রতিদিন দেখিয়াও তবু দেখা শেষ হয় না।

রমা সন্ধ্যা দিবার জন্য ঘরের দুয়ারে আসিয়া খড়মের কাছে পিতাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রদীপ হাতে লইয়া ফিরিয়া গেল, তাহার আর ঘরে প্রদীপ দেওয়া হইল না। ফিরিয়া গিয়া প্রদীপ রাখিয়া সে রন্ধনগৃহের দুয়ারে বসিয়া পড়িল, মায়ের কথা মনে পড়িয়া সহসা তাহার দুই চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল।

দিদিকে রান্নাঘরের দুয়ারে বসিতে দেখিয়া উমা আসিয়া তাহার কাছ ঘেঁষিয়া বসিল, কিন্তু দিদি যে চুপ করিয়া আছে, ইহা তাহার কিছুতেই ভাল লাগিল না। এমন সময় দিদির এক ফোঁটা চোখের জল তাহার হাতের উপর পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল।

"এ কি দিদি, তুই কাঁদছিস কেন?"

দিদির প্রতি উমার এই অযথা 'তুই' সম্বোধনের জন্য সে অনেকের নিকট অনেকবার তিরস্কৃত হইয়াছে, অবশেষে একবার উমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে দিদিকে আর 'তুই' বলিবে না—এবার হইতে 'তুমি' বলিবে। কিন্তু যখন সে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে গেল, তখন তাহার বিষম কষ্ট উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ও দিদি, দিদি রে, তোকে যে আমি 'তুমি' বলতে পারি নে রে।"

উমার কথার উত্তরে দিদি হাসিয়া বলিল, "তুই কেন দুপুরবেলা কাঁদছিলি?"

উমা অনুনয় করিয়া বলিল, "না দিদি, তোর পায়ে পড়ি, কি হয়েছে?"

রমা বলিল, "তোর মুখুয্যে মশায় বকেছেন।"

উমা হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িল। এ কথাটা এত অসম্ভব যে, তাহার বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইল না। সে নিশ্চয়ই জানিত, মুখুয্যে মশায় দিদিকে কখনই বকিবেন না, বরং দিদিই সুবিধা পাইলে তাঁহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়ে না।

তখন দিদি বলিলেন, "কাঁদছি কেন জানিস, তোর বিয়ে হবে, তুই আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবি তাই।"

উমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল। দেখিয়া দিদি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "মেয়েটার হ'ল কি?"

জানালার উপর উমা তাহার পুতুলের ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছিল। সেখানে প্রতিদিন কতই যে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ ঘটিত তাহার ঠিক নাই।

উমার বাড়ীতে নানারূপ ক্রিয়াকর্মে তাহার বাবার নিমন্ত্রণ হইত, দিদির নিমন্ত্রণ হইত, ক্ষান্ত ঝিও বাদ যাইত না। কিন্তু আজকাল তাহার পুতুলগুলি অষ্টপ্রহর লেপমুড়ি দিয়া ঘুমায়, আর সে সমস্ত দুপুরবেলা কাঠের গরাদের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরে বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। রমা কাজকর্ম শেষ করিয়া উপন্যাস হাতে লইয়া মাদুর বিছাইয়া শয়ন করে, দুই-চারি ছত্র পড়িতে না পড়িতে ঘুমে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসে। নীচের উঠান হইতে ক্ষান্তকালীর বাসনের ঝন্ ঝন্ ও ঝাঁটার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোথাও একটু খট্ খট্ শব্দ হইলেই উমা কড়ানাড়ার শব্দ মনে করিয়া চমকিয়া উঠে।

গলিটিতে বেশী লোকের চলাফিরা নাই। হয়তো কখন একটা চুড়িওয়ালা 'বেলোয়ারী চুড়ি' হাঁকিয়া যায়, হয়তো দুটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক পরস্পরের সুখদুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে চলিয়াছে, হয়তো দুটি তিনটি ছেলে এক সঙ্গে গোলমাল করিতে করিতে চলিয়া গেল, তাহার মধ্যে কখন যে একটি লোক আসিয়া সম্মুখের দুয়ারে দাঁড়াইবে, সেই প্রত্যাশায় উমা একাগ্রমনে পথের দিকে চাহিয়া থাকে।

ক্রমে যতই বেলা বাড়িতে থাকে, ততই তাহার মনের অস্থিরতাও বাড়িতে থাকে। এত বেলায় লোকের কতই ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইতে পারে, মনে ক্রমাগত এই কথার আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে হয়তো বেলা হওয়ার জন্য ঝি আজ কতই বকিবে,—হয়তো এতক্ষণ বিড়ালে ভাত খাইয়া গিয়াছে,—এই সমস্ত ভাবনায় ভয়ের সঞ্চার হয়। রমানাথের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে, অনুমানে বুঝিতে পারিলে উমার সে দিনটি সার্থক মনে হইত।

উমা যে এমন দিন দিন ধ্যানে তন্ময় হইয়া তপস্বিনী হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাহার নিরীহ দিদি কোন ক্রমেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন নাই। দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাটির পর তিনি সুস্থচিত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বোনটিকে চুল বাঁধিতে ডাকিতে আসিতেন এবং উমার বাড়ীতে অনেকদিন কোন ক্রিয়াকর্ম না হওয়ার জন্যও কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিতেন।

উমার এই প্রাত্যহিক ধ্যান একরূপ নির্বিঘ্নে চলিতেছিল। সহসা তাহার মধ্যে বিবাহের কথা আসিয়া পড়িয়া তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। এই বাতায়নখানির সঙ্গে যদি কেহ তাহার বিবাহ দিত, তাহাতে তাহার কোন আপত্তি ছিল না।

রাত্রে ক্ষান্ত তাহাকে ভাত খাইতে ডাকিতে আসিয়া দেখিল, উমা বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। দেখিবামাত্র ক্ষান্তর হৃদয়ে যে ভাবপ্রবাহ উপস্থিত হইল, তাহা কণ্ঠনালীতে উপস্থিত হইয়া তড়িদ্‌বেগে রন্ধনগৃহ পর্যন্ত ব্যাপৃত হইল. অতএব রমা রন্ধনগৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ শয়নগৃহে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন।

রমা বিছানার পাশে গিয়া অশ্রুজলপ্লাবিতা উমাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "পাগ্‌লি, সেই দুপুর থেকে কেঁদে কেঁদে যে চোখ রাঙা করলি! হয়েছে কি তোর?"

উমা দিদির বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, "বাবাকে ব'লো আমি বিয়ে করব না।"

কিন্তু পরদিনই হরিহরবাবু একটি বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিলেন। ছেলের বাপের পাটের কারবার আছে, সম্পত্তিও বিস্তর। বাপের একমাত্র ছেলে. ছেলেটি এল. এ. পড়িতেছে। উমা যখন তাহার পিসীর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিল. তখন পাত্রের পিতা তাহাকে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া তাঁহার মেয়েটিকে অতিশয় পছন্দ হইয়াছে, বৈশাখ মাসের প্রথমেই তিনি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন।

হরিহরবাবু রমার নিকট শুভসংবাদ দিতে গিয়া গৃহিণীকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ক্ষান্ত এই সংবাদ শুনিয়া এতই আনন্দিতা হইল যে, তৎক্ষণাৎ হরির লুঠ দিবার জন্য বাতাসা কিনিতে বাজারের অভিমুখে প্রস্থান করিল, অগত্যা তাহার অবশিষ্ট কাজগুলি রমাকে করিতে হইল।

সেদিন বাসন্তী দেবীর অষ্টমী-পূজা, আফিসের ছুটি ছিল, হরিহরবাবু জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বিবাহের বাজার করিতে গেলেন।

রমা কাজ সারিয়া উমার নিকট আসিয়া বলিল, "বুলবুলি, জানলায় কি তোকে পেয়ে বসল নাকি? আয়, চুল বেঁধে দি।"

সম্মুখের বাড়ীতে সজোরে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

রমা বলিল, "এবার যে মিত্তিররা খুব ঘটা ক'রে অন্নপূর্ণা পুজো করছে; আর বছর, পেলেগের যে মহামারী গিয়েছে, সেই জন্য উদ্‌যাপন করতে পারে নি। এবার বোধ হয় উদ্‌যাপন হবে।"

বলিদানের বাজনা কানে যাইবামাত্র উমার মনে একটি ভীত, কাতর, আর্ত ছাগবৎসের চিত্র উদিত হইল। গত বৎসর উমা যে বলিদানের দৃশ্য দেখিয়াছিল, —চারিদিকে লোকের কোলাহল, তাহার মধ্যে স্নাত জবামাল্য-পরিহিত সিন্দূর-চর্চিত উৎসর্গীকৃত ছাগ-বৎসটিকে হাড়িকাঠের কাছে আনা হইয়াছে। সে এত ভয় পাইয়াছে যে, 'মা' বলিয়া ডাকিতেও পারিতেছে না, কেবল অতি করুণ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতেছে, সেই চাহনি দেখিয়া উমা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সকলে তখন তাহাকে কত নিন্দাই করিয়াছিল, বাবা তখন তাহাকে কত আদর করিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত কথাই উমার মনে পড়িয়া গেল। সে দিদির কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া কাতরস্বরে বলিল, "দিদি, মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন? এই পূজা নিয়ে কি দেবতা প্রসন্ন হবেন?"

দিদি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "ছিঃ, ও-কথা বলতে নাই।"

ক্ষান্তর হরির লুঠ দেওয়া শেষ হইলে সে প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইল। উমা রাজরাণী হইবে—ইহা যে ক্ষান্ত চক্ষে দেখিবে, এত সুখ যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, এই চিন্তায় তাহার রোদন অনিবার্য হইয়া উঠিল।

উমা দিদির দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "দিদি, বাবা বুঝি আমাকেও সিঁদুর মাখিয়ে বলি দেবেন?"

রমা পিতার নিকট গিয়া বলিল, "জ্বরটা বলির বাজনা শুনে ভয় পেয়েই হয়েছে, নইলে এত প্রলাপ বকবে কেন? যা হোক বাবা, তুমি একবার ডাক্তার জ্যাঠাকে ডাকতে পাঠাও।"

কিছুক্ষণ পরে হরিহরবাবু ডাক্তারবাবু ও তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন।

ডাক্তারবাবুর সহিত এ পরিবারের বহুদিনের সম্বন্ধ, তিনি উমা ও রমাকে ছেলেবেলা কোলে করিয়াছেন, তাঁহার নিকট রমার কোনই সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে দেখিয়া সে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ও-ছেলেটি বড় ভাল, শুনলাম জ্বরটা বেশী, যদি তাড়াতাড়ি কোন ঔষধ আনাতে হয়, তাই ওকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। ওকে দেখে কিছু লজ্জা করতে হবে না।"

উমা শুষ্ক লতার মত বিছানায় পড়িয়া ছিল, তাহার জ্বরক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রমানাথের প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল।

উমা তখন প্রলাপ বকিতেছিল, "দিদি, দুটো যে বেজে গেল, এখনও কেন

কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে না? এত বেলায় মানুষের কত ক্ষিধে পায় বল দেখি। এলে পরেই আবার ঝি কত বকবে!"

রমা উমার মুখের উপর মুখ নত করিয়া বলিল, "উমা, উমা, কি বলছিস?" তাহার পর ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সমস্ত রাতই এমনি বকেছে। বোধ হয়, ভয় পেয়ে জ্বরটা হয়েছে, তাই এত বকছে।"

ডাক্তারবাবু হরিহরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, "এত বেশী ব্যস্ত হইবেন না।"

উমা সহসা বিছানায় উঠিয়া বসিল, বলিল, "দিদি, দেখ্, দেখ্, জানলায় গিয়ে দেখ্, ওই বুঝি কড়ানাড়ার শব্দ হচ্ছে।"

রমা অশ্রু মুছিয়া বলিল, "জ্যাঠামহাশয়, জ্বরটা কি খুব বেশী হয়েছে? সমস্ত দিন জানলায় থেকেই বুলবুলি অসুখটি বাধালে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "জানলাটা দেখি?" বলিয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমানাথ ও হরিহরবাবুও তাঁহার সংগে আসিলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমা, ভয় পাওয়ার কথা বলছিলে, ভয় পাওয়ার কারণটা কি?"

"মিত্র-বাড়ীতে অন্নপূর্ণা-পূজা হচ্ছিল, বুলবুলি জানলায় ব'সে বলিদানের বাজনা শুনেছিল।"

"মিত্র-বাড়ী? ওঃ! রমানাথ, এই বাড়ীতেই তুমি থাক না?"

রমানাথ মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উমার প্রলাপের সমস্ত অর্থই এখন তাহার নিকট অতিশয় স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "বুলবুলি কি সমস্ত দিন এই জানলায় থাকত?"

"সমস্ত দুপুর এই জানলায় ব'সে খেলা করত।"

"ওঃ, গলিটা কি কদর্য! এই গলির দূষিত বাতাসেই রোগের উৎপত্তি হয়েছে।" বলিয়া ডাক্তারবাবু হরিহরবাবুর হাত ধরিয়া পাশের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হরিহরবাবু অবসন্নভাবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রোগটি কি কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে?"

ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর শান্ত স্বরে বলিলেন, "বিপদের সময় অধৈর্য হওয়া পুরুষের উচিত নয়। জ্বর অতি কঠিন, বিকারে পরিণত হইয়াছে, প্লেগ হইলেও হইতে পারে। তবে এখন অবধি নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখা যায় নাই।"

মিত্র-বাড়ী হইতে সজোরে অন্নপূর্ণার বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল; গলিতে একটা ছেলে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"শুধু পথের দেখা দু' দণ্ডেরি তরে।"

('জাহ্নবী', বৈশাখ ১৩১৩)

পুরানো ডায়েরী

১৫ই কার্তিক, মঙ্গলবার। আজ তৃতীয়া তিথি, পালামৌ আসিবার পর আজ বিশেষ করিয়া বাড়ীর কথা মনে পড়িতেছে, কেননা, বাড়ী হইতে যেদিন আসি, সেদিনও শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। আজ বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে আসীন হইয়া কম্বল জড়াইয়া যেমন একদৃষ্টে রেখা-চাঁদখানিকে দেখিতেছি, সেদিনও ট্রেন হইতে এই রকমই দেখিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত বেশীক্ষণ দেখা হইল না, কেননা, জ্বর আসিয়া পড়িল। ওঃ! সেদিন ট্রেনে যে ভিড় সে ভিড়ের কথা সহজে ভুলিতে পারিব না। সেদিনের বাষ্পরথযাত্রা জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা। আচ্ছা, মহাপূজার সময় পশ্চিমের গাড়ীতে বাঙ্গালী-যাত্রীর এত আধিক্য কেন? এটা আমার কাছে কিছু আশ্চর্যের বিষয় মনে হইয়াছে। আমিই না হয় মূর্খের মত গৃহাগতা মহামায়ার চরণপূজা অপেক্ষা সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে বসিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি-বিষয়ক ধ্যানটাই শ্রেয় মনে করিয়াছি; কিন্তু তাহা বলিয়া সকলেই যে আমার মত মূর্খ হইবে, এ কথা আমি ভাবিতেই পারি না। পূজার সময় দেশছাড়া—বাড়ীছাড়া হওয়া যে কত কষ্ট, আমি সে বিষয়টি খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি। আমার এ ডায়েরী দেখিলে লোকে আমাকে ছেলেমানুষ ভাবিবে; কিন্তু সত্য কথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, ষষ্ঠীর দিন সকালে উঠিয়া যখন প্রথমে আলোর মুখ দেখিলাম, তখন প্রাণের ভিতর শোকের মেঘ যেন অন্ধকার করিয়া আসিল। সত্যই শোকের মেঘ! যখন মনে হইল, বাড়ীতে এতক্ষণ বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে, তখন পুরুষ হইয়াও স্ত্রীলোকের মত চোখের জল ফেলিয়াছি, সোজা কথায় বলিতে গেলে, ঝাড়া আধ ঘণ্টা কাঁদিয়াছি। সেই যে উঠানে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল, সে কি আনন্দ, কি আনন্দ! সে আনন্দ কি বুঝানো যায়? আর মনে পড়ে, সেই বিজয়ার কোলাকুলি। এখানে কোলাকুলি করিবার লোকই খুঁজিয়া পাই না। বন্ধুবর সাহেবী মেজাজের লোক, তাহাতে আবার হাকিম মানুষ। অষ্টপ্রহর প্যাণ্ট্‌কোট্‌ লইয়া যাঁহার কারবার, তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি বড় সুবিধা হয় না; তা বলিয়া আমি ছাড়িবার পাত্রও নই। তাঁহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াছিলাম, আর তাঁহার তিন বছরের মেয়ে কুন্দর সঙ্গে খুব ভাল করিয়া কোলাকুলি করিয়াছিলাম, তা ছাড়া দু'-একজন 'সেইয়া-মেইয়া' যাহাকে পাইয়াছিলাম, তাহারই সহিত কোলাকুলি করিয়াছি। সেদিন কি মনে হয় না যে, আজ যাহাকে কাছে পাই, তাহাকেই কোল দিই, যে কাছে আসে, তাহাকেই বুকে ধরি! মা বিদায়ের দিনে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কি ভালবাসার বাঁধনেই মিলাইয়া দিয়া যান! সেদিন আমাদের কি শুভদিন, মহা-মিলনের দিন! সেদিন কি আর হাড়ি ডোম বলিয়া ঘৃণা হয়? ধনী দরিদ্রের পার্থক্যে কোন

সঙ্কোচ মনে আসে, না, শত্রুকে শত্রু বলিয়া মনে হয়? বৎসরের ভিতর একটি দিন। তা হোক্, সেই একদিনেই আমাদের সমস্ত বৎসরটা সার্থক হয়। সেই একদিনেই সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান, সেই একদিনেই মিলনের ভিতর সমস্ত বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি!

আর একদিন কাল গিয়াছে। ভাই-দ্বিতীয়ার দিন। কাল সরযূ আমাকে ফোঁটা দিয়াছিল। সরযূ আমার আশ্রয়দাতা গৃহকর্তা বন্ধুবর প্র—র সকলের ছোট বোন। (N. B. প্র—র সম্বন্ধে মান্য করিয়া অনেকটা বিশেষণ জুড়িয়া দেওয়া গেল।) গত বৎসর তাহার বিবাহের সময় এত ঘটা হইয়াছিল যে, তার বিবরণ লিখিতে আমার ডায়েরীর সম্পূর্ণ আটটি পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছিল। মেয়েটি দেখিতে ভারি সুন্দর। এমন কালো চুল, এমন সুন্দর ভ্রূ, আর এমন বড় বড় কালো চোখ! আমার দেখিতে ভারি ভাল লাগে। কিন্তু সে এমন লাজুক যে, আমি এক মাস হইল আসিয়াছি, তাহার মধ্যে কাল কেবল আমার সম্মুখে আসিয়াছিল। চন্দনের বাটীতে আঙ্গুল ডুবাইয়া সে যখন বিড় বিড় করিয়া

> "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
> যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।"

বলিয়া আমার কপালে ফোঁটা দিলে, তখনই আমার মিনি পাগ্লীর কথা মনে পড়িয়া গেল। মিনিতে আর এতে কই আমি তো কিছু তফাত দেখিতে পাই না, সে একটা মিনি আর এ একটা মিনি। সে না হয় মিনি পাগ্লী, আর এ না হয় সরযূ পাগ্লী। সে দুড়্দাড় করিয়া আসিয়া "দাদা, দাদা" করিয়া ডাকিয়া চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তোলে, এ আবার আর এক রকম, ভূঁয়ে পা পড়ে কি না পড়ে, আস্তে আস্তে চলে, আর লজ্জায় কারুর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতেই পারে না। এই রকম কত ধরণের কত যে পাগ্লী আছে, তাহার ঠিকানা নাই। ওই যে রাস্তা দিয়া হিন্দুস্থানীর মেয়েটি চুবড়ি মাথায় করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ওটিও মিনিরই আর এক মূর্তি, বুধিয়া পাগ্লী কি দুলিয়া পাগ্লী, এই রকম একটা কিছু হবে; ও যখন বাড়ী গিয়া মাথার চুবড়ি ফেলিয়া "ভাইয়া হো!" বলিয়া ওর ভাইকে ডাকিবে, তখন দেখিলেই মনে হইবে, মিনি আর কোথায় আছে!

আমার সকলের সঙ্গেই ভাব করিতে ইচ্ছা করে, আড়িটা ভারি অপছন্দ জিনিস। হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে যদি হিন্দুস্থানী হইয়া মিশিয়া যাইতে পারি, কোলেদের সঙ্গে, সাঁওতালদের সঙ্গে যদি ভারী একটা বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিতে পারি, সে কেমন সুন্দর হয়! কিন্তু সে পক্ষে একটি বাধা,—সে বিষম বাধা! সে বাধাটি হইল আমার ভাষাজ্ঞানের অল্পতা। বাস্তবিক নিজের মূর্খতা দেখিয়া নিজের উপর বিষম রাগ ধরিয়া যায়! প্র— কেমন হিন্দুস্থানী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া যায়, যেন সে সেই দেশেই জন্মিয়াছে! কিন্তু আমার কি দুর্দশা, একটা কথা যদি অনেক কষ্টে জুটাইয়া আনি, তবে তাহার সঙ্গে জোড়া

দিবার মত আর একটি খুঁজিয়া পাই না। যদি বা দ্বিতীয় শব্দটিও অনেক কষ্টে মিলাইয়া তুলি, তৃতীয়টির বেলায় তো একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

আজ কোর্ট খুলিয়াছে, কাজেই বন্ধুবর ধড়াচূড়া পরিয়া আদালত-তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। আমি সমস্ত দিন কাব্য-পাঠেই সময় কাটাইয়াছি, আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তাই ক্রমাগত মনে পড়িতেছিল,—

"শাম্‌লা বাঁধিয়া নিত্য
তুমি কর ডেপুটীত্ব
একা প'ড়ে মোর চিত্ত
করে ছট্‌ফট্‌।"

১৭ই কার্তিক, শুক্রবার। আজ সকাল থেকে একটু একটু মেঘ করিয়াছে, সেজন্য শীতটা কিছু কম বোধ হইতেছে।

আজ কোর্টে গিয়াছিলাম, সমস্ত দিনটা কেবল "হাজির হো" চীৎকার, সওয়াল-জবাব, জেরা, বাদ-প্রতিবাদ, আর লোকের ভিড়। মনটা আজ ভারি শ্রান্ত, যেন তার উপর একটি প্রকাণ্ড ভার চাপিয়া আছে। বন্ধুবর নবীন ডেপুটী, তাঁহার বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া, তিনি যে শীঘ্রই প্রমোশন পাইবেন, এ অনুমান মাথায় আসা আশ্চর্য নয়। আমি যদি ডেপুটী হইতাম, তাহা হইলে কি রকম বিচারপ্রণালীর পক্ষপাতী হইতাম, তা এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। হয়তো সোনার কাঠি ছুঁইয়া রাজকন্যা যেমন জাগিয়া উঠিত, আমার নির্জীব বিচার-বুদ্ধিও তেমনি ডেপুটীর আসনে উপবেশনের ফলেই সজাগ হইয়া উঠিত।

একটা বিচারের দৃষ্টান্ত ডায়েরীর পাতায় লিখিয়া রাখিব। চুরি করা অপরাধে দুল্‌হা মাঝির এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল। চুরিটা পকেট-কাটাও নয়, সিঁধ-কাটাও নয়, রাস্তা দিয়া গমের গাড়ী যাইতেছিল, দুল্‌হা তার পিছনে ছিল। বস্তার ফুটা দিয়া গম রাস্তায় পড়িতেছিল, দুল্‌হা তাই কুড়াইয়া কোঁচড় বোঝাই করিয়াছে, এই তার অপরাধ। এখন কথা হইতেছে, বস্তায় ফুটা হইল কি করিয়া? গাড়োয়ান বলে—তার বস্তায় ফুটা ছিল না, ফুটা থাকলে কি আর এত পথ গম পড়ত না? দুল্‌হাই দুষ্টামী ক'রে বস্তায় ফুটো ক'রে দিয়েছে। দুল্‌হাকে জিজ্ঞাসা করিলে, দুল্‌হা বলিল—সে ইচ্ছা করিয়া ফুটা করে নাই, তবে তাহার হাতে টাঙগী ছিল, টাঙগীর গুঁতা লাগিয়া ছিদ্র হইতে পারে। বেচারী সাঁওতাল, মিথ্যা কথা বলা তাহার অভ্যাস নাই, মিথ্যা বলিতে গেলেও সত্য কথাই বলিয়া ফেলে। যখন তাহাকে আদালত হইতে প্রশ্ন করা হইল—অন্যের গম জানিয়াও সে কেন লইতেছিল, তখন দুল্‌হা উত্তর দিল, "চার রোজ হইতে তার ঘরে দানা নাই।" এই উত্তর শুনিয়া আদালতে একটা হাসির ধ্বনি উঠিয়াছিল। হাসিবার কথাই বটে। তোমার ঘরে দানা নাই বলিয়াই কি তুমি পরের ঘরে সিঁধ দিবে?

আমার মনের ভাবটা আমি যে ডায়েরীর পাতায় কালির অক্ষরে ঠিক বসাইয়া যাইব, এমন ক্ষমতা আমার নাই। তবে এক কথায় বলিতে পারি, আমার মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। কেন আঘাত লাগিয়াছিল, এ কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। চুরি করিয়া চোর দণ্ড পাইবে ইহা তো সমাজ-রক্ষার জন্য অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে দুঃখ করা অনুচিত। আমি জানি না যে, তা নয়, কিন্তু সব চুরিই কি একরকমের চুরি? চুরি করিলেই সে চোর, কেন চুরি করিয়াছিল, তাহার খবর আর কে রাখে?

সকলেই বলাবলি করিতেছিল, দুলুহা বড় দাঙ্গাবাজ, বড় অহঙ্কারী। আমি সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, সওয়াল-জবাব বুঝা আমার অসাধ্য; তবে কতক অনুমানে, কতক জিজ্ঞাসা করিয়া, এইটুকু মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝিয়া লইয়াছিলাম। আমি একবার অপরাধীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। দীর্ঘদেহ সাঁওতাল, সম্ভবত এককালে খুব বলিষ্ঠ ছিল, কিন্তু এখন বোধ হয়, অন্নাভাবেই শরীর নিতান্ত জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পিঠের মেরুদণ্ডও একটু বাঁকিয়াছে। শীর্ণ মুখের ভিতর বড় বড় চোখ দুটি, তাহার উপর কি হুকুম হয় শুনিবার জন্য যেন আশঙ্কা আর উদ্বেগে জ্বলিতেছিল। সেই চোখের চাহনিতেই যেন বুঝাইয়া দিতেছিল, 'আমার ঘরে দানা নাই', সেই দৃষ্টি আমার প্রাণের ভিতর গিয়া ছুরির মত আঘাত করিতে লাগিল। আমি আর সে চোখের সম্মুখ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না, কেবলই আমার চোখের উপর তাহার সেই শিরা-বহুল দীর্ঘ শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বিবর্ণ ম্লানমুখ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার সমস্ত আকৃতিটাতেই যেন লেখা ছিল, 'আমার ঘরে দানা নাই'। কিন্তু যখন সে শুনিল যে, তাহার এক মাস কারাবাসের হুকুম হইল, তখন এক মুহূর্তের জন্য তাহার রক্ত-শূন্য বিবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে সজোরে তাহার দুই হাত মুঠা করিয়া ধরিল, রক্তবর্ণ চোখে বিচারপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে মুঠাবাঁধা দুই হাত একবার উপর দিকে তুলিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া তাহার জাতীয় ভাষায় কি যেন বলিল, তাহার একবর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি আর বেশীক্ষণ আদালতে না থাকিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

দুলুহা মাঝি আজ যেন ভূতের মত আমার ঘাড়ে চাপিয়াছে। যতই বই খুলি, যতই পাতা উল্টাই কেবল সেই চেহারাই মনে আসে। চেহারাটা ঠিক যেন মূর্তিমান্ নৈরাশ্যের মূর্তি। এক মাস জেলের হুকুম তো আর ফাঁসির হুকুম নয়, তবে ওর অতটা নিরাশ হইবার কারণ কি? কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মুক্ত বাতাসে আকাশের নীচে ইচ্ছামত আহার-বিহার, শয়ন-ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে বন্দীত্বের কষ্ট কি অনুভব করা যায়?

একা-একা কি করা যায়, মনটা বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, মালী গিরিধারীলাল ফুলের তোড়া লইয়া আসিল দেখিয়া, তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিলাম। আমি আমার স্ব-রচিত ভাষায় কথাবার্তা চালাইলাম, গিরিধারী

অবশ্য তাহার দেশীয় ভাষাতেই উত্তর দিয়াছিল; কিন্তু সে কথাগুলি তো আর আমার মুখস্থ হয় নাই, কাজেই আমি আমার দেশীয় ভাষাতেই তাহা ডায়েরীর পাতায় লিখিয়া রাখিব।

"আচ্ছা গিরিধারী, তোমার কয়টি লেড়্কা-লেড়্কী?" আমার প্রশ্ন শুনিয়া গিরিধারী ভারী খুসী; আমি দেখিয়াছি, লেড়্কা-লেড়্কীর কথা তুলিলেই লোকের সঙ্গে খুব শীঘ্র বন্ধুত্ব জমিয়া উঠে।

গিরিধারী তোড়াটা টেবিলের উপর ফুলদানীতে রাখিয়া ম্যাটিংএর উপর আসন গ্রহণ করিল; বলিল, "বাবু সাহেব, আমার তিন লেড়্কা, আর দুটি লেড়্কী ছিল, এখন ভগবানজী কেবল তিনটিকে রাখিয়াছেন!"

প্রশ্নোত্তরে ক্রমশ তাহার বৃদ্ধা মা, একটি ছোট বোন ও একটি ভাই আছে, ভাই পুরুলিয়ায় সাহেবের নিকট কর্ম করে, ইত্যাদি সমস্ত সংবাদই জানিয়া লইলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মাহিনা তো ছয়টি টাকা, এবার যেমন অজন্মা, তাহাতে তোমাদের কি করিয়া চলে?"

আমার প্রশ্নে গিরিধারী ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিল যে, তাহারা গমের রুটি খাইতে পায় না, মাড়ুয়া খোসাশুদ্ধ পিষিয়া তাহারই রুটি খায়, জমিতে কিছু মাড়ুয়া হয়, আর ভাইয়া মাসে মাসে দুটি টাকা পাঠাইয়া দেয়।

গিরিধারীলালের বাড়ী এখান হইতে কিছু দূর 'দেহাত' অর্থাৎ পল্লীগ্রামে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি দুল্‌হা মাঝিকে চেন?"

গিরিধারীলাল বলিল, "তাহার বাড়ীর নিকটেই দুল্‌হার বাড়ী। দুল্‌হার স্ত্রী আর দুটি ছেলে আছে।"

ক্রমশ প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, দুল্‌হার স্ত্রী গ্রামেরই মেয়ে, খুব খাপ্‌সুরৎ অর্থাৎ সুন্দরী এবং তাহার স্বভাব বড় ভাল। সে প্রায় এক মাস পীড়িত অবস্থায় শয্যাগত আছে।

আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছেলে দুটিকে দেখে কে?"

গিরিধারীলাল উত্তর দিল, "ভগবানজী।"

সন্ধ্যার পর বন্ধুবরের সঙ্গেও দুল্‌হার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। বন্ধুবর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ দুল্‌হা মাঝিকে দেখেছিলে? বেটা ডাকাত, ওর অসাধ্য কিছু নাই। যে রকম সাপের মত গজ্‌রাতে লাগল, আমার ভয় হচ্ছে, জেল থেকে ফিরে এসে আমার বাংলায় আগুন না ধরিয়ে দেয়।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে কিছু আশ্চর্য নাই। তোমরা অপরাধের সংখ্যা কমাইতে চেষ্টা কর কিনা জানি না, কিন্তু বাড়াইয়া তোল ইহা নিশ্চয়।"

প্র— বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসে? অপরাধ করিয়া দণ্ড না পাইলেই অপরাধীর সংখ্যা কমিয়া যাইবে, বুদ্ধদেবের কি এইরূপ মত?"

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, "বিচারপতি মহাশয়, প্রথমে জানিতে চাই, চুরি করা কাহাকে বলে?"

"কেন? ছেলেবেলার পড়া একেবারেই ভুলিয়াছ—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়?"

"আর জোর করিয়া পরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে কি হয়?"

"ডাকাতি।"

আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "ন্যায়-দণ্ডধারক, আমার একটি প্রশ্ন মীমাংসা করুন। রোজ রোজ যে ছাগলের ছানাগুলিকে মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া রসনা-তৃপ্তির জন্য বলি দেওয়া হয়, এটা কোন্ ধারার ভিতর পড়ে? মায়ের কি ছেলের উপর দাবী নাই, না, ওই বেচারা বাচ্চাগুলির নিজের প্রাণের উপরও অধিকার নাই? আপনার আইন-গ্রন্থ খুলিয়া একবার অনুগ্রহ করিয়া অধিকার-তত্ত্বটি দেখিবেন কি? এই রকম আত্মস্বার্থের জন্য জোর করিয়া পরের প্রাণ কাড়িয়া লওয়াকে—কি বলা যাইতে পারে, চুরি না ডাকাতি?"

ডেপুটী সাহেব শুনিয়া এত জোর হাসিলেন যে, কুন্দ ব্যাপার কি জানিবার জন্য পর্দা ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিল। হাস্যবেগ কিছু মন্দীভূত হইলে বলিলেন, "সাধে বলি বুদ্ধদেব! কিন্তু তুমি যে দেখছি আদালত থেকে একেবারে রাজ-নীতি-ক্ষেত্রে এসে পড়লে! এ সব বিষয়ে বিধান দিতে আমার সাহস নেই।"

১৮ই কার্তিক, শনিবার। দুই দিন হইতে আমার শরীরটা কিছু অসুস্থ বোধ হইতেছিল। কাল রাত্রে মাথার ভারি যন্ত্রণা হইয়াছে। বন্ধু বলেন, "ওসব কিছুই নয়, তোমার স্নায়ুর দৌর্বল্য, স্নায়ুর উত্তেজনা কিছু অতিরিক্ত।" তাহা আমিও অস্বীকার করি না। স্নায়ুর দৌর্বল্যের জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক সকালে একটু জ্বর হইয়াছিল, পালামৌ আসিবার পর আর আমার জ্বর হয় নাই। কয়েক ঘণ্টা শয্যাগত ছিলাম, অবশেষে স্নায়ুর উত্তেজনায় শয্যা অসহ্য হইয়া উঠিল। বাড়ীর কাছেই একটি ছোট নদী আছে, নদীর নাম কৈল নদী। নদীর ধারে—নদীর ভিতরে যে কত বর্ণের, কত আকারের ছোট বড় সুন্দর সুন্দর পাথর আছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই সমস্ত নানা গঠনের চিত্রবিচিত্র পাথরের উপর দিয়া নদীর স্বচ্ছ-ধারা বহিয়া যায়। আমি এই ছোট নদীটিকে বড়ই ভালবাসি। পালামৌ ছাড়িয়া যাইবার সময় আমার নিশ্চয় এই নদীটির জন্য প্রাণ কেমন করিবে।

নদীর ধারে প্রায় আধ ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম, তাহার পর দূরে একটি চলিষ্ণু বংশছত্র দেখিয়া বুঝিলাম, বাগানের মালী গিরিধারীলাল কুর্মী আসিতেছে। গিরিধারীলাল নিকটে আসিয়া আমাকে রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইল, বলিল, "বাবু সাহেব, আজ আপনার জীউ আচ্ছা নাই, তবে ধূপে বসিয়া আছেন কেন?" আমি বুঝিলাম, আমার সঙ্গে গিরিধারীর বন্ধুত্ব ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আজ আর তাহার কিছু বিশেষ কাজ নাই বলিয়া সে এক বেলার ছুটি নিয়া বাড়ী যাইতেছে। আমি বলিলাম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, দুল্‌হা মাঝির ঘর আমাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।" তাহাকে কিছু পুরস্কার দিবার ভরসাও দিলাম।

আমার কথা শুনিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া থাকিল। তাহার পর "বড় ধূপ", "সে স্থান এখান হইতে অনেক দূর" ইত্যাদি নানা আপত্তি করিতে আরম্ভ করিল। পুরস্কারের ভরসা সত্ত্বেও তাহার এতটা অনিচ্ছার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, গিরিধারীলাল রৌদ্রকে বড় ভয় করে, তাহার মস্তকে সর্বক্ষণ বিরাজিত বংশছত্রটিই তাহার প্রমাণ; কিন্তু রৌদ্রে বেড়াইলে আমার অসুখ বাড়িবার আশঙ্কায় পুরস্কারের প্রলোভন ত্যাগ করাটা কিছু অতিরিক্ত স্বার্থত্যাগ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আমার আগ্রহে গিরিধারী অবশেষে সম্মত হইলেও, তাহাকে বড় অপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার অহঙ্কার ছিল যে, আমি খুব রৌদ্রে ঘুরিতে পারি: কিন্তু দুল্‌হা মাঝির বাড়ী পেঁাছাইতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া গেলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল। এ পথের কি আর শেষ নাই? কত ধানের ক্ষেতের আল, কত চোরকাঁটার জঙ্গল, কত উঁচুনীচু মাঠ যে পার হইয়া আসিয়াছি, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। বোধ হয়, তিন চার ক্রোশ রাস্তা পার হইয়া আসিয়াছি, এখনও গ্রামের দেখা নাই। যত জিজ্ঞাসা করি—"আর কতদূর আছে," সেই একই উত্তর শুনি—"বাবু সাহেব লগিজ।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক চলিয়া দুল্‌হা মাঝির 'ডেরা'য় পেঁাছিলাম। 'ডেরা' তো 'ডেরা'ই, একখানা মাঝারি খড়ের ঘর আর তাহারই সামনে একটু চাল দেওয়া দাওয়ার মত। ঘরের চারিপাশে জঙ্গলের মত বেড়া, সেই বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া গিরিধারী ডাকিতে লাগিল, "আগে মাঝিয়ান, মাঝিয়ান হো!" কিন্তু মাঝিয়ানের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ঘরের ভিতর হইতে একটা অস্পষ্ট গোঙানির মত শব্দ আসিতেছিল, শুনিয়া আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা সঙ্গত মনে করিলাম না; কাঁটার বেড়া টপ্‌কাইয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইলাম দেখিয়া গিরিধারী ভয় পাইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ঘরের ভিতর গোঙানির শব্দ শুনিয়া বুঝি কূর্মী-পুত্রের দিনের বেলাতেই ভূতের ভয় হইয়াছে; কিন্তু পরে বুঝিলাম ঠিক তাহা নয়। গিরিধারীলাল এতক্ষণের পর তাহার ভাব স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া ফেলিল, বলিল, "বাবু সাহেব, ভিতর মৎ যাইয়ে, দুল্‌হা মাঝি বড়ি দাঙ্গাবাজ আদ্‌মী, কোই জানে কোন্ ফাসাদ্ করেগা।"

আমার শরীরটা পরিশ্রমে অবসন্ন, মাথা ঘুরিতেছিল, তবু গিরিধারীর কথা শুনিয়া হাসি আসিল; এতক্ষণে বুঝিলাম, "মাঝিয়ান খাপ্‌সুরৎ" শুনিয়াই আমি

এতটা পথ পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি, গিরিধারীলাল অনুমান দ্বারা এই রকম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে।

যাক্, সে যা ভাবে ভাবুক না কেন, আমার তাহা লইয়া মাথা ঘামানোর সময় ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি বেড়া টপ্‌কাইয়া গিয়া ঘরের আগড় খুলিয়া ফেলিলাম, গিরিধারীও আমার পিছনে আসিল।

রৌদ্র হইতে ভিতরে আসিয়া প্রথমটা সব যেন অন্ধকার ধোঁয়ার মত বোধ হইতেছিল। তারপর দেখিলাম, ঘরের দুয়ারের পাশেই একটি কঙ্কালসার শিশুমূর্তি, আমাদের দেখিয়া সে হামা দিয়া আমাদের কাছে আসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু উঠিবার উপক্রম করিবামাত্র পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠনালী হইতে একটি অস্ফুট শব্দমাত্র বাহির হইল। তাহার একটু তফাতে আর একটি চার-পাঁচ বৎসরের ছেলে মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, সে এতই শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে প্রথমটা নিদ্রিত কি মৃত তাহা বুঝা যায় না।

ছেলে দুটিকে দেখিবার পর তাহাদের মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সে তখন অতি কষ্টে উঠিয়া ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল দিয়া কোন রকমে আপনাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তাহাদের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল, "বাবুয়া হামারা অন্ বিন্ মর্ গেই, তিন রোজসে ঐসিন পড়ল্ রহা", অর্থাৎ আমার বাছারা অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছে, তিন দিন থেকে এইভাবে পড়িয়া আছে। আহা বাছা রে! তোর বাছারা মরিয়াছে বলিতেছিস, তোরই বা মরিবার বাকি কি আছে?

যাহাদের অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয় নাই, তাহারা যদি আমার ডায়েরী পড়ে তাহা হইলে হয়তো ভাবিবে, আমি কিছু অতিরঞ্জন-প্রিয়; কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, আমি যে দুরবস্থা চোখে দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। আশ্চর্য কাণ্ড! গাঁয়ে কি লোক নাই? গিরিধারী বলিল, "সকলেরই প্রায় এক অবস্থা, কে কাহার খোঁজ লইবে?"

বেশ কথা! তবে সকলেরই দেখিতেছি ঘরে সিঁধ দেওয়ার মত অবস্থা। আমার বন্ধুর কার্যের সাহায্যের জন্য শীঘ্রই সহযোগী আবশ্যক হইবে বোধ হয়। আমি এখন বেশ বুঝিলাম, দুল্‌হা জেলে যাইবার সময় তাহার ঘরে যে স্ত্রী পুত্র অনাহারে মরিবে এ কথা বুঝিয়াই জেলে গিয়াছিল।

যাহা হউক, আমার তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিবার সময় ছিল না। গিরিধারীর হাঁকডাকে জনকতক লোক জড় হইল। তাহাদের ভিতর দু' তিন জনকে দুধের সন্ধানে আর দু' তিন জনকে ডুলির সন্ধানে পাঠাইলাম। গিরিধারী সত্যই বলিয়াছিল, সকলেরই প্রায় একরকম অবস্থা।

বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রি বলিয়া অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টিকে হাসপাতালে পোঁছাইয়া দিলাম। আমার বন্ধু আমার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে চুরুট

মুখে ঘন ঘন রাস্তায় পায়চারী করিতেছিলেন, আমার অগ্রগামী লণ্ঠনের আলো দেখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন, আর আমার কাছে আসিয়া একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। অত বড় একটা রোম্যান্সের ব্যাপার প্র— র মত লোকের আর কখনও ঘটিয়াছিল কিনা জানি না।

বাড়ী ফিরিয়া আর আমার বসিবার ক্ষমতা ছিল না; শরীরটা যে এত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আগে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি শয্যার আশ্রয়-গ্রহণ করিলাম, বন্ধু থার্মমিটার লইয়া আসিলেন, তখন জ্বর ১০৪-এর কিছু উপরে। প্র— তো একেবারে অস্থির। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য যদিও তাঁহার কৌতূহল বড় কম হয় নাই, তবু কৌতূহল দমন করিয়া তিনি আমাকে ঘুমাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমার একেবারেই ঘুম আসিতে-ছিল না। ঘটনাগুলি সংক্ষেপে তাঁহাকে শুনাইয়া দিলাম। কথা বলিবার সময় আমার গলা কাঁপিতেছিল, প্রবল জ্বরের জন্যও বটে—অশ্রুজলের আবেগেও বটে। এই যে এখন লিখিতেছি, এখনও আমার চোখের জল পড়িয়া কালির অক্ষর মুছিয়া যাইতেছে। করুণাময়কে প্রণাম করি—বার বার তাঁহাকে প্রণাম করি। আমার মনে এমন শুভ ইচ্ছা যে ইচ্ছাময় দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। আর একদিন বিলম্ব করিলে হয়তো শিশু দু'টি মরিয়া যাইত। দেখিলাম, আমার বিচারপতি বন্ধুও ঘন ঘন রুমালে চোখের জল মুছিতেছেন।

১৯শে কার্তিক, রবিবার। আজ সকালে উঠিয়া শরীরটা অনেক ভাল বোধ হইল, বোধ হয় জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কাল ডায়েরী লেখা হয় নাই, আজ মুখ ধুইয়াই আগে গতদিনের ঘটনাগুলি লিখিলাম। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টির অবস্থা কিছু ভাল। ডাক্তারবাবু আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, পেটের অসুখ না হইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

২৭শে কার্তিক, সোমবার। পাঁচ ছয় দিন জ্বরে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, সরযু এ কয়দিন অনেক সময়ই আমার কাছে থাকিত, প্র— সস্ত্রীক আমার রাত্রের শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলেন। আজ সকালে আমি অনেকটা ভাল আছি। এইমাত্র বাড়ী হইতে বাবার পত্র পাইলাম, মিনির বিবাহ একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের ২৪শে বিবাহ। আমাকে বোধ হয় পাঁচ ছয় দিনের ভিতরই কলিকাতায় যাইতে হইবে। যাহা হউক, বাঁচা গেল, মিনির বিবাহের জন্য দুই বৎসর নাকানি-চোবানি খাইতে হইয়াছে, যে রকম ভাল সম্বন্ধ পাওয়া গেল, তাহাতে আর সেজন্য কোন দুঃখ নাই। সরযু আজ আবার আমার কাছে একটু লজ্জা করিবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু আমি

একটা ছবির বইয়ের ছবি দেখাইয়া সে চেষ্টাটুকু সফল হইতে দিই নাই। মেয়েটি স্বভাবতই ভারি শান্ত। আমি মিনির বিবাহের উপলক্ষে, প্র—কে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কিন্তু ঘানির বলদের তো আর ঘানি ছাড়িয়া নড়িবার উপায় নাই। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় এবার তাহারা বাঁচিয়া গেল। যাইবার সময় খরচের টাকা বাদে আর যাহা কিছু থাকিবে, তাহাদের জন্য রাখিয়া যাইব ভাবিয়াছি।

২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার। কাল মিনির বিবাহ হইয়া গিয়াছে; বরকন্যা বিদায় দিয়া বাড়ীটা যেন একেবারেই খালি হইয়া গিয়াছে, যাওয়ার সময় মিনির যে কান্না! মিনির কান্নায় মিনি-বেড়ালটি পর্যন্ত কাঁদিয়াছিল। বাবা এত গম্ভীরস্বভাব, বাবাই চোখের জল রাখিতে পারেন নাই। মিনিকে যেমন বলিতাম, রাঙ্গা বর আনিয়া দিব, তেমনি সুন্দর বর হইয়াছে। এমন সরল মিষ্টি স্বভাব, ঠিক আমার মিনিরই মতন। এমন ছেলেমানুষের মত কথাবার্তা যে, এই ছেলে আবার অঙ্কশাস্ত্রে সম্মানের সঙ্গে বি. এ. পাস করিয়াছে তাহা যেন মনেই হয় না। মিনির বৌদিদি মিনির বিবাহে যে উপহার-পদ্যটা লিখিয়াছিলেন, সেটা আমার বেশ ভাল লাগিল। আমি দেখিতেছি, গৃহিণী ক্রমেই কবি হইয়া উঠিতেছেন, আমার মত মূর্খের সঙ্গে তাঁর মিল থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

আজ দুল্‌হা মাঝি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে। হাওড়া হইতে পথ চিনিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল। সে আসিয়াই যখন আমাকে দেখিতে পাইল, "বাবু সাহেব!" বলিয়া আমার পায়ের তলায় একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল। বেচারী আর একটা কথাও বলিতে পারিল না। আমি উহাকে দেখিয়া ভারি খুসী হইয়াছি। দরোয়ান বাড়ী যাইবে বলিতেছে, সে যত দিন না আসে, ততদিন তাহার কাজ দুল্‌হাই করিতে পারিবে। তার পর যাহা হয় দেখা যাইবে।

নিশি

রামকান্তবাবুকে বড়ই নির্লিপ্তস্বভাবের লোক বোধ হইত। জগৎ-সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যথাসময়ে পোষাকটি পরিয়া ছাতিটি মাথায় দিয়া আফিসে যাওয়া ও আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসা, এই দুইটি কেবল তাঁহার দৈনিক কর্তব্য। লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে প্রায় তাঁহাকে দেখা যাইত না, তবে প্রয়োজনবশত মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই-চারিটি কথা বলিতেন, এই মাত্র। পাড়ার একজন হঠাৎ-কবি রামকান্ত সম্বন্ধে বলিতেন, "রামকান্ত পাখীর মন, বাঁধা আছে অনুক্ষণ, গৃহপিঞ্জরে" কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে গেলে, রামকান্তের গৃহপিঞ্জরে তাঁহার গুড়গুড়িটি ভিন্ন আর বিশেষ কেহ সঙ্গী ছিল না।

রামকান্তের সংসারটি ক্ষুদ্র। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রীতে কেমন প্রণয় অথবা অপ্রণয় তাহা আমরা জানি না, তবে কলহ যে ক্বচিৎ হইত, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রামকান্ত নিজের গুড়গুড়িটি, তাকিয়া ও দুই-একখানি পুস্তক লইয়া সময় কাটাইতেন, রাজলক্ষ্মী ঘরকন্নার কাজ-কর্ম লইয়া থাকিতেন। বাড়ীতে অভ্যাগতের গতিবিধি নাই, বালকবালিকার কোলাহল নাই, এজন্য রামকান্ত অত্যন্ত শান্তিতে থাকিতেন।

বিধাতার কেমন খেলা, সহসা একদিন এই আঁধার ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা সহসা আনন্দহীন শান্তি ভঙ্গ করিয়া এই নিস্তব্ধ গৃহে অশান্ত আনন্দকোলাহল উঠিল। যেন দেবতাপূজার একটি নির্মাল্য দেবপদচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীর শূন্য অঙ্কে খসিয়া পড়িল। প্রতিবেশিনীগণের এ গৃহে বড় একটা গতিবিধি ছিল না: কিন্তু আজ সে নিয়ম হঠাৎ ভাঙিগয়া গেল। এতদিনের পর রামকান্তের একটি মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রাজলক্ষ্মীর বহুদিনের শুষ্ক মাতৃস্নেহ-সমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিল। এমন কি, নির্বিকারচিত্ত রামকান্তও সকলের অনুরোধে একবার সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিয়া কন্যাটিকে দেখিলেন। চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছিল কি না, অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

এতদিন রামকান্তের সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। বন্ধনরজ্জু তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। আজ তিনি নিজে আসিয়া ধরা দিলেন। মেয়েটি যেন একটা আকস্মিক উৎপাতের মত তাঁহার হৃদয়রাজ্যে হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। এ কি শক্তি! মাতৃ-অঙ্কশায়িনী ওই ক্ষুদ্র বালিকাটির এত ক্ষমতা!

পূর্বে রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া যথারীতি জলযোগ করিয়া যেমন নিশ্চিন্তমনে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়্গুড়ি টানিতেন, এখন ঠিক আর সেরূপ হয় না। কন্যাপ্রসবের পর হইতেই রাজলক্ষ্মী পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে রামকান্তের শান্তিসুখ একেবারেই গিয়াছে। গৃহে আর লোক নাই, পীড়িতার যথারীতি শুশ্রূষা হইতেছে না, কন্যাটিরও যত্ন হয় না। রামকান্তের এই বিপদের সময় তাঁহার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পূর্বে কখনও রামকান্তের গৃহে আসেন নাই, তাঁহারাই এখন তাঁহার গৃহস্থালীর ও কন্যাপালনের ভার লইলেন। রামকান্তকে আবার জগতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইল।

রাজলক্ষ্মীর বিছানা হইতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, মেয়েটি তাঁহার কোলের কাছে শুইয়া হাত পা নাড়িয়া খেলা করিত, রাজলক্ষ্মীর তখন একবার উঠিয়া তাহাকে কোলে করিবার জন্য প্রাণের ভিতর হাকুলি-বিকুলি করিত, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই, শুইয়া শুইয়াই মেয়ের গায়ে একবার হাত দিতেন। কখনও, নিকটে কেহ না থাকিলে, মেয়ে যখন ক্ষুধায় কাঁদিত, রাজলক্ষ্মীরও চোখ দিয়া জল পড়িত, কাতরভাবে বলিতেন, "ঠাকুর, কবে আমি ভাল হব?" রাজলক্ষ্মীর সযত্নমার্জিত ঘর-দুয়ার মলিন হইয়া গিয়াছে, বাক্সের উপর, দেরাজের গায়ে ধুলো জমিয়াছে, জিনিষপত্র যে কোন্‌টা কোনখানে গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই; রাজলক্ষ্মী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন, আর নিশ্বাস ফেলিতেন। কখনও বা মৃদুস্বরে কোন প্রতিবেশিনীকে বলিতেন, "দিদি, ফরসিটা ক্ষ্যান্তর কাছে মাজতে দিও, ময়লা ফরসিতে উনি তামাক টানতে পারেন না।" এই কথাটি বলিতেই যেন কত সঙ্কোচ! "দিদি, মাছের ঝোল হ'লে উনি দুটি ভাত খেতে পারেন!" কত অনুনয়ের স্বরেই বলিতেন।

রামকান্ত কখনও কখনও আসিয়া রাজলক্ষ্মীর মাথার কাছে বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিতেন। "দেখ, খুকি কেমন খেলা করছে, ওর চোখ দুটি কার মত হয়েছে বল দেখি?" এইরূপ নানা কথা বলিয়া মা যেমন রোরুদ্যমান সন্তানকে ভুলায় তেমনি রাজলক্ষ্মী স্বামীর বিষণ্ণতা ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। রামকান্তের মুখে একটু হাসি দেখিলেই পীড়িতার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।

তিন মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। পূর্ণ তিন মাস শয্যাগত অবস্থায় রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মী সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। চিরবিদায়ের সময়—এখনই যে রাজলক্ষ্মী চলিয়া যাইবেন, রামকান্ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রতিদিনের মত তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া ছিলেন। রাজলক্ষ্মী যখন বলিলেন, "তুমি একটু স'রে এস, আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।" তখন পত্নীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রামকান্তের মনে সহসা কি যেন আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ব্যাপার যে কি ঘটিতেছে, ভাল করিয়া বুঝিতে না বুঝিতেই আত্মীয়স্বজনগণ তাড়াতাড়ি

ধরাধরি করিয়া রাজলক্ষ্মীকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল, রামকান্ত শূন্যগৃহে একাকী নির্বাকভাবে বসিয়া রহিলেন।

পত্নীর অন্তিমকার্য সম্পন্ন করিয়া রামকান্ত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন একজন প্রবীণা প্রতিবেশিনী কন্যাটিকে আনিয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার দুই চক্ষে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; পত্নীবিয়োগের পর এই তাঁহার প্রথম অশ্রুপাত। পত্নী জীবিতা থাকিতে রামকান্ত তাঁহাকে ভালবাসিতেন কি না তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না, আজ বুঝিলেন। বালিকার মুখখানি দেখিতে দেখিতে তাহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে রামকান্তের হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। একদিনও তিনি রাজলক্ষ্মীকে আদর করেন নাই, একটি ভালবাসার কথা পর্যন্ত বলেন নাই। রাজলক্ষ্মীর অভিমানশূন্য সদাপ্রফুল্ল মুখখানি তিনি একদিন ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। পীড়িতার সেই শীর্ণ দেহলতা, সেই অন্তিম বাক্য বার বার মনে পড়িতে লাগিল। রামকান্তের মনে হইল, রাজলক্ষ্মী যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "ছি! চোখ মুছে ফেল, খুকীকে কোলে নাও।" রামকান্ত প্রগাঢ় স্নেহে কন্যার মুখচুম্বন করিলেন।

বন্ধুরা বলিলেন, "এমন ক'রে আর কতদিন থাকবে? মেয়েটাকে তো বাঁচাতে হবে। আবার বিবাহ কর।"

প্রবীণগণ বলিলেন, "এত অল্পবয়সে কি শূন্য গৃহ শোভা পায়? বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ কর।" রামকান্ত নীরব হইয়া থাকিতেন।

মেয়ের মুখের দিকে চাহেন আর চোখে জল আসে। আ মরি, কি সুন্দর মুখশ্রী! এ কি বাঁচিবে? ভগবান কি দয়া করিয়া হতভাগ্যের তাপিত হৃদয় শীতল করিতে মেয়েটি দান করিবেন?

মেয়েটি বাঁচিল। এত অযত্নেও মেয়ে বলিয়াই বুঝি বাঁচিল। রামকান্ত মেয়ের নাম রাখিলেন "নিশি।"

রামকান্তের আয় অল্প, সংসারটিও ক্ষুদ্র। একটি পিতা একটি কন্যা, কিংবা একটি মা আর একটি ছেলে। বেশীর ভাগ একটি ঝি। নিশি এখন কেবল ছয় বছরে পা দিয়াছে, কিন্তু এখনই সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সেই এ সংসারের গৃহিণী। ঘরের জিনিসপত্র সে ইহারই মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে শিখিয়াছে। বাবা আফিস হইতে আসিবার আগে জলের ঘটীটি, গামছাখানি, কাপড়খানি এ সকল সে কখনও ঝিকে রাখিতে দেয় না। রামকান্তের উপর তাহার অতি কঠিন শাসন। যদি কোন দিন তিনি ভুলিয়া ছাতাটি বাড়ী ফেলিয়া যান, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিশি "এত

রোদ লাগিয়েছ, দেখো, অসুখ করবে, তা হ'লে আর আফিস যেতে পাবে না" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শাসন করে; কেবল তাহাই নহে, তাহার পর অন্তত দশ দিন রামকান্তের অভিভাবিকা আফিসে যাইবার সময় তাঁহার ছাতাটি আনিয়া হাতে তুলিয়া দেয়। রামকান্ত সর্বদা সর্ববিষয়ে নিশির কথানুযায়ী চলেন, তিলমাত্র অবাধ্যতা করিতে সাহস করেন না।

বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি, আকাশ মেঘপূর্ণ, নিশি রামকান্তের নিকট বসিয়া "গল্প বল, ও বাবা, একটা গল্প বল" বলিয়া আবদার করে। রামকান্ত কি করেন, গুড়গুড়ি ছাড়িয়া নিশির মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। আবার কোনদিন যদি আফিস হইতে আসিয়া "আমার বড় অসুখ করেছে বুড়ি" বলিয়া শয়ন করেন, সেদিন নিশির খেলা-ধুলা একেবারে বন্ধ হয়। "বাবা, তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? তোমার পা টিপে দেব? একটু জল খাবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন মিনিটে দশবার করিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। মনের ভাবটা যে, হয়তো বাবা বলিতেছেন না, বাবার বুঝি কিছু করিতে হইবে।

রামকান্ত সকালে দুটি ভাত রাঁধিয়া নিশিকে খাওয়াইয়া ও আপনি খাইয়া আফিস যাইতেন; নিশিও যত বড় হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। "বাবা, তুমি রোজ রোজ রাঁধ কেন, আমি বেশ রাঁধতে শিখেছি। তুমি দেখই না কেন! তুমি তাড়াতাড়ি পার না, আমি বেশ ভাল ক'রে রাঁধব।" ইত্যাদি নানাপ্রকার আবেদন আরম্ভ হইল। কোনদিন রামকান্ত স্বীকৃত হইতেন। সে দিন রান্নার ধুম দেখে কে? ডালনা, চচ্চড়ি, ভাজা কিছুই বাকী থাকিত না, তাহার পরদিন নিশির হাতে ফোস্কা দেখিয়া যখন রামকান্ত কিছুতেই রাঁধিতে দিতে চাহিতেন না, তখন নিশি বলিত, "তবে আজ আমরা দুজনেই রাঁধব।"

সন্ধ্যাবেলা গলির শেষের বাড়ীটির জানালার দিকে চাহিয়া দেখ, একটি ছোট মেয়ে কেবল একদৃষ্টে গলির মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। অবাধ্য কালো কালো চুলের থোপাগুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, দু'খানি ছোট ছোট হাতে তাহা সরাইয়া দিতেছে। যাই ছাতি-হাতে রামকান্ত গলির মোড়ে দর্শন দিতেন, অমনি চারিটি চোখে চোখাচোখি হইত।

দিনে দিনে নিশি বাড়িয়া উঠিতেছে। দশ বৎসরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায়! রামকান্ত বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সৎপাত্রে দিবেন একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু টাকা কই? সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে, তাহাতে এখনকার দিনে অসৎপাত্রই জুটিয়া উঠে না। রামকান্ত বড়ই বিব্রত হইলেন।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করেন, "আহা, মেয়েটার মা নেই, কেই বা বিয়ের কথা বলে! হাজার হোক, এখন বড়টি হয়েছে, বিয়েতে কি আর সাধ হয় না? বিয়ের ভাবনায় রাতদিন মুখখানি মলিন ক'রে থাকে।" আহা, সত্যই

আজকাল নিশির মুখখানি বড়ই ম্লান। রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি সর্বদা হাসিমাখা থাকিত, আজকাল কেন জানি না, সে ওষ্ঠে আর হাসি নাই। রামকান্ত আজকাল এত অন্যমনস্ক যে, একবার নিশির মুখখানি চাহিয়াও দেখেন না। নিশি পা ধোয়ার জল লইয়া গেলে আর "আমার মা লক্ষ্মী" বলিয়া আদর করেন না। অভিমানী মেয়ের এত অনাদর সহ্য হয় না। নিশির যে চোখে জল আসে, তা তো রামকান্ত দেখিতেও পান না!

বঙ্গদেশে মেয়ে কেন জন্মগ্রহণ করে! বোধ হয় পিতামাতার পূর্বজন্মের কর্মফলেই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। রামকান্তের জগৎ-সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছেন। কন্যার বিবাহের যে কি উপায় করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, পরিচিত অপরিচিত সকলেরই অনুগ্রহের ভিখারী হইয়াছেন, কিন্তু সে অনুগ্রহ অতি দুর্লভ!

একদিন রাত্র অধিক হইল, তবু রামকান্তের দেখা নাই। নিশি একবার দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিতেছে, একবার জানালায় আসিতেছে, কত ঠাকুর-দেবতাকে মানিতেছে, তবু রামকান্তের দেখা নাই; প্রতি মুহূর্তেই নিশি চমকিয়া উঠিতেছে, ওই বুঝি রামকান্ত আসিতেছেন, ওই বুঝি গলির মোড়ে ছাতা দেখা যায়,—কই, কিছুই না! অবশেষে যখন রামকান্ত সত্যই আসিলেন, তখন নিশির প্রাণ আসিল। রামকান্ত দুয়ারে পা দিবা মাত্র নিশি তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, এত দেরি কেন?" রামকান্ত কেবল বলিলেন, "একটু কাজে", আর কিছু বলিলেন না। বিমর্ষভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, নিশির মুখখানি তেমনি আঁধার হইয়া গেল।

এইবার বুঝি নিশির বিয়ের ফুল ফুটিল। আজ ছয় মাস রামকান্ত কত বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া, কত সুপুত্রের পিতার পায়ে ধরিয়া, কত খুঁজিয়া যাহা মিলাইতে পারেন নাই, এইবার বুঝি বিধি তাহা মিলাইয়া দিলেন। এতদিনে একটি ছেলে ঠিক হইল। ছেলেটি সৎস্বভাব, বাপ-মা কেহই নাই, আসামের পোষ্টাফিসে কাজ করেন। বিবাহ করিয়া নিশিকে সেখানে লইয়া যাইবেন।

রামকান্ত বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় ভাবী জামাতা সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। নিশি একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল, নীচে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুরেশচন্দ্র একবার ঈষৎ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, নিশি চলিয়া গেল।

আজ ছয় মাসের পর রামকান্তের বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। এতদিন নিশির কোথায় বিবাহ দিবেন, কিরূপ পাত্র হইবে, শ্বশুরবাড়ীর সকলে ভালবাসিবে কি না, এই চিন্তায় কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না। আজ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভাবী

জামাতার মধুর চরিত্র ও ব্যবহার যত স্মরণ করিতেছেন, ততই হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। নিশি সৎপাত্রে পড়িবে, নিশি সুখী হইবে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, সেখানে আজ অন্য চিন্তার স্থান নাই। সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে নিশির ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নিশি জানালার ধারে বসিয়া আছে। নিশিকে দেখিয়া রামকান্তের চোখে একবিন্দু জল আসিল, —একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ নিশির মুখখানি দেখিয়া মনে হইল, যেন অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, এত কাহিল হয়ে গিয়েছ কেন?" নিশি উত্তর না দিয়া মুখ অবনত করিল, অনেক দিনের পর আদর পাইয়া অভিমানে তাহার দীর্ঘ নেত্রপল্লব অশ্রুবিন্দুতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পিতা আদর করিয়া মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "ছিঃ মা, কান্না কেন?" নিশি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাবা, কাল কি রাঁধব, বল না?" পিতা বলিলেন, "তোমার যা সাধ হয় তাই রেঁধো। এতদিন তো খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলে, এখন ছেলেটিকে কার হাতে দিয়ে যাবে? মা হয়ে আর কে রেঁধে দেবে?" নিশি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বাবা, আমি কোথা যাব?" রামকান্ত বলিলেন, "চিরকালই কি মা, তুমি আমার এই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকবে?" বলিতে বলিতে তাঁহারও নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল, নিশির মাথায় হাত দিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, স্বামীর ঘরে গিয়ে এমনি লক্ষ্মী হ'য়ো।"

রাত্রি অধিক হইল। উভয়ে আহার করিয়া শয়নগৃহে গমন করিলেন। পিতা কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা আমার আনন্দময়ী, কেমন ক'রে তোকে পরের হাতে দেব! দেবতা করুন, চিরজীবন সুখী হ'য়ো।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশি অর্দ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" আর কোন কথা হইল না।

সম্মুখে বৈশাখ মাস, তাহার পরে অকাল, অতএব এই মাসেই বিবাহ দিবার জন্য রামকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। ভাল ছেলেটি পাছে আবার হাতছাড়া হয়, এখন চারি হাত এক করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। রামকান্ত বিবাহের আয়োজন এবং জিনিসপত্র ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সময়ের অভাবে নিশির উদ্দেশ লইতেও পারিতেন না। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল বটে, কেবল বিবাহ সম্পন্ন হইল না। নিশি অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল।

সমস্ত বৈশাখ গেল, নিশির পীড়া আরোগ্য হইল না। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্রের ছুটি ফুরাইয়া গেল, তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় নিশিকে একবার দেখিয়া গেলেন, আর ভাবী শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন,

"সম্মুখে অকাল, আর আমারও শীঘ্র ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, পীড়ার অবস্থা আমাকে সর্বদা লিখিবেন।" রামকান্তবাবু শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নিশির পীড়া আরোগ্যের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না। দিন দিনই অধরপল্লব দুখানি রক্তশূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন হইতেছে। পীড়া উত্তরোত্তর কেবল বাড়িতেছে। রামকান্তের আহার-নিদ্রা নাই, দিবারাত্র কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। নিশি কখনো রামকান্তের গায়ে হেলান দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে, "বাবা, আমার অসুখ ভাল হ'লে কি কি খাব, সেই গল্প করি এস।" রামকান্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন, নিশিরও ঘুম নাই—"ও বাবা, শোও না।" রামকান্ত বলেন, "লক্ষ্মী মা, একটু চুপ ক'রে ঘুমাও।" নিশি বলে, "আর তুমি জেগে বাতাস করবে? তুমি না ঘুমালে আমি ঘুমাব না।"

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যায় পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া নিশির বিছানায় নিশির শীর্ণ মুখখানিতে পড়িয়াছে। নিশি ঘুমাইতেছে, রামকান্ত এক পার্শ্বে, ডাক্তার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রামকান্ত কেবল আকুল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ডাক্তার মুহুর্মুহু নাড়ী দেখিতেছেন। অবশেষে ডাক্তারবাবু নিশির হাত ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ আনিবার জন্য উঠিলেন, রামকান্ত ডাকিলেন, "নিশি, মা আমার!" নিশি জাগিয়া উঠিল, "বাবা" বলিয়া হাত দুখানি রামকান্তের কোলের উপর তুলিয়া দিল, আর সেই মুহূর্তেই রামকান্তের গৃহের আলো জন্মের মত নিবিয়া গেল।

ইহার চারিদিন পরে একদিন রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া গৃহের বহির্দ্বারে বসিলেন, অমনি জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেখানে আজ আর কেহই নাই। খোলা জানালার উচ্ছৃঙ্খল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া হু-হু করিয়া উঠিতেছে। রামকান্তের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর চক্ষু মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মা আমার, তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, আমি তোমাকে লইয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছিলাম। তুমি আমার বড় আদরিণী, কার হাতে সঁপিয়া দিব, সে তোর আদর করিবে কি না, এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। যাঁহার ধন তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি। হায় প্রভু, বন্ধন ভাল, না, বন্ধনের মুক্তি ভাল, এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই।" নিশ্বাস ফেলিয়া রামকান্ত শূন্যগৃহে প্রবেশ করিলেন।

('ভারতী ও বালক', পৌষ ১৩০৪)৮

কন্যাদায়

খুব ভোরেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। 'বাড়ী' বলিতে অনেক দিনের পর বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আর সে বাড়ী চোখে দেখি নাই, এখন মামার বাড়ীই আমাদের আশ্রয়, এই আশ্রয় না থাকিলে মা ও আমরা তিনটি ভাইবোন যে কোথায় দাঁড়াইতাম, ভাবিয়া পাই না।

যখন প্রথম মামার বাড়ীতে আসি, চারু তখন পাঁচ বছরের, তরু সাত বছরের। তরুর নিজের অবস্থা বুঝিবার মত জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু চারু তো কিছুতেই বুঝে না, কেবলি বলিত, "মা, এ বাড়ীতে থাকব না, এ বাড়ী ভাল নয়, আমাদের সে বাড়ী কই?" মা চারুর কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইতেন। আমি বুঝিতে পারিতাম, চোখের জল লুকাইবার জন্য মা মুখ ফিরাইয়াছেন। কিন্তু চারু তো তাহা বুঝিত না, কেবলই মার আঁচল ধরিয়া টানিত, আর সেই এক কথা "ওমা, বাড়ী চল।"

সেদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার শীত শীত করিতেছিল, মনে হইতেছিল, বুঝি জ্বর আসে। মাতুলালয়ের পল্লীটি কলিকাতার অন্তর্বর্তী বলিয়া ধরা হইলেও এখানে শহরের কোন চিহ্ন ছিল না। এজন্য চারিপাশের ঝোপ্‌-ঝাপে ম্যালেরিয়ার বাসা ছিল, কাজেই আজ পাঁচ-ছয় মাস হইতে আমার উপরও তাঁহার শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। বাড়ীখানি একতলা, দুটি ঘর ও একটি রোয়াক মাত্র, তাহাও আবার অনেক দিন হইতে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, বালি চূণ সমস্তই খসিয়া গিয়াছে, কেবল জীর্ণ ইষ্টকের কঙ্কাল কয়খানি কোনমতে খাড়া হইয়া রহিয়াছে। আম, জাম ও নারিকেল গাছ চারিদিক হইতে বাড়ীখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহার লজ্জানিবারণ করিয়াছে। পিছনে এঁদো পুকুর, সেইটিই ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রিয়স্থান।

বড় মামা সওদাগরী আফিসে কাজ করেন, পঁচিশটি টাকা মাহিনা পান, আর দুটি মামা এখনও পঠদ্দশায়। ইহা হইতেই সাংসারিক অবস্থা অনুমেয়।

আমার পায়ের শব্দ শুনিয়াই মা বাহিরে আসিলেন। বোধ হয় আমার জন্য মার সমস্ত রাত্রিই ঘুম হয় নাই। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "অমূল্য, এলি বাবা? অসুখ শরীর নিয়ে অতদূর যাওয়া, আমার মন ভারি উতলা হয়েছিল। কোন অসুখ করে নি তো?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মা, মানকর স্টেশন যদি তোমার কাছে 'অতদূর' হয়, তবে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন তো পৃথিবীর বাহিরে। তোমার আর কোনকালে তীর্থ করা হবে না।"

মা বলিলেন, "কে জানে বাছা কতদূর; জন্মে কখনও রেলগাড়ীতে উঠি নি, পাড়াগাঁ শুনলেই মনে হয়, সে কোন্ তেপান্তর মাঠের ভিতর। তা যাক্‌গে, তুই আছিস্ কেমন, বেশী ঠাণ্ডা লাগাস্ নি তো?"

আমি। মা, যার জন্য গিয়েছিলাম, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে না, কেবল বাজে বকছ। তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করলে না, তেমনি আমিও তোমাকে কিছু বলছি না।

"আচ্ছা বলিস্ নে।" বলিয়া মা গৃহকার্যে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া ভাবিলাম, আমিই তবে হারিলাম।

এমন সময় বড় মামা বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কি রে অমূল্য, ছেলে কেমন দেখে এলি, বাড়ী-ঘর কেমন দেখলি? কত চায় তারা?"

আমি। ছেলেটি মন্দ নয়। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছিল, এখন পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় ঢুকেছে। বাড়ী-ঘর বেশ ভাল, বাড়ীতে বাগান-পুকুরও আছে। ধেনো জমিও কিছু আছে, তাতে বেশ ধান হয়।

মামা। এ সব তো ভালই, এখন আসল কথা, চায় কত?

আমি। মাসীমার বাড়ী তরু যেদিন গিয়েছিল, সেইদিন ছেলে নাকি নিজেই তরুকে দেখেছে। ধরণীবাবু বললেন, "আমি হাজার টাকার এক পয়সা কমেও ছাড়তুম না, তবে ছেলের পছন্দ হয়েছে, আর তোমাদের অবস্থাও ভাল নয় শুনেছি, এই জন্য পাঁচ শো টাকাতেই রাজী হতে হ'ল।"

মামা। পাঁচ শো টাকা! এবার তোর মাথার চুল বিকিয়ে যাবে। এ টাকা ছাড়া আরও কিছু দিতে থুতে হবে নাকি?

আমি। না, ঐ টাকার ভিতরই সব, এই কথা তো বলেছেন।

"এক রকম সস্তাই বলতে হবে, কিন্তু পাঁচ শো টাকা কি ক'রে যোগাড় হবে! তাই তো!" বলিতে বলিতে মামা স্নান করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

মা তখন স্নান করিয়া আসিয়াছেন, তরু বঁটি লইয়া কুটনো কুটিতেছে। আমি মার নিকটে গিয়া বলিলাম, "মা, তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে এসেছি, এখন পাঁচ শো টাকা দাও।"

মা ম্লান হাসি হাসিলেন।

আমি বলিলাম, "পাঁচ শো টাকা চাওয়া ভুল হয়েছে মা, ছ' শোই দিতে হবে, বরযাত্রী খাওয়ানো আছে, আর আমরাই বা কি দোষ করেছি যে, খেতে পাব না!"

মা বলিলেন, "আমার যথাসর্বস্ব ধন কেবল তুমি আছ, আর কিছু নাই।"

"তবে আমাকেই বিক্রী কর, ক'রে টাকা দাও। টাকা না দিলে তো মেয়ের বিয়ে হবে না।"

তরুর দিকে চাহিয়া দেখি, ঘাড় হেঁট করিতে করিতে সে বঁটির উপর উপুড় হইয়া পড়িবার মত হইয়াছে। বাস্তবিক তরুর জন্য ভারি কষ্ট হয়।

উঠিতে বসিতে, কথায় কথায়, মার কাছে বকুনি খায়। অপরাধ কি—না, বিয়ে হয় না। আমি ভাবি ও-বেচারী কি করিবে? বিয়ে করিতে যে ওর অনিচ্ছা এমন কথা তো কখনও বলে নাই, যদিই বা বলে তাহাতেও কিছু বিবাহ বন্ধ হইবে না। বিবাহ বন্ধ হইতেছে কেবল টাকার জন্য, তাতে ওর দোষ কি? বাস্তবিক মার কি অন্যায়! তরু খাবার চাহিলে মা রাগের মাথায় কতদিন বলিতেন, "থুবড়ি! বিয়ে হয় না, কেবল খেয়ে খেয়ে হাতী হচ্ছে।" এ কি আশ্চর্য! বিয়ে হয় না বলিয়া সে উপোস করিয়া থাকিবে নাকি? আবার না খাইলেও বকুনি, "বিয়ের চিন্তায় বুঝি মুখে অন্ন রুচে না?" পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতে যাওয়া বন্ধ, "এত বড় আইবুড়ো মেয়ের কি পাড়ায় বেড়ানো ভাল দেখায়?" বেচারীর কি কষ্ট! আমি মনে করিতাম, "মেয়েগুলো কেন যে জন্মায়!" কিন্তু, আজ তরু তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া অসাবধানে এক ঘটি জল ফেলিয়া দিল, মা তবুও কিছু বলিলেন না, এটা একটা আশ্চর্যের কথা। বোধ হয় বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে দেখিয়া মা তরুর উপর খুসী হইয়াছিলেন।

সেদিন ভাত খাইতে বসিয়া আমি কেবল টাকার কথাই ভাবিতেছিলাম। ভাবনাটা আমার তেমন অভ্যাস ছিল না, কিন্তু আজকাল তাহার সঙ্গে একটু একটু করিয়া আলাপ হইতেছে। দিদির বিবাহের ভাবনা আমাকে ভাবিতে হয় নাই, তখন আমি ছোট ছিলাম বলিয়া মা একাই সকল ভাবনার ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু তরুর যে আবার বিবাহ দিতে হইবে সে কথা বোধ হয় মার মনে ছিল না, তাই যা কিছু সম্বল ছিল, সমস্ত ঘুচাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ভাল ঘরে দিদির বিবাহ দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি দিদির শ্বশুররা খুব বড় মানুষ, তাঁহাদের অর্থের অভাব কিছুই নাই, তবে কেন দরিদ্রের সামান্য সম্বলটুকু গ্রহণ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল, এ কথা বুঝিতে পারি না। ধনী কুটুম্ব করিবার সাধ মার বড়ই প্রবল ছিল, তাহারই ফলে বিবাহের পর দিদি যে এক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সে এক বৎসর মা আর তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, কেবল তাঁহার যাত্রা করিবার দিন লোকের মুখে সংবাদ পাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন। গিয়া যা দেখিয়াছিলাম, সে কথা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। লক্ষ্মী-প্রতিমার মত দিদির সেই সুন্দর অচেতন দেহখানি অঙ্গনে পড়িয়া আছে, সেই সুন্দর কালো চুলগুলি ভূমিতে লুটাইতেছে,—উঃ, সে কি চোখে দেখা যায়! দিদির শাশুড়ী দ্বিতলের বারান্ডায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "ওরে, হাতের চুড়িগুলো আর তাগা দুগাছা খুলে নে।" সে কথা যেন বজ্রধ্বনির মত আমার কানে গিয়া লাগিয়াছিল। দিদির মুখের কাছে মুখ নিয়া ডাকিলাম, "দিদি!" সেই আমার মৃদুস্বরের ডাকেই দিদির চৈতন্য ফিরিয়া আসিল,

অবশ্য তাহার দেশীয় ভাষাতেই উত্তর দিয়াছিল; কিন্তু সে কথাগুলি তো আর আমার মুখস্থ হয় নাই, কাজেই আমি আমার দেশীয় ভাষাতেই তাহা ডায়েরীর পাতায় লিখিয়া রাখিব।

"আচ্ছা গিরিধারী, তোমার কয়টি লেড়্কা-লেড়্কী?" আমার প্রশ্ন শুনিয়া গিরিধারী ভারী খুসী; আমি দেখিয়াছি, লেড়্কা-লেড়্কীর কথা তুলিলেই লোকের সঙ্গে খুব শীঘ্র বন্ধুত্ব জমিয়া উঠে।

গিরিধারী তোড়াটা টেবিলের উপর ফুলদানীতে রাখিয়া ম্যাটিংএর উপর আসন গ্রহণ করিল; বলিল, "বাবু সাহেব, আমার তিন লেড়্কা, আর দুটি লেড়্কী ছিল, এখন ভগবানজী কেবল তিনটিকে রাখিয়াছেন!"

প্রশ্নোত্তরে ক্রমশ তাহার বৃদ্ধা মা, একটি ছোট বোন ও একটি ভাই আছে, ভাই পুরুলিয়ায় সাহেবের নিকট কর্ম করে, ইত্যাদি সমস্ত সংবাদই জানিয়া লইলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মাহিনা তো ছয়টি টাকা, এবার যেমন অজন্মা, তাহাতে তোমাদের কি করিয়া চলে?"

আমার প্রশ্নে গিরিধারী ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিল যে, তাহারা গমের রুটি খাইতে পায় না, মাড়ুয়া খোসাশুদ্ধ পিষিয়া তাহারই রুটি খায়, জমিতে কিছু মাড়ুয়া হয়, আর ভাইয়া মাসে মাসে দুটি টাকা পাঠাইয়া দেয়।

গিরিধারীলালের বাড়ী এখান হইতে কিছু দূর 'দেহাত' অর্থাৎ পল্লীগ্রামে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি দুল্‌হা মাঝিকে চেন?"

গিরিধারীলাল বলিল, "তাহার বাড়ীর নিকটেই দুল্‌হার বাড়ী। দুল্‌হার স্ত্রী আর দুটি ছেলে আছে।"

ক্রমশ প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, দুল্‌হার স্ত্রী গ্রামেরই মেয়ে, খুব খাপ্‌সুরৎ অর্থাৎ সুন্দরী এবং তাহার স্বভাব বড় ভাল। সে প্রায় এক মাস পীড়িত অবস্থায় শয্যাগত আছে।

আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছেলে দুটিকে দেখে কে?"

গিরিধারীলাল উত্তর দিল, "ভগবানজী।"

সন্ধ্যার পর বন্ধুবরের সঙ্গেও দুল্‌হার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। বন্ধুবর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ দুল্‌হা মাঝিকে দেখেছিলে? বেটা ডাকাত, ওর অসাধ্য কিছু নাই। যে রকম সাপের মত গজ্‌রাতে লাগল, আমার ভয় হচ্ছে, জেল থেকে ফিরে এসে আমার বাংলায় আগুন না ধরিয়ে দেয়।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে কিছু আশ্চর্য নাই। তোমরা অপরাধের সংখ্যা কমাইতে চেষ্টা কর কিনা জানি না, কিন্তু বাড়াইয়া তোল ইহা নিশ্চয়।"

প্র— বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসে? অপরাধ করিয়া দণ্ড না পাইলেই অপরাধীর সংখ্যা কমিয়া যাইবে, বুদ্ধদেবের কি এইরূপ মত?"

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, "বিচারপতি মহাশয়, প্রথমে জানিতে চাই, চুরি করা কাহাকে বলে?"

"কেন? ছেলেবেলার পড়া একেবারেই ভুলিয়াছ—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়?"

"আর জোর করিয়া পরের দ্রব্য কাড়িয়া লইলে কি হয়?"

"ডাকাতি।"

আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "ন্যায়-দণ্ডধারক, আমার একটি প্রশ্ন মীমাংসা করুন। রোজ রোজ যে ছাগলের ছানাগুলিকে মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া রসনা-তৃপ্তির জন্য বলি দেওয়া হয়, এটা কোন্ ধারার ভিতর পড়ে? মায়ের কি ছেলের উপর দাবী নাই, না, ওই বেচারা বাচ্চাগুলির নিজের প্রাণের উপরও অধিকার নাই? আপনার আইন-গ্রন্থ খুলিয়া একবার অনুগ্রহ করিয়া অধিকার-তত্ত্বটি দেখিবেন কি? এই রকম আত্মস্বার্থের জন্য জোর করিয়া পরের প্রাণ কাড়িয়া লওয়াকে—কি বলা যাইতে পারে, চুরি না ডাকাতি?"

ডেপুটী সাহেব শুনিয়া এত জোর হাসিলেন যে, কুন্দ ব্যাপার কি জানিবার জন্য পর্দা ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিল। হাস্যবেগ কিছু মন্দীভূত হইলে বলিলেন, "সাধে বলি বুদ্ধদেব! কিন্তু তুমি যে দেখছি আদালত থেকে একেবারে রাজ-নীতি-ক্ষেত্রে এসে পড়লে! এ সব বিষয়ে বিধান দিতে আমার সাহস নেই।"

১৮ই কার্তিক, শনিবার। দুই দিন হইতে আমার শরীরটা কিছু অসুস্থ বোধ হইতেছিল। কাল রাত্রে মাথার ভারি যন্ত্রণা হইয়াছে। বন্ধু বলেন, "ওসব কিছুই নয়, তোমার স্নায়ুর দৌর্বল্য, স্নায়ুর উত্তেজনা কিছু অতিরিক্ত।" তাহা আমিও অস্বীকার করি না। স্নায়ুর দৌর্বল্যের জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক সকালে একটু জ্বর হইয়াছিল, পালামৌ আসিবার পর আর আমার জ্বর হয় নাই। কয়েক ঘণ্টা শয্যাগত ছিলাম, অবশেষে স্নায়ুর উত্তেজনায় শয্যা অসহ্য হইয়া উঠিল। বাড়ীর কাছেই একটি ছোট নদী আছে, নদীর নাম কৈল নদী! নদীর ধারে—নদীর ভিতরে যে কত বর্ণের, কত আকারের ছোট বড় সুন্দর সুন্দর পাথর আছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই সমস্ত নানা গঠনের চিত্রবিচিত্র পাথরের উপর দিয়া নদীর স্বচ্ছ-ধারা বহিয়া যায়। আমি এই ছোট নদীটিকে বড়ই ভালবাসি। পালামৌ ছাড়িয়া যাইবার সময় আমার নিশ্চয় এই নদীটির জন্য প্রাণ কেমন করিবে।

নদীর ধারে প্রায় আধ ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম, তাহার পর দূরে একটি চলিষ্ণু বংশছত্র দেখিয়া বুঝিলাম, বাগানের মালী গিরিধারীলাল কুর্মী আসিতেছে। গিরিধারীলাল নিকটে আসিয়া আমাকে রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইল, বলিল, "বাবু সাহেব, আজ আপনার জীউ আচ্ছা নাই, তবে ধূপে বসিয়া আছেন কেন?" আমি বুঝিলাম, আমার সঙ্গে গিরিধারীর বন্ধুত্ব ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আজ আর তাহার কিছু বিশেষ কাজ নাই বলিয়া সে এক বেলার ছুটি নিয়া বাড়ী যাইতেছে। আমি বলিলাম, "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, দুল্‌হা মাঝির ঘর আমাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।" তাহাকে কিছু পুরস্কার দিবার ভরসাও দিলাম।

আমার কথা শুনিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া থাকিল। তাহার পর "বড় ধূপ", "সে স্থান এখান হইতে অনেক দূর" ইত্যাদি নানা আপত্তি করিতে আরম্ভ করিল। পুরস্কারের ভরসা সত্ত্বেও তাহার এতটা অনিচ্ছার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, গিরিধারীলাল রৌদ্রকে বড় ভয় করে, তাহার মস্তকে সর্বক্ষণ বিরাজিত বংশছত্রটিই তাহার প্রমাণ; কিন্তু রৌদ্রে বেড়াইলে আমার অসুখ বাড়িবার আশঙ্কায় পুরস্কারের প্রলোভন ত্যাগ করাটা কিছু অতিরিক্ত স্বার্থত্যাগ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আমার আগ্রহে গিরিধারী অবশেষে সম্মত হইলেও, তাহাকে বড় অপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার অহঙ্কার ছিল যে, আমি খুব রৌদ্রে ঘুরিতে পারি; কিন্তু দুল্‌হা মাঝির বাড়ী পেঁছাইতে গিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া গেলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল। এ পথের কি আর শেষ নাই? কত ধানের ক্ষেতের আল, কত চোরকাঁটার জঙ্গল, কত উঁচুনীচু মাঠ যে পার হইয়া আসিয়াছি, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। বোধ হয়, তিন চার ক্রোশ রাস্তা পার হইয়া আসিয়াছি, এখনও গ্রামের দেখা নাই। যত জিজ্ঞাসা করি—"আর কতদূর আছে," সেই একই উত্তর শুনি—"বাবু সাহেব লগিজ।"

প্রায় ঘণ্টা চারেক চলিয়া দুল্‌হা মাঝির 'ডেরা'য় পেঁছিলাম। 'ডেরা' তো 'ডেরা'ই, একখানা মাঝারি খড়ের ঘর আর তাহারই সামনে একটু চাল দেওয়া দাওয়ার মত। ঘরের চারিপাশে জঙ্গলের মত বেড়া, সেই বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া গিরিধারী ডাকিতে লাগিল, "আগে মাঝিয়ান, মাঝিয়ান হো!" কিন্তু মাঝিয়ানের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ঘরের ভিতর হইতে একটা অস্পষ্ট গোঁঙানির মত শব্দ আসিতেছিল, শুনিয়া আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাটা সঙ্গত মনে করিলাম না; কাঁটার বেড়া টপ্‌কাইয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইলাম দেখিয়া গিরিধারী ভয় পাইয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ঘরের ভিতর গোঙানির শব্দ শুনিয়া বুঝি কুর্মী-পুত্রের দিনের বেলাতেই ভূতের ভয় হইয়াছে; কিন্তু পরে বুঝিলাম ঠিক তাহা নয়। গিরিধারীলাল এতক্ষণের পর তাহার ভাব স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া ফেলিল, বলিল, "বাবু সাহেব, ভিতর মৎ যাইয়ে, দুল্‌হা মাঝি বড়ি দাঙ্গাবাজ আদ্‌মী, কোই জানে কোন্‌ ফাসাদ্‌ করেগা।"

আমার শরীরটা পরিশ্রমে অবসন্ন, মাথা ঘুরিতেছিল, তবু গিরিধারীর কথা শুনিয়া হাসি আসিল; এতক্ষণে বুঝিলাম, "মাঝিয়ান খাপ্‌সুরৎ" শুনিয়াই আমি

এতটা পথ পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি, গিরিধারীলাল অনুমান দ্বারা এই রকম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে।

যাক্, সে যা ভাবে ভাবুক না কেন, আমার তাহা লইয়া মাথা ঘামানোর সময় ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি বেড়া টপ্কাইয়া গিয়া ঘরের আগড় খুলিয়া ফেলিলাম, গিরিধারীও আমার পিছনে আসিল।

রৌদ্র হইতে ভিতরে আসিয়া প্রথমটা সব যেন অন্ধকার ধোঁয়ার মত বোধ হইতেছিল। তারপর দেখিলাম, ঘরের দুয়ারের পাশেই একটি কঙ্কালসার শিশুমূর্তি, আমাদের দেখিয়া সে হামা দিয়া আমাদের কাছে আসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু উঠিবার উপক্রম করিবামাত্র পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠনালী হইতে একটি অস্ফুট শব্দমাত্র বাহির হইল। তাহার একটু তফাতে আর একটি চার-পাঁচ বৎসরের ছেলে মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, সে এতই শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে প্রথমটা নিদ্রিত কি মৃত তাহা বুঝা যায় না।

ছেলে দুটিকে দেখিবার পর তাহাদের মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল, সে তখন অতি কষ্টে উঠিয়া ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল দিয়া কোন রকমে আপনাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তাহাদের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল, "বাবুয়া হামারা অন্ বিন্ মর্ গে'ই, তিন রোজসে ঐসিন পড়ল্ রহা", অর্থাৎ আমার বাছারা অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছে, তিন দিন থেকে এইভাবে পড়িয়া আছে। আহা বাছা রে! তোর বাছারা মরিয়াছে বলিতেছিস, তোরই বা মরিবার বাকি কি আছে?

যাহাদের অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয় নাই, তাহারা যদি আমার ডায়েরী পড়ে তাহা হইলে হয়তো ভাবিবে, আমি কিছু অতিরঞ্জন-প্রিয়; কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, আমি যে দুরবস্থা চোখে দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। আশ্চর্য কাণ্ড! গাঁয়ে কি লোক নাই? গিরিধারী বলিল, "সকলেরই প্রায় এক অবস্থা, কে কাহার খোঁজ লইবে?"

বেশ কথা! তবে সকলেরই দেখিতেছি ঘরে সিঁধ দেওয়ার মত অবস্থা। আমার বন্ধুর কার্যের সাহায্যের জন্য শীঘ্রই সহযোগী আবশ্যক হইবে বোধ হয়। আমি এখন বেশ বুঝিলাম, দুল্হা জেলে যাইবার সময় তাহার ঘরে যে স্ত্রী পুত্র অনাহারে মরিবে এ কথা বুঝিয়াই জেলে গিয়াছিল।

যাহা হউক, আমার তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিবার সময় ছিল না। গিরিধারীর হাঁকডাকে জনকতক লোক জড় হইল। তাহাদের ভিতর দু' তিন জনকে দুধের সন্ধানে আর দু' তিন জনকে ডুলির সন্ধানে পাঠাইলাম। গিরিধারী সত্যই বলিয়াছিল, সকলেরই প্রায় একরকম অবস্থা।

বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রি বলিয়া অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টিকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিলাম। আমার বন্ধু আমার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে চুরুট

মুখে ঘন ঘন রাস্তায় পায়চারী করিতেছিলেন, আমার অগ্রগামী লণ্ঠনের আলো দেখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন, আর আমার কাছে আসিয়া একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। অত বড় একটা রোম্যান্সের ব্যাপার প্র—র মত লোকের আর কখনও ঘটিয়াছিল কিনা জানি না।

বাড়ী ফিরিয়া আর আমার বসিবার ক্ষমতা ছিল না; শরীরটা যে এত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আগে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি শয্যার আশ্রয়-গ্রহণ করিলাম, বন্ধু থার্মমিটার লইয়া আসিলেন, তখন জ্বর ১০৪-এর কিছু উপরে। প্র— তো একেবারে অস্থির। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য যদিও তাঁহার কৌতূহল বড় কম হয় নাই, তবু কৌতূহল দমন করিয়া তিনি আমাকে ঘুমাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমার একেবারেই ঘুম আসিতেছিল না। ঘটনাগুলি সংক্ষেপে তাঁহাকে শুনাইয়া দিলাম। কথা বলিবার সময় আমার গলা কাঁপিতেছিল, প্রবল জ্বরের জন্যও বটে—অশ্রুজলের আবেগেও বটে। এই যে এখন লিখিতেছি, এখনও আমার চোখের জল পড়িয়া কালির অক্ষর মুছিয়া যাইতেছে। করুণাময়কে প্রণাম করি—বার বার তাঁহাকে প্রণাম করি। আমার মনে এমন শুভ ইচ্ছা যে ইচ্ছাময় দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। আর একদিন বিলম্ব করিলে হয়তো শিশু দু'টি মরিয়া যাইত। দেখিলাম, আমার বিচারপতি বন্ধুও ঘন ঘন রুমালে চোখের জল মুছিতেছেন।

১৯শে কার্তিক, রবিবার। আজ সকালে উঠিয়া শরীরটা অনেক ভাল বোধ হইল, বোধ হয় জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কাল ডায়েরী লেখা হয় নাই, আজ মুখ ধুইয়াই আগে গতদিনের ঘটনাগুলি লিখিলাম। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টির অবস্থা কিছু ভাল। ডাক্তারবাবু আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, পেটের অসুখ না হইলে বাঁচিয়া যাইতে পারে।

২৭শে কার্তিক, সোমবার। পাঁচ ছয় দিন জ্বরে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, সরযু এ কয়দিন অনেক সময়ই আমার কাছে থাকিত, প্র— সস্ত্রীক আমার রাত্রের শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলেন। আজ সকালে আমি অনেকটা ভাল আছি। এইমাত্র বাড়ী হইতে বাবার পত্র পাইলাম, মিনির বিবাহ একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের ২৪শে বিবাহ। আমাকে বোধ হয় পাঁচ ছয় দিনের ভিতরই কলিকাতায় যাইতে হইবে। যাহা হউক, বাঁচা গেল, মিনির বিবাহের জন্য দুই বৎসর নাকানি-চোবানি খাইতে হইয়াছে, যে রকম ভাল সম্বন্ধ পাওয়া গেল, তাহাতে আর সেজন্য কোন দুঃখ নাই। সরযু আজ আবার আমার কাছে একটু লজ্জা করিবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু আমি

একটা ছবির বইয়ের ছবি দেখাইয়া সে চেষ্টাটুকু সফল হইতে দিই নাই। মেয়েটি স্বভাবতই ভারি শান্ত। আমি মিনির বিবাহের উপলক্ষে, প্র—কে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কিন্তু ঘানির বলদের তো আর ঘানি ছাড়িয়া নড়িবার উপায় নাই। মাঝিয়ান ও তাহার ছেলে দু'টি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় এবার তাহারা বাঁচিয়া গেল। যাইবার সময় খরচের টাকা বাদে আর যাহা কিছু থাকিবে, তাহাদের জন্য রাখিয়া যাইব ভাবিয়াছি।

২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার। কাল মিনির বিবাহ হইয়া গিয়াছে; বরকন্যা বিদায় দিয়া বাড়ীটা যেন একেবারেই খালি হইয়া গিয়াছে, যাওয়ার সময় মিনির যে কান্না! মিনির কান্নায় মিনি-বেড়ালটি পর্যন্ত কাঁদিয়াছিল। বাবা এত গম্ভীরস্বভাব, বাবাই চোখের জল রাখিতে পারেন নাই। মিনিকে যেমন বলিতাম, রাঙ্গা বর আনিয়া দিব, তেমনি সুন্দর বর হইয়াছে। এমন সরল মিষ্টি স্বভাব, ঠিক আমার মিনিরই মতন। এমন ছেলেমানুষের মত কথাবার্তা যে, এই ছেলে আবার অঙ্কশাস্ত্রে সম্মানের সঙ্গে বি. এ. পাস করিয়াছে তাহা যেন মনেই হয় না। মিনির বৌদিদি মিনির বিবাহে যে উপহার-পদ্যটা লিখিয়াছিলেন, সেটা আমার বেশ ভাল লাগিল। আমি দেখিতেছি, গৃহিণী ক্রমেই কবি হইয়া উঠিতেছেন, আমার মত মূর্খের সঙ্গে তাঁর মিল থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

আজ দুলহা মাঝি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছে। হাওড়া হইতে পথ চিনিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল। সে আসিয়াই যখন আমাকে দেখিতে পাইল, "বাবু সাহেব!" বলিয়া আমার পায়ের তলায় একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল। বেচারী আর একটা কথাও বলিতে পারিল না। আমি উহাকে দেখিয়া ভারি খুসী হইয়াছি। দরোয়ান বাড়ী যাইবে বলিতেছে, সে যত দিন না আসে, ততদিন তাহার কাজ দুলহাই করিতে পারিবে। তার পর যাহা হয় দেখা যাইবে।

নিশি

রামকান্তবাবুকে বড়ই নির্লিপ্তস্বভাবের লোক বোধ হইত। জগৎ-সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যথাসময়ে পোষাকটি পরিয়া ছাতিটি মাথায় দিয়া আফিসে যাওয়া ও আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসা, এই দুইটি কেবল তাঁহার দৈনিক কর্তব্য। লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে প্রায় তাঁহাকে দেখা যাইত না, তবে প্রয়োজনবশত মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই-চারিটি কথা বলিতেন, এই মাত্র। পাড়ার একজন হঠাৎ-কবি রামকান্ত সম্বন্ধে বলিতেন, "রামকান্ত পাখীর মন, বাঁধা আছে অনুক্ষণ, গৃহপিঞ্জরে" কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে গেলে, রামকান্তের গৃহপিঞ্জরে তাঁহার গুড়গুড়িটি ভিন্ন আর বিশেষ কেহ সংগী ছিল না।

রামকান্তের সংসারটি ক্ষুদ্র। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রীতে কেমন প্রণয় অথবা অপ্রণয় তাহা আমরা জানি না, তবে কলহ যে ক্বচিৎ হইত, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রামকান্ত নিজের গুড়গুড়িটি, তাকিয়া ও দুই-একখানি পুস্তক লইয়া সময় কাটাইতেন, রাজলক্ষ্মী ঘরকন্নার কাজ-কর্ম লইয়া থাকিতেন। বাড়ীতে অভ্যাগতের গতিবিধি নাই, বালকবালিকার কোলাহল নাই, এজন্য রামকান্ত অত্যন্ত শান্তিতে থাকিতেন।

বিধাতার কেমন খেলা, সহসা একদিন এই আঁধার ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা সহসা আনন্দহীন শান্তি ভঙ্গ করিয়া এই নিস্তব্ধ গৃহে অশান্ত আনন্দকোলাহল উঠিল। যেন দেবতাপূজার একটি নির্মাল্য দেবপদচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীর শূন্য অঙ্কে খসিয়া পড়িল। প্রতিবেশিনীগণের এ গৃহে বড় একটা গতিবিধি ছিল না; কিন্তু আজ সে নিয়ম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিনের পর রামকান্তের একটি মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রাজলক্ষ্মীর বহুদিনের শুষ্ক মাতৃস্নেহ-সমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিল। এমন কি, নির্বিকারচিত্ত রামকান্তও সকলের অনুরোধে একবার সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিয়া কন্যাটিকে দেখিলেন। চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছিল কি না, অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

এতদিন রামকান্তের সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। বন্ধনরজ্জু তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। আজ তিনি নিজে আসিয়া ধরা দিলেন। মেয়েটি যেন একটা আকস্মিক উৎপাতের মত তাঁহার হৃদয়রাজ্যে হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। এ কি শক্তি! মাতৃ-অঙ্কশায়িনী ওই ক্ষুদ্র বালিকাটির এত ক্ষমতা!

পূর্বে রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া যথারীতি জলযোগ করিয়া যেমন নিশ্চিন্তমনে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন, এখন ঠিক আর সেরূপ হয় না। কন্যাপ্রসবের পর হইতেই রাজলক্ষ্মী পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে রামকান্তের শান্তিসুখ একেবারেই গিয়াছে। গৃহে আর লোক নাই, পীড়িতার যথারীতি শুশ্রূষা হইতেছে না, কন্যাটিরও যত্ন হয় না। রামকান্তের এই বিপদের সময় তাঁহার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পূর্বে কখনও রামকান্তের গৃহে আসেন নাই, তাঁহারাই এখন তাঁহার গৃহস্থালীর ও কন্যাপালনের ভার লইলেন। রামকান্তকে আবার জগতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইল।

রাজলক্ষ্মীর বিছানা হইতে উঠিবার ক্ষমতা ছিল না, মেয়েটি তাঁহার কোলের কাছে শুইয়া হাত পা নাড়িয়া খেলা করিত, রাজলক্ষ্মীর তখন একবার উঠিয়া তাহাকে কোলে করিবার জন্য প্রাণের ভিতর হাকুলি-বিকুলি করিত, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই, শুইয়া শুইয়াই মেয়ের গায়ে একবার হাত দিতেন। কখনও, নিকটে কেহ না থাকিলে, মেয়ে যখন ক্ষুধায় কাঁদিত, রাজলক্ষ্মীরও চোখ দিয়া জল পড়িত, কাতরভাবে বলিতেন, "ঠাকুর, কবে আমি ভাল হব?" রাজলক্ষ্মীর সযত্নমার্জিত ঘর-দুয়ার মলিন হইয়া গিয়াছে, বাক্সের উপর, দেরাজের গায়ে ধূলা জমিয়াছে, জিনিষপত্র যে কোন্‌টা কোনখানে গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই; রাজলক্ষ্মী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন, আর নিশ্বাস ফেলিতেন। কখনও বা মৃদুস্বরে কোন প্রতিবেশিনীকে বলিতেন, "দিদি, ফরসিটা ক্ষ্যান্তর কাছে মাজতে দিও, ময়লা ফরসিতে উনি তামাক টানতে পারেন না।" এই কথাটি বলিতেই যেন কত সঙ্কোচ! "দিদি, মাছের ঝোল হ'লে উনি দুটি ভাত খেতে পারেন!" কত অনুনয়ের স্বরেই বলিতেন।

রামকান্ত কখনও কখনও আসিয়া রাজলক্ষ্মীর মাথার কাছে বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিতেন। "দেখ, খুকি কেমন খেলা করছে, ওর চোখ দুটি কার মত হয়েছে বল দেখি?" এইরূপ নানা কথা বলিয়া মা যেমন রোরুদ্যমান সন্তানকে ভুলায় তেমনি রাজলক্ষ্মী স্বামীর বিষণ্ণতা ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। রামকান্তের মুখে একটু হাসি দেখিলেই পীড়িতার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিত।

তিন মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। পূর্ণ তিন মাস শয্যাগত অবস্থায় রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মী সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। চিরবিদায়ের সময়—এখনই যে রাজলক্ষ্মী চলিয়া যাইবেন, রামকান্ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রতিদিনের মত তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া ছিলেন। রাজলক্ষ্মী যখন বলিলেন, "তুমি একটু স'রে এস, আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।" তখন পত্নীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রামকান্তের মনে সহসা কি যেন আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ব্যাপার যে কি ঘটিতেছে, ভাল করিয়া বুঝিতে না বুঝিতেই আত্মীয়স্বজনগণ তাড়াতাড়ি

ধরাধরি করিয়া রাজলক্ষ্মীকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল, রামকান্ত শূন্যগৃহে একাকী নির্বাকভাবে বসিয়া রহিলেন।

পত্নীর অন্তিমকার্য সম্পন্ন করিয়া রামকান্ত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন একজন প্রবীণা প্রতিবেশিনী কন্যাটিকে আনিয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার দুই চক্ষে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; পত্নীবিয়োগের পর এই তাঁহার প্রথম অশ্রুপাত। পত্নী জীবিতা থাকিতে রামকান্ত তাঁহাকে ভালবাসিতেন কি না তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না, আজ বুঝিলেন। বালিকার মুখখানি দেখিতে দেখিতে তাহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে রামকান্তের হৃদয় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিনও তিনি রাজলক্ষ্মীকে আদর করেন নাই, একটি ভালবাসার কথা পর্যন্ত বলেন নাই। রাজলক্ষ্মীর অভিমানশূন্য সদাপ্রফুল্ল মুখখানি তিনি একদিন ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। পীড়িতার সেই শীর্ণ দেহলতা, সেই অন্তিম বাক্য বার বার মনে পড়িতে লাগিল। রামকান্তের মনে হইল, রাজলক্ষ্মী যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "ছি! চোখ মুছে ফেল, খুকীকে কোলে নাও।" রামকান্ত প্রগাঢ় স্নেহে কন্যার মুখচুম্বন করিলেন।

বন্ধুরা বলিলেন, "এমন ক'রে আর কতদিন থাকবে? মেয়েটাকে তো বাঁচাতে হবে। আবার বিবাহ কর।"

প্রবীণগণ বলিলেন, "এত অল্পবয়সে কি শূন্য গৃহ শোভা পায়? বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ কর।" রামকান্ত নীরব হইয়া থাকিতেন।

মেয়ের মুখের দিকে চাহেন আর চোখে জল আসে। আ মরি, কি সুন্দর মুখশ্রী! এ কি বাঁচিবে? ভগবান কি দয়া করিয়া হতভাগ্যের তাপিত হৃদয় শীতল করিতে মেয়েটি দান করিবেন?

মেয়েটি বাঁচিল। এত অযত্নেও মেয়ে বলিয়াই বুঝি বাঁচিল। রামকান্ত মেয়ের নাম রাখিলেন "নিশি।"

রামকান্তের আয় অল্প, সংসারটিও ক্ষুদ্র। একটি পিতা একটি কন্যা, কিংবা একটি মা আর একটি ছেলে। বেশীর ভাগ একটি ঝি। নিশি এখন কেবল ছয় বছরে পা দিয়াছে, কিন্তু এখনই সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সেই এ সংসারের গৃহিণী। ঘরের জিনিসপত্র সে ইহারই মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে শিখিয়াছে। বাবা আফিস হইতে আসিবার আগে জলের ঘটিটি, গামছাখানি, কাপড়খানি এ সকল সে কখনও ঝিকে রাখিতে দেয় না। রামকান্তের উপর তাহার অতি কঠিন শাসন। যদি কোন দিন তিনি ভুলিয়া ছাতিটি বাড়ী ফেলিয়া যান, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিশি "এত

রোদ লাগিয়েছ, দেখো, অসুখ করবে, তা হ'লে আর আফিস যেতে পাবে না" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শাসন করে; কেবল তাহাই নহে, তাহার পর অন্তত দশ দিন রামকান্তের অভিভাবিকা আফিসে যাইবার সময় তাঁহার ছাতাটি আনিয়া হাতে তুলিয়া দেয়। রামকান্ত সর্বদা সর্ববিষয়ে নিশির কথানুযায়ী চলেন, তিলমাত্র অবাধ্যতা করিতে সাহস করেন না।

বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি, আকাশ মেঘপূর্ণ, নিশি রামকান্তের নিকট বসিয়া "গল্প বল, ও বাবা, একটা গল্প বল" বলিয়া আবদার করে। রামকান্ত কি করেন, গুড়গুড়ি ছাড়িয়া নিশির মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। আবার কোনদিন যদি আফিস হইতে আসিয়া "আমার বড় অসুখ করেছে বুড়ি" বলিয়া শয়ন করেন, সেদিন নিশির খেলা-ধুলা একেবারে বন্ধ হয়। "বাবা, তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? তোমার পা টিপে দেব? একটু জল খাবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন মিনিটে দশবার করিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। মনের ভাবটা যে, হয়তো বাবা বলিতেছেন না, বাবার বুঝি কিছু করিতে হইবে।

রামকান্ত সকালে দুটি ভাত রাঁধিয়া নিশিকে খাওয়াইয়া ও আপনি খাইয়া আফিস যাইতেন; নিশিও যত বড় হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। "বাবা, তুমি রোজ রোজ রাঁধ কেন, আমি বেশ রাঁধতে শিখেছি। তুমি দেখই না কেন! তুমি তাড়াতাড়ি পার না, আমি বেশ ভাল ক'রে রাঁধব।" ইত্যাদি নানাপ্রকার আবেদন আরম্ভ হইল। কোনদিন রামকান্ত স্বীকৃত হইতেন। সে দিন রান্নার ধুম দেখে কে? ডালনা, চচ্চড়ি, ভাজা কিছুই বাকী থাকিত না, তাহার পরদিন নিশির হাতে ফোস্কা দেখিয়া যখন রামকান্ত কিছুতেই রাঁধিতে দিতে চাহিতেন না, তখন নিশি বলিত, "তবে আজ আমরা দুজনেই রাঁধব।"

সন্ধ্যাবেলা গলির শেষের বাড়ীটির জানালার দিকে চাহিয়া দেখ, একটি ছোট মেয়ে কেবল একদৃষ্টে গলির মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। অবাধ্য কালো কালো চুলের থোপাগুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, দুখানি ছোট ছোট হাতে তাহা সরাইয়া দিতেছে। যাই ছাতি-হাতে রামকান্ত গলির মোড়ে দর্শন দিতেন, অমনি চারিটি চোখে চোখাচোখি হইত।

দিনে দিনে নিশি বাড়িয়া উঠিতেছে। দশ বৎসরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায়! রামকান্ত বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সৎপাত্রে দিবেন একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু টাকা কই? সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে, তাহাতে এখনকার দিনে অসৎপাত্রই জুটিয়া উঠে না। রামকান্ত বড়ই বিব্রত হইলেন।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করেন, "আহা, মেয়েটার মা নেই, কেই বা বিয়ের কথা বলে! হাজার হোক, এখন বড়টি হয়েছে, বিয়েতে কি আর সাধ হয় না? বিয়ের ভাবনায় রাতদিন মুখখানি মলিন ক'রে থাকে।" আহা, সত্যই

আজকাল নিশির মুখখানি বড়ই ম্লান। রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি সর্বদা হাসিমাখা থাকিত, আজকাল কেন জানি না, সে ওষ্ঠে আর হাসি নাই। রামকান্ত আজকাল এত অন্যমনস্ক যে, একবার নিশির মুখখানি চাহিয়াও দেখেন না। নিশি পা ধোয়ার জল লইয়া গেলে আর "আমার মা লক্ষ্মী" বলিয়া আদর করেন না। অভিমানী মেয়ের এত অনাদর সহ্য হয় না। নিশির যে চোখে জল আসে, তা তো রামকান্ত দেখিতেও পান না!

বঙ্গদেশে মেয়ে কেন জন্মগ্রহণ করে! বোধ হয় পিতামাতার পূর্বজন্মের কর্মফলেই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। রামকান্তের জগৎ-সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছেন। কন্যার বিবাহের যে কি উপায় করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, পরিচিত অপরিচিত সকলেরই অনুগ্রহের ভিখারী হইয়াছেন, কিন্তু সে অনুগ্রহ অতি দুর্লভ!

একদিন রাত্র অধিক হইল, তবু রামকান্তের দেখা নাই। নিশি একবার দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিতেছে, একবার জানালায় আসিতেছে, কত ঠাকুর-দেবতাকে মানিতেছে, তবু রামকান্তের দেখা নাই; প্রতি মুহূর্তেই নিশি চমকিয়া উঠিতেছে, ওই বুঝি রামকান্ত আসিতেছেন, ওই বুঝি গলির মোড়ে ছাতা দেখা যায়,—কই, কিছুই না! অবশেষে যখন রামকান্ত সত্যই আসিলেন, তখন নিশির প্রাণ আসিল। রামকান্ত দুয়ারে পা দিবা মাত্র নিশি তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, এত দেরি কেন?" রামকান্ত কেবল বলিলেন, "একটু কাজে", আর কিছু বলিলেন না। বিমর্ষভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, নিশির মুখখানি তেমনি আঁধার হইয়া গেল।

এইবার বুঝি নিশির বিয়ের ফুল ফুটিল। আজ ছয় মাস রামকান্ত কত বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া, কত সুপুত্রের পিতার পায়ে ধরিয়া, কত খুঁজিয়া যাহা মিলাইতে পারেন নাই, এইবার বুঝি বিধি তাহা মিলাইয়া দিলেন। এতদিনে একটি ছেলে ঠিক হইল। ছেলেটি সৎস্বভাব, বাপ-মা কেহই নাই, আসামের পোষ্টাফিসে কাজ করেন। বিবাহ করিয়া নিশিকে সেখানে লইয়া যাইবেন।

রামকান্ত বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় ভাবী জামাতা সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। নিশি একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল, নীচে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুরেশচন্দ্র একবার ঈষৎ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, নিশি চলিয়া গেল।

আজ ছয় মাসের পর রামকান্তের বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। এতদিন নিশির কোথায় বিবাহ দিবেন, কিরূপ পাত্র হইবে, শ্বশুরবাড়ীর সকলে ভালবাসিবে কি না, এই চিন্তায় কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না। আজ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভাবী

জামাতার মধুর চরিত্র ও ব্যবহার যত স্মরণ করিতেছেন, ততই হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। নিশি সৎপাত্রে পড়িবে, নিশি সুখী হইবে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, সেখানে আজ অন্য চিন্তার স্থান নাই। সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে নিশির ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নিশি জানালার ধারে বসিয়া আছে। নিশিকে দেখিয়া রামকান্তের চোখে একবিন্দু জল আসিল, —একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ নিশির মুখখানি দেখিয়া মনে হইল, যেন অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, এত কাহিল হয়ে গিয়েছ কেন?" নিশি উত্তর না দিয়া মুখ অবনত করিল, অনেক দিনের পর আদর পাইয়া অভিমানে তাহার দীর্ঘ নেত্রপল্লব অশ্রুবিন্দুতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পিতা আদর করিয়া মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "ছিঃ মা, কান্না কেন?" নিশি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাবা, কাল কি রাঁধব, বল না?" পিতা বলিলেন, "তোমার যা সাধ হয় তাই রেঁধো। এতদিন তো খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলে, এখন ছেলেটিকে কার হাতে দিয়ে যাবে? মা হয়ে আর কে রেঁধে দেবে?" নিশি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বাবা, আমি কোথা যাব?" রামকান্ত বলিলেন, "চিরকালই কি মা, তুমি আমার এই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকবে?" বলিতে বলিতে তাঁহারও নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল, নিশির মাথায় হাত দিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, স্বামীর ঘরে গিয়ে এমনি লক্ষ্মী হ'য়ো।"

রাত্রি অধিক হইল। উভয়ে আহার করিয়া শয়নগৃহে গমন করিলেন। পিতা কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা আমার আনন্দময়ী, কেমন ক'রে তোকে পরের হাতে দেব! দেবতা করুন, চিরজীবন সুখী হ'য়ো।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশি অর্দ্ধস্বরে বলিল, "বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।" আর কোন কথা হইল না।

সম্মুখে বৈশাখ মাস, তাহার পরে অকাল, অতএব এই মাসেই বিবাহ দিবার জন্য রামকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। ভাল ছেলেটি পাছে আবার হাতছাড়া হয়, এখন চারি হাত এক করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। রামকান্ত বিবাহের আয়োজন এবং জিনিসপত্র ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সময়ের অভাবে নিশির উদ্দেশ লইতেও পারিতেন না। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল বটে, কেবল বিবাহ সম্পন্ন হইল না। নিশি অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল।

সমস্ত বৈশাখ গেল, নিশির পীড়া আরোগ্য হইল না। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্রের ছুটি ফুরাইয়া গেল, তিনি কর্মস্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় নিশিকে একবার দেখিয়া গেলেন, আর ভাবী শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন,

"সম্মুখে অকাল, আর আমারও শীঘ্র ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, পীড়ার অবস্থা আমাকে সর্বদা লিখিবেন।" রামকান্তবাবু শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নিশির পীড়া আরোগ্যের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না। দিন দিনই অধরপল্লব দুখানি রক্তশূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন হইতেছে। পীড়া উত্তরোত্তর কেবল বাড়িতেছে। রামকান্তের আহার-নিদ্রা নাই, দিবারাত্র কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। নিশি কখনো রামকান্তের গায়ে হেলান দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে, "বাবা, আমার অসুখ ভাল হ'লে কি কি খাব, সেই গল্প কর্রি এস।" রামকান্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন, নিশিরও ঘুম নাই—"ও বাবা, শোও না।" রামকান্ত বলেন, "লক্ষ্মী মা, একটু চুপ ক'রে ঘুমাও।" নিশি বলে, "আর তুমি জেগে বাতাস করবে? তুমি না ঘুমালে আমি ঘুমাব না।"

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যায় পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া নিশির বিছানায় নিশির শীর্ণ মুখখানিতে পড়িয়াছে। নিশি ঘুমাইতেছে, রামকান্ত এক পার্শ্বে, ডাক্তার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রামকান্ত কেবল আকুল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ডাক্তার মুহুর্মুহু নাড়ী দেখিতেছেন। অবশেষে ডাক্তারবাবু নিশির হাত ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ আনিবার জন্য উঠিলেন, রামকান্ত ডাকিলেন, "নিশি, মা আমার!" নিশি জাগিয়া উঠিল, "বাবা" বলিয়া হাত দুখানি রামকান্তের কোলের উপর তুলিয়া দিল, আর সেই মুহূর্তেই রামকান্তের গৃহের আলো জন্মের মত নিবিয়া গেল।

ইহার চারিদিন পরে একদিন রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া গৃহের বহির্দ্বারে বসিলেন, অমনি জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেখানে আজ আর কেহই নাই। খোলা জানালার উচ্ছৃংখল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া হু-হু করিয়া উঠিতেছে। রামকান্তের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর চক্ষু মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মা আমার, তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, আমি তোমাকে লইয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছিলাম। তুমি আমার বড় আদরিণী, কার হাতে সঁপিয়া দিব, সে তোর আদর করিবে কি না, এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। যাঁহার ধন তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি। হায় প্রভু, বন্ধন ভাল, না, বন্ধনের মুক্তি ভাল, এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই।" নিশ্বাস ফেলিয়া রামকান্ত শূন্যগৃহে প্রবেশ করিলেন।

('ভারতী ও বালক', পৌষ ১৩০৪)

কন্যাদায়

খুব ভোরেই বাড়ী আসিয়া পেঁৗছিলাম। 'বাড়ী' বলিতে অনেক দিনের পর বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আর সে বাড়ী চোখে দেখি নাই, এখন মামার বাড়ীই আমাদের আশ্রয়, এই আশ্রয় না থাকিলে মা ও আমরা তিনটি ভাইবোন যে কোথায় দাঁড়াইতাম, ভাবিয়া পাই না।

যখন প্রথম মামার বাড়ীতে আসি, চারু তখন পাঁচ বছরের, তরু সাত বছরের। তরুর নিজের অবস্থা বুঝিবার মত জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু চারু তো কিছুতেই বুঝে না, কেবলি বলিত, "মা, এ বাড়ীতে থাকব না, এ বাড়ী ভাল নয়, আমাদের সে বাড়ী কই?" মা চারুর কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইতেন। আমি বুঝিতে পারিতাম, চোখের জল লুকাইবার জন্য মা মুখ ফিরাইয়াছেন। কিন্তু চারু তো তাহা বুঝিত না, কেবলই মার আঁচল ধরিয়া টানিত, আর সেই এক কথা "ওমা, বাড়ী চল।"

সেদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার শীত শীত করিতেছিল, মনে হইতেছিল, বুঝি জ্বর আসে। মাতুলালয়ের পল্লীটি কলিকাতার অন্তর্বর্তী বলিয়া ধরা হইলেও এখানে শহরের কোন চিহ্ন ছিল না। এজন্য চারিপাশের ঝোপ্-ঝাপে ম্যালেরিয়ার বাসা ছিল, কাজেই আজ পাঁচ-ছয় মাস হইতে আমার উপরও তাঁহার শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। বাড়ীখানি একতলা, দুটি ঘর ও একটি রোয়াক মাত্র, তাহাও আবার অনেক দিন হইতে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, বালি চূণ সমস্তই খসিয়া গিয়াছে, কেবল জীর্ণ ইষ্টকের কঙ্কাল কয়খানি কোনমতে খাড়া হইয়া রহিয়াছে। আম, জাম ও নারিকেল গাছ চারিদিক হইতে বাড়ীখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহার লজ্জানিবারণ করিয়াছে। পিছনে এঁদো পুকুর, সেইটিই ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রিয়স্থান।

বড় মামা সওদাগরী আফিসে কাজ করেন, পঁচিশটি টাকা মাহিনা পান, আর দুটি মামা এখনও পঠদ্দশায়। ইহা হইতেই সাংসারিক অবস্থা অনুমেয়।

আমার পায়ের শব্দ শুনিয়াই মা বাহিরে আসিলেন। বোধ হয় আমার জন্য মার সমস্ত রাত্রিই ঘুম হয় নাই। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "অমূল্য, এলি বাবা? অসুখ শরীর নিয়ে অতদূর যাওয়া, আমার মন ভারি উতলা হয়েছিল। কোন অসুখ করে নি তো?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মা, মানকর স্টেশন যদি তোমার কাছে 'অতদূর' হয়, তবে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন তো পৃথিবীর বাহিরে। তোমার আর কোনকালে তীর্থ করা হবে না।"

মা বলিলেন, "কে জানে বাছা কতদূর; জন্মে কখনও রেলগাড়ীতে উঠি নি, পাড়াগাঁ শুনলেই মনে হয়, সে কোন্ তেপান্তর মাঠের ভিতর। তা যাক্‌গে, তুই আছিস্ কেমন, বেশী ঠান্ডা লাগাস্ নি তো?"

আমি। মা, যার জন্য গিয়েছিলাম, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে না, কেবল বাজে বকছ। তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করলে না, তেমনি আমিও তোমাকে কিছু বলছি না।

"আচ্ছা বলিস্ নে।" বলিয়া মা গৃহকার্যে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া ভাবিলাম, আমিই তবে হারিলাম।

এমন সময় বড় মামা বাহিরে আসিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কি রে অমূল্য, ছেলে কেমন দেখে এলি, বাড়ী-ঘর কেমন দেখলি? কত চায় তারা?"

আমি। ছেলেটি মন্দ নয়। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছিল, এখন পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় ঢুকেছে। বাড়ী-ঘর বেশ ভাল, বাড়ীতে বাগান-পুকুরও আছে। ধেনো জমিও কিছু আছে, তাতে বেশ ধান হয়।

মামা। এ সব তো ভালই, এখন আসল কথা, চায় কত?

আমি। মাসীমার বাড়ী তরু যেদিন গিয়েছিল, সেইদিন ছেলে নাকি নিজেই তরুকে দেখেছে। ধরণীবাবু বললেন, "আমি হাজার টাকার এক পয়সা কমেও ছাড়তুম না, তবে ছেলের পছন্দ হয়েছে, আর তোমাদের অবস্থাও ভাল নয় শুনেছি, এই জন্য পাঁচ শো টাকাতেই রাজী হতে হ'ল।"

মামা। পাঁচ শো টাকা! এবার তোর মাথার চুল বিকিয়ে যাবে। এ টাকা ছাড়া আরও কিছু দিতে থুতে হবে নাকি?

আমি। না, ঐ টাকার ভিতরই সব, এই কথা তো বলেছেন।

"এক রকম সস্তাই বলতে হবে, কিন্তু পাঁচ শো টাকা কি ক'রে যোগাড় হবে! তাই তো!" বলিতে বলিতে মামা স্নান করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

মা তখন স্নান করিয়া আসিয়াছেন, তরু বঁটি লইয়া কুটনো কুটিতেছে। আমি মার নিকটে গিয়া বলিলাম, "মা, তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে এসেছি, এখন পাঁচ শো টাকা দাও।"

মা ম্লান হাসি হাসিলেন।

আমি বলিলাম, "পাঁচ শো টাকা চাওয়া ভুল হয়েছে মা, ছ' শোই দিতে হবে, বরযাত্রী খাওয়ানো আছে, আর আমরাই বা কি দোষ করেছি যে, খেতে পাব না!"

মা বলিলেন, "আমার যথাসর্বস্ব ধন কেবল তুমি আছ, আর কিছু নাই।"

"তবে আমাকেই বিক্রী কর, ক'রে টাকা দাও। টাকা না দিলে তো মেয়ের বিয়ে হবে না।"

তরুর দিকে চাহিয়া দেখি, ঘাড় হেঁট করিতে করিতে সে বঁটির উপর উপুড় হইয়া পড়িবার মত হইয়াছে। বাস্তবিক তরুর জন্য ভারি কষ্ট হয়।

উঠিতে বসিতে, কথায় কথায়, মার কাছে বকুনি খায়। অপরাধ কি—না, বিয়ে হয় না। আমি ভাবি ও-বেচারী কি করিবে? বিয়ে করিতে যে ওর অনিচ্ছা এমন কথা তো কখনও বলে নাই, যদিই বা বলে তাহাতেও কিছু বিবাহ বন্ধ হইবে না। বিবাহ বন্ধ হইতেছে কেবল টাকার জন্য, তাতে ওর দোষ কি? বাস্তবিক মার কি অন্যায়! তরু খাবার চাহিলে মা রাগের মাথায় কতদিন বলিতেন, "থুবড়ি! বিয়ে হয় না, কেবল খেয়ে খেয়ে হাতী হচ্ছে।" এ কি আশ্চর্য! বিয়ে হয় না বলিয়া সে উপোস করিয়া থাকিবে নাকি? আবার না খাইলেও বকুনি, "বিয়ের চিন্তায় বুঝি মুখে অন্ন রুচে না?" পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতে যাওয়া বন্ধ, "এত বড় আইবুড়ো মেয়ের কি পাড়ায় বেড়ানো ভাল দেখায়?" বেচারীর কি কষ্ট! আমি মনে করিতাম, "মেয়েগুলো কেন যে জন্মায়!" কিন্তু, আজ তরু তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া অসাবধানে এক ঘটি জল ফেলিয়া দিল, মা তবুও কিছু বলিলেন না, এটা একটা আশ্চর্যের কথা। বোধ হয় বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে দেখিয়া মা তরুর উপর খুসী হইয়াছিলেন।

সেদিন ভাত খাইতে বসিয়া আমি কেবল টাকার কথাই ভাবিতেছিলাম। ভাবনাটা আমার তেমন অভ্যাস ছিল না, কিন্তু আজকাল তাহার সঙ্গে একটু একটু করিয়া আলাপ হইতেছে। দিদির বিবাহের ভাবনা আমাকে ভাবিতে হয় নাই, তখন আমি ছোট ছিলাম বলিয়া মা একাই সকল ভাবনার ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু তরুর যে আবার বিবাহ দিতে হইবে সে কথা বোধ হয় মার মনে ছিল না, তাই যা কিছু সম্বল ছিল, সমস্ত ঘুচাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ভাল ঘরে দিদির বিবাহ দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি দিদির শ্বশুররা খুব বড় মানুষ, তাঁহাদের অর্থের অভাব কিছুই নাই. তবে কেন দরিদ্রের সামান্য সম্বলটুকু গ্রহণ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল, এ কথা বুঝিতে পারি না। ধনী কুটুম্ব করিবার সাধ মার বড়ই প্রবল ছিল, তাহারই ফলে বিবাহের পর দিদি যে এক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সে এক বৎসর মা আর তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, কেবল তাঁহার যাত্রা করিবার দিন লোকের মুখে সংবাদ পাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন। গিয়া যা দেখিয়াছিলাম, সে কথা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। লক্ষ্মী-প্রতিমার মত দিদির সেই সুন্দর অচেতন দেহখানি অঙ্গনে পড়িয়া আছে, সেই সুন্দর কালো চুলগুলি ভূমিতে লুটাইতেছে,—উঃ, সে কি চোখে দেখা যায়! দিদির শাশুড়ী দ্বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "ওরে, হাতের চুড়িগুলো আর তাগা দুগাছা খুলে নে।" সে কথা যেন বজ্রধ্বনির মত আমার কানে গিয়া লাগিয়াছিল। দিদির মুখের কাছে মুখ নিয়া ডাকিলাম, "দিদি!" সেই আমার মৃদুস্বরের ডাকেই দিদির চৈতন্য ফিরিয়া আসিল,

চোখ খুলিয়া যখন আমার দিকে চাহিলেন, সে চোখে কি করুণ স্নেহের দৃষ্টিই দেখিয়াছিলাম!

কি কথা ভাবিতে ভাবিতে যে কি কথা মনে আসিয়া পড়ে তাহার ঠিক নাই। দিদির কথা মনে পড়িয়া আমি তো তরুর বিবাহের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া মনে করিতেছেন, সেই চিন্তাতেই বুঝি আমি তন্ময় হইয়া আছি। বোধ হয় অনেকক্ষণ মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুই যে কিছুই খেতে পারলি নে? অমূল্য, অত ভাবিস নে বাবা, ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। বন্ধকী বাড়ীটা বিক্রি হ'লে কি চার শো টাকাও পাওয়া যাবে না? আমার যেমন অদৃষ্ট! দুধের ছেলে তুই, পোনের বছর বয়সেই তোকে বোনের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হ'ল।"

মার কথা শুনিয়া আমার ভারি লজ্জা হইল। মাকে থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না মা, আমি কিছুই ভাবছি নে। তুমি আজ একবার মাসীমার কাছে গিয়ে ব'লে দেখো তিনি যদি কিছু ধার দেন।"

"আমোদিনী! সে আবার টাকা দেবে? সে 'দিদি' ব'লে আমার সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা পায়, তরুর বিয়েতে সে টাকা দেবে! তবু মনীনকে ভাল বলতে হয়, সে ভগ্নীপতি, বোনই যখন বোনের দুঃখ বোঝে না, তখন ভগ্নীপতিকে আর কি বলব? টাকার কথা যা হোক, আমোদিনী যদি তার বাড়ী থেকে বিয়ে দিতে দেয় তা হ'লেও বাঁচি। এ বাড়ী তো একে ভাঙা, তায় মোটে দুখানা ঘর। সভাই বা কোথায় হবে, লোকজনই বা কোথায় বসবে?"

আমি মায়ের কথায় আর কিছু উত্তর দিলাম না। কেননা, জানিতাম, কথায় কথা বাড়িলে ক্রমে পুরানো কথা উঠিয়া পড়িবে আর সেই সঙ্গে মায়ের দুঃখসমুদ্রও উথলিয়া উঠিবে, শেষে মা কাঁদিতে আরম্ভ করিবেন। ভাত খাওয়া শেষ করিয়াই মাসীমার বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইলাম। পথে এক পসলা বৃষ্টি আসিল, ছাতা ছিল না, বাধ্য হইয়া ভিজিতে হইল।

অদৃষ্টগুণে ও সৌন্দর্যের গুণে মাসীমা ধনবানের পত্নী হইয়াছিলেন। মাসীমা যে মাকে 'দিদি' বলিতে লজ্জা বোধ করেন, তাহাতে মাসীমাকে দোষ দেওয়া যায় না। আজ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমার কাপড়ের অপেক্ষা মাসীমার দেউড়ির দরোয়ানের পোষাক তো ভালই, এমন কি হরে চাকরের কাপড়-জামাও অনেক ভাল।

তবু সেই ময়লা ভিজা কাপড়ে সেই কাদা-মাখা জুতা পায়েই দ্বিতলে উঠিলাম। মাসীমা তখন আহারান্তে শয়নগৃহে সোফার উপর শুইয়া একখানি উপন্যাস পড়িতেছিলেন, মেসোমহাশয় দুয়ারের নিকট চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে অমূল্য, বর দেখে এলি?"

আমি বর দেখার বিস্তারিত বিবরণ মেসোমহাশয়ের নিকট বলিলাম।

মেসোমহাশয় বিষয়ী লোক, খুঁটিনাটি সকল দিকেই তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টি, খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সমস্ত বিবরণ আমার নিকট সংগ্রহ করিয়া অবশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "সম্বন্ধটা তবে মন্দ নয়।" আমি বলিলাম, "পাড়াগাঁ ব'লে মার একটু মন খুঁত খুঁত করছে?"

আমার কথা শুনিয়া সোফা হইতে মাথা তুলিয়া মাসীমা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মেসোমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "দিদির ওসব কথা যেতে দাও। এখন কাজের কথা হোক। টাকার কথা একেবারে ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে?"

"হাঁ, পাঁচ শোর ভিতরই সব, এই রকম কথা হয়েছে।"

"কথা তো হয়েছে, কিন্তু হয়তো এর পর আবার নূতন কিছু বায়না নিয়ে বসবে। তা সে যা হয় হবে, এখন টাকার চেষ্টাটা আগে চাই। তোদের বাড়ীটা রেখে আর কি হবে, সুদে সুদে আর কিছু দিন পরে বাড়ী থেকে একটা পয়সা পাওয়া যাবে না। বাড়ীটা বিক্রীর চেষ্টা করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আপনি ভার না নিলে কোন মতেই হবে না। আপনি এ সমস্ত যেমন বোঝেন—" মেসোমহাশয় হাসিতে লাগিলেন, বিষয়কার্য তিনি ভাল বুঝেন, এ কথা কেহ বলিলে তাঁহার বড়ই আমোদ হইত। বলিলেন, "দেখা যাক্, কি হয়, বিয়ে তো এই মাসেই?"

"তা নইলে তো আর দিন নাই! সম্মুখে ভাদ্র মাস, তার পরও আশ্বিন কার্তিক দু মাস বিয়ে হবে না।"

"তবে তো এই মাসে দেওয়া দরকার বটে।"

আমি বলিলাম, "বিয়ে কোন্ বাড়ী থেকে হবে? ও বাড়ীতে মোটে দু খানা ঘর, কোথায় সভা হবে, কোথায় বরযাত্রী বসবে, মা এই কথা বলছিলেন।"

মেসোমহাশয় বলিলেন, "তাই তো! তা না হয় এ বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে।"

মাসীমা এইবার হাতের উপন্যাস রাখিয়া দিলেন। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া একবার মেসোমহাশয়ের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন; শেষে একটু শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "যাদের মোটে দুখানা ঘর তারা কি আর মেয়ের বিয়ে দেয় না? সকলেরই কি তোমার মত ভগ্নীপতি থাকে যে, তার বাড়ী থেকে বিয়ে দেবে?"

মেসোমহাশয় হাসিতে লাগিলেন। আমি দুয়ারে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, একবার আমার দিকে একবার মাসীমার দিকে চাহিয়া মেসোমহাশয় বলিলেন, "তোমার যদি কোন অমত থাকে, তবে ঐ বাড়ী থেকে তোমার বোনঝির বিয়ে হোক, কি বল? তোমার অমতে তো আমি কোন কাজ করি না। তবে বরযাত্রীদের জন্য তত ভাবি না, তুমি গিয়ে বসবে কোথায় সেই ভাবনা হচ্ছে।"

মাসীমা এই কথা শুনিবামাত্র বই ফেলিয়া সশব্দে সোফা হইতে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। তিনি যে রাগ করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য খুব জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "তোমার বাড়ী তুমি যা খুসী তাই করবে, আমি কেন তাতে কথা কইতে যাব?"

মেসোমহাশয় কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমার দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিয়া আমার বড়ই শীত করিতেছিল। মেসোমহাশয় আমার দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "এ কি অমূল্য, তুই কাঁপছিস যে, শীতে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিস্! এতক্ষণ ভিজা কাপড়ে আছিস্? শীগ্‌গির কাপড় ছাড়্।"

আমি অতি কষ্টে বলিলাম, "বাড়ী গিয়েই কাপড় ছাড়ব।"

অত্যাচারের ফলে এবার আমার জ্বরটা খুব বেশীই হইল, দুই দিন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলাম। এ দুই দিন বড় মামা আফিস কামাই করিয়া আমার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় বরফ চাপাইয়াছিলেন।

বড় মামার স্বভাবটি ঠিক বুঝা যায় না। জীবনে কখনও তাঁহার মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বড় মামার বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর, পাঁচ বৎসর পূর্বে বড় মামার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল, এক স্থানে প্রায় ঠিকঠাকই হইয়া গিয়াছিল। তখন আমার দিদিমা জীবিত ছিলেন, বধূমুখ দেখিবার জন্য ছেলের মায়েরা যেমন ব্যাকুল, দিদিমা তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যাকুলই হইয়াছিলেন। দিদিমার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, মনের ব্যাকুলতায় তাঁহার দু চোখে যাহা পড়িত, ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাহাই কিনিবার চেষ্টা করিতেন। গায়ে-হলুদের তত্ত্বে পাঠাইতে খুঁটিনাটি যাহা দরকার, দিদিমার সমস্ত গুছানো হইয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে আমরা পিতৃহীন হইয়া মাতুলের গলগ্রহরূপে উপস্থিত হইলাম। বাবা জীবিত থাকিতে লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া মনে করিত, কত আশ্রয়হীন তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই যে তাঁহার ঋণদায়ে আমরা একেবারে নিরাশ্রয় হইব, এ কথা তিনি হয়তো কখনও মনে করেন নাই। আমরা মামার বাড়ী আসিবার পরদিন বড় মামা দিদিমাকে বলিলেন, "আমি বিবাহ করিব না।" বড় মামার কথায় ও কাজে কখনও অমিল হয় না, দিদিমা এ কথা খুব ভাল করিয়াই জানিতেন, তথাপি অনুনয়, বিনয়, অশ্রুবর্ষণ, আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখানো প্রভৃতি কোন উপায় অবলম্বন করিতেই ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে কয়েক মাস পরে ভগ্নহৃদয়ে পরলোকে প্রস্থান করিলেন; পুত্রবধূর মুখদর্শনের সাধ আর তাঁহার মিটিল না।

বড় মামার মুখে মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই, কিন্তু কটুকথা অনেক শুনিয়াছি। স্বভাবত বড় মামা একটু রাগী স্বভাবের, রাগ হইলে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না, অনেক দিন রাগের মাথায় মাকে বলিতেন, "তুমি আমার বাড়ী

থেকে চ'লে যাও। আমি গরীব মানুষ, এত লোককে কোথা থেকে খেতে দেব?" মা একটিও উত্তর করিতেন না। নিঃশব্দে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত, আমি সে চোখের জল কত দিন দেখিয়াছি। মায়ের চোখের জল যেন আমার হাড়ের ভিতর আগুন জ্বালাইয়া তুলিত। চাকরির জন্য কত জায়গাই ঘুরিয়াছি, অবশেষে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত একটা প্রেসের কাজ জুটিয়া গেল। পরীক্ষা দিবার লোভ কিছুতেই ছাড়িতে পারিলাম না বলিয়া দিনের কাজ আর নেওয়া হইল না।

এখন সে কথা যাক্। দুই দিনের পর যে দিন আমার সহজ জ্ঞান হইল, সেই দিন বড় মামা আর আফিস কামাই করিতে ভরসা করিলেন না। তাড়াতাড়ি দুটি গরম ভাতে-ভাত নাকে-মুখে গুঁজিয়া আফিসে ছুটিলেন। বড় মামা বাহির হইয়া যাইবার পরক্ষণেই ঘটকী আসিয়া উপস্থিত।

"কর্তা দিন ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন, পরশু গায়ে-হলুদ, তার পরদিনে বে', তা ছাড়া আর ভাল দিন নেই।" মা তো আকাশ হইতে পড়িলেন।

"সে কি, বিয়ের যে এ মাসে ঢের দিন আছে, এই তো মাসের মোটে আট দিন।"

ঘটকী বলিল, "সে সব দিন তেমন ভাল নয়, তারা অদিনে ছেলের বে' দেবে না। তা তোমাদের তো শুভ কাজ শীগ্‌গির হয়ে গেলেই ভাল, আর কিই বা এমন ঘটা করবে যে দু দিনে যোগাড় হবে না।" মা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাড়ীতে লোক তো কেউ নেই, মনীনের কাছে এখন কে যায়! ফণী (বড় মামা) আফিস থেকে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়ে, আবার এই দুদিন না খাওয়া, রাত জাগায় তার শরীর একেবারে কাঠি হয়ে গিয়েছে, তাকেই বা কি ক'রে বলি?"

"আমি মেসোমহাশয়ের কাছে যাচ্ছি" বলিয়া আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মা "করিস্ কি অমূল্য, ঘুরে প'ড়ে যাবি" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু সে কথা শুনিতে গেলে চলে না, কাজেই আর বাধ্য ছেলে হওয়া চলিল না।

মেসোমহাশয় বারান্ডার সম্মুখে দুয়ারের কাছে চেয়ারে বসিয়া খড়খড়িতে পা দিয়া খবরের কাগজ পাঠে মগ্ন ছিলেন; আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এ কি অমূল্য, তোর না ভারি অসুখ?"

আমি এক নিশ্বাসে সমস্ত বক্তব্য শেষ করিয়া মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িলাম।

মেসোমহাশয় জমিদারি চালে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তাই তো, দু দিনের ভিতর কি ক'রে হয়, বাড়ী বিক্রী কি মুখের কথা, তা আবার বন্ধকী বাড়ী।"

আমি বলিলাম, "আপনি মনে করলে সমস্তই হবে। আপনি ছাড়া আর উপায় নেই।"

বেশ জানিতাম, এই কথাটিই মেসোমহাশয়কে কাজে লাগাইবার প্রধান ঔষধ।

মাসীমার বাড়ী থেকেই বিবাহ হওয়া স্থির হইল। মাসীমা কিন্তু সেদিন মাথাধরায় বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার সময় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া বরযাত্রী সহ বর আসিলেন। মেসোমহাশয় যথাবিধি আদর অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। অবশেষে সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত হইয়াই বিপদ বাধিল। "এ কি, এ পাতে চাল ডাল, ঢালা দানসামগ্রী, বাসন কই? ছেলের ঘড়ি ঘড়িচেন দিবে না, তাই বলিয়া কি আংটিও দিবে না? আসন বসন ছত্র অঙ্গুরী এ সকল না দিলে কি সম্প্রদান হয়? এ কি হিন্দুর বাড়ী নয় না কি?"—বরকর্তা একেবারে চটিয়া আগুন হইলেন, "আমি এমন ছোটলোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিব না" বলিয়া পাত্রের হাত ধরিলেন। পাত্র বেচারীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, বেচারীর বিবাহ না করিয়া অমনি অমনি ফিরিয়া যাইতে একেবারেই ইচ্ছা নাই। কিন্তু কি করে, পিতার ভয়ে একেবারে নীরব। বাড়ীতে হাঁক-ডাক চীৎকার, বরযাত্রীদের কলরব ইত্যাদিতে বিবাহ-আসরটি বেজায় জমকাইয়া উঠিল। বড় মামার খুব রাগ হইলে কাছা খুলিয়া যাইত, এবং কথা বলিতে পারিতেন না। কথা বলিতে পারিতেন না এইটি মঙ্গলের বিষয়, নহিলে সে রাত্রে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিত।

তরু এতক্ষণ আলিপনা-দেওয়া ধান-বিছানো পিঁড়ির উপর চেলীর কাপড় পরিয়া বসিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতেছিল, ভয়ে এখন তাহার কান্না বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চারু দিদিমণির পিছনে চুপ করিয়া ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। মা একেবারে মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিলেন, "অমূল্য, এ কি হ'ল রে বাবা! এখন যে জাত যায়!"

গোলমালে মাসীমার মাথাধরা ছাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এ কি বালাই ঘাড়ে করা! আমি এই জন্যই তখন বলেছিলাম, তা আমার কথা শুনবে কেন? .এখন পরের জঞ্জাল ঘাড়ে ক'রে নিয়ে কি করবে তা কর।"

মেসোমহাশয় আলমারি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তোমার মেয়ের বিয়েতে এর চেয়েও বেশী জঞ্জাল ভুগতে হবে।"

তারপর মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি, হয়েছে কি, তোমার অমন প্যানপ্যানে স্বভাব কেন? এ আর গোলমাল কিসের? গোলমাল নইলে কি বিয়ে হয়? এমন কত বিয়ে দেখে এসেছি। আমি যখন ভার নিয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

মেসোমহাশয় আলমারি হইতে ঘড়া ঘটি বাটি থালা কার্পেট ইত্যাদি বাহির

করিতেছেন দেখিয়া মাসীমা বলিলেন, "ও হচ্ছে কি, সুরোর দানের জিনিস বার করছ কেন?"

"তরুর দানে দেব ব'লে।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিবাহ-সভায় দানের সামগ্রী সাজানো হইয়া গেল, ছাতা জুতা কার্পেট কিছুই বাদ পড়িল না। বরকর্তা চাহিয়া দেখিলেন, জিনিস অনেক। আর সব জিনিসের মত জিনিস বটে, অতএব অবাধে সম্প্রদান শেষ হইয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যুষে কন্যা-বিদায়। বর-কনে গাড়ীতে উঠিলে বরকর্তা দানসামগ্রীর আর কোন খোঁজ পাইলেন না। বলিলেন, "দানের জিনিস-গুলি এই সঙ্গেই দিয়া দিন, ফুলশয্যার সঙ্গে পাঠাতে ভারি হাঙ্গাম হবে।"

মেসোমহাশয়ের গোমস্তা রামলোচনবাবু বরকর্তার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি যেন বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি মশায়, দানের জিনিস আবার কি, সে সব কিছু তো দেওয়ার কথা ছিল না! আপনি বলেছিলেন যে, পাঁচ শোর ভিতরই সব।"

"আরে তা তো বলেছি। কাল দানে যে জিনিস দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো কোথা গেল?"

"সে দেখতে খারাপ দেখায় ব'লে বাবু আসর সাজিয়ে দিয়েছিলেন, এখন আবার তুলে রাখা হয়েছে।" বলিয়া গোমস্তা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

বরকর্তার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। "পাজি, ছোটলোক" বলিয়া ছুটিয়া দরজায় গিয়া দেখিলেন, ততক্ষণে বরকন্যার গাড়ী স্টেশনে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার গাড়ীখানা কেবল উপস্থিত আছে।

অগত্যা সেই গাড়ীতে উঠিয়া বরকর্তা স্টেশন অভিমুখে রওনা হইলেন।

এইরূপে বরকন্যা বিদায় করিয়া দিয়া মেসোমহাশয়ের আর স্ফূর্তির সীমা নাই। বড় মামার পিঠ চাপড়াইয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, "ভায়া, আমাকে কি যেমন-তেমন লোক ঠাওরাও?"

মাসীমার কাছে গিয়া বলিলেন, "কি? বড় যে বল বুদ্ধি নাই, আছে কি না দেখলে?" মাসীমা সে কথার উত্তর দিলেন না। বরের হাতে সুরোদাদার আংটি পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আংটিটি খুলিয়া নেওয়া হয় নাই, সেই আংটির কথা স্মরণ করিয়া মাসীমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

মেসোমহাশয় মাকে বলিলেন, "কেমন দিদি, জাত তো যায় নাই? মেয়ের বিয়ে হ'ল তো?" মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মেসো-মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার গুণের ধার এ জীবনে শোধ দিতে পারব না।"

মেসোমহাশয় শুনিয়া হা-হা করিয়া খুব হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'তা ব'লে আংটির ধারটা তোমার শোধ ক'রে দিতে হবে, তা নইলে সুরোর মা আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।"

আমি দেখিলাম, ব্যাপারটা তেমন সুবিধা হইল না। আমাদের এই জুয়া-চুরির ফল তরু বেচারীকে ভুগিতে হইবে। কিন্তু সে সময় আর তো কিছু উপায়ও ছিল না!

('জাহ্নবী', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫)

কাঁচের দোয়াত

পৌষ মাসের শীত, তাহাতে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন দিনে যে আমার খিচুড়ী খাইবার বাসনা প্রবল হইবে, সে কথা আমার স্নেহময়ী খুড়িমার মনে হওয়াই স্বাভাবিক, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রন্ধনগৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলে খুড়িমা আমার জন্য নিজেই রাঁধিতেন।

দেখিলাম, খুড়িমা খিচুড়ীই রাঁধিতেছেন বটে। এত সাধের খিচুড়ী পাছে অশ্রুজলে লবণাক্ত হইয়া যায়, এই ভয়ে আগামী কল্য কলিকাতায় যাইতে হইবে, এ সংবাদ তাঁহাকে দিতে সাহস হইল না।

খুড়িমার বোধ হয় হাত পুড়িয়া গিয়াছিল, কেননা, তিনি একটু অপ্রসন্ন-মুখে ছিলেন. কিন্তু রন্ধনগৃহের দ্বারে আমার আবির্ভাব হইবামাত্র তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আমার দিকে চাহিয়াই তিনি বলিলেন, "হ্যা রে খোকা, আজও তুই স্নান করলি নে? এত শীতের ভয় তোর? যা, শীগ্‌গির তেল মেখে দীঘিতে একটা ডুব দিয়ে আয়. আমার খিচুড়ী হয়েছে, মাছটা হ'লেই হয়।"

আমি উনিশ বৎসর বয়সেও খুড়িমার নিকট খোকা ছিলাম। অনেক চেষ্টাতেও তাঁহার এ কু-অভ্যাস দূর করিতে পারি নাই।

নির্মলা রোয়াকের উপর বসিয়া শাক বাছিতেছিল, তাহাকে বলিলাম, "নির্মলা, শাকবাছা রেখে শীগ্‌গির আয়, তোকে একটা কবিতা শোনাব। শুনে তোকে ঠিক ক'রে বলতে হবে, কেমন হয়েছে।"

নির্মলা বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে চলিল। খুড়িমা ডাকিতে লাগিলেন, "ও খোকা, খোকা, কবিতে পড়া এখন থাক্, আগে তেল নিয়ে যা, বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে।" আমি সে কথায় কর্ণপাতও করিলাম না।

পড়িবার ঘরে গিয়া ডেস্কর ভিতর হইতে একখানি সুন্দর বাঁধানো খাতা বাহির করিলাম, সেখানি আমার ডায়েরী।

নির্মলা লুব্ধদৃষ্টিতে খাতাখানির দিকে যে নিশ্চয়ই চাহিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সকৌতুকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি কবিতার খাতা? কার খাতা দাদা?"

আমি বলিলাম, "বল্ দেখি কার?"

নির্মলা বলিল, "আমি জানি না, তুমি বল।"

আমি যতদূর সাধ্য গাম্ভীর্যের আসনে আপনাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিলাম, "আমার।"

"সত্যি!" এত বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে নির্মলা এই কথাটি বলিল যেন, তাহার দাদা কোন রাজ্য জয় করিয়া আসিয়াছে।

"তুমি কবিতা লিখতে পার? কি ক'রে শিখলে?"

"পাগল! কবিতা লিখতে কি আবার শিখতে হয়, ও-সব আপনা হতেই মনে আসে। দেখিস্, এখন থেকে কত কবিতা লিখব। শোন্,—

রাণী তুমি রাণী নহ, রাজরাজেন্দ্রাণী!
তুচ্ছ এ পৃথিবীর রাজ্য সকলি অসার।
তুমি হৃদয়ের রাণী, এ হৃদয়খানি
তব সিংহাসন! দেবী, সাম্রাজ্য তোমার।
কি গর্বস্ফুরিত ওই ফুল্ল ওষ্ঠাধর;
অঙ্গে অঙ্গে কি মহিমা কি গরিমা হেরি
বন্দী চিত্ত আছে নিত্য চরণের 'পর,
নূপুরের মত ওই পা দুখানি ঘেরি।
কি অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গী! ললাট সুন্দর!
নয়নে করুণ দৃষ্টি কি শান্ত সুধীর!
কি গরিমাপূর্ণ ওই কাম-কলেবর,
কল্পনার দেবী তুমি, নহ পৃথিবীর!
রাজেন্দ্রাণী দীনে কর তব মালাকার,
নিত্য মালা গাঁথি দিব চরণে তোমার।"

কবিতা শুনিয়া নির্মলা একেবারে মুগ্ধ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন হয়েছে?" সে কথা তাহার কানেই পেঁাছিল না। দেখিলাম, সে অন্যমনস্কভাবে জানালার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দুটি চোখের কোলে দুই ফোঁটা জল টলটল করিতেছে। ভাবিলাম, সার্থক এ কবিতা!

হঠাৎ নির্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "রাণী কে, দাদা?"

আমি বলিলাম, "দূর মুর্খ, ও-সব কল্পনা। এতকাল কবিতা পড়িয়া আসিতেছিস, কল্পনা সম্বন্ধে তোর একটুও জ্ঞান হইল না?"

বাস্তবিক নির্মলা বারো বৎসর বয়স হইতে কেবল কবিতাই পড়িয়া আসিতেছে, উপন্যাস সম্বন্ধে তাহার বড় বেশী আগ্রহ ছিল না। বিবাহের পূর্বেও যখন সে কেবল সাত-আট বৎসরের, তখনই স্কুল-পাঠ্যের মধ্যে কবিতা-পুস্তকই তাহার বেশী প্রিয় ছিল। পলাশীর যুদ্ধের "ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি" ও হেমবাবুর "বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে" সে এমন সুন্দর আবৃত্তি করিত যে, বাবা বন্ধু-মজ্‌লিসের মধ্যে তাহাকে কবিতা আবৃত্তি করাইয়া গৌরব অনুভব করিতেন। সেই জন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া নির্মলাকেই আমার কবিতার যথার্থ সমালোচক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

কিন্তু যথার্থই কি কেবল কল্পনা? কবিতা কি কেবলই আকাশকুসুম, বাস্তবের বৃন্তটুকুর সহিতও কি তাহার কোন সম্বন্ধ নাই? যাঁহারা প্রকৃত কবি তাঁহারাই এ কথার উত্তর দিতে পারেন। নির্মলাকে কবিতা শোনাইবার

পর এই বিষয়ের সমস্যা লইয়াই মনের মধ্যে একটা বিচার চলিতেছিল; সম্ভবত খিচুড়ী খাইবার সময় এই কারণেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং বার বার খুড়িমার তাড়না শুনিতেছিলাম "খেতে ব'সে হাঁ ক'রে ভাবছিস্ কি, খিচুড়ী যে জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আকাশের তারা দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে মনে হইল, ওই যে সুদূর আকাশে জ্যোতির বিন্দুগুলি, ও-গুলির অস্তিত্ব কি কেবল কল্পনায়? 'রাণী'র নয়নতারার সঙ্গে আকাশের তারাব তুলনা করিয়াছিলাম কি না তাহা স্মরণ হয় না, তবে এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, জগৎটা আজকাল আমার দৃষ্টিতে কেবল কবিত্বময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই কবিত্বস্রোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর দর্শনশাস্ত্র ও অংকশাস্ত্র ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; সম্ভবত বাবার সতর্কদৃষ্টি এটুকু লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

মধুর সন্ধ্যা, আকাশে তারা, হৃদয়ে কবিত্ব, এত সুখ বিধাতার সহ্য হয় না। কাজেই বাবার আহ্বানে আমার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

বাবা ডাকিলেন, "নির্মল!"

স্বরটা অতিরিক্ত গম্ভীর। বাবা আমাদের সঙ্গে সমবয়স্কের মত খেলা, গল্প ও আমোদ করিতেন; কিন্তু যখন গম্ভীর হইতেন—বিষম গম্ভীর হইতেন। বাবার তিরস্কারকে কখনও ভয় করি নাই, কিন্তু বাবার গাম্ভীর্যকে বড়ই ভয় করিতাম। কিন্তু বাবা খুব বেশী বার গম্ভীর হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, বাবা প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে, নির্মলাকে আর পাড়ার যত ছেলে পাইতেন, সকলকেই লইয়া গল্প করিতে বসিতেন; সে গল্প আমাদের এত মিষ্ট লাগিত যে, দুপুর-রৌদ্রে কাঁচা আমও বোধ হয় তত মিষ্ট লাগে না। আমরা যখন হাসিতাম, বাবাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া উচ্চহাস্য করিতেন, ঠিক যেন তিনি আমাদেরই একজন। লুকাচুরি খেলিবার সময় কতদিন বাবাকে বুড়ি করিয়া খেলা করিয়াছি; বাবার সঙ্গে যে খেলা করা চলে না, সে কথা কই একবারও তো মনে হয় নাই!

কিন্তু তাহারই মধ্যে বাবা যেদিন গম্ভীর হইতেন, সেদিন আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে কি মুখের দিকে চাহিতেও সাহস করিতাম না। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, একবার স্কুলে যাইবার নাম করিয়া পথে বাহির হইয়া স্কুলে যাই নাই, তাহার পরিবর্তে একদল দুষ্ট ছেলের সঙ্গে মিশিয়া বেচারী যদু ঘোষের বাগানের সব ফল-পাকড় নষ্ট করিয়াছিলাম, সেই দিন বাবা গম্ভীর হইয়াছিলেন। আর একদিন, যেদিন গাছে চড়িয়া পাখীর ছানা চুরি করি, সেই দিন।

ছেলেবেলা হইতেই আমি বড় অভিমানী। এই অভিমান আমার উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সম্পত্তি; কেন না, শুনিতে পাই, বাবাও বড় অভিমানী ছিলেন। এখনও আছেন কি না সে কথাই বা কে বলিতে পারে! আমার

অভিমানের সঙ্গে কতকগুলি অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংযোগ হইয়া তাহাকে দিনে দিনে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। আমি শিবহাটীর দশ-আনী জমিদারের একমাত্র বংশধর। আমি শৈশবে মাতৃহীন ও সন্তানহীনা খুড়িমার স্নেহাঞ্চলে পালিত,—তদুপরি ক্রমশ, আমি বুদ্ধিমান—আমি ভাল ছেলে—আমি অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা ও দ্বিতীয় তোরণ খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছি, অভিমানের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা এইরূপভাবে বয়োবৃদ্ধির সহিত অভিমানও ক্রমশ বর্ধিত করিয়া তুলিতেছিল।

অতএব, বাবার গম্ভীর স্বর শুনিয়াই আমার অভিমান চঞ্চল হইয়া উঠিল। বাবা বলিলেন, "আজকাল কলেজে কি কবিতা লিখতে শেখাচ্ছে?"

আমি নিরুত্তর।

"কলিকাতার মেসে থাকিয়া কবিত্বের চর্চা করা অপেক্ষা বরং বাড়ীতে বসিয়া ব্যবসায় ও বিষয় ইত্যাদি সম্বন্ধে চর্চা করিলে নিজের ও অন্যের অনেক বেশী উপকার হইতে পারে।"

আমি পাঁচ মিনিট মাথা তুলিতে পারিলাম না। যখন মাথা তুলিলাম, দেখিলাম বাবা চলিয়া গিয়াছেন।

আমার রাগের তালটা নির্মলার কাঁধে গিয়াই পড়িল; কেন না, চিরদিন তাহাই পড়িয়া আসিতেছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, নির্মলা গিয়া বাবাকে বলিয়াছে, "বাবা, বাবা, দাদা ভারি সুন্দর কবিতা লিখতে শিখেছে।" রাগের সময় যদি নির্মলাকে দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে ঝোঁকটা এক রকম করিয়া কাটিয়া যাইত, কিন্তু সিঁড়িতে নামিতেই দেখি, সম্মুখে নির্মলা! দেখিয়াই রাগে শরীর জ্বলিয়া গেল, এত রাগ যে, তাহাকে 'তুই' বলিয়া কথা বলিতে পারিলাম না। "বাবার কাছে আমার নামে লাগানো হয়েছে? তা বেশ।" রুক্ষস্বরে এই কথা বলিয়া আমি আর তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলাম। নির্মলা বেচারী! সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া রেলিং ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে বুঝিতেও পারিল না যে, তাহার অপরাধটা কি!

সে রাত্রে ঘুম হইল না। চিন্তার হস্তে আমাকে অর্পণ করিয়া নিদ্রা বিদায় লইলেন। চিন্তা সম্ভবত পুরুভূজ জাতীয়, দেখিতে দেখিতে তাহার শাখা প্রশাখা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রথম চিন্তা—আমার দোষ কি? বাবা কেন গম্ভীর হইলেন? বাবার এরূপ গম্ভীর হইবার অধিকারই বা কি আছে? মনে কর, আমি ডায়েরী লিখি এবং ডায়েরীরই অঙ্গীভূত দুই-একটা কবিতাও কখন কখন হয়তো লিখি; কিন্তু ডায়েরী লেখাটা কি মন্দ? বিখ্যাত লোকেরা সকলেই প্রায় ডায়েরী লিখিয়া গিয়াছেন ও লেখেন। ইহা দ্বারা আমি এমন কথা প্রমাণ করিতে চাহি না যে,

ডায়েরী লিখি বলিয়া আমি একজন বিখ্যাত লোক, তবে ডায়েরী লেখাটা যে নিন্দনীয় নহে, তাহাই প্রমাণ করিতে চাই। বাবারও ডায়েরী আছে, ডায়েরী না থাকিলে তাঁহার আড়ত কি আর চলিত? তবে বাবার ডায়েরী এমন সুন্দর বাঁধানো খাতা নয়, খেরোর মলাট দেওয়া, কান-ফোঁড়া খাতা, আর তাহা কেবল ব্যাপারী ও খরিদ্দারের নামের তালিকা এবং দৈনিক ক্রয়-বিক্রয়ের ও আয়ব্যয়ের হিসাবেই পরিপূর্ণ। মানুষের মন বলিয়া যে কোন জিনিস আছে, তাহার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

খেরো-বাঁধানো খাতার কথা মনে পড়িতেই মনের চিন্তার আবার আর এক শাখা বাহির হইল। খেরো-বাঁধানো খাতার আনুষঙ্গিক যে কয়টা জিনিস আমি আদৌ দেখিতে পারি না, খেরো-বাঁধানো খাতাকে অগ্রগামী করিয়া সেইগুলি আমার কল্পনার দরবারে হাজির হইল। আমি চোখ বুজিয়াই যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, ঘর-জোড়া তক্তপোশ, তাহার উপর শতরঞ্চ ও ফরাসের চাদর, দেল্‌কোর উপর রেড়ির তৈলের প্রদীপ, হুঁকার বৈঠক, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, মেটে দোয়াতে কালি আর কান--ফোঁড়া খাতা। এই সব জিনিস আমি আদৌ পছন্দ করি না, আর বাবা এই সকলেরই বিশেষ পক্ষপাতী। বাবা বোধ হয় হিসাব রাখাটাই জগতে সকলের অপেক্ষা দরকারী বলিয়া মনে করেন। তিনি যদি কবিতার আস্বাদ বুঝিতেন, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতেন, জগতের যত কিছু সার সৌন্দর্য, সে কেবল কবিতাতেই আছে।

আচ্ছা, এই যে আমি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া পড়ি, সে বুঝি কিছুই নয়? আর একটি মাত্র কবিতা লিখিয়াছি, এই অপরাধেই বাবা এত গম্ভীর হইলেন! কাল হইতে আমি দিবারাত্র কেবল কবিতাই লিখিব, দেখি বাবা কি করেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই বুঝি জীবনের সার পদার্থ, আর কবিত্বের যে অমর যশঃসৌরভ—সে বুঝি কেবল তুচ্ছ জিনিস!

বাবার এই যে এক ব্যবসা-বাতিক হইয়াছে, বাবার ইচ্ছা বোধ হয় আমিও তাহাতে যোগ দিই। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার হঠাৎ এই নূতন ধরণের ব্যবসার খেয়াল চাগিয়া উঠিল। এই ব্যবসার খাজাঞ্চী, কার্যাধ্যক্ষ, কেরানী, সমস্তই একাধারে বাবা নিজে। হিসাব এমন পরিষ্কার থাকিত যে, কোথাও পাই পয়সার অমিল নাই। বড় বড় অংক সামান্য ভুলে কতবার মাটি করিয়াছি, বাবা কি করিয়া এত নির্ভুল হিসাব রাখেন, সে একটা ভাবিবার কথা বটে।

এই সমস্ত বিচিত্র চিন্তার মধ্যে অত্যন্ত শীত বোধ হওয়ায় চৈতন্য হইল, দেখিলাম, সম্মুখের জানালাটি খোলা আছে। জানালার দিকে চাহিয়া দেখি, নির্মলার ঘরের জানালাও খোলা; এত রাত্রেও নির্মলা জাগিয়া জানালার লোহার শিকের উপর মাথা রাখিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে!

দেখিবামাত্র মনে আঘাত লাগিল। নির্মলা এত রাত্রে জানালায় বসিয়া

কি করিতেছে? নিশ্চয়ই কাঁদিতেছে। কতবার—কতবার, নির্মলাকে এমনি করিয়া আমি কাঁদাইয়াছি। আহা বেচারী, উহার কোন দোষ নাই। একবার মনে হইল, উঠিয়া যাই, এত রাত্রে জাগিয়া আছে বলিয়া বকিয়া দিই। কিন্তু পারিলাম না। মুক্তার মত স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দুগুলি একটির পর একটি ঝরিয়া পড়িয়া লোহদণ্ডের অগ্র ভিজাইতেছে, এ দৃশ্য যেন আমি অন্ধকারেও দেখিতে পাইলাম। মনে হইল, আমার মন বুঝি ওই লোহার শিকগুলি অপেক্ষাও কঠিন। জানালা বন্ধ করিতে গিয়া আর বন্ধ করা হইল না, লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

কিন্তু চিন্তা আমাকে তখনও ছাড়িল না, তিন বছরের ছোট্ট নির্মলাকে সে আমার মনের সম্মুখে লইয়া আসিল। সেই একটি কেতকী রংয়ের ঘাগ্‌রা পরা, সেই ঘাড়ের উপর কালো থোপা থোপা চুল, সেই চোখের উপর চুল আসিয়া পড়িতেছে আর দুই হাত দিয়া বার বার সরাইতেছে, সেই ঠোঁটে হাসি আর চোখেও হাসি, সে কি সুন্দর! আমি তখন সাত বৎসরের, কেবল স্কুলে ভর্তি হইয়াছি। ছুটির সময় নির্মলা গেটের কাছে ছাড়া আর কোনখানে থাকিত না, আমাকে দূর হইতে পথে দেখিয়াই "দাদা, দাদা" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিত। খুড়িমা বলিতেন, "নাও! এখন হলো? নে, তোর বোনকে নে। এ মেয়ে কি আমি রাখতে পারি? সমস্ত দিন কেবল দাদা আর দাদা! কাল থেকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যাস্।"

সেই একদিন মাধব পেয়ারা গাছে উঠিয়া গাছ ঝাড়া দিতেছিল, আর পাড়ার সব মেয়েরা পেয়ারা কুড়াইতেছিল। নির্মলা একটি পাকা পেয়ারা কুড়াইয়া পাইয়াছে। পেয়ারা কামড়াইয়া তাহার খুব মিষ্ট লাগিয়াছে, তাই অমনি সে পেয়ারা হাতে করিয়া ব্যাটবল খেলার মাঠ পর্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বেচারী সে দিন আমার কাছে কি বকুনিই খাইয়াছিল! অনেক বকিয়া শেষে আমার একটু অনুতাপ হইলে যখন বলিলাম, "দেখি, কই তোর পেয়ারা দে," তখন নির্মলা এক হাতে চোখের জল মুছিতেছে, আবার সে চোখে আনন্দের হাসি, সে যে কেমন দেখাইতেছিল! তাহার কামড় দেওয়া জায়গা আমি বাদ দিয়া পেয়ারা খাইতেছি দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা, ঐখানটা বেশী মিষ্টি, ঐখানটা খাও।"

আর একদিন আমার খুব জ্বর, রাত্রে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া আছি, কিন্তু তবুও বুঝিতে পারিতেছি, দুখানি শীতল কোমল হাত আমার উত্তপ্ত কপালের উপর রহিয়াছে। সকালে যখন আমার জ্বর ত্যাগ হইল, তখন দেখিলাম, সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সাত বৎসরের বালিকাটি শুষ্কলতার মত আমার পায়ের তলায় পড়িয়া আছে। খুড়িমা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা, এ কি, নির্মলারও যে খুব জ্বর হয়েছে! না, এ মেয়ে নিয়ে আর পারি নে। সারা রাত এমন ক'রে জাগলে জ্বর হবে না তো কি হবে?"

দেড় বৎসর বয়সে মাতৃহীন। বাবা নির্মলাকে বুকের উপর লইয়া উঠানে

পায়চারী করিতেন, এখনও আমার সে কথা একটু একটু মনে পড়ে। বাবা অনেক দেখিয়া শুনিয়া নির্মলার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট কি কেহ খণ্ডাইতে পারে? উমাপ্রসাদ সুশিক্ষিত সুশ্রী সচ্চরিত্র এবং সদ্বংশজাত; এই চারটি "স"-এর একত্র সম্মিলন দেখিয়া, বাবা প্রফুল্লচিত্তে তাহার হাতে নির্মলাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রফুল্লচিত্তে কিনা, সে কথা ঠিক বলা যায় না। হাতে হাতে সঁপিয়া দেওয়াটা যে কি বিশ্রী জিনিস! কি না, 'আমার ছিল, এখন তোমার হাতে দিয়ে দিলাম।' তাই নাকি কেউ একেবারে দিয়া দিতে পারে?

বিবাহের পর আমরা জানিলাম, উমাপ্রসাদবাবু শুধু কেবল সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র প্রভৃতি নহেন, তাঁহার আরও একটি সু আছে, তিনি একজন সুকবি। তিনি নিজে রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া, সুন্দর সুন্দর বাঁধানো খাতায় সেগুলি পরিপূর্ণ করিয়া "শ্রীমতী নির্মলা দেবীর করকমলে" উপহার দিতেন এবং অন্যান্য আধুনিক বিখ্যাত কবিদের কাব্যও পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লাল নীল পেন্সিলের দাগ সহ নির্মলা দেবীর করকমলে উপহার প্রদানের ছলে সর্বসাধারণ্যে স্বীয় কাব্যরসাভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। সেই অবধিই বাবার কবিতা লেখার উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তথাপি উমাপ্রসাদবাবু এত ভদ্রতায় অভ্যস্ত ও সুচতুর ছিলেন যে, প্রায় এক বৎসর বাবা পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে পারেন নাই। পরে বুঝিলাম, এবং এই অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম যে, পুত্তলিকাও নিপুণ হস্তের গঠনে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, কিন্তু প্রাণ একটা স্বতন্ত্র পদার্থ।

আমার কবিতা শুনিতে শুনিতে নির্মলার নয়নের সেই দুটি বিন্দু জল, তাহার প্রকৃত অর্থ তখন বুঝি নাই, রাত্রির অন্ধকারে এখন বুঝিতেছি, স্মৃতির মেঘ দুটি বিন্দু মাত্র অগ্নিময় বারিতে কেমন করিয়া বহুদিনের সঞ্চিত বজ্রাগ্নির উত্তাপ ঢালিয়া দেয়। কিন্তু সেই জলবিন্দু দুটির অর্থ যেমন আমি বুঝি নাই, তেমনি যাহার চোখের জল সেও বুঝে নাই। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "নির্মলা, তুই কাঁদলি কেন?" সে সরলভাবে উত্তর দিত, "কি জানি কেন দাদা, জানি না তো।"

নির্মলা কোন দিন আমার কাছে কোন জিনিস চাহে নাই, আমার কাছেই বা কেন,—খুড়িমার কাছেও সে আবদার করিয়া কিছু চাহে নাই। আমার আবদারে খুড়িমা দিন রাত এত ব্যস্ত হইতেন, নির্মলা যে মোটেই আবদার করে না, সেটা তাঁহার চোখেই পড়িত না। আমার আবদার আর নির্মলার শান্তশিষ্টভাব উভয়ই তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে তাহাতে যে কোন বিশেষত্ব আছে, সে কথা তাঁহার মনেই উদয় হইত না। কতদিন তিনি বলিতেন, "যদু কেমন লক্ষ্মী ছেলে, দেখে একটু শিখিস দেখি! রতন কেমন শান্ত, ওর দেখে দেখে একটু শান্ত হতে শেখ্ দেখি!" কিন্তু একদিনও বলেন নাই যে, "নির্মলাকে দেখে একটু শান্ত হতে শেখ্ দেখি," অথবা নির্মলাকেও বলেন নাই যে, "তোর দাদাকে দেখে একটু আবদার করতে শেখ্ দেখি।"

কিন্তু নির্মলা আমার কাছে প্রত্যক্ষ না হোক্, পরোক্ষভাবে একটি জিনিস চাহিয়াছিল। সে জিনিসটি কোন মহামূল্য দ্রব্য নহে, সামান্য একটি কাঁচের দোয়াত। সেই চাওয়ার একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস প্রায় আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আজ আবার এমন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে যে, সে যেন এই মাত্রের ঘটনা।

মনে হইতেছে, আবার যেন আমি সেই বারো বৎসর বয়সের বালক হইয়া গিয়াছি। যতীশদের বাড়ী, যতীশের পড়িবার টেবিলের উপর ছোট একটি গোল কাঁচের দোয়াত, নির্মলা সেটি হাতে লইয়া একমনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে, যেন সেটি কি আশ্চর্য জিনিস! এমন সময় যতীশ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ও নির্মলার হাতে কাঁচের দোয়াত দেখিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল, "থাক্ থাক্, রেখে দে। কাঁচের দোয়াত হাতে নেওয়া হয়েছে! রেখে দে শীগ্গির। হাত থেকে পড়লেই ভেঙে যাবে, জানিস নে?"

আমি এক পাশে জানালার কাছে চেয়ার লইয়া গিয়া রবিন্সন্ ক্রুশোর অপূর্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তন্ময় হইয়া পড়িতেছি, যতীশের গর্জনে মাথা তুলিয়া চাহিলাম। বেচারী নির্মলার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে দোয়াতটি সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। নির্মলার মলিন মুখ দেখিয়া আমার প্রাণের ভিতর যেন কি রকম করিয়া উঠিল। বলিলাম, "যতীশ, হয়েছে কি, বকছ কেন ওকে?"

"দেখ না, দোয়াতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, আর একটু হ'লেই ভেঙে ফেলত। মাটির দোয়াত আর খাগের কলম দিয়ে আঁকুড়ে 'ক' লেখেন, ওঁর আবার কাঁচের দোয়াত নিতে সাধ হয়!"

যতীশের এই ছোটলোকের মত কথা শুনিয়া আমার ভয়ানক রাগ হইল। এত রাগ হইল যে, আর তাহার সঙ্গে কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না। রবিন্সন্ ক্রুশোখানি টেবিলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "নির্মলা, আয় বাড়ী যাই। তোকে এবার রথতলা থেকে খুব সুন্দর দেখে একটা কাঁচের দোয়াত কিনে দেব।"

কিন্তু দোয়াত কিনিয়া দিই নাই, নির্মলাও আর চাহে নাই। তবে মাঝে মাঝে তাহাকে সঙ্গিনীদের কাছে বলিতে শুনিয়াছি, "দাদা আমাকে কেমন সুন্দর দোয়াত কিনে দেবে।" তারপর আমি দোয়াতের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু আবার একবার মনে পড়িয়াছিল, নির্মলার বিবাহের পর। বিবাহের সময় তাহার বাক্স সাজাইবার জন্য যাহার উপর জিনিস ক্রয় করিবার ভার ছিল, সে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে দুটি দোয়াত কিনিয়া আনিয়াছিল ও তাহা দিয়া বাক্স সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নির্মলা দোয়াত দুটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া রাখিয়াছিল। খুড়িমা দেখিয়া বলিলেন, "ও কি রে, দোয়াত বার ক'রে ফেলছিস্ কেন?" নির্মলা বলিল, "ও-দোয়াত আমি নেব না, দাদা আমাকে ভাল দোয়াত কিনে এনে দেবে।।" কিন্তু

নির্মলার কার্যতৎপর দাদার এখনও পর্যন্ত সেই ভাল দোয়াত কিনিয়া আনিয়া দেওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই।

বাবা নির্মলাকে ছেলেবেলায় "বুড়ী" বলিয়া ডাকিতেন। এখনও মাঝে মাঝে "বুড়ী" বলিয়া ডাকেন। খুড়িমা বাড়ীর ভিতর থাকেন, যদি হঠাৎ বাবার সম্মুখে পড়েন, সেই জন্য বাবা তাঁহাকে এবং আর যে সমস্ত বধূ-সম্পর্কীয়া আসিয়া মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন তাঁহাদেরও সাবধান করিবার জন্য "বুড়ি, আমি যাচ্ছি বুড়ি, আমি যাচ্ছি" বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতর আসিতেন। তিনি বাড়ীর মধ্যে আসিবামাত্র ছেলে-মহলে আনন্দের রোল উঠিত। কেবলমাত্র আহারের সময়ই প্রায় তিনি বাড়ীর মধ্যে আসিতেন, বিশেষ দরকার না হইলে অন্য সময় আসিতেন না। আহার করিতে বসিয়া বাবা "বুড়ি, বুড়ি" বলিয়া হাঁক দিতেন। "এক বুড়ি পাঁচ গণ্ডা, দু'বুড়ি দশ গণ্ডা, তিন বুড়ি পনেরো গণ্ডা, আয়, সব আয়।" বলিতে বলিতে তাঁহার পাতের কাছে বর্ষার দিনে পুখুরে মাছের গাঁদির মত ছেলেদের গাঁদি লাগিয়া যাইত।

সেই বাবা যদি গম্ভীর হন, তাহাতে কাহার বা অভিমান হয়? যা হোক, নির্মলাকে বকিয়া অন্যায় করিয়াছি। যাইবার আগে কাল তাহার সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া লইতে হইবে।

সকালে উঠিয়া দেখিলাম, কলিকাতা যাত্রার উদ্‌যোগ হইতেছে। তবুও কতক ভাল। বাবা যদি বলিয়া বসেন, "আর কলিকাতায় গিয়া কাজ নাই," আমার সেই ভয় হইতেছিল।

বই গুছাইয়া লইতে গিয়া দেখিলাম, ডায়েরীখানি খোলা, টেবিলের উপরেই পড়িয়া আছে, নির্মলাকে কবিতা শোনাইয়া সেখানি তুলিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কবিতাটীর পাশে নীল পেন্সিলের দাগ, এবং বাবার হাতের লেখা,—"পাঠ্যাবস্থার অনুপযুক্ত।" দেখিয়া বুঝিলাম, নির্মলার কোন দোষ নাই, বাবা নিজেই চোরামাল ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

যাত্রাকালে খুড়িমা দুর্গার অর্ঘ আনিয়া মাথায় দিলেন, সেই সঙ্গে অবনত মস্তকের উপর অজস্র অশ্রু ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন। নির্মলা নীরবে আমাকে প্রণাম করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল, আমি তাহাকে একটি কথাও বলিতে পারিলাম না।

বাবার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার দৃষ্টি অপ্রসন্ন নহে, তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মন দিয়া পড়িও।"

বাবার সেই যাত্রাকালীন আশীর্বাদ বা আদেশ ইষ্টমন্ত্রের মত হৃদয়ে ধারণ করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়াই মিস্টার সান্ন্যালের নিকট হইতে নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। সে নিমন্ত্রণের প্রলোভনও যে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম, সে কেবল সেই ইষ্টমন্ত্রের শক্তিতে। পরীক্ষা নিকট বুঝিয়া মিস্টার সান্ন্যালও বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন না।

মিস্টার সান্ন্যাল বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার, "রাণী" তাঁহারই একমাত্র কন্যা।

মিস্টার সান্ন্যালের সহিত আমার পরিচয় এক বৎসর মাত্র। কিন্তু এই একটি বৎসর আমার জীবনের একটি নূতন যুগ। এক বৎসর আমি কত সুখে, কত দুঃখে, কত আশায়, কত আশংকায় প্রতি মুহূর্ত কাটাইয়াছি, ভাবিয়া তাহার শেষ পাই না। গত বৎসর নিদারুণ বসন্ত রোগে যখন বান্ধবহীন নিঃসহায় অবস্থায় একাকী হাসপাতালে পড়িয়াছিলাম, বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইবার মত অথবা আত্মপরিচয় দিবার মত জ্ঞানও যখন আমার ছিল না, তখন,—সেই দুর্দিনে মূর্তিমতী শান্তি দেবীর মত রাণীকে আমার রোগশয্যার শিয়রে দেখিয়াছিলাম। সে দুর্দিন, না, সুদিন? যাহাই হউক, সে দিন কি আর জীবনে ভুলিতে পারিব?

কলিকাতায় আসিবার দুই সপ্তাহ পরে রাণীর একখানি চারিপৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র পাইলাম, দুই ছত্র লিখিয়া তাহার উত্তর দিলাম। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না।

রাত্রি ও দিনের মধ্যে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কেবল আহার-নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সময় পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম। যদি কখন ক্লান্তি বোধ হইত, তখন বাবার সেই কথা কয়টি মনে করিতাম, "নির্মল, মন দিয়া পড়িও।"

পরীক্ষা শেষ হইলেও মেস পরিত্যাগ করিলাম না, ফল জানিবার অপেক্ষায় একাকী শূন্য মেসে পড়িয়া রহিলাম। খুড়িমার অশ্রুসিক্ত রাশি রাশি পত্র আসিয়া আমার ডেস্ক পূর্ণ করিতে লাগিল। অবশেষে ফল বাহির হইলে জানিতে পারিলাম, আমি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং বিলাত যাইবার বৃত্তিও পাইয়াছি।

সেই দিনই সান্ন্যাল সাহেবের বাড়ী হইতে ডিনারের নিমন্ত্রণ পাইলাম। এবার আর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলাম না।

বিলাত যাইবার প্রবল ইচ্ছা এতদিন আমার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা যে কত প্রবল, তাহা এই সুযোগ পাইয়া বুঝিতে পারিলাম। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্ ক্রুশো পড়িতে পড়িতে দেশবিদেশ-ভ্রমণের স্বপ্ন দেখিতাম। কতদিন স্বপ্নে পক্ষিরাজের পিঠে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছি! আজ আমার সেই শৈশব-স্বপ্ন জাগ্রৎ-সত্যে পরিণত হইবার পথ পাইয়াছে। আঃ, সে কি কম উৎসাহ! নির্মলা রবিন্‌সন্ ক্রুশোর ভ্রমণবৃত্তান্ত যেমন পেটুকের মত গ্রাস করিত, আমি যখন দেশে ফিরিয়া তাহাকে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনাইব, তখন না জানি তাহার কি অবস্থা হইবে! উৎসাহে আমার আহার-নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, মিস্টার সান্ন্যাল আমার এই উৎসাহ-বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে ত্রুটি করিলেন না। সে উৎসাহ রাণীর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়াও ম্লান হইল না। তাহাকে বুঝাইলাম,

কয়েকটি বৎসর মাত্র। প্রতি মেলে যদি পত্র পাওয়া যায়, তবে এই কয়েকটি বৎসর অতি সহজেই কাটিয়া যাইবে।

বিলাত যাইবার বৃত্তি পাইয়াছি, বাবাকে পত্রে তাহা জানাইয়াছি। এখন বাড়ী গিয়া তাঁহার মত লইতে হইবে। "বাবা যদি মত না দেন?" চকিতের মত এ আশঙ্কা মনে উদয় হইলেও প্রবল উৎসাহের মুখে তৃণের মত তাহা ভাসিয়া যাইত।

আসিবার সময় নির্মলাকে কাঁদাইয়া আসিয়াছি, সে কথা আমি পরীক্ষার তাড়ার মধ্যেও ভুলিতে পারি নাই। এমন একটি জিনিস এবার তাহার জন্য লইয়া যাইব যে, সে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই খুসী হইয়া উঠিবে। সে জিনিস,— একটি কাঁচের দোয়াত।

বাজারে বাজারে ঘুরিয়া দোয়াত দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কোন দোয়াতই আমার পছন্দ হয় না। নির্মলার এত দিনের দেনা, সে যে সুদে আসলে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সহজে কি তাহা শোধ হয়? তাহার জন্য কিছু পরিশ্রম করা দরকার।

বাজার ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা দ্বিপ্রহর করিয়া অবশেষে ভাগ্যক্রমে আমার একটি বেলোয়ারী কাঁচের দোয়াত পছন্দ হইল। ভারী কাঁচের তৈয়ারী একটি দোয়াত শিল্প-নৈপুণ্যে যেন হীরার মত ঝক্ঝক্ করিতেছে। খুড়িমার জন্য একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা কিনিলাম, এবং বাবার জন্য একজোড়া চটি জুতা।

মেসে ফিরিয়া আসিয়া খুড়িমার পত্র ও মনি-অর্ডার পাইলাম। কালীঘাটে পূজা দিবার জন্য, মদনমোহনের পূজা দিবার জন্য, দীন দরিদ্রকেও কিছু দান করিবার জন্য তিনি মনি-অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়াছেন, আরও লিখিয়াছেন, আমার প্রথম মাসের বৃত্তির টাকা গোপীনাথের ভোগের জন্য দিতে হইবে। খুড়িমা শাক্ত ঘরের বধূ হইলেও বৈষ্ণব-পরিবারের যে কন্যা, তাঁহার এইরূপ কোন কোন কথায় মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া যাইত। নির্মলাকে শ্বশুর-বাড়ী হইতে লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমি বাড়ী যাইতেছি বলিয়া এবং নির্মলারও কয়েকদিন হইল জ্বর হইয়াছে, সে কারণে তাহার শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া উপস্থিত স্থগিত আছে, সে সংবাদও দিয়াছেন। পরিশেষে, আমি যেন আর বাড়ী যাইতে একদিনও বিলম্ব না করি, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বিশেষ করিয়া সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

আমি খুড়িমার কথা লক্ষ্মী ছেলের মত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলাম এবং সেই রাত্রের গাড়ীতেই বাড়ী রওনা হইলাম।

স্টেশনে নামিয়াই দেখিলাম, ভজহরি ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আমি নামিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কই? তিনি কোন্ গাড়ীতে আছেন?"

আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার কিসের?"

"বাবু যে আপনাকে ডাক্তারের জন্য তারে খবর দিয়েছিলেন।"

"কই, না, আমি তো তার পাই নাই!"

অসুখ কাহার এ কথাটা সাহস করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলাম না। কিন্তু বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র জানিতে পারিলাম, অসুখ নির্মলার। কয়েকদিন হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল, গত রাত্রি হইতে জ্বর বাড়িয়া সে ক্রমাগত প্রলাপ বকিতেছে।

আমি দুই দিন দুই রাত্রি তাহার মাথার কাছে বসিয়া সেই সমস্ত প্রলাপ শুনিলাম। ওঃ, সে যে কি কষ্ট!

তৃতীয় দিনে নির্মলার জ্ঞান হইল। চোখ মেলিয়া সে ব্যাকুলনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। আমার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার মুখ প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতি অস্ফুট, অতি মৃদু, অতি করুণ ও অতি মিষ্টস্বরে সে যেন আত্মগতভাবেই উচ্চারণ করিল, "দাদা!" একটি শব্দমাত্র! কিন্তু সেই একটি কথায় তাহার যত কথা বলিবার ছিল, সমস্তই বলা হইয়া গেল।

বড় ইচ্ছা ছিল, একবার নির্মলার শীর্ণ হাতখানি হাতে লইয়া আদর করি, বলি, "দিদি, তোর নিষ্ঠুর দাদাকে মার্জনা কর্," কিন্তু সে কথা বলা হইল না, আর সময় ছিল না।

দেখিলাম, খুড়িমা নির্মলার দেহখানি বুকে করিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন। অনাহারে ও রাত্রি জাগরণে তিনি এত শীর্ণ হইয়াছেন যে, তাঁহাকেও যেন মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। আর কি দেখিলাম?

কি দেখিলাম, তাহা নিজেই বুঝিতে পারি নাই। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু চোখে একবিন্দু জল আসিল না। যদি কেহ নির্মলার মত বোন পাইয়া নিজে বিসর্জন দিয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন, সে বিদীর্ণ হৃদয়ের যন্ত্রণা কেমন! কে আমাকে ধরিয়া টানিতেছে, কোথায় লইয়া যাইতেছে, কিসের আগুন জ্বলিতেছে, এত লোকজন কেন, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিবার শক্তি হারাইয়াছি। স্বপ্ন, স্বপ্ন—সকলই স্বপ্ন! এ কি ভীষণ স্বপ্ন আমাকে ঘূর্ণাবর্তে ডুবাইতেছে! খুড়িমা বলিতেন, "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ।" হে গোবিন্দ, আমাকে এ কি স্বপ্ন দেখাইতেছ,—জাগাইয়া দাও, জাগাইয়া দাও। একবার আমার ছোট বোনটির হাসিমুখ দেখিয়া প্রাণ পাই।

ভজহরি দুই হাত দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল ডাকিতেছে, "দাদাবাবু দাদাবাবু!" তার সেই আহ্বানে জ্ঞান পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যাহা দেখিবার সমস্তই দেখিলাম। সব শেষ হইয়া গেল। এখন ঢাল, ঢাল, কলসী কলসী জল আনিয়া ঢাল, আগুন কি তাহাতে নিবাইতে পারিবে? জোয়ার আসিল, আমার মনে হইল যেন মধুমতী নদী নিজে অগ্রসর হইয়া নির্মলাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিয়াছে। মধুমতী, মা গো, নির্মলা যে কতদিন তোর জলে খেলা করিয়াছে, আজ তাহার জ্বরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোর শীতল কোলে কোথায় তাহাকে লুকাইয়া রাখিলি মা!

সহসা আমার আর একটি কথা স্মরণ হইল। উন্মত্তের মত ছুটিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

"কোথা যাও?" বলিয়া অনেকগুলি বাহু আমাকে জোর করিয়া ধরিল। তাহাদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিলাম। এক নিশ্বাসে বাড়ী আসিয়া ব্যাগ হইতে সেই অতি সাধের কাঁচের দোয়াতটি বাহির করিয়া লইয়া আবার সেইভাবেই নদীকূলে ছুটিলাম। নদীর ধারে আসিয়া কাঁচের দোয়াতও মধুমতীর জলে বিসর্জন দিলাম।

বাবার সঙ্গে আমার দুই দিন একেবারেই দেখা হয় নাই, তৃতীয় দিনে বাবা তাঁহার বসিবার ঘরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বাবার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া অপরিচিত কেহই বুঝিতে পারিত না যে, সম্প্রতি তিনি কন্যাশোক পাইয়াছেন। কেহ তো বুঝিতে পারে না, সে শোক কত গভীর, যাহার উপরে বিন্দুমাত্রও তরঙ্গের চিহ্ন নাই! কিন্তু আমি বুঝিলাম, এবং আরও বুঝিলাম, নদীর নির্মল জলে দিবস-অন্তে গোধূলির ছায়া পড়িয়া যেমন দেখায়, সেইরূপ তাঁহার নির্মল ললাটে কি যেন ঈষৎ অন্ধকার ছায়া পড়িয়া তাঁহাকে ঠিক আর আগের মত দেখাইতেছে না।

বাবা শান্তভাবে বলিলেন, "মল্লিক-বৃত্তি লইয়া তবে তুমি বিলাত যাইবে বলিয়াই স্থির করিয়াছ?"

বাবা সহজভাবেই বলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনে হইল, 'স্থির' শব্দটির উপর তিনি যেন একটু জোর দিলেন।

আমি প্রথমটা উত্তর দিতে পারিলাম না। বাবা কিছুক্ষণ আমার উত্তরের অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "সান্ন্যাল সাহেবের কন্যার সহিত নিজের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছ, এ কথাও তবে সত্য?"

বাবার দৃষ্টি আমার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে, কাপুরুষের মত আর মৌন থাকিলে চলে না। কোনরূপে ভূমিতলে দৃষ্টি রাখিয়া অর্ধোচ্চারিত কণ্ঠে উত্তর দিলাম "হাঁ।"

"তবে সত্য--?" উত্তর পাইয়াও বাবা আবার দ্বিতীয়বার যেন আরও একটু জোরের সহিত তাঁহার পূর্বপ্রশ্নের শেষ শব্দ দু'টি উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন, "নির্মল, মুখ তোল, আমার মুখের দিকে চাও। এমন কিছু অন্যায় তুমি কর নাই, যাহাতে তুমি মাথা তুলিয়া তোমার পিতার মুখের দিকে চাহিতে পার না। বরং যদি তুমি আমার ভয়ে এখন বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর, কিংবা যদি 'হাঁ' বলিয়া আমার কথার উত্তর দিয়া একথা স্বীকার না করিতে, তাহাতেই তোমার মাথা তুলিয়া চাহিবার অধিকার হারাইতে। তবে, এ কথা আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই, কি, এত বড় একটা বিষয়ে আমার মতামত নেওয়াও আবশ্যক মনে কর নাই। ভাল কথা। যত দিন সন্তান নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া নিজে চলিতে না

পারে, তত দিনই পিতামাতার অভিভাবকত্বের প্রয়োজন, তাহার পরে আর নহে। আমি এরূপ বিবাহ অথবা বিলাত যাওয়া পছন্দ না করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! অভিভাবকের ইঙ্গিতে চিরদিনই চলিতে হইবে, তাহার কি অর্থ আছে? মানবমাত্রেরই ভাল মন্দ বিচার করিবার একটা স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতায় কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। পিতামাতা দূরের কথা, ঈশ্বরের পর্যন্ত নাই, এবং ইহাই তাঁহার নিজকৃত বিধান।"

আমি মাথা তুলিয়া বার বার বাবার মুখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন মতেই মাথা তুলিতে পারিলাম না।

বাবাও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বোধ হয় আবার আমাকে যে কথাগুলি বলিবেন সে কথাগুলি উচ্চারণ করিবার জন্য মনে মনে শক্তিসংগ্রহ করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাবা কথা বলিলেন। অতি ধীরে ধীরে প্রত্যেক শব্দের উপর জোর দিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি ও নির্মলা আমার সংসারের বন্ধন ছিলে। নির্মলা গিয়াছে, তোমাকেও মুক্তি দিলাম। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, আমার মতামতের জন্য আর তোমার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।"

বুঝিলাম, পিতা আমাকে ত্যাগ করিলেন। এত নির্মমভাবে এমন করিয়া ত্যাগ করিলেন যে, আমার স্বপক্ষে একটি কথা বলিবারও অবসর দিলেন না। বাবা যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন, তবে আমিই কি আর তাঁহা হইতে দূরে গিয়া থাকিতে পারি না? আমি করিয়াছি কি? কি অপরাধে আমার এত কঠিন শাস্তি?

পিতার সহিত আমার এই কথাবার্তার কিছু দিন পরে একদিন প্রভাতে বোম্বাই বন্দরে বিলাতগামী জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া সান্ন্যাল সাহেব ও রাণীর নিকট বিদায় লইলাম; আর কেহই আমাকে বিদায় দিতে আসে নাই। মন এত ভারাক্রান্ত ছিল যে, বিদায়কালে রাণীর সেই অশ্রুসজল নেত্র, সেই ম্লানমুখ দেখিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিলাম না।

সূর্যাস্তের রেখাগুলি মিলাইয়া গিয়া যখন চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, তখন মনে হইল, এ অন্ধকার আমাকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে। জন্মভূমির স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ধকার নীলজল আমাকে কোন্ রহস্যময় জীবনাবর্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল!

পথে রাণী ও সান্ন্যাল সাহেবের পত্র যথানিয়মে পাইলাম, বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া উদ্দেশ লইলেন, কিন্তু বাটীর কোন সংবাদ পাইলাম না। লণ্ডনে পৌঁছিয়াই বাবার নিকট হইতে একটি মনি-অর্ডার পাইলাম, কিন্তু বাবার হাতের লেখা একটি ছত্রও পাইলাম না। অভিমানে চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল, অতি কষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া মনি-অর্ডার ফেরত পাঠাইলাম।

তার পর বহুদিন কাটিয়া গেল, বাবার আর কোন উদ্দেশই পাইলাম না। এক ছত্র পত্র তো নয়ই, মনি-অর্ডার পর্যন্ত নয়। সান্ন্যাল সাহেবের নিকট হইতে বাড়ীর সংবাদ পাওয়া অসম্ভব হইত না, কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে আমি জানাইব যে, প্রবাসী পুত্র পিতার কোন সংবাদই পায় না! বাবা আমার সংবাদ পাইতেন কি না জানি না, হয়তো পাইতেন। কেননা, শুনিয়াছিলাম, বাবার দুই-একজন পরিচিত ব্যক্তি লণ্ডনে ছিলেন, কিন্তু আমার তো সংবাদ পাইবার কোন উপায়ই ছিল না। দুর্ভাবনা ও অভিমান একখানি অতি গুরুভার প্রস্তরের মত আমার বুকের উপর চাপিয়া রহিল। ধূম্র ও কুয়াশাচ্ছন্ন লণ্ডন নগরীর আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতাম, আমার হৃদয়াকাশের অবস্থা ঠিক এইরূপেই শোচনীয়।

কিন্তু মানুষের মন বহুদিন একভাবে থাকিতে পারে না, ক্রমশ বিস্মৃতি আসিয়া তাহাকে শান্তি দেয়। প্রস্তরে অঙ্কিত শিলালিপি যেমন বহুদিন রুদ্ধগৃহে থাকিলে ধূলিজালে ক্রমশ তাহার বর্ণমালা অস্পষ্ট হইয়া যায়, মানব-মনের পূর্বস্মৃতিও সেইরূপ। মৃত আত্মীয়ের শোকের ন্যায় আমার জীবিত আত্মীয়গণের স্মৃতিও ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। ইহার একমাত্র কারণ নবজীবনের মাদকতা। নূতন সঙ্গ, নব অভিজ্ঞতা, নব জীবনের উৎসাহ, পুরাতন দুঃখ স্মৃতিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মানুষ স্বভাবত সুখ-প্রিয়; কে স্বেচ্ছায় ভস্মাবৃত অগ্নি স্মৃতিবায়ুতে পুনরুদ্দীপিত করিয়া আপনা-আপনি দগ্ধ হইতে চাহে!

স্মৃতিতে দাহ আছে বটে, আবার বিমল আনন্দও আছে। ভাগ্য আমার আনন্দটুকু মুছিয়া লইয়া কেবল দাহটুকুই অবশিষ্ট রাখিয়াছিল।

রাণীর পত্রই এখন আমার জীবনের সম্বল। আমি প্রতি মেলে ডাক চাহিয়া থাকিতাম, একটিবারও আমাকে নিরাশ হইতে হইত না। প্রতি পত্রে রাণী আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কি উজ্জ্বল, কি গৌরবপূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত করিয়া দিত! সে চিত্র আমার হৃদয়ে বজ্রের বল আনিয়া দিত, মস্তিষ্কে নব শক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত। রাণী আমাকে মনুষ্যত্বের সিংহাসনে বসাইয়া কল্পনায় মহীয়ান্ রাজপদে অভিষেক করিয়াছে, সে কল্পনা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমার উপর, এবং আমি যে তাহা নিশ্চয়ই পারিব, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিত না।

দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ প্রবাসের পর আবার জন্মভূমির মুখ দেখিলাম। আমার সেই নদীবহুলা সুজলা শ্যামা জন্মভূমি! আমার সেই স্নিগ্ধ স্নেহময়ী ধরিত্রী জননী!

রাণীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে মিস্টার সান্ন্যাল বাবার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং বাবার উত্তর পাইয়া তিনি মোহিত

হইয়া গিয়াছিলেন। মিস্টার সান্ন্যাল আমাকে বার বার বলিলেন, "নির্মল, তোমার বাবা এত ভদ্র ও এত মহৎ, তাহা আমি পূর্বে জানিতাম না। এই উচ্চমনা পিতার সন্তান তুমি, এই কথা স্মরণ রাখিয়া সর্বদা গর্বিত হইও, ও নিজের কর্তব্যপথ স্থির করিয়া লইও।" কিন্তু আমি,—আমিও সে পত্র পড়িয়াছিলাম, এবং বার বার সে পত্রের এই কয়টি ছত্রই মনে আসিয়া বাজিতেছিল, " 'অনুমতি' সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা বলিবার আছে। আমার মতে প্রত্যেক পিতারই সন্তানকে শিশুকাল হইতে এইরূপ ভাবে গঠন করা প্রয়োজন যে, সে যেন তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পরে সর্ববিষয়ে নিজের কর্তব্য নিজেই নির্ধারণ করিয়া লইতে সমর্থ হয়, এবং সে বিষয়ে তাহাকে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে না হয়; এবং পিতারও প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বাধ্যতার শৃংখলে বন্ধ রাখিয়া তাহার স্বকীয় স্বাধীনতা ও শক্তিতে মনুষ্যত্ব লাভ করিবার পথে বাধাস্বরূপ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে, চিরদিনই আমার এইরূপ বিশ্বাস। এই জন্য নির্মলের সম্বন্ধেও আমার এইরূপ ইচ্ছা যে, সে কোন বিষয়ে যেন আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে।" বাবার এই মন্তব্যে সান্ন্যাল সাহেব মুগ্ধ হইলেও আমি মুগ্ধ হইতে পারি নাই। আমার মনের ভিতর অভিমানের সিন্ধু সগর্জনে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, যেন আমার বুকের ভিতর আর ধরে না। উপলগামিনী খরস্রোতা নদী যেমন প্রস্তরের বাধা চূর্ণ করিয়া উদ্দাম স্রোতে ছুটিয়া যায়, আমার অন্তর্নিহিত অভিমানও যেন সেইরূপ আমার বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছিল। কোথায়? কোন্ সাগরের অভিমুখে তাহা জানি না। কেবল আমার মনে হইতেছিল, "কি করিয়াছি? আমি এত কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি? কি অপরাধে আমার এ কঠিন শাস্তি?" পত্র পড়িবার পর জানুর উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। রাণী না আসিলে বোধ হয় আরও অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতাম। রাণী আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "এই সন্ধ্যাবেলা এমন ক'রে একলাটি ব'সে কি করছ?" আমি তখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিলাম, "কাঁদবার চেষ্টা করছি রাণি! কিন্তু পারলাম না, আমার চোখে জল আসে না।"

কিন্তু তথাপি বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর রাণীকে লইয়া আমি কর্মস্থানে চলিয়া গেলাম। পদ্মাতীরে সুন্দর বাংলা, রাণী আমার সেই গৃহের রাণী। একখানি বোট ছিল, কখন কখন নদীতে বেড়াইতাম, কেননা রাণী নৌকা-ভ্রমণ বড় ভালবাসিত। কার্যানুরোধেও কখন কখন দুই দশ দিন নৌকায় বাস করিতে হইত।

একবার এইরূপ নৌকা-ভ্রমণে গিয়া নৌকা আঁধিতে পড়িয়া গেল। বর্ষার শেষ, নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণা। কয়েকদিন অনবরত নৌকায় বাস করিয়া আমার বিরক্ত ধরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাণীর "অমৃতে অরুচি নাই।" জলের খেলা দেখিয়া, জলের কুলুকুলু ধ্বনি শুনিয়া তাহার যে কি আমোদ হয় সেকথা

সেই জানে। সমস্ত রাত্রি নৌকার দোলায় দুলিতে দুলিতে মনে করিয়াছি, সকালে উঠিয়া কোন গ্রামে নৌকা লাগাইয়া মাটিতে পা দিয়া বাঁচিব। সকালে উঠিয়া দেখি, এমন কুয়াশা যে, জল কি স্থল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মাঝি দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া নিরুপায়ে হাল ধরিয়া রহিল, নৌকা ইচ্ছামত ভাসিয়া চলিল। তাহার পর কুয়াশা গিয়া রৌদ্রের আভা দেখা দিতে না দিতেই পশ্চিম আকাশে ভয়ানক মেঘ করিয়া আসিল। মেঘ দেখিয়া মাঝিরা সশংকচিত্তে কিনারা ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় কিনারা! দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল, নৌকা ঝড়ের মুখে ভাসিয়া চলিল। সেই প্রবল ঝড়ের প্রতিকূলে নৌকাকে কূলের নিকট লইয়া যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে দেখিয়া মাঝি আশা-ভরসা ছাড়িয়া দিয়া পীরের নাম জপ করিতে করিতে কেবল হাল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

ভরসার মধ্যে নৌকা খুব হাল্‌কা, সহজে ডুবিবার ভয় নাই, তবে উল্টাইয়া যাইতে পারে। আমি যদিও সাঁতার জানিতাম, কিন্তু এই ঝড়ে উন্মত্ত তরংগে সাঁতার দিয়া প্রাণ বাঁচানো একরূপ অসম্ভব। রাণী তো একেবারেই সাঁতার জানে না।

কিন্তু কি যে তাহার অদ্ভুত প্রকৃতি, ঝড় দেখিয়া ভয় পাওয়া দূরে যাক্, বরং আমোদ যেন আরও বাড়িয়া গেল। বলিল, "দেখ, কি সুন্দর একখানা উপন্যাস হয়ে গেল। কুয়াশা, ঝড়, নদীর প্রবল তরংগে ডুবু ডুবু নৌকা, এ সমস্ত ঠিক ঠিক উপন্যাসের সংগে মিলে যাচ্ছে। এখন নৌকা যদি ডোবে তা হ'লে কি মজাই হয়, উপন্যাসের আর তা হ'লে কিছুই বাকি থাকে না। আচ্ছা, নৌকা যদি ডোবে, তা হ'লে তুমি কি কর? উপন্যাসের মত আমাকে পিঠে ক'রে সাঁতরাও, না, সত্যি যা হয় সেই রকম কর,—সাঁতরে নিজের প্রাণ বাঁচাও। কি কর বল দেখি?" বলিয়া আমার শঙ্কিত চিন্তাবিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বালিকার মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি রাণীকে কাছে টানিয়া আনিলাম ও বোটের জানালাগুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিলাম।

রাণী বলিল, "আহা, কর কি? জানালা বন্ধ কর কেন? এমন অন্ধকার, এমন মেঘের শোভা, এমন নদীর ঢেউ কিছুই যে তা হ'লে দেখা যাবে না!"

ক্রমশ সন্ধ্যার সংগে সংগে ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিল এবং অনেক রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। একটি গ্রামের ঘাট পাওয়া গেল দেখিয়া মাঝিরা সেখানে নৌকা লাগাইল।

শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। প্রকৃতির ক্ষণপূর্বের রণোন্মাদিনী কালিকামূর্তির পরই এই রূপান্তর, এই জ্যোৎস্না-বিভূষণা শান্তিময়ী মূর্তি, বিচিত্র, অতি বিচিত্র! আমি নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া যতক্ষণ প্রকৃতির এই লীলা-বৈচিত্র্যের বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছি, ততক্ষণে বহুকষ্টের পর রাণী নৌকা হইতে নামিয়া পড়িয়াছে এবং আমাকেও ডাকিতেছে, "এস না, এই জ্যোৎস্নায় একটু চড়ার উপর বেড়াই।"

রাণী তো নামিতে গিয়া পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কাদা মাখাইয়াছে, আমি কি করিয়া নামি? রাণীর আদেশ অবহেলা করিতেও সাহস হইল না, অগত্যা চেয়ারে চড়িয়া চড়ায় নামিতে বাধ্য হইলাম।

এইমাত্র জোয়ার নামিয়া গিয়াছে, চড়ায় কেবল কাদা। এই কাদার মধ্যে বেড়াইয়া যে কি সুখ, রাণীই তাহা জানে। যাহা হউক, আমি বাহকস্কন্ধে চেয়ার সহিত একেবারে কিছু উচ্চে গিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম, রাণী তখনও চড়ার কাদাতেই ঘুরিতেছে।

"দেখ, দেখ, কাদার মধ্যে কি সুন্দর একটি কাঁচের দোয়াত!"

"দোয়াত?" আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কি, এ কোথায় আসিয়াছি? এ যে শিবহাটির শ্মশান-ঘাট! এখানেই তো আমার নির্মলা-প্রতিমা বিসর্জন দিয়াছি! ওই যে সেই বেলের গাছ, ওই তো সেই শিবালয়, আর ওই তো দূরে গাছের আড়াল হইতে আমার ছাদের সেই চিলের ঘর দেখা যাইতেছে!

জন্মভূমি, এতদিন পরে অকৃতজ্ঞ সন্তানকে কি তুমি এমনি করিয়া কোলে লইলে!

* * *

রাণী বলিল, "তোমার ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় যাও, আমি আর কোনখানে যাচ্ছি না।"

আমি বলিলাম, "রাণী, তুমি তো জান না, বাবা কখনই তোমাকে ঘরে নেবেন না। আমার বিলাত যাওয়ার অপরাধই বাবা এখনও মার্জনা করেন নাই, এখন আমি কোন্ সাহসে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাব?"

রাণী বলিল, "ঘরে নেবেন না? আচ্ছা নাই নেবেন। বাইরেও তো নেবেন? তাঁর বাড়ীতে কি বাইরের কাজ করার দাসী নেই?"

আমি বলিলাম, "রাণী, তুমি জান না, তাই ও-কথা বলছ। বাবা যা সঙ্কল্প করেন, তা থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারে না। চিরদিন তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই ক'রে এসেছেন। আমার মা যে সন্ধ্যায় বাড়ী অন্ধকার ক'রে চ'লে গেলেন, ঠিক তাঁর যাত্রার সময়টিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের আরতির সময় হ'ল। ঘরের লক্ষ্মী জন্মের মত ঘর ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তবু লক্ষ্মী-নারায়ণের আরতিতে সেদিনও সময় উত্তীর্ণ হতে পায় নাই, বাবা তা হ'তে দেন নাই। আমি ন বৎসর বয়সে পৈতা নিয়েছি, তার পর এক সন্ধ্যায় কখনও দুবার খাই নাই। একদিন খুড়িমা লুকিয়ে তাঁর পাতের খিচুড়ী দিয়েছিলেন, বাবাকে দূর থেকে আসতে দেখে খিচুড়ীর থালা হাতে নিয়ে আমবাগানে পালিয়েছিলাম, সে কথা আমার এখনও মনে আছে। কুলধর্মের কিংবা ব্রহ্মণ্যধর্মের বিন্দুমাত্র নিয়ম-লঙ্ঘনকে তিনি অমার্জনীয় অপরাধ ব'লে মনে করেন। তার জন্য তিনি একমাত্র ছেলেকেও ত্যাগ করতে পারেন, সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ! তবে আর কেন মিছা কষ্ট পেতে চাও! বাবা যা মনে স্থির করেছেন, তোমার কি আমার, কারো স্নেহেই তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করবেন না।"

আমি যতক্ষণ কথা বলিতেছি, ততক্ষণে রাণী অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছে। আমিও চলিলাম। প্রতি পদক্ষেপে পা কাঁপিতেছিল, আমার বুকের শব্দ আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম।

তখনও সামান্য অন্ধকার আছে। পূর্বে বাবা এ সময় কাছারী ঘরের রোয়াকের উপর কম্বলের আসনে বসিয়া থাকিতেন। এখন কি করেন জানি না। তথাপি ধীরে ধীরে সেই রোয়াকের দিকে কোনরূপে পা দুটিকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। রোয়াকের সম্মুখেই ফুলবাগান। গাছতলায় শিউলী ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, আর শিশির ঝরিয়া ফুলের উপর পড়িতেছে। আমি আর নির্মলা প্রতিদিন ভোরবেলায় এই গাছতলায় ফুল কুড়াইতাম।

ছায়া দেখিয়া বাবা চমকিয়া "কে ও?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"বাবা, আমি" বলিয়া রাণী গিয়া তাঁহার পায়ের তলায় উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল। বাবা স্থির প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমিও শিউলী গাছের তলায় নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলাম না।

প্রভাতের প্রথম আলো তখন গাছের শিশিরসিক্ত পত্রগুলির উপর খেলা করিতেছে। বাবা একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি অবনত করিলাম, বাবার দৃষ্টিতে যে কি লেখা ছিল তাহা পড়িতে সাহস করিলাম না।

রাণী বাবার দুই পা জড়াইয়া তাহার উপর মুখ দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহার চোখের জলে যে বাবার পা ভিজিতেছিল তাহা আমি না দেখিয়াও অনুমান করিয়াছিলাম। একবার রাণী অশ্রুসিক্ত মুখ অল্প তুলিয়া বলিল "বাবা!" সে শব্দটি যেন আর্তনাদের মত শুনাইল।

"বাবা, আমাকে কি আপনি ঘরে নেবেন না বাবা?" এ যে একেবারে ঠিক নির্মলার আবদারের সুর! এ কি, রাণী এ সুর কোথায় শিখিল?

"কেন নেব না মা আমার!" কি স্নিগ্ধ, কি গম্ভীর স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বর! বাবার গলার স্বর আমি কতদিন—কতদিন শুনি নাই, সে স্বর যেন আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

খিড়কীর দুয়ার ঈষৎ খোলা ছিল। সেই খোলা দুয়ারের ফাঁক দিয়া আমি খুড়িমার অস্পষ্ট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। খুড়িমা ঘড়া লইয়া, ঘোমটা দিয়া ঘাটের পথে চলিতেছিলেন.—আগেও তিনি এই সময়ই ঘাটে যাইতেন। একজন দাসী আসিয়া তাঁহাকে কি যেন বলিল, কৌতূহলী হইয়া খুড়িমা দুয়ারের ফাঁক দিয়া বাহিরে কি হইয়াছে দেখিতে আসিলেন। পরমুহূর্তেই,—যে খুড়িমার গলার আওয়াজ কি পায়ের শব্দও বাবা জীবনে কখনও শুনিতে পান নাই, তাঁহার ত্বরিত আবেগকম্পিত উচ্চ কণ্ঠধ্বনি শুনিলাম, "ওরে ভব, শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা, আমাদের বৌমা এসেছে—ওরে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসেছে।"

উচ্চ শব্দে পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সে শঙ্খধ্বনির অন্তরালে আমি যেন ক্রন্দনের গুঞ্জনধ্বনি শুনিলাম, "নির্মলা, বাড়ী আয় রে মা আমার,

এতদিনের পর তোর দাদা ফিরে এসেছে রে।" সে অস্ফুট ক্রন্দন সত্য কি আমার মনেরই প্রতিধ্বনি তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। কাঁচের দোয়াতটি তখনও আমার হাতেই ছিল।

('কুন্তলীন পুরস্কার', ১১শ বর্ষ)

স্বয়ম্বরা

হরিপ্রসন্নবাবুর বাংলার সম্মুখের বারান্দায় একখানি চৌকির উপর বসিয়া বিনোদ দিগন্তের সীমানায় তাহার দৃষ্টি প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং মনোরমা ফুলবাগানে একটা কামিনীগাছের তলায় দাঁড়াইয়া ছিল।

তখন শীত-প্রভাতের মধুর রৌদ্র কেবলমাত্র তরুশিরের পত্রগুলি রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। বাংলাটির চারিপাশে বন্য গুল্ম ও ছোট বড় শাল পলাশগাছে আচ্ছন্ন সমতল প্রান্তর; গুল্ম ও শালগাছের পাতার আড়ালে এখনও কুয়াশা লুকাইয়া আছে, মাঠের পরে আকাশের সীমা পর্যন্ত কুয়াশার সম্পূর্ণ অধিকার।

বিনোদ হরিপ্রসন্নবাবুর আশ্রিত এবং মনোরমা হরিপ্রসন্নবাবুর একমাত্র আদরিণী কন্যা। অবস্থাগত পার্থক্যের মত উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। বিনোদ যেমন শান্ত, নম্র ও সংযতস্বভাব, মনোরমা তেমনই অবাধ্য, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, তথাপি এই দুইটি বিরোধী-প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে স্নেহের অর্ঘ্য দিয়া চিরসাথী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল।

তিন বৎসর পূর্বে বিনোদ যখন পিতার দারিদ্র্যক্লেশ নিবারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া গৃহ হইতে বাহির হয়, তখন তাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। দুশ্চিন্তায় ও পথশ্রমে রেলগাড়ীর ভিতর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কখন যে তাহার পথের যৎসামান্য সম্বল টিকিটখানি অপহৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রত্যুষে টিকিট-পরীক্ষকের আহ্বানে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখিল এক অজ্ঞাত স্থানে সে নিঃসম্বল, এবং প্রবঞ্চনার অপরাধে অভিযুক্ত। সেই বিপদের মধ্যে হরিপ্রসন্নবাবুর সদাপ্রসন্ন করুণাপূর্ণ মুখখানি প্রথম তাহার চোখের উপর পড়িয়াছিল।

সেদিনও এমনই শীতের প্রভাত, এমনই কুয়াশা। হরিপ্রসন্নবাবু তাহার হাত ধরিয়া যখন ফুলবাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন তখন তাহার সর্বাঙ্গ এত কাঁপিতেছিল যে, সে আর পথ চলিতে পারিতেছিল না। মনোরমা বাগানে ফুল তুলিতেছিল, পিতাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল এবং বিনোদের পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আহা, এ যে শীতে কাঁপছে বাবা! নাও, আমার এই গায়ের কাপড়খানি গায়ে জড়িয়ে নাও।" বলিয়া নিজের গায়ের বনাতখানি লইয়া অসঙ্কোচে বিনোদের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। বিনোদ কে ও কোথা হইতে আসিতেছে, সে বিষয়ে একটি প্রশ্নও করিল না।

হরিপ্রসন্নবাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে কন্যা কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যাবতী হয়, কিন্তু কোন রকমেই সে বিষয়ের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে বিনোদের আগমনে কন্যার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে হরিপ্রসন্নবাবু কতক নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিনোদের দৃষ্টি যখন দিগন্তের সীমা হইতে সংসারের সীমায় অবতীর্ণ

হইল, তখন বিনোদ কামিনীতলায় দণ্ডায়মানা মনোরমাকে দেখিতে পাইল। ছাত্রীকে শাসন করিবার অধিকার বিনোদের ছিল, অতএব সে ডাকিল, "মনোরমা, উঠে এস, সকালবেলায় এত ঠাণ্ডা না লাগিয়ে ঘরে গিয়ে একটু পড়াশুনায় মন দাও।"

মনোরমা বলিল "এখন আমি যাব না।" এরূপ উত্তরই মনোরমার পক্ষে স্বাভাবিক, এজন্য বিনোদ তাহাতে কিছুই আশ্চর্য হইল না, কিন্তু তাহার গলার স্বর শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইল।

বিনোদ দৃঢ়স্বরে ডাকিল, "মনোরমা, উঠে এস।" মনোরমা সে কথায় কিছুই উত্তর দিল না। বাধ্য হইয়া বিনোদকেই ফুলবাগানে নামিতে হইল।

বিনোদ মনোরমার নিকট আসিয়া দেখিল, যেমন অল্প অল্প বাতাসে নাড়া পাইয়া কামিনীগাছের পাতা হইতে বড় বড় শিশিরের ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে, তেমনি মনোরমার চোখের পল্লব হইতে বড় বড় ফোঁটা টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, লাল ঠোঁট ও গাল দুটি আরও বেশী লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া বিনোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে তোমার?" বিনোদ তিন বৎসরের ভিতর মনোরমাকে কখনও কাঁদিতে দেখে নাই।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকাকে ওরূপ ভাবে অশ্রু বিসর্জন করিতে দেখিলে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের মনে বিপ্লব বাধিবার একান্তই সম্ভাবনা। কিন্তু বিনোদের ভাবে তাহার কিছুই বোধ হইল না, সে রুক্ষস্বরে বলিল, "মানু, ঘরে যেতে বলছি শুনতে পাচ্ছ না কি?"

মনোরমা বিনোদের আদেশে পড়িবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল, যাইবার সময় চোখের জলে অথবা শিশির-জলে ভিজা একখানি ছোট পত্র বিনোদের হাতে দিয়া গেল।

সেদিন আহারের ঘণ্টা পড়িবার পরও বিনোদকে আহারের ঘরে অনুপস্থিত দেখা গেল। আহারের ঘণ্টাটি হরিপ্রসন্নবাবুর সাহেবী চালচলনের একটি উদাহরণ।

তিন চার বৎসর পূর্বে এ পরিবারে রন্ধন ব্যাপারে বাবুর্চিরই ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সময়ক্রমে শ্রীমতী অন্নপূর্ণার হিন্দুয়ানীতে অনুরাগসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চির ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া হরিপ্রসন্নবাবুর এক বিধবা জ্ঞাতি ভ্রাতৃবধূর অন্নবস্ত্র সংস্থানের উপায় হইয়াছিল। বিধবা ভ্রাতৃজায়ার নাম যোগমায়া; নিতান্ত শান্ত স্বভাব ও সকলের উপরেই মমতা, এই দুইটি তাঁহার স্বভাবের প্রধান গুণ বা দোষ।

হরিপ্রসন্নবাবু আহারের ঘরে বিনোদকে অনুপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, "বিনোদ আসে নাই?" তাহার পর বিনোদকে ডাকিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। চাকরকে হুকুম করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।

বিনোদের ঘরের দরজা রুদ্ধ ছিল, হরিপ্রসন্নবাবুর আহ্বানে বিনোদ দুয়ার

খুলিয়া বাহিরে আসিল। হরিপ্রসন্নবাবু বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ কি বিনোদ, তোমার চোখ এত লাল হয়ে ফুলে উঠেছে কেন?"

বিনোদ ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সর্দি লেগে বড় মাথা ধরেছে।" জ্ঞানোদয়ের পর বিনোদ বোধ হয় এই প্রথম মিথ্যা বলিল।

হরিপ্রসন্নবাবু একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "বোধ হয় খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, যে রকম চোখ লাল হয়েছে, জ্বর হতে পারে। যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, আমি এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিনোদ বিষণ্ণভাবে ঘরে ফিরিয়া গেল; বালিশের নীচে হইতে মনোরমার লেখা সেই ছোট পত্রখানি বাহির করিয়া যেন কোনও দুর্বোধ ভাষায় লিখিত পত্র পাঠ করিবার মত একাগ্রচিত্তে তাহার এক-একটি অক্ষরের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছোট পত্রখানিতে এই কয়টি কথা লেখা ছিল, "বিনোদ, বাবা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।"—বিনোদ সকাল হইতে বেলা দশটা পর্যন্ত বার বার পড়িয়াও এই দুইটি মাত্র ছত্রের অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বৈকালে বিনোদ অন্নপূর্ণার ঘরে গেল। অত্যন্ত সংযত-স্বভাব হইলেও সমস্ত দিনের মানসিক বিপ্লবে তাহার প্রফুল্ল মুখকান্তি কিছু ম্লান হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কি রে বিনু, এক দিন না খেয়ে তুই হয়েছিস কি?"

বিনোদ একটু হাসিয়া বলিল, "একেবারে না খাওয়া নয় মা, দু বাটি চা—আর পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খেয়েছি।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তোকে আর হাসতে হবে না বিনু, তুই হাসছিস, না, কাঁদছিস? কি হয়েছে সত্য ক'রে বল্ দেখি?"

বিনোদ অন্নপূর্ণার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়া একেবারে আত্মগোপন করা অসম্ভব মনে করিল। বলিল, "একটা যৎসামান্য কিছু হয়েছে। তোমাকে বাড়ি যাবার কথা বলেছিলাম তা কি ভুলে গিয়েছ? আমি পরশু দিন বাড়ি যাব স্থির করেছি; একেবারে স্থির না করলে আর যাওয়া হবে না।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোর জ্বর আর সর্দি! ওঁর যেমন কীর্তি, ছেলেটাকে শুধু শুধু পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাওয়ালেন! বাড়ি যাস যাবি, সামনে পৌষ, মাঘের প্রথমেই বোধ হয় মানুর বিয়ে হবে, ফাল্গুনে এলাহাবাদে পরীক্ষা দিয়ে ঐ পথে একেবারে বাড়ি চ'লে যাস।"

বিনোদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না মা, তা হবে না।"

অন্নপূর্ণা একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "থাকা হবে না? যেতেই হবে তোকে?"

বিনোদের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। নতমুখে বলিল, "হ্যাঁ মা। আর যাতে আমার যাওয়া হয় তোমাকেই তার ঠিক ক'রে দিতে হবে।" ইতিমধ্যে হরিপ্রসন্ন-বাবু শুভসংবাদ বহন করিয়া গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন, "অনু, সব ঠিক

হয়ে গেল, মাঘের প্রথমেই বিবাহ স্থির হয়েছে। সম্বন্ধটা যে এত শীঘ্র স্থির হয়ে যাবে তা মনেও ভাবিনি। ছেলেটি এম-এ পড়ছে, স্বভাব-চরিত্রও তেমনি ভাল, বড় ভাই দুটিও কৃতী, আর ভবেশবাবু নিজে তো মাটির মানুষ। তিনি আমাকে দেনা-পাওনার কথা মুখেও আনতে দিলেন না।"

অন্নপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেনা-পাওনার কথা মুখে আনবার বিশেষ দরকারও ছিল না; মনে নিশ্চয়ই জানেন যে ফাঁকিতে পড়বেন না, আমাদের যা কিছু আছে সবই মনোরমার।"

হরিপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "তা যাই হোক, ভবেশবাবু যে হরিদ্বারে বেড়াতে এসেছিলেন এটি আমাদের উপর ভগবানের বিশেষ কৃপা বলতে হবে। না হ'লে তুমি ভেবে দেখ তো অনু, এই উত্তর-পশ্চিমের প্রান্তে মনোরমার জন্য সুপাত্রের সন্ধান কোথায় পাওয়া যেত? যা হোক, অনেকদিনের দুশ্চিন্তার পর এবার নিশ্চিন্ত হতে পারব।"

বিনোদ চলিয়া গেল। যোগমায়া ও অন্নপূর্ণা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিলেন।

যোগমায়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "দিদি, মানুকে কেন বিনোদের হাতে দিলে না? এমন সুপাত্র তুমি আর কোথায় পাবে? ধন-সম্পত্তির কথা যদি বল, তবে সে যে ছেলে, সে যদি বেঁচে থাকে, নিশ্চয় একটা মানুষের মত হবে।"

অন্নপূর্ণার মুখে একটা কালিমার ছায়া পড়িল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সে হবার নয়, বিনোদেরা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ।"

"কায়স্থের আবার উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম কি? কায়স্থ তো বটে! যদি সামান্য কিছু গোল হ'ত, বড়ঠাকুর মনে করলে কি মিটিয়ে দিতে পারতেন না?"

অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার মনের ভিতরের চিন্তার রেখা নির্মল ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতেছিল।

বিনোদ বিদায় লইবার সময় মনোরমাকে ডাকে নাই। মনোরমা তখন পড়িবার ঘরে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া গাড়ি চলিয়া যাইবার শব্দ শুনিতেছিল। ক্রমে গাড়ির চাকার শব্দ মৃদু ও মৃদুতর হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল; তখন তাহার শূন্য হৃদয় যেন একান্ত অবলম্বনহীন হইয়া একটা কিছু আশ্রয় খুঁজিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

টেবিলের উপর একটি স্ফটিকনির্মিত কোণভাঙ্গা কাগজচাপা পড়িয়া ছিল, মনোরমা সেটা তুলিয়া লইয়া অতি আগ্রহের সহিত বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর তাজমহলের একটি সুন্দর ছবি ছিল, নানা দিক হইতে তাহা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইত। দেখিতে সুন্দর বলিয়া গত বৎসর বিনোদ তাহাকে সেটি কিনিয়া দিয়াছিল। মনোরমাকে বিনোদের সেই প্রথম ও শেষ উপহার! সেই সামান্য বস্তুটিতে যে কতদিনের কত কাহিনী, কত স্নেহ, কত প্রীতি, কত শিক্ষা জড়িত হইয়াছিল অন্যে তাহা জানিত না। একবার অসাবধানে

টেবিল হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার একটা কোণ ভাঙিগয়া গিয়াছিল। পশ্চিম দিকের সূর্যকিরণ সেই ভাঙ্গার উপর পড়িয়া যখন তাহাকে নানা বর্ণে সাজাইতেছিল, তখন মনোরমার মনের ভিতরেও এই তিন বৎসরের কত ইতিহাস উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

কত ইতিহাস! কিন্তু সে ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য কোন ঘটনাই ছিল না। বিনোদ মনোরমাকে অনেক শাসন করিয়াছে, কিন্তু "মানু লক্ষ্মীটি, একটু শান্ত হও দেখি" কি "দুষ্টুমিটা একটু কমাও দেখি" ইহা ভিন্ন আর কোন দিন মনোরমাকে কোন আদরের কথা বলিয়াছে বলিয়া মনোরমার স্মরণ হয় না। স্মরণ করিতে গেলে সেই সকালবেলায় বিছানা হইতে উঠা, সেই চা খাওয়া, তারপর পড়া দেওয়া এবং প্রতিদিনই পড়া তৈয়ারী না হইবার জন্য বকুনি খাওয়া, এই সবই কেবল মনে পড়ে। বিশেষ ঘটনার মধ্যে, কোনদিন বই হাতে করিয়া ভোলার সঙ্গে বাগানে ছুটোছুটি করিতে করিতে ভুলিয়া ইঁদারার ধারে বই রাখিয়া আসিয়াছিল, ও রাত্রে বৃষ্টি হইয়া বই ভিজিয়া গিয়াছিল, কোনদিন মা ঘুমাইলে চুপি চুপি তক্তার উপর হইতে তেঁতুল কাসুন্দী পাড়িতে গিয়া জলের কলসী উল্টাইয়া ফেলিয়াছিল, কোনদিন বা বাবার সঙ্গে সহস্রঝোরা দেখিতে গিয়াছিল, এই মাত্র; কিন্তু জলে যেমন সূর্যের কিরণ রামধনুর রঙ ফলায়, স্ফটিকের কাগজ-চাপাটিতে যেমন সূর্যের কিরণ রঙ ফলাইতেছে, এই তিন বৎসরের প্রতি দিনের সামান্য ঘটনাগুলিও যেন সেইরূপ আজ কি জানি কোন্ সূর্যের কিরণে রামধনুর বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

কাগজ-চাপার নীচে বিনোদের ছোট একখানি খাতা ছিল। বিনোদ ভুলিয়া খাতাখানি ফেলিয়া গিয়াছিল। মনোরমা দেখিয়াছিল, বিনোদ প্রতিদিন এই খাতায় কি যেন লিখিত। মনোরমা খাতাখানির সমস্ত পাতা উল্টাইয়া দেখিল, সবই ইংরাজী লেখা, মনোরমার কিছুই বুঝিবার সাধ্য নাই, কেবল সেই সমস্ত ইংরাজী লেখার মধ্যে একছত্র নীল পেন্সিলের দাগ দেওয়া বাংলা লেখা আছে— "পবিত্রতা মৃত-সঞ্জীবনী, যে ইহার সংস্পর্শে আসে, সেই নব-জীবন লাভ করে!"

পৌষ মাসের ছোট বেলার দিন কাজে-কর্মে শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, মনোরমার মনে হইতে লাগিল দিনগুলি যেন রেলগাড়ির মত দৌড়িয়া চলিতেছে; মাঘ মাস আসিবার আশঙ্কায় সে অস্থির হইয়া উঠিল।

হরিপ্রসন্নবাবু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "অনু, মনোরমা এখন কেমন শান্ত হয়েছে; সমস্ত দিন পড়বার ঘর ছাড়া আর কোথাও তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।"

পৌষ মাষ শেষ হইবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া মনোরমা আর থাকিতে পারিল না। একদিন সন্ধ্যার সময় মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, আমার বিয়ে দিও না।"

মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "ও আবার কি কথা!"

দোসরা মাঘ মনোরমার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল, এজন্য নানা কাজে

হরিপ্রসন্নবাবুর সময় আজকাল খুবই কম। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর কিছু অপটু, ও সেই সঙ্গে মনও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। বিনোদ কাছে নাই বলিয়া যেন তাঁহার সকল কাজেই অসুবিধা বোধ হইত।

একদিন সকালবেলা অন্নপূর্ণা স্বামীর নিকট আসিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "মানু কোথায় গেল? সকাল থেকে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

হরিপ্রসন্নবাবু ইজিচেয়ারে অর্ধনিমগ্ন হইয়া খবরের কাগজ দেখিতেছিলেন, চমকিত হইয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন, "সে কি, কুয়ায় প'ড়ে যায়নি তো?"

মনোরমাকে কোন স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অন্নপূর্ণা দুই মাস হইতে মনে যে সংশয় পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিলেন।

হরিপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "এতদিন কেন বল নাই?"

অন্নপূর্ণা অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এমন যে হবে, তা কি আগে বুঝতে পেরেছিলাম!" অনুতাপে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

লোকে যে বিষয়টা একেবারেই অসম্ভব মনে করে সেটা সহসা যে কেমন করিয়া সম্ভব হইয়া যায় তাহা বলা যায় না। মনোরমা কখনও বাড়ির বাহির হয় নাই, স্টেশন বহু দূরে, কোন্ পথে স্টেশনে যাইতে হয় তাহাও সে জানিত না। বিনোদের গ্রামের নাম ও কোন্ স্টেশনে নামিতে হয়, তাহা মনোরমা বিনোদের নিকট শুনিয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত যে কখন কোন প্রয়োজনে লাগিবে তাহা মনে কল্পনাও করে নাই।

স্টেশনমাস্টার মনোরমার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "তুমি একা কোথায় যাবে মা?"

মনোরমা বলিল, "আমার স্বামীর অসুখ, আমাকে যেতেই হবে।"

মনোরমার সেই উন্মাদিনীর ন্যায় মূর্তি দেখিয়া সে কথায় কাহারও অবিশ্বাস হইল না।

স্টেশনের পর স্টেশন ছায়ার মত চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। কোন্ কোন্ স্টেশনে উঠিতে ও নামিতে হইবে স্টেশনমাস্টার তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি সে মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মনে রাখিতেছিল। আহার ও নিদ্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাহার কোন চৈতন্যই ছিল না।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া অসহায়া সুন্দরী বালিকার পথে কত বিপদের সম্ভাবনা, কিন্তু মনোরমার সে সমস্ত কিছুই ঘটিল না। জগতে সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীর লোকই আছে, কিন্তু যে কেহ তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল সে-ই বিস্মিত হইতেছিল, তাহাকে কোন কুকথা বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

সন্ধ্যার পর জমিদার বিনোদবিহারীবাবুর বৈঠক বসিয়াছে। বিনোদবিহারীবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সভ্যতা সম্বন্ধে আদর্শ দেখাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন, অতএব তাঁহাদের সুমার্জিত বিচারশক্তির অনুকূলতায় বৈঠকখানার শোভা বর্ধন

করিবার জন্য ভদ্রলোকের যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছিল, কেবল রমণীকণ্ঠের সুমার্জিত স্বরলহরীর অভাবে অদ্যকার সভাস্থলীতে সমস্তই বিরস বোধ হইতেছিল।

সভাগৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর অদর্শনজনিত মনের বিষণ্ণতা দূর করিবার জন্য বিনোদবিহারী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধের গুণে ক্রমে সকলের মন প্রফুল্ল হইল। চতুর্দিকের দেয়ালগিরির আলোকরশ্মি কাচের গেলাসের উপর পড়িয়া আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতে লাগিল। গেলাসের ঠুন্‌ঠুন্, তবলার মৃদু আওয়াজ এবং গীতেবাদ্যে ও বক্তৃতায় সভা ক্রমে আনন্দময় হইয়া উঠিল। নৃত্যের অভাব পূরণ করিবার জন্য বন্ধুবর্গের কেহ কেহ আপনার পায়ে ঘুঙুর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় দুয়ার খুলিয়া আকস্মিক বিদ্যুৎরেখার মত এক অপূর্ব সুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা সভাস্থলে প্রবেশ করিল। বিনোদবাবুর বন্ধুবর্গ তাহাকে দেখিয়া সকলে শৃগালবিনিন্দিত স্বরে একত্রে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

বালিকার সঙ্গে যে লোকটি আসিয়াছিল সে তাকিয়ার উপর অর্ধশায়িত, শটকাহস্ত, অর্ধনিমীলিতনেত্র বিনোদবাবুকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ যে বিনোদবাবু!"

মুহূর্তের মধ্যে মনোরমার পায়ের নীচে হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া গেল। "এ কি, এ তো নয়!" বলিয়া মূর্ছিতের মত পড়িয়া যাইতেছিল, তৎক্ষণাৎ আত্ম-সম্বরণ করিয়া প্রস্তরমূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

জমিদার মহাশয় আলস্যবিজড়িত স্বরে, "এত গোল কিসের?" বলিয়া অর্ধ-নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন। সম্মুখে উপবাসক্লিষ্টা, রুক্ষকেশা দীনা মনোরমার উন্মাদিনীর ন্যায় মূর্তি দেখিয়া "এ কি!" বলিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কে যেন তীব্র কষাঘাতে গভীর নিদ্রা হইতে তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিল। অতি যন্ত্রণার সঙ্গে বিনোদবাবুর মুখ হইতে "ও!" এই শব্দটি আর্তনাদের ন্যায় বাহির হইল।

"এ যে দেবী জগদ্ধাত্রী! এ নরককুণ্ডে তুমি কেন মা!" বলিতে বলিতে বিনোদবাবুর মস্তক আপনা হইতেই মনোরমার পদপ্রান্তে অবনত হইল।

বেলা প্রায় নয়টা, হরিপ্রসন্নবাবু ফুলবাগানে বেড়াইতেছিলেন। পনেরো দিনে হরিপ্রসন্নবাবুর বয়স পনেরো বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছিল।

ডাকহরকরা ডাক দিয়া গেল। হরিপ্রসন্নবাবু একখানি অপরিচিত হাতের লেখা পত্র দেখিয়া সকলের আগে সেই পত্রখানিই খুলিলেন; তখন তাঁহার মনে আশা বা আশঙ্কা কোনটি যে প্রবল হইয়াছিল, মুখের দিকে চাহিয়া তাহা কিছুই বুঝা যাইত না।

পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু, মহাশয়, আমি আপনার নিকট অপরিচিত, কেন-না ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ অথবা লিপিযোগে আলাপ পরিচয় ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দৈববশতঃ আমার ভাগ্যক্রমে আপনার সাবিত্রীরূপা কন্যাকে আমি জননীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি এবং সেই সূত্রে অপরিচিত হইয়াও আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতেছি।

শ্রীমান্ বিনোদবিহারী রায় আমার স্বগ্রামবাসী ও প্রতিবেশী, তাঁহারই গৃহের অনুসন্ধানে মা ভ্রমক্রমে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি এখন এই গৃহেই আমার স্ত্রীর পরিচর্যায় অবস্থান করিতেছেন। মা যখন গৃহত্যাগ করিয়া আসেন তখন অন্য পাত্রে সমর্পিতা হইবার আশঙ্কায় সংজ্ঞাশূন্যা হইয়াছিলেন, এখন নিজকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিতা ও সংকুচিতা হইয়াছেন। ভরসা করি আপনারা তাঁহার সে ত্রুটী মার্জনা করিবেন। আপনার নিকটে আমার আরও একটি নিবেদন আছে, এ বিষয়ে আমার ধৃষ্টতা ও অতিরিক্ত সাহস ক্ষমা করিবেন। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি সপরিবারে একবার দীনের ভবনে পদার্পণ করিয়া এই স্থান হইতে মাকে যথাবিধি স্বামীহস্তে অর্পণ করিবেন, আমি তাহা দেখিয়া জীবন সার্থক করিব। এবিষয়ে আপনার কিরূপ অনুমতি পত্রোত্তরে জানিতে ইচ্ছা করি। নিবেদনমিতি—

প্রণত

শ্রীবিনোদবিহারী রায়চৌধুরী"

('কুন্তলীন পুরস্কার', ১৩১৩)

সন্ন্যাস

আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাহার পূর্বেই আমি কিঞ্চিৎ ইঁচড়ে পাকিয়া গিয়াছিলাম। বিবাহের পূর্বে যখন দাদা পঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া একটু আপত্তি তুলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন সম্মুখে গলদশ্রুলোচনা পিসিমাকে অবস্থিত দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে সম্ভাবিত আপত্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল।

পিসিমা বলিলেন, "ও কি আমার অদৃষ্টে বাঁচবে? তাতে আবার ওর লেখাপড়ার জন্য এত শাসন! এ-বিয়েতে আর অমত ক'রো না বাবা; মেয়েটি সুন্দরী, বিয়েটা হ'লে আমিও নরুর ছেলে-মেয়ের মুখ দেখে সুখে মরতে পারি।"

অতএব পিসিমার এই কথায় প্রতিপন্ন হইল পিসিমার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, এবং তাঁহার অদৃষ্টের দোষেই আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। যখন বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প তখন লেখাপড়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, এবং বিবাহটা একান্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ যখন মেয়েটি সুন্দরী। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল; কিন্তু আমার ছেলে-মেয়ের মুখ দেখিয়া মরা পিসিমার পক্ষে এত সুখকর কেন, সেইটিই বুঝিতে আমার কিছু গোলমাল ঠেকিতেছিল।

যাহা হউক, দাদা এই সকল অমোঘ যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তি উত্থাপনের সাহস করিলেন না। অতএব নির্বিঘ্নে সুষমার সহিত আমার উদ্বাহ-বন্ধন সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

কিন্তু এ হেন পিসিমার বর্তমানেও যে জীবনটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের নয় তাহা পরে জানিয়াছিলাম।

আমার বৌদিদির অনেক দোষ ছিল। প্রথম দোষ তিনি সর্বদাই হাস্যমুখী; তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই বোধ হইত তিনি হাসিতেছেন। মেয়েমানুষের এত হাসি কেন? পিসিমার দিকে চাহিয়া দেখ দেখি, তিনি কত গম্ভীর! তা ছাড়া, বৌদিদির অন্যান্য দোষেরও সীমা ছিল না। বৌদিদির দোষেই পিসিমা অন্যমনস্ক হইয়া পা দিয়া দুধের বাটি প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেন, হাত হইতে তেলের ভাঁড় পড়িয়া যাইত, পিসিমা দুধ জ্বাল দিতে গেলেই বৌদিদির দোষে কড়ার সমস্ত দুধ উথলাইয়া পড়িত। মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হয়? কাজেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটিলে পিসিমা বৌদিদিকে তিরস্কার করিতেন; তা বৌ-ঝির দোষ দেখিলে শাসন না করিলে কি চলে? তাহাতেই পাড়ার দগ্ধাননীরা পিসিমাকে বৌকাঁটকি বলিত। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি পিসিমা যখন শাসন করিতেন, বৌদিদি তখন তাঁহার সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া ভিজে বেড়ালটির মত দাঁড়াইয়া থাকিতেন (এ উপমাটি পিসিমা প্রদত্ত)। তখনও তাঁহার মুখ তেমনি হাস্যময় দেখিতাম। বৌদিদির সর্বাপেক্ষা দোষ, তিনি আমার উপর সর্বদা গুরুগিরি করিতেন। আমি তাঁহার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হইলেও হইতে পারি, তাই বলিয়া মেয়েমানুষের

কাছে উপদেশ লইতে হইবে নাকি? একে বৌদিদির উপদেশ, তারপর আবার দাদার বকুনি! কথা বলিতে তো খরচ লাগে না, কাজেই দাদা অনর্গল বকিয়া যাইতেন। (এ কথায় যেন কেহ মনে না করেন—দাদা কৃপণ।)

দাদার সেই সমস্ত বাক্যব্যয়ের ফলে আমি যেদিন দাদার কিছু খরচ বাঁচাইতাম অর্থাৎ খাইতাম না এবং পিসিমাও অনাহারে থাকিতেন, সেদিন বৌদিদি বেচারীরও অগত্যা খাওয়া হইত না।—দেখিয়া শুনিয়া সংসারে আমার নিতান্ত বিরাগ উপস্থিত হইল।

তখন পিসিমা বৌদিদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা বৌমা! তোমাদের কেমন আক্কেল বল দেখি?" বৌদিদি শঙ্কিত হইয়া উত্তর করিলেন, "কি হয়েছে পিসিমা?"

"হবে আবার কি? চোখে কি কিছু দেখতে পাও না? নরু আমার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে, বে দিলে, তা বৌ আনবে না? আজ যদি শাশুড়ী থাকত, তো দেখতে পেতে নরুর বৌয়ের কত আদর! আহা, নরু আমার বাঁচবে, তার আবার বৌ হবে, এ কথা স্বপ্নের অতীত।" শেষকথার সঙ্গে পিসিমার চক্ষে অশ্রুর আবির্ভাব হইল।

বৌদিদি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমি তো পিসিমা, আনবার কথা বলেছিলাম; তা ঠাকুরপোর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে—"

"পরীক্ষা তো ফাল্গুন মাসে! তা ব'লে তদ্দিন ঘরের বউ ঘরে আনবে না?"

দিন দেখিয়া দুই-তিন দিন পরে সুষমাকে বাড়ী আনা হইল।

লোকে বলিত, "আহা, দুটি জায়ে কেমন ভাব, যেন মায়ের পেটের বোনের মত দুটিতে আছে।"

কিন্তু পিসিমা সর্বদাই বলিতেন, "ওর শাশুড়ী নেই, ওকে আর কে যত্ন করবে? বউ? বউ তো কেবল রাত-দিন খাটিয়েই নিতে পারে, তা না করে খাওয়ার যত্ন, না করে মাখবার যত্ন।"

বৌদিদি শুনিয়া হাসিতেন। সুষমা কি ভাবিত জানি না; কিন্তু দেখিতাম সে রোজ বিকালে পিসিমার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিত, এবং রাত্রে তাঁহার পায়ে তেল মাখাইত; সন্ধ্যাবেলায় বৌদিদি যখন রাঁধিতেন তখন তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত। এইসব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইত সুষমা নিতান্ত বোকা। বারো বৎসর বয়সেও তাহার এ জ্ঞানটুকু হইল না যে, অমূল্য জীবনটা পাকাচুল তুলিয়া, পায়ে তেল ঘষিয়া ও রান্নাঘরে গল্প করিয়া কাটাইবার জন্য নহে। তবে, বৌদিদির বুদ্ধির পরিচয়ও কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম; শনি ও রবিবারে দুপুরবেলায় যখন সুষমা খোকাকে লইয়া আদর করিতে মহাব্যস্ত থাকিত, তখন বৌদিদি তাহাকে টানিয়া আনিয়া আমার ঘরের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতেন। ইহাতে পিসিমাও কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "বড় বৌমার তো বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে!"

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, একে তো স্ত্রীলোক মাত্রেই বোকা, তার

উপর সুষমা আবার বিষম বোকা। আমার মত ব্যক্তির জীবনের সহচরী হইবার জন্য উহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন। অতএব দোকানে গিয়া একখানি দ্বিতীয় ভাগ ও একখানি কথামালা কিনিয়া আনিলাম।

সুষমার বই দেখিয়াই অরুচি ধরিয়া গেল; বলিল, "এ আমি পড়তে পারব না।" দুর্ভাগ্যবশত তখন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ও কথামালা 'সচিত্র' হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তাহা হইলে, সুষমা পড়ুক বা না পড়ুক অন্ততঃ ছবিও দেখিত।

পাঠে উৎসাহিত করার মুষ্টিযোগ আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। আমি বলিলাম, "তুমি যদি এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করতে পার তো তোমাকে একটা জিনিস দেব।"

তৎক্ষণাৎ সুষমার কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। "কি জিনিস বল না" বলিয়া সাগ্রহে আমার মুখের দিকে চাহিল।

কি জিনিস? দূর ছাই। জিনিসের নামও যে মনে পড়ে না। কাজেই বলিলাম, "কি জিনিস বল দেখি? যদি বলতে পার তাহ'লে আরেকটা জিনিস দেব।"

সুষমা হাসিয়া বলিল, "আর, আরও একটা যে কি জিনিস তা যদি বলতে পারি তাহ'লে আরও একটা জিনিস দেবে, কেমন তো? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিছুই দেবে না, আমাকে কেবল ভোলাচ্ছ।"

আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, যদি এখনই আমি বলি, "তোমার জন্য একটা ঘাগরা-পরা পুতুল আনব" তাহা হইলে আর সুষমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। হায়, এইরূপ মূর্খ—যে পুতুলখেলা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, কি উপায়ে তাহাকে আমি আমার জীবনসঙ্গিণীর যোগ্যা করিয়া লইব?

কিন্তু ক্রমশঃ বোধ হইতে লাগিল, সুষমা নিতান্ত বোকা নয়। খনির গর্ভে হীরকের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে কিছু জ্ঞানরত্ন আছে, একটু ঘষিয়া মাজিয়া লইতে পারিলেই হয়। তবে বৌদিদির সঙ্গে তাহার অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমার ভয় হইত, সেও বা বৌদিদির নিকট হইতে গুরুগিরি বিদ্যাটা শিখিয়া ফেলে! আমি মাথায় লম্বা চুল রাখিয়াছিলাম সেগুলি কাটিয়া ফেলিলাম, এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে সুষমাকে রাত্রে ও মধ্যাহ্নে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। এদিকে আমার পরীক্ষার সময়ও ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

সেদিন বৌদিদি সুষমাকে লইয়া কাহাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। দাদা আফিসে গিয়াছেন, ছেলেদের গোলমাল নাই, বাড়ী নিস্তব্ধ; বাহিরের ঘরে ক্ষুদিরাম চাকর নাক ডাকাইতেছে, পিসিমার ঘরে পিসিমা মালা হাতে করিয়া ঢুলিতেছেন, এবং আমার ঘরে আমি কলেজ-পলাতকরূপে নীরবে খাটের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছি, আর আমার সম্মুখে সুষমার কথামালা ও মানে লেখার খাতা-খানি সুষমার বিরহে কালির দাগ গায়ে মাখিয়া মলিন ভাবে পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, "সজল নিবিড় ঘন, সরস বরষা"। বৃষ্টি-

বিন্দুগুলি আকাশ হইতে ঝরিয়া পাতায় পাতায় পড়িতেছে, আবার পাতা হইতে ঝরিয়া কর্দমাক্ত ভূমিতে পড়িতেছে,—তাহাই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর সুষমার বই ও খাতাখানির দিকে দৃষ্টি পড়িল। ছাত্রী অনুপস্থিতা, কি আর করি? মানের খাতাখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া মনে মনে নিজের শিক্ষকতার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, মানের খাতার এক কোণে ছোট ছোট অক্ষরে কি লেখা আছে। পাঠ্যপুস্তকে বাজে কথা লেখা অন্যায়; এ বিষয়ে সুষমাকে কত শিক্ষা দিয়াছি, তথাপি ছাত্রীর এইরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। লেখাটি পড়িয়া দেখিলাম, "এই বুঝি তোমার জিনিস কিনে দেওয়া? আমি তো এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছি।" অবশ্য, যে শিক্ষক পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া পরিশেষে পুরস্কার প্রদানের কথা বিস্মৃত হন তিনি দোষী বটে, এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা কোন ছাত্রীরই কর্তব্য নহে।

রাত্রে সুষমাকে বলিলাম, "কেমন নিমন্ত্রণ খেলে?"

"কেমন আবার!"

"নিমন্ত্রণ খেতে খেতে এতদিন যা শিখেছ সেগুলিও তো খেয়ে ফেলনি? মানে লেখার খাতাখানি একবার নিয়ে এস দেখি!"

সুষমা আশ্চর্য হইয়া বলিল, "কেন?"

"কেমন লিখেছ দেখব।"

সুষমা বলিল, "সে হারিয়ে গিয়েছে।" স্ত্রীলোকের নীতিজ্ঞান কি কম! স্বচ্ছন্দে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল!

প্রাতে উঠিয়া প্রথমে পিসিমার শরণাপন্ন হইলাম ও পরে বাজারের দিকে চলিলাম। আমার বাসস্থান মুঙ্গের, এখানে একটু অনুসন্ধান না করিলে সহজে প্রার্থিত দ্রব্য মিলে না। বাড়ী ফিরিতে বেলা বারোটা হইয়া গেল। পিসিমা ভাবিয়াছিলেন, আমি গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছি; অতএব তিনি কাঁদিতেছিলেন, এবং সেটা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সেদিন যে মাসের শেষ শনিবার তাহা আমার স্মরণ ছিল না, কাজেই দাদাকে সম্মুখে দেখিয়া এবং তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমার মত সাহসীরও হৃদয় বিচলিত হইল।

দাদা জলদগম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "নরেন!" বুঝিলাম, বড় সুবিধার কথা নহে। ভয়ে ভয়ে দাদার নিকটস্থ হইলাম; ছেলেবেলার গুরুমহাশয়কে স্মরণ হইতে লাগিল, কিন্তু মনকে প্রবোধ দিলাম, দাদা কখনই আমাকে বেত মারিবেন না।

আমি দাদাকে রাগ করিতে জীবনে দু-তিন বারের বেশী দেখি নাই; আজ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, দাদা রাগ করিয়াছেন। রাগ করিলে দাদা অধিক কথা বলিতেন না, আজও বলিলেন না। দুই চারি কথার পর শেষে বলিলেন, "পরীক্ষা দিয়া যতদিন পাস না হইতে পার, ততদিন আমার সম্মুখে আসিও না।"

প্রবেশিকাসাগর সন্তরণ দিয়া পার হওয়া আমার দুঃসাধ্য। কি করিব ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটাইয়া শেষে শয়নগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম; তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সুষমা উবুড় হইয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া শুইয়া ছিল। আমি

ভাবিলাম, বোধ হয় তাহার জ্বর হইয়াছে, নতুবা সে এ অসময়ে শুইয়া থাকিবে কেন?

সুষমাকে ডাকিয়া বলিলাম, "সুষমা, ওঠ, তোমার জন্য কি এনেছি দেখ!" সুষমা উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ মুখ লাল হইয়াছে ও চোখের পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে, সম্ভবতঃ জ্বরটা খুব বেশীই হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির কি কৌতূহল! এত জ্বরেও সে কি আনিয়াছি তাহা দেখিবার জন্য উঠিয়া বসিল।

আমি পকেট হইতে একটি ভেল্‌ভেটের কৌটা বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম, তাহার মধ্যে দুটি কানের দুল ছিল। ছোট একটি সোনার পাখী একটি ফলের থোকা মুখে লইয়া উড়িতেছে; পাখীর পাখা ছোট ছোট চুনি দিয়া সাজানো, ফলগুলি মুক্তার। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি এই দুল দুইটি মনোনীত করিয়াছিলাম।

সুষমা দুল দেখিয়া সবেগে উঠিয়া বসিল ও আমার হাত হইতে বাক্সটি ছিনাইয়া লইয়া টেবিলের নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। দুল দুইটি স্থানচ্যুত হইয়া দূরে ঠিকরাইয়া পড়িল।

পরদিন বৌদিদিকে বলিলাম, "বৌদিদি, বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এখন আমার পরীক্ষার সময়, পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আনিয়ো।"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বৌ কাছে থাকলে পরীক্ষা দেওয়া যায় না, এ জ্ঞান তোমার কবে থেকে হ'ল? সুষমার সঙ্গে কাল বোধ হয় ঝগড়া হয়েছে, না?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "ছি বৌদিদি, এ সব গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা ভাল নয়।"

বৌদিদি আর বিশেষ কিছু বলিলেন না, বোধ হয় সুষমার নিকট ব্যাপার জানিতে গেলেন। বৌদিদি সম্ভবতঃ দাদাকে এ কথা বলিয়া থাকিবেন, কারণ তাঁহাকে কিছু প্রসন্ন দেখিলাম। কিন্তু সুষমার বাপের বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া পিসিমার অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হইল।

মন অত্যন্ত উদাসীন হইয়া উঠিল, বাজারে গিয়া একখানি 'বেদান্তদর্শন' কিনিয়া আনিলাম।

সুষমার বাপের বাড়ী যাওয়াই স্থির হইল। আমি ঘরে বসিয়া ছিলাম, বৌদিদি সুষমাকে সেখানে রাখিয়া গেলেন; দেখিলাম সুষমা কাঁদিতেছে।

সুষমাকে বলিলাম, "সুষমা, আমি যদি মরে যাই, তুমি কি আমাকে মনে রাখবে?" সুষমা কোন উত্তর দিল না, চোখের জলটা আরো বেশী বাড়িল দেখিলাম; কিন্তু আমার উপায় কি?

ভাবিলাম সংসার মায়াময়, এ মায়ার বন্ধন হইতে যাহাতে শীঘ্র মুক্তি পাইতে পারি তাহাই করিতে হইবে।

সুষমা গিয়া বৌদিদিকে প্রণাম করিল, বৌদিদি তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বৌদিদির চোখেও জল পড়িতেছে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

বারান্দায় বসিয়া পিসিমা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছিলেন, "পুজো সম্মুখে; এমন সময়ে কে কোথায় ঘরের বৌ পাঠায়? নরুর মা যদি বেঁচে থাকত, তা হ'লে কি এমন দিনে বৌ পাঠাতে দিত? আমি কে যে আমার কথা ওরা শুনবে?"

গাড়ী চলিয়া গেল, জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তারপর শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। তখনও ঘরখানি কি এক সৌরভে পরিপূর্ণ। সে কি সুষমার অঙ্গ-সৌরভ, না, তাহারই স্মৃতি, সৌরভের মত আমার চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "মায়া! সমস্তই মায়া!" তাহার পর টেবিলের উপর হইতে 'বেদান্তদর্শন'খানি আনিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

আমার ধর্মভাব যে পূর্ব হইতেই একটু প্রবল ছিল, দীর্ঘ কেশরাশিই তাহার প্রমাণ। কিছুদিন ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সুপ্ত ধর্মবৃত্তি আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল।

বৌদিদিকে বলিলাম, "আমি আর মাছ খাইব না।"

বৌদিদি বলিলেন, "পরীক্ষায় পাস দিতে হলে বুঝি মাছও ছাড়তে হয়!"

আমাদের একটি প্রকাণ্ড ছাত্রসমাজ ছিল, সভ্যসংখ্যা সতেরো জন। সভার সভাপতি আমি স্বয়ং। সভায় প্রস্তাব করিলাম, "প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া হিমাচলে গিয়া ভগবানের ধ্যান করা অনেক ভাল। কেন না, পরীক্ষা দিয়া অসার উপাধিলাভে বাহিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করা হয় মাত্র; তদপেক্ষা, যাহা একমাত্র সার সেই ভগবানের চরণ লাভের উপায় চিন্তা করাই সর্বাগ্রে উচিত।"

আমার এই সাধু প্রস্তাবে চৌদ্দটি সভ্য সম্মতি প্রকাশ করিলেন, আর তিন জন যদিও এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না; কিন্তু এ সমস্ত কথা গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

জলখাবারের পয়সা জমাইয়া ক্রমশঃ চৌদ্দখানি কম্বল সংগ্রহ করা হইল, এবং চৌদ্দটি ত্রিশূলের জন্য কামারবাড়ী বায়না দেওয়া গেল। চুল ছাঁটা বন্ধ করিলাম, কাজেই চুল ক্রমে লম্বা হইতে লাগিল। এইরূপে সন্ন্যাসের পূর্বসূচনা আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলিকে ডেস্কের মধ্যে বিশ্রাম করিতে দিয়া 'বেদান্ত-দর্শন' ও 'গীতা' পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

আমাদের সন্ন্যাস-সভাটি ধীরে ধীরে উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ত্রিশূল প্রস্তুত হইয়া আসিল, গৈরিক বস্ত্রও সংগৃহীত হইল। চৌদ্দখানি ত্রিশূল যখন সূর্যকিরণে ঝক্‌ঝক্‌ করিতে লাগিল, আমাদের উৎসাহও সেই সঙ্গে ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর ব্রহ্ম-অন্বেষণে গমনের জন্য মন ততই উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল। কোনক্রমে এখন এই পথটা অতিক্রম করিয়া হিমালয়ে গিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেই হয়। অবশেষে একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিলাম। যাইবার পূর্বে ডেস্কের উপর একখানি কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল,—

"কোথায় সে জন, জানে কোন জন,
যে জন সৃজন লয় করে—
তাঁহারই উদ্দেশে চলিলাম।"

যখন আমরা চৌদ্দজন তরুণ সন্ন্যাসী নিশীথের অন্ধকারে জঙ্গলের পথ ধরিলাম, সে-সময়টার কথা একবার ভাবিয়া দেখ। সেই নীরব রাত্রি, সেই নীরব পৃথিবী, সেই নীরব আকাশে নক্ষত্ররা নীরবে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সমস্তই আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ। মনে হইতেছিল যেন দেবতারা তারার আলোকে আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে গিয়া কেবলই পথ হারাইতে লাগিলাম। ধরা পড়িবার ভয়ে সোজা পথ ছাড়িয়া জঙ্গলের পথ ধরিয়াছিলাম, ইচ্ছা ছিল জঙ্গলপথে চলিয়া ক্রমশঃ নেপালের দিকে অগ্রসর হইব। কিন্তু জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের ভয় ও অনাহারে মৃত্যুর ভয় আসিয়া আমাদের চিত্তকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ধর্মপথে বিঘ্ন অনেক, তাহা না হইলে যে গৃহকারাগার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত অসীম অরণ্যে ঘুরিতেছি, ব্রহ্মচিন্তার পরিবর্তে সেই গৃহকারাকূপের চিন্তা সর্বদাই মনে উদয় হয় কেন? বুঝিলাম, মায়ার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড় সহজ নহে। আবার, কয়েকদিন বনভ্রমণের পর পায়ে এত ব্যথা হইল যে, বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। অগত্যা তখন স্টীমারপথে চলাই উচিত মনে হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, টিকিট ক্রয় করিবার জন্য কম্বল কয়খানি বিক্রয় করিতে হইল।

স্টীমারে আসিয়াও বিপদ অল্প নহে। যাত্রিগণ হাঁ করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বোধ হয় তাহারা আমাদের সেই ভস্মাবৃত তেজঃপুঞ্জ কলেবরে কোন অসাধারণ দীপ্তি দেখিতে পাইয়াছিল; নহিলে অমন করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে কেন? দুই একটা সাহেব যেন আমাদের দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতে লাগিল; আমার আশঙ্কা হইল, হয়তো তাহারা আমাদের রাজনৈতিক সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিতেছে। এই জন্য, আমাদের পলায়ন সম্বন্ধে খবরের কাগজে কোন বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে কিনা দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও খবরের কাগজ পড়িবার সাহস হইল না।

রাজঘাটে স্টীমার থামিল। দেখিলাম, জন কতক লোক স্টীমারে উঠিলেন, সারেংএর সঙ্গে তাঁহাদের কি কি কথা হইল। আমি রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সারেং হাত বাড়াইয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিল। লোকগুলি উপরে উঠিয়া আসিলেন।

আমাদের কাছে আসিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের নাম বলিতে বোধ হয় কোন আপত্তি নাই?"

আমি উত্তর করিলাম, "সন্ন্যাসীর পরিচয়ে প্রয়োজন কি?"

"সম্ভবতঃ আপনারা মুঙ্গের থেকে আসছেন?"

"হইলেও হইতে পারে।"

তখন তিনি আমার সম্মুখে একখানি কাগজ ধরিলেন,—সেটি দাদার টেলিগ্রাম।

অবশেষে কিনা বিশ্বাসঘাতক উমেশ আমাদের ধরাইয়া দিল! হায়, কোথায় গেল এতদিনের সন্ন্যাসের সাধ? আবার কিনা গৃহপিঞ্জরে আসিয়া প্রবেশ করিতে হইল! ধরণীকে মনে মনে বলিলাম, "তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি, তাহা হইলে আর আমাকে দাদার নিকট মুখ দেখাইতে হইবে না।" কিন্তু পৃথিবী আমার মিনতি শুনিলেন না; কলেরার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সেও আমার প্রতি নির্দয় হইল; বিষ কিংবা ছুরিরও কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না; অগত্যা সুস্থ শরীরে আবার সেই চিরপরিচিত বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী হইতে নামিলাম। পিসিমা "ওরে বাপ নরু রে! এমন ক'রে কি প্রাণবধ ক'রে যেতে হয় রে!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

দাদা একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "এখন একটু কান্নাকাটি থামাও। খেয়েদেয়ে হতভাগাটা আগে ঠাণ্ডা হোক, তার পর যত পার কেঁদো।"

যাহা হউক, অনেক দিনের পর বৌদিদির হাতের রান্না খাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল।

আহারান্তে বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে কি?"

"যাও, যাও বৌদি! তোমরা ও-সব কথা কি জানবে?"

"তা জানি আর নাই জানি, কিন্তু চেহারাখানি তো বেশ সন্ন্যাসীর মতই করেছ দেখছি! পা দুখানিরই বা বাহার বেরিয়েছে কি?"

বৌদিদির এই কথা শুনিয়া মনে করুণরসের আবির্ভাব হইল; সকরুণভাবে পথের দুর্দশার কাহিনী বৌদিদির নিকট বর্ণনা করিলাম।

পর-বৎসর পরীক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। যেদিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সেদিন সেই ভেল্‌ভেটের বাক্সটি লইয়া গিয়া আবার আমি সুষমার হাতে দিলাম; বলিলাম, "সুষমা, এবারেও কি ফেলে দেবে?" সুষমা হাসিয়া দুল কানে পরিল, বলিল, "মা গো মা, কি মিথ্যে কথা! এর নাম বুঝি জিনিস? এ তো কানের দুল!"

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি হাস্যমুখী বৌদিদি আমার সম্মুখে।

বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো! সন্ন্যাসী হয়ে তো 'সে জনের' কোন সন্ধান পেলে না, এখন ঘরে ব'সে বোধ করি কিছু সন্ধান পেয়েছ!"

পিসিমা সেদিন অনেক ব্রাহ্মণ খাওয়াইলেন ও হরির লুট দিলেন।

সর্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, দাদা সেদিন আদর করিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছিলেন।

('কুন্তলীন পুরস্কার', ৮ম বর্ষ)

মধুপুরে

মধুপুরের সেই বাড়ীটার কথা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে।

এক কম্পাউণ্ডের ভিতর চারি-পাঁচখানা বাড়ী ছিল। তাহার ভিতর যে দুখানা খুব কাছাকাছি, তাহার একখানাতে তোমরা থাকিতে আর একখানাতে আমরা থাকিতাম। বাড়ীর সম্মুখেই ফুলের বাগান, সে বাগানে খুব বড় বড় গোলাপ ফুল ফুটিত। বাগানের ভিতর দিয়া একটা লাল কাঁকুরে রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া সদর দরজা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। তুমি আর আমি সেই বাগানে সমস্ত সকাল-বেলা সমস্ত দুপুরবেলা কত ছুটাছুটি করিতাম, কত খেলা করিতাম! কোন কোন দিন ফুল তুলিয়া তোমাকে সুন্দর করিয়া সাজাইতাম, সাজাইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দেখাইতাম; মা হাসিয়া বলিতেন, "ঠিক যেন পরিদের মেয়ে।" তখনকার তোমার সেই লজ্জাবিজড়িত সুন্দর মুখখানি যেন আমি এখনও চোখের উপর দেখিতে পাই। সেখানে সেই যে তিন মাস, সে তিন মাস কি আনন্দেই কাটিয়াছিল! কি আনন্দেই শীতকালের ছোট ছোট দিনগুলি ফুরাইয়া যাইত, সে কয়টি দিনের কথা আর এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমিও বোধ হয় কখনও ভুলিতে পারিবে না। তবুও গত কথা তুলিতে ভাল লাগে বলিয়া আর একবার সে দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম।

তাহার কতদিন পরে আবার সেই মধুপুর! বাড়ীর সম্মুখে যখন পাল্কী থামিল, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, এ যে সেই বাড়ী। সে বাড়ী কি আর ভুলিতে পারি? তখন মনে যে কি ভাব হইল তাহা তোমাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না। পাল্কী হইতে নামিয়া ধূলিপরিপূর্ণ বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে নিকটের সেই বাড়ীখানি (সেই তোমাদের বাড়ী) দেখিতে লাগিলাম। আমার তখন মনে হইতেছিল, বুঝি তোমরা এখনও ঐ বাড়ীতেই আছ। আমাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার স্বামী আমার কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "রেলগাড়ীর ঝাঁকুনিতে বুঝি তোমার মাথা ঘুরছে? একদিনে রেলগাড়ী চড়বার সাধ কিছু কমেছে কি? এখন খুকীকে ধর, ও ভারি কাঁদছে।" আমার মোহভঙ্গ হইয়া গেল। দেখিলাম, স্বামীর হাতে ক্যাশবাক্স, আর কোলে খুকী। দেখিয়া লজ্জিত হইয়া খুকীকে কোলে নিলাম।

এ যাত্রায় কেবল আমরা চারিজন আসিয়াছিলাম। আমি, আমার স্বামী, আমার দিদিশাশুড়ী, আর ঊষারাণী। ঊষারাণীকে পুরা একজন না ধরিলে সাড়ে তিনজন বলা যায়। দেশের চাকর বামুন কেহই আমাদের সঙ্গে আসে নাই; সে জন্য প্রথম দিনকতক খুব অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কলিকাতায় থাকিতেই খুকীর ঝি ব্যারাম হইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া ঊষা দুই-তিন দিনের ভিতরেই নূতন চাকরদের সঙ্গে এমন ভাব করিয়া লইল, যেন তাহারা কতদিনের চেনা। তাহা হইলে কি হয়, উনি তো নূতন চাকরের কাছে খুকীকে রাখিয়া

কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। দিনের ভিতর কতবার খুকীর খোঁজ লইতে আসিতেন, আমি এক-একদিন ভাবিতাম এই খোঁজ নেওয়ার সংখ্যাটা গুনিয়া খাতায় টুকিয়া রাখিব। তাঁহার এইরকম অতি সাবধানতার জন্য আমি কত যে আমোদ করিতাম, আবার মাঝে মাঝে বিরক্তও হইতাম। বলিতাম "তোমার সবই বাড়াবাড়ি", শুনিয়া তিনি কেবল হাসিতেন। খুকীর হাতে দুইগাছি বালা ছিল, সে বালা দুইগাছি যে কয়দিন হাতে ছিল সে কয়দিন তাঁহার তাড়নায় আমার আহার নিদ্রা রহিত হইয়া আসিয়াছিল। সুন্দর গোল গোল হাতে বালা দুইগাছি এমন মানাইত, কিন্তু হইলে কি হয়? খুলিয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া তবে প্রাণ বাঁচিল।

মধুপুরে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইলেও শেষকালে বেশ ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। দিদিমার যে কেমন সুচীবাই তাহা তো তুমি জানই। তিনি আমাদের এদিকে বড় একটা আসিতেন না। মালা হাতে লইয়া তাঁহার কোণের ঘরটিতেই সদা সর্বদা থাকিতেন। একজন বামুন ছিল, সে কেবল দিদিমার রাঁধিবার জল তুলিয়া দিত; আমি তাহাকে রাঁধিতে দিতাম না, নিজেই রাঁধিতাম। কে সেই ময়লা কাপড় পরা ভূতের মত নোংরা হিন্দুস্থানী বামুনের হাতের রান্না খাইবে? তা ছাড়া আমার স্বামী নিজে যে কাজের লোক, কাজ ভিন্ন এক মুহূর্তও থাকিতে ভালবাসিতেন না, আমি শুধু আলসেমি করিয়া কোন্ লজ্জায় দিন কাটাইব! তিনি এক-একদিন বলিতেন, "খুকীকে নিয়ে তোমার রাঁধতে কষ্ট হয়, কাজ কি? এখানে তো রাঁধতে আস নি, বেড়াতেই এসেছ, যদি রান্নাঘরেই দিন কাটাবে তবে বেড়াবে কখন?" আমি বলিতাম, "আমার মাঠে হাওয়া খাওয়ার চেয়ে রান্নাঘরে ধোঁয়া খাওয়াই ভাল লাগে। কলকাতায় গিয়ে তো আর এমন ক'রে রাঁধতে পাব না!" তিনি আমার কথা শুনিয়া যে খুব প্রফুল্ল হইতেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতাম। তিনি খাইতে খাইতে বলিতেন, "এ তরকারিটা এমন সুন্দর হয়েছে।" "এ মোচার ঘণ্ট তো জন্মেও ভুলতে পারব না।" "তুমি এমন রাঁধতে শিখলে কোথায় বল দেখি!" ইত্যাদি। তাঁহার সে সমস্ত কথা শুনিয়া আমার যে কি আনন্দ হইত, তাহা প্রকাশ করা যায় না। লজ্জায় ও আনন্দে আমার মন অভিভূত করিয়া তুলিত; মনে মনে ভাবিতাম, এই আনন্দের স্বাদ পাইয়াই সেকালে মেয়েরা অক্লান্তভাবে অত বড় বড় যজ্ঞের রান্নাও রাঁধিতে পারিতেন, কিন্তু এখন আমরা নিজের দোষেই সে সৌভাগ্য হারাইতে বসিয়াছি।

তোমরা যে বাড়ীতে ছিলে, সেই বাড়ীতে একজন ভাড়াটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধ কর্তা এবং বৃদ্ধা গৃহিণী, তাঁহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ, আর একটি নাতি, এই তাঁহাদের পরিবার। বৌটির বয়স চৌদ্দ-পনের বৎসরের বেশী হইবে না, কিন্তু তারই কোলে একটি দেড় বছরের ছেলে। কর্তা পঁচিশটি টাকা পেন্‌শন্ পান, ছেলে কোন সওদাগরী অফিসে কাজ করেন, তাঁহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়। কিন্তু ছেলের অসুখ, কাজেই তাঁহারা ঋণ করিয়াও মধুপুরে বায়ু-পরিবর্তন করিতে আসিয়াছেন। আমি এক-একদিন দুপুরবেলায় তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম। বৌটি তো আমাকে দেখিয়া এক গলা ঘোমটা টানিয়া দিত, অগত্যা গিন্নির সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হইল। গিন্নি

ভারি সাদাসিদে ও ভালমানুষ, আমার কাছে বসিয়া তিনি সংসারের অনেক সুখ-দুঃখের গল্প করিতেন। কিছুদিন পূর্বে গিন্নির কন্যার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার কথা বলিয়া সময় সময় অনেক কাঁদিতেন, আর আমাকে বলিতেন, "মা, তোমাকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন অনুপমাকেই ফিরে পেয়েছি।" গিন্নি বেশ হাসিখুসী ভালবাসিতেন আর আমুদে-স্বভাবের লোক ছিলেন, কিন্তু যে দিন ছেলের জ্বর বেশী হইত সেই দিন তাঁহার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া যাইত। সর্বদাই আমার নিকট বলিতেন, "মা, অনুকে হারিয়ে আমি অতুলের মুখ দেখে সংসারে আছি। কি যে বাছাকে ম্যালেরিয়ায় ধরলে, ভগবানের মনে কি আছে মা, কিছু জানি নে।" সুখের বিষয়, মধুপুরে আসিয়া দিন দিনই অতুলবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছিল।

আমাদের প্রতিবেশীরা আসিয়া অবধি ঊষার তো বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধই রহিল না। অতুলবাবুর ছেলেটি যদিও ঊষার চেয়ে কেবল ছয় মাসের ছোট, তবু সে যেন ঊষার একটি খেলিবার পুতুল হইল। ছেলেটি ভারি শান্ত, ঊষা তাহাকে লইয়া বিড়ালছানাটির মত টানাটানি করিত, তবু সে ঊষাকে ভালবাসিত। ঊষা তাহার কোল হইতে চলিয়া আসিলেই সে কাঁদিতে আরম্ভ করিত। আমার স্বামী, খুকী যে সর্বদাই ও বাড়ীতে থাকে তাহা জানিতেন, তবু মাঝে মাঝে আসিয়া বলিতেন, "ঊষা কোথায়?" না হয় তো বলিতেন "সমস্ত দিনই কি ও-বাড়ী থাকবে, নিয়ে এস তাকে।" তবে মধুপুরে আসিয়াই তাঁহার মনোনীত কাজ জুটিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য বাড়ী থাকিতে তত সময় পাইতেন না। ঢেঁকী যেমন স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে, তিনি তেমনি মধুপুরে আসিয়াও নাড়িটেপা ভুলিতে পারেন নাই। সকাল হইতে কেবল লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন, কে কেমন আছে, কাহাকে কি ঔষধ দিতে হইবে ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মধুপুরে রোগীরও অভাব ছিল না, আর ডাক্তারেরও তেমন সুবিধা নাই, বিশেষ অমন বিনা ভিজিটের ডাক্তার পাইলে আর কে ছাড়িয়া দেয়? কোন কোন দিন যদি কাহারও বেশী অসুখ হইত সেদিন রাত্রেও বাড়ী আসিতে পারিতেন না, সারারাত্র সেইখানেই কাটাইয়া দিতেন। আর বাড়ী আসিলেই আমাকে যাহা বলিবেন তাহা আমার আগে থাকিতেই জানা থাকিত—"অমুকের জন্য একটু পলতার ঝোল ক'রে পাঠিয়ে দাও, বেচারী একলা অসুখ নিয়ে বিদেশে প'ড়ে আছে, দেখবার লোক কেউ নেই।" "অমুকের জন্য একটু সাগু ক'রে দাও" ইত্যাদি। তা ছাড়া আবার স্বদেশীচর্চাও ছিল। যে দিন যাহার বাড়ীতে গিয়া স্বদেশীপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইত, সে দিন বেলা দুটা হইয়া গেলেও তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেই পড়িত না, ঘরে ভাত শুকাইতে থাকিত, দিদিমা তো রাগিয়া খুন হইতেন।

রাখীবন্ধনের আগের দিন আমার সমস্ত দিনটা নানা কাজে কাটিয়া গেল। আমার চরখাটা সঙ্গেই আনিয়াছিলাম, চরখার সুতা হলুদ দিয়া ছোপাইয়া অনেক রাখী তৈয়ার করিলাম, রেশমী সৌখীন রাখী আর অত কোথায় পাব বল! সে দিন ওঁর বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল, তাহার পর কথায় বার্তায় আরও অনেক রাত্রি হইয়া গেল। শেষে এমন হইল যে, ঘুম আর কিছুতেই আসে না। শেষ-রাত্রে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম কিছুই জানিতে পারি নাই।

তুমি স্বপ্ন বিশ্বাস কর না, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। অনেক সময় দেখিয়াছি আমার স্বপ্ন এমন ঠিক ঠিক ফলিয়া গিয়াছে যে, তুমি শুনিলে আশ্চর্য হইবে। সেদিন শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি যে, তোমাকে আর কি লিখিব—আমার এত চোখে জল আসিতেছে যে, কলম ধরিতে পারিতেছি না। স্বপ্নে দেখিতেছি, ঊষারাণী যেন হাতে একগোছা রাখী লইয়া দুইখানি সোনার পাখা বাহির করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। তখন যেন সূর্য সবেমাত্র উদয় হইয়াছে, তাহার সোনার আলো খুকীর মুখের উপর পড়িয়াছে। সেই আলোতে ঊষাকে এত সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাইতেছে যে ঊষাকে আর আমার ঊষা বলিয়া মনে করিতে সাহস হইতেছে না। আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিব তাহাই ভাবিতেছি। খুকী যেন আমার দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে আধ আধ স্বরে বলিল, "মা, রাখী বাঁধতে যাচ্ছি।" অমনি কোথা হইতে আমার কানে একটা গম্ভীর স্বর আসিল, "পৃথিবীর সহিত স্বর্গের রাখীবন্ধন!" তখনই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, ঊষা আমার কোলের কাছেই শুইয়া আছে।

সকালে উঠিয়া স্বপ্নের কথা কিছুই মনে ছিল না। যখন বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম তখন খুব ভোর, কুয়াশার ভিতর হইতে সূর্য কেবল উদিত হইবার উপক্রম করিতেছেন। আমার মনে হইতেছিল যে, আমাদের দেশের অবস্থাও এখন এইরূপ, কিন্তু ক্রমে সূর্য যখন সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে তখন দেশ যে কি গৌরবের দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া উঠিবে,—মনে মনে কল্পনা করিয়া আমার সমস্ত মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একবার সম্মুখে প্রসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত গুল্ম-লতা-শালতরু-আচ্ছাদিত মাঠের দিকে চাহিয়া মাতৃভূমির শস্যশ্যামলা মূর্তি মনে মনে ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম, আর ধরিত্রীকে "মা" বলিয়া প্রাণের কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলাম। মনে মনে তাঁহাকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া একান্ত ভক্তির সহিত প্রণাম করিলাম।

তুমি বোধ হয় আমার এ ছাইভস্ম পাগলামি পড়িয়া হাসিতেছ। ছয় মাসের পর তোমার সঙ্গে এই সম্ভাষণ! এই ছয় মাসে কতদিন কত কথা তোমাকে বলিব বলিয়া মনে মনে গুছাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সেই জানালার কাছে বসিয়া তেমনি করিয়া গল্প করিবার সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না। আমার অভ্যাস তুমি জানই, পত্র লিখিতে আমার এত আলস্য যে দুই মাস ছয় মাস কলম ধরাই হয় না, কিন্তু একবার কলম হাতে ধরিলে সে কলম আর থামিতে চায় না। আমি তোমাকে যখন যে দিনের কথা লিখিতেছি, তখন সেই দিনের চিত্রটি আমার মনের ভিতর এমন উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে যেন আজই এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে। বারান্দার এ পাশে আসিয়া দেখি, উনি ঊষাকে লইয়া বাহিরে আসিতেছেন। ঊষার ছোট হাতে একগাছি রাখী বাঁধিয়া দিয়াছেন; আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এস, এস, একটি ছোট্ট স্বদেশী মানুষ দেখে যাও।" দিদিমাও সেই সময় ঘর হইতে বাহির হইলেন। তখনও দিদিমার স্নান হয় নাই, কাজেই সে সময় আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে তাঁহার কোন ভয়ের কারণ ছিল না। দিদিমাকে দেখিয়া ঊষা ছুটিয়া তাঁহার কাছে

গেল। দিদিমা তাহাকে কোলে করিয়াই বলিলেন, "এ কি, খুকীর যে গা গরম হয়েছে!" দিদিমা এ সমস্ত এত ভাল বুঝিতে পারিতেন যে, ডাক্তার-কবিরাজেরাও তাঁহার নিকট হার মানিত। "গা গরম হয়েছে" শুনিয়া উনি আসিয়া ঊষার হাত দেখিয়া বলিলেন, "তাই তো, জ্বরই তো হয়েছে।" সেই সময় আমাদের বাড়ীতে একটি কুষ্ঠরোগী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। সে বোধ হয় ডাকাডাকি করিয়াছিল, কেহ শুনিতে পায় নাই, তাই সে আস্তে আস্তে ফটক পার হইয়া ফুলবাগানের ভিতর আসিয়া তাহার ভাংগা ভাংগা করুণ স্বরে সবে মাত্র "এ মাইজী" বলিয়া সুর ধরিয়াছে, আর উনি এমন রাগিয়া ও চিৎকার করিয়া, "যাও, যাও, আবি বাহার যাও" বলিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন যে, আমি একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমি উঁহাকে এত রাগ করিতে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তারী বুদ্ধির সাবধানতার জন্য কুষ্ঠরোগী বাড়ীর ভিতর আসিলে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু তাহাদের উপর খুব মায়াও ছিল। আমার মনটা বড়ই ম্লান হইয়া গেল। আজিকার দিনে,—যে দিন 'ভাই ভাই' বলিয়া সকলকে মিলনবন্ধনে বাঁধিব সেই দিনে, এমন সুন্দর প্রভাতে ও বেচারীকে অমন করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া আমার কিছুতেই ভাল লাগিল না। কেন, ও কি আমাদের ভাই নয়? আমি একটু ভয়ে ভয়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। তখন আস্তে আস্তে বলিলাম, "ওকে দুটী চাল দিয়ে আসুক, বেচারী!" এইটুকু বলিতেই দিদিমা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, চাল দিয়ে আসুক। তোমাদের যেমন হয়েছে, কিছুই মান্‌বিচ নেই। সকাল বেলায়,—বাসী কাপড়ে, না নাওয়া, না ধোওয়া—এখুনি ভিক্ষে দিয়ে আসুক। মা লক্ষ্মী এত অনাচার সইতে পারেন না। আর মেয়েটার জ্বর হয়েছে সেদিকে একটু নজর নেই। বাড়ীতে অসুখ হ'লে কি ভিক্ষে দিতে আছে?" আমি চুপি চুপি ঘরের ভিতর গিয়া গুটিকতক পয়সা লইয়া আসিলাম। দিদিমার নজর সব দিকেই পড়ে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি এ সময় কথাবার্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া আমার চুরি ধরিতে পারিলেন না। তখন আস্তে আস্তে রান্নাঘরে আসিয়া পাঁড়েকে বলিলাম, "পাঁড়ে, সেই ভিখারীকে পয়সা দিয়ে এস তো।" কিন্তু সে ধমক খাইয়া তখনই চলিয়া গিয়াছে, পাঁড়ে আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

আমি ফিরিয়া আসিলে স্বামী বলিলেন, "ঊষাকে দেখ গিয়া, সে যেন আজ ঘরের বাহিরে না যায়।" বলিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। আবার একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বৈদ্যনাথে কি ডাক্তার আনতে লোক পাঠাব?" সিধু আমাদের ঘর শূন্য করিয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে ঊষার একটু কিছু অসুখ হইলেই উনি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আমি বলিলাম, "কেবল একটু গা গরম হয়েছে, সে জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? নিজেই তো একটু ওষুধ দিতে পার।" আমার কথায় তিনি কোন উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া তিনি আমার কথা শুনিতে পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না।

সেদিন বাড়ীতে রন্ধনের ব্যাপার ছিল না, সেজন্য সকলেরই এক রকম ছুটি।

আমি ঘরের ভিতর বসিয়া ঊষার সঙ্গে খেলা করিয়া তাহাকে একটু খুশী করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে ঘুমাইয়া পড়িল দেখিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া তাহার মাথার নিকটে জানালার পাশে বসিয়া রহিলাম। পথ দিয়া একদল স্বদেশী-সংকীর্তন যাইতেছিল, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। দিদিমা অন্য দিন স্নানের পরে আর আমাদের ঘরে আসেন না, আজ পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া মালা হাতে করিয়া ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুকী কেমন আছে?" আমি খুকীর মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বর কিছু বাড়িয়াছে। অন্য লোকের বেলায় "বাড়াবাড়ি" বলি আর যাহাই বলি, আমার নিজের মনটাও অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, বৈদ্যনাথ হইতে ডাক্তার আনিতে বলিলেই ভাল হইত।

দিদিমা ঘরের মেঝেয় বসিলেন দেখিয়া আমিও খাট হইতে নামিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলাম, তিনি বলিলেন, "না, না, থাক তুমি, খুকীর কাছেই থাক।" তারপর দিদিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল-বেলার সেই কুষ্ঠরোগীকে কিছু ভিক্ষা দিয়াছিলে কি?" আমি বলিলাম, "না, সে চ'লে গিয়েছিল।" দিদিমা বলিলেন, "আজ আমি পূজার সময় ধ্যান করতে ব'সে যতই ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান ক'রে মনে মনে তাঁকে পঞ্চব্যঞ্জন অন্ন ভোগ দিতে চাই, কেবলই দেখতে পাই, কতকগুলি আতুর অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী সারি সারি পাত নিয়ে বসেছে, তাদের পাতেই আমি অন্ন দিচ্ছি। তখনই মনে হ'ল গুরুদেব বলেছিলেন, ভগবানের যদি সেবা করতে চাও তবে সর্বভূতের সেবা কর। সর্বভূতের ভিতর দিয়েই ভগবান তাঁর পূজা নেবেন।" বলিতে বলিতে দিদিমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, দিদিমার কথা-গুলি কেবলই মনের ভিতর ঘুরিতে লাগিল, আর ভাবিতেছিলাম, "ভগবান আমার দুয়ারে পূজা লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি"

বেলা অনেক হইয়া গেল, তখনও আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন না। তাঁহার চিরকালই এইরূপ অভ্যাস, যখন যে কাজে যান তখন তাহাতেই মাতিয়া যান, সে সময় আর অন্য কিছুই মনে থাকে না, বিশেষতঃ দেশের সম্বন্ধে কিছু হইলে তো কথাই নাই। এদিকে খুকীর জ্বর খুবই বাড়িয়াছে, তাহার চোখ দুইটি ভয়ানক লাল হইয়াছে, আর একেবারে অজ্ঞান হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। আমার মন অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিল। পাঁড়েজী, রামশরণ এবং দাই সকলকেই তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য ক্রমে ক্রমে পাঠাইলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাড়ী আসিলেন। প্রথমে ঊষা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার জন্য খাবার লইয়া আসিলাম, কিন্তু তিনি ততক্ষণে খুকীর কাছে চলিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় হইতে ঊষা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল, কোন মতে বিছানায় থাকিতে চাহে না। জ্বরের উত্তাপে তাহার মুখখানি সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যে কি অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা

যায়। আমি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার কি আনিতে পাঠাইয়াছ?" তিনি কেবল বলিলেন, "হ্যাঁ।" তাহার পর এক মনে খুকীর মাথায় বরফ দিতে লাগিলেন। আর একবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখানকার ডাক্তার শিমুলতলাতে গিয়াছেন, বৈদ্যনাথে ডাক্তারের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি।"

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, ডাক্তার তখনও আসিয়া পৌঁছিলেন না। ঊষা সেইরূপে ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, দিদিমা ঘরের এক পাশে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, আর পাঁচ মিনিট অন্তর এক একবার উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জ্বর কি একটু কমল?" আমার মনে হইতেছিল, যেন অন্ধকার রাত্রে একাকী অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছি। এক একবার ভাবিতেছিলাম, "কেন মধুপুরে এলাম?" এই সময় বাহির হইতে "বাবু! বাবু!" আহ্বান শুনিয়া "ডাক্তার আসিয়াছেন?" বলিয়া উনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিলেন। দুয়ার খুলিতেই দেখিলাম, আমাদের পাশের বাড়ীর গিন্নি আসিয়াছেন। তিনি আমার স্বামীকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা, একবার শীঘ্র এস, বুঝি বিদেশে আমাদের সর্বনাশ হয়। অতুল দুবার ভেদ হ'য়ে কেমন হ'য়ে পড়েছে!" গিন্নি আমার স্বামীর সম্মুখে বাহির হইতেন না, কিন্তু আজ বিপদের দিনে আর তাঁহার লজ্জা নাই।

আমার স্বামী খাটের নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার মুখের দিকে চাহিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যাই?" আমি মনের সমস্ত বল একত্র করিয়া বলিলাম, "যাও।"

সে যে কি ভয়ানক রাত্রি, তাহা আমি নিজেই মনে মনে ধারণা করিতে পারি না, অন্যকে কেমন করিয়া বুঝাইব? ঘর নিস্তব্ধ, এক পার্শ্বে বসিয়া দিদিমা মালা হাতে ঢুলিতেছেন, দাই দুয়ারের নিকটে দেয়াল ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে, আর কেবল ঘড়ির 'টিক্‌ টিক্‌' শব্দ সেই নিস্তব্ধতাকে দ্বিগুণ নিস্তব্ধ করিয়া তুলিতেছে। ঊষা একটু শান্ত হইয়াছে, তাহার গায়ের উত্তাপও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমি ভাবিলাম, জ্বর কমিয়া আসিতেছে, তাহাতেই সে একটু আরাম পাইয়াছে। ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দ শুনিতে শুনিতে আমি কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। খুব অল্পক্ষণ,—পনের মিনিট সময়ের অধিক ঘুমাই নাই, ঊষার গায়ের উপরেই আমার হাত ছিল, জাগিয়াই দেখিলাম গা অতিশয় ঠাণ্ডা, বরফের মত ঠাণ্ডা! ওঃ! মা হইয়া যে আমি কি করিয়া লিখিতেছি, জানি না।

দুয়ারে ধাক্কা পড়াতে দাই উঠিয়া তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দিল। আমার স্বামী ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ডাক্তার আসিয়াছেন।" কিন্তু তখন আমার, কি যে হইয়াছে, কি যে হইতেছে, কি যে হইবে,—কিছুই অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল না, কেবল এই মাত্র মনে আছে যেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "অতুলবাবু কেমন আছেন?" আর "ভাল আছেন" এই উত্তরটি মাত্র শুনিয়াছিলাম।

পরদিন, সেই শয়নগৃহেই, সেই খাটের উপর শুইয়া ছিলাম, আজ আমার কোলের কাছে কেহই নাই। মাথার কাছে গোলাপ ফুলের গাছে কত গোলাপ ফুটিয়াছে, জানালার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। তাহারা যেন ঊষার সেই কচি-মুখের হাসি চুরি করিয়া স্বর্গের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। কাল,—ঊষা এমনি সকালবেলায় এই খাটের উপর বসিয়া পুতুল লইয়া খেলা করিয়াছিল। আজ আমার ঊষা কই? সেই হাসিমাখা, দুষ্টামিভরা বড় বড় চোখ, সেই গোলাপী গাল দুইখানি, সেই রাঙ্গা ঠোঁট, সেই ছোট কচি হাত দুইখানি,—কোথায় গেল? আর আমি সেই হাসিমাখা মুখ দেখিতে পাইব না, সে আর আমাকে "মা" বলিয়া ডাকিবে না—এ কি বিশ্বাস হয়?

স্মৃতি-চিহ্ন

দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে যখন কাত্যায়নীর শ্বশুর, দেবর, স্বামী ও পুত্রকন্যা সকলেই একে একে ভবসংসারের বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন এবং বিষয়-সম্পত্তিও সেই সঙ্গে পরহস্তগত হইয়া পড়িল, তখন একমাত্র শিশুপুত্র নরেশ ও পর-প্রত্যাশা ভিন্ন আর তাঁহার কোন সম্বল রহিল না। রঘুপুরের মিত্রবংশ চিরদিন বিদ্যা-গৌরবের জন্য বিখ্যাত; নরেশের পিতা ও পিতামহ উভয়েই দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সেই বংশের একমাত্র বংশধর নরেশ যে মূর্খ হইয়া থাকিবে, এ কথা মনে করিতেও কাত্যায়নীর কষ্ট বোধ হইত, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া তিনি কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না।

রঘুপুরের জমিদার চৌধুরী মহাশয়কে সকলে অতি সদাশয় বলিত, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একটু কোপনস্বভাব বলিয়াও তাঁহার একটা অখ্যাতি ছিল। কাত্যায়নী মনে করিলেন, চৌধুরী মহাশয়ের একটু কৃপাদৃষ্টি হইলেই নরেশ "মানুষ" হইতে পারে। কিন্তু জমিদার মহাশয় দশ-পনেরো বৎসর হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপাতে স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় গিয়া সপরিবারে বসবাস করিতেছিলেন; বৎসরের মধ্যে একবার পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিতেন। তাঁহার ভদ্রাসনে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত, তিন দিন গ্রামের কাহাকেও অভুক্ত থাকিতে হইত না। সেবার অষ্টমীর রাত্রে সন্ধিপূজা শেষ হইলে স্ত্রীলোকেরা যখন দেবী-প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন, ঠিক সেই সময়টিতে কাত্যায়নী জমিদার-গৃহিণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৌ, আজ মায়ের সম্মুখে আমাকে একটি ভিক্ষা দাও, তোমার অক্ষয় পুণ্য লাভ হবে।" জমিদার-পত্নী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কি ভিক্ষা ঠাকুরঝি?" কাত্যায়নী ছেলের হাত ধরিয়া তাহাকে তাঁহার কোলের কাছে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আমার নরুকে তোমার হাতে দিলাম, ছেলে যাতে মূর্খ না হয় তোমাকে তাই করতে হবে।" জমিদার-পত্নী দুঃখিনী বিধবার এই কাতর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না, তিনি স্বামীর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় নরেশকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কলিকাতায় গিয়া নরেশ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, কি কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই, তবে এ কথা সকলেই জানিল যে নরেশ যখন প্রবেশিকা-সাগর সন্তরণে পার হইয়া পুরস্কারস্বরূপ দশ টাকা বৃত্তি লাভ করিল তখন রায়গঞ্জের রমানাথ বসু স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাহাকে তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যাদানে সমুৎসুক হইলেন; নরেশকে দেখিয়া তাঁহার এতই মনে ধরিয়াছিল যে, গরীবের ঘর বলিয়া অধিকাংশ আত্মীয় আপত্তি করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

'রায়গঞ্জের রমানাথ বসু' এই নামটা সে অঞ্চলে কে না জানিত? বসুজা মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ, কিন্তু তাঁহার পিতৃনামে মধ্যম পঞ্চ-সন্তানের মধ্যে

হেমাঙ্গিনী তাঁহার একমাত্র কন্যা ও শৈশবে মাতৃহীনা বলিয়া অত্যন্ত আদরণীয়া। তিনি সর্বদা বলিতেন, "মা আমার যেমন লক্ষ্মী, তেমনি আমি নারায়ণ এনে জামাই করব।" এই জন্য, নরেশচন্দ্র তাঁহার মনোনীত হইলে তিনি আর কাহারো কথা না শুনিয়া তাহাকে কন্যা হেমাঙ্গিনীকে সম্প্রদান করিলেন। কেহ কথাপ্রসঙ্গে নরেশের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন, "যে মানুষ হয়, সে কি তার স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতে পারে না? আমি মানুষ চাই, ধন-সম্পত্তি থাক্ না থাক্, তা দেখতে চাই না।"

নরেশের শ্যালকেরা কিন্তু বুঝিলেন, পিতা মুখে যাহাই বলুন না কেন, কার্যতঃ তাহাদের সম্পত্তির অংশ নিশ্চয়ই হেমকে উইল করিয়া দিয়া যাইবেন। ভাই বিষয়ের ভাগ পায় এ ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে একরকম সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু বোন বিষয়ের ভাগ পাইলে তাহা সহজে সহ্য হয় না। বসু মহাশয় বুদ্ধিমান হইয়াও বুঝিতে পারিলেন না যে, এই বিবাহের ফলে হেম তাহার ভ্রাতাদের বিদ্বেষের পাত্রী হইয়া দাঁড়াইল।

বিবাহের পর গোলমাল চুকিয়া গেলে নরেশ আবার কলিকাতায় গিয়া চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে পূর্বের মত থাকিয়া পড়াশুনা করিবে, মাতা-পুত্রে ইহাই স্থির করিলেন। দশ টাকা বৃত্তিতে পড়িবার খরচ চলিবে না, বিশেষ এতদিন চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়া আজ বড়মানুষের জামাই হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়াটা কোনমতেই সঙ্গত নহে। কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে শ্বশুরের সহিত দেখা করিতে গেলে বসু মহাশয় জানিতে চাহিলেন যে, সে এখন কোথায় থাকিয়া পড়াশুনা করিবে। নরেশ যাহা ঠিক করিয়াছিল তাহা জানাইলে তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, ওখানে যদি তোমার পড়াশুনার অসুবিধা হয়, তবে এবার পৃথক বাসা ক'রেই পড় না কেন, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয় সে ভার না হয় আমার উপর থাকবে।" বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন তিনি নরেশের পড়িবার খরচ দিবেন। নরেশ সবিনয়ে তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "সেখানে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় না।" রমানাথবাবু মুগ্ধ হইলেন। তিনি যে আদর্শ খুঁজিয়া আসিয়াছেন, নিজের ছেলের নিকট যাহা পান নাই, আজ পরের ছেলের নিকট তাহা পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। এই তরুণ সৌম্যমূর্তি বালকটির অন্তরের প্রকৃত পরিচয় যেন সেই সবিনয় আপত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইল। তিনি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "তাই ভাল বাবা, সেইখানেই তুমি থাক, আমি না বুঝে অন্যত্র থাকতে বলেছিলাম। তাঁরা তোমাকে এতদিন প্রতিপালন করেছেন—যে ভাবেই করুন, তবুও তাঁদের ঋণ তুমি কখনও শোধ দিতে পারবে না, আর আমিও তাঁদের কাছে চিরঋণী যে, তাঁদের দয়াতেই তোমাকে পেয়েছি।"

নরেশ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার সম্বন্ধে বাড়ীর আর সকলেরই কিছু না কিছু ভাব ও ব্যবহারের পরিবর্তন হইয়াছে, কেবল পরিবর্তন হয় নাই কমলের। কমল, চৌধুরী মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা, তাহার বয়স দশ বৎসর।

নরেশ বাড়ীর ভিতর যাইবামাত্র চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণী সস্নেহহাস্যে বলিলেন, "এই যে বড়মানুষের জামাই! কখন এলে?" নরেশ তাঁহার পদপ্রান্তে অবনত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "এই ভোরের গাড়ীতে।"

"থাক্ বাবা থাক্, প্রাতঃবাক্যে চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক। মা যেমন দুঃখ ক'রে মানুষ করেছে, সে দুঃখ তার সার্থক হোক। আর আমরাও বাবা, ফণী আর তোমাকে তো কখনও ভিন্ন ভাবিনি। তোমার মা যেদিন আমার হাতে স'পে দিলে, সেদিন থেকে পেটের ছেলের মতই যখন যা করা দরকার তাই ক'রে আসছি।"

গৃহিণীর এইরূপ বক্তৃতা আরও বহুক্ষণ চলিত, কিন্তু হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজাইতে বাজাইতে ও তালে তালে দ্রুত দুপ্ দুপ্ শব্দের পদধ্বনি করিতে করিতে কমল ছুটিয়া আসিয়া একেবারে নরেশের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "নরেশ দাদা, নরেশ দাদা, বিয়ে ক'রে এলে, তোমার বৌ কই? বৌ কি শেয়ালকে দিয়ে এসেছ নাকি? শেয়াল বলছে 'টোপরের বদলে বৌ পেলাম, টাকডুমাডুম ডুম'!"

এক মুহূর্তেই ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। ঘরের ভিতর যেন একটা সৌরভ-মিশ্রিত আনন্দের দমকা বাতাস বহিয়া গেল; গৃহিণী রাগ করিয়া বকিয়া উঠিলেন, "দেখ না মেয়ে যেন দিনে দিনে ধিঙ্গী হচ্ছেন!" কিন্তু তিনি যতই বকুন, তাঁহার সেই দুরন্ত মেয়েটিকে তিনি কোন মতে সামলাইতে পারিতেন না।

গৃহিণীর বকুনির অবসরে নরেশ চুপি চুপি কমলকে বলিল, "বৌ আছে রে, শেয়ালে নেয় নি; নিয়ে আসব এর পর, দেখিস।" কিন্তু বলিয়াই আবার ভয় হইল, কমল পাছে আবদার ধরিয়া বসে "এখনি নিয়ে এস।"

এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি কমলের সঙ্গে নরেশের গাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, কমল তখন চার বৎসরের। কমলের সঙ্গে বন্ধুত্বরক্ষা নিতান্ত সহজ নয়, তাহার যেমন সকলের সঙ্গেই অতি শীঘ্র বন্ধুত্ব হইত তেমনি একটুতেই তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিত। একমাত্র নরেশই কেবল ছয় বৎসর পর্যন্ত কমলের সকল আবদার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া সেই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্নভাবে বজায় রাখিয়াছিল। যথার্থ কথা বলিতে কি, এক হিসাবে কমলের জন্যই নরেশ এতদিন এ বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছে, নহিলে পরের ঝঞ্ঝাট এমন ভাবে দীর্ঘকাল ঘাড়ে রাখিতে গৃহিণী বোধ হয় স্বীকৃত হইতেন না।

যাহা হউক, কথাবার্তা শেষ হইলে নরেশ বলিল, "জ্যাঠাইমা, তবে বাজারের পয়সাটা দিন, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

গৃহিণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "থাক্ বাবা, তোমার আর বাজারে যেয়ে কাজ নেই, মাধবই যাবে। সকালবেলা তোমার পড়ার বড় ক্ষেতি হয়! তবে কি জান, চাকর-বাকরের বাজার করা, ওরা তো কেবল অর্ধেক চুরি করবে বই তো নয়, আর তুমি যেমন আপনার মনে বুঝে জিনিসপত্র আন—"

নরেশ তাঁহার কথা শেষ হইবার অবসর না দিয়া বলিল, "না, একবার বাজারে ঘুরে আসব তাতে পড়ার আর কি ক্ষতি হবে? বেলা হয়ে গেলে আর ভাল মাছ পাওয়া যাবে না জ্যাঠাইমা, আপনি আর দেরি করবেন না।"

"পড়ার ক্ষতি হবে"—গৃহিণীর মুখে এ কথা যে নরেশ প্রথম শুনিল তাহা

নহে, আগেও অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার সুর অন্য রকম ছিল। সন্ধ্যার সময় লণ্ঠন পরিষ্কার করা হয় নাই, অঙ্ক কষিতে কষিতে নরেশ সে কথা হয়তো ভুলিয়া গিয়াছে, যতক্ষণ আলো দেখা যায় নরেশ ছাদে বসিয়া ততক্ষণ একমনে অঙ্ক কষিয়াছে, কিন্তু যখন আর চোখে দেখা যায় না, তখনই নরেশের ছাঁৎ করিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে "ওঃ, আজ যে আলো সাজানো হয় নাই!" তাড়াতাড়ি অপরাধীর মত নীচে নামিয়া আসিয়া লণ্ঠনে হাত দিবামাত্র গৃহিণী তখনই বলিয়াছেন, "থাক্ থাক্, তোমার পড়ার ক্ষেতি হবে, আমিই লণ্ঠন সাজাচ্ছি। চাকররা পারে না, নষ্ট ক'রে ফেলে, তুমি পার তাই, নইলে কি আর সাধ ক'রে বলি? সন্ধ্যা উৎরে গেল, এখন এলেন আলো সাজাতে!"

হয়তো কোন দিন ছোট খোকা আবদার লইয়াছে, গৃহিণী রাগিয়া তার পিঠে ভাদ্র মাসের কিল বর্ষণ করিতেছেন, নরেশ খোকার কান্না শুনিয়া ছুটিয়া গেলেই বলিয়াছেন, "থাক্, থাক্, তুমি কেন আবার এসেছ? যাও, তোমার আর ছেলে ধরতে হবে না, তোমার পড়ার ক্ষেতি হবে।"

এটা গেল নরেশের জীবনের কেবল এক অংশের ইতিহাস, কিন্তু তাহার জীবনের আর একটি অংশ ছিল, যাহার ইতিহাস কেবল তাহার নিজের মনের মধ্যেই লেখা ছিল, অন্যের চক্ষে সে ইতিহাস কখনও পড়ে নাই। সে ইতিহাস কেবল স্বপ্নের ইতিহাস, অথবা জাগরণ ও স্বপ্নে মিশ্রিত এক অপূর্ব অনুভূতির ইতিহাস। অতি শৈশবে ছোটকাকা কোনদিন তাহাকে আদর করিয়া রাসের মেলা হইতে একটি লাটিম কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন, সে কথাটিও সে ইতিহাসের এক কোণে লিখিত আছে। যে টিয়া পাখীটা খাঁচায় থাকিয়া কেবল ক্যা ক্যা করিয়া চেঁচাইত, তাহার স্মৃতির সহিত মা দুপুরবেলায় বসিয়া তাহাকে ধারাপাত পড়াইতে পড়াইতে যে তাহার ছেঁড়া কাপড় শেলাই করিতেন সে কথার কোন বিশেষ মিল না থাকিলেও হয়তো টিয়ার কথার সঙ্গেই মার কাপড় সেলাইয়ের কথা একত্রে সংযুক্ত হইয়া মনে পড়িত, আবার হয়তো সেই সঙ্গে পদ্মবিলের ধারে যে একটা গাবগাছে মস্ত বড় মৌচাক হইয়াছিল, আর মৌচাক ভাঙিয়া লইবার পর মাছিরা যে আট দশ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত সেই শূন্য গাবগাছের ডালের চারি পাশে গুন গুন করিয়া ঘুরিয়াছিল, সে কথাও তাহার মনে পড়িয়া যাইত। বস্তুতঃ হয়তো এই সকল ইতিহাসের মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সংযোগ সূত্র ছিল, যাহাতে বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন স্মৃতিগুলি মাল্যের মত গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু কি সে সূত্র,—দিনে দিনে, পলে পলে, ঘটনার প্রতিকূলতা ও অনুকূলতার তরঙ্গে খণ্ডিত মানবজীবন যাহাকে আশ্রয় করিয়া অখণ্ড ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে? দার্শনিক বলেন, কবি বলেন, সে সূত্র ভালবাসা; আর অন্য কিছুতেই বহুকে এমন করিয়া এক করিতে পারে না। নরেশের সমস্ত বাল্য জীবনের স্মৃতিও একই সূত্রে গ্রথিত ছিল, সে সূত্র জননীর স্নেহ। আপনাকে বাদ দিয়া লোকে যেমন স্বপ্ন দেখিতে পারে না, সকল স্বপ্নের মধ্যে যেমন 'অহং'-এর অস্তিত্ব বর্তমান

থাকেই, নরেশের জীবনের সকল স্বপ্নের মধ্যে সেইরূপ মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জননীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার জীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর কূলপ্লাবিনী স্নেহের বন্যায় তাহার জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার সকল ব্যথা ভাসিয়া যাইত। লোকে দেখিত নরেশের বড় দুঃখ, কিন্তু নরেশ আপনার আনন্দে আপনি ভরপুর থাকিত।

হেমের সঙ্গে বিবাহের কথা উঠিলে কনে'র সম্বন্ধে প্রথমেই তাই তাহার মনে হইয়াছিল, "আহা, বেচারীর মা নাই!" বারো বছরের মেয়ে এখনকার দিনে যেমন চালাক-চতুর হইয়া উঠে, হেম তাহা হয় নাই। বেশভূষা করা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। হেমের দুই বৌদিদি স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন; যিনি বাড়ীতে থাকিতেন তিনি চুলের পারিপাট্য, নভেল, পশমের শিল্প ও দিবানিদ্রা লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, নিজের সন্তানদেরই খোঁজ লইবার অবকাশ পাইতেন না, ননদের খোঁজ লওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু অযত্ন-মলিনা হেমকে যেন আরও সুন্দর দেখাইত,—অন্ততঃ নরেশের তাহাই মনে হইয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় চকিত নেত্রে হেমের মুখখানি দেখিয়া নরেশ ভাবিয়াছিল, "এ যেন ঠিক র‍্যাফেলের আঁকা একখানি ম্যাডোনার ছবি।" কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন সে হেমকে দেখিল, তখন তাহার মনে হইল, "ছবিতে কখনও এত সৌন্দর্য ও এত কোমলতা প্রস্ফুটিত হতে পারে না।"

নরেশের বিবাহের পর অনেকে বলিয়াছিলেন, "ছোকরা বেশ পড়াশুনা করছিল, কিন্তু বিয়ে ক'রে এবার মাটি হয়ে যাবে।" কিন্তু কার্যতঃ হিতৈষীদের শুভকামনা ফলবতী হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিবাহের পর নরেশের পাঠের উৎসাহ বাড়িল বই কমিল না। এল-এ পরীক্ষা দিবার পর সে যে নিশ্চয়ই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে, সে বিষয়ে তাহার সহাধ্যায়ী অথবা অধ্যাপকগণের কোন সন্দেহ রহিল না।

নরেশ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী গেল। মা বলিলেন, "বাবা, এবার তো তোর পরীক্ষা হয়ে গেল, এখন রায়গঞ্জে গিয়ে বৌমাকে নিয়ে আয়। আমি আর কতদিন এ শূন্য ঘরে একা থাকব বল্ দেখি?"

নরেশ হাসিয়া বলিল, "আমি তো এখন তোমার কাছে ব'সে আছি মা, তবু তোমার একলার দুঃখ আর যাচ্ছে না?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "তুমি কি বাবা, আমার কাছে থাক? তুই যখন বিদেশে থাকবি, শাশুড়ী বৌ সুখ-দুঃখের সাথী, তোর কথা মনে ক'রে দুজনে দিন কাটাব। তোকে দূরে রেখে একলা যে প্রাণ কি করে, তুই তার কি বুঝবি, বাবা?"

মা যখন এ কথা বলিতেছিলেন, নিয়তি তখন যে কি নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছিল, তিনি তাহা জানিতেন না।

নরেশ মিনতি করিয়া বলিল, "তোমার কাছে দুদিন থাকি মা, তারপর না হয় রায়গঞ্জে যাব। সেখানে গেলেও হয়তো আবার ফিরে আসতে দিনকতক দেরি হবে। তোমার কাছ ছেড়ে আর আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, মা।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "পাগল! কবে যে তোর বুদ্ধি হবে!"

ইহার প্রায় দুই মাস পরে চৌধুরী মহাশয় একদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মফঃস্বলস্তম্ভে একটি সংবাদ পড়িয়া চমকিত হইলেন। সংবাদটি এই—"গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় রায়গঞ্জের জমিদার রমানাথ বসু মহাশয় হৃদ্‌রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সেইদিনই অপরাহ্ণে তাঁহার একমাত্র জামাতার বিসূচিকায় মৃত্যু হয়। বসু মহাশয় জামাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। বসু মহাশয়ের তুল্য মহাপ্রাণ, সদাশয় ও দীনবৎসল জমিদার এ অঞ্চলে আর আছেন কিনা সন্দেহ। ভরসা করি, সেই স্বর্গীয় মহাত্মার দৃষ্টান্তে তাঁহার পুত্রেরাও পিতৃপদানুসরণ করিবেন। বসু মহাশয়ের জামাতা নরেশচন্দ্রও অতি সচ্চরিত্র ও প্রতিভাবান যুবক ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ঊনবিংশতি বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যু হইল। কয়েকদিন মাত্র পূর্বে তাঁহার পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছিল। জামাতার সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ পাইয়া বসু মহাশয় মহাসমারোহে কালীপূজা ও কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিলেন। উৎসবের সমারোহ মিটিতে না মিটিতেই রায়গঞ্জ অন্ধকার হইয়া গেল। ভগবান এই শোকাভিভূত পরিবারকে শান্তিদান করুন।"

চৌধুরী মহাশয় সংবাদ পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর আলবোলার নল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অন্দরের দিকে ছুটিলেন, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো শোন, শোন, কি সর্বনাশের কথা!"

"কি সর্বনাশ আবার হ'ল তোমার?"

"নরেশ যে মারা গিয়েছে।"

"নরেশ? কি বল গো? আমাদের নরেশ? সে যে কালীপূজায় শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিল? খবর পেলে কার কাছে? কি হয়েছিল তার?"

এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী মহাশয় কেবল বলিলেন, "কলেরা হয়েছিল।" অশ্রুর আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল।

"চুপ কর, চুপ কর, এ কথা নিয়ে আর তোলাপাড়া ক'রো না। কমল শুনলে এখনি কেঁদে কেটে অনর্থ করবে। আহা, মাগী কত কষ্টেই ছেলে মানুষ করেছিল, সবই কপাল!"

তখন খুব ভোর, পূর্বদিক কেবল লাল হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। গাছ, পাতা, ঘাস সমস্ত শিশিরে আর্দ্র, কিন্তু কুয়াসা তেমন বেশী নাই। ছিন্ন লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমাঙ্গিনী তাহার শাশুড়ীকে ডাকিল, "মা!"

একবার আহ্বানে শাশুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিল না।

হেমাঙ্গিনী আবার ডাকিল, "মা, ওঠ, বেলা হয়ে গেল, ডাল ধুতে ঘাটে যাবে না? বড়ি দেওয়া হবে কখন?"

শাশুড়ীর এইবার ঘুম ভাঙ্গিল। নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "এত ভোরেই উঠেছিস পাগলীর ঝি? বড় শীত, আয়, আর একটু লেপের ভিতর শুয়ে থাক্।"

বউ বলিল, "মা যেন কি! ঘুমোলে আর কিছু জ্ঞান থাকে না। দত্তদের বাড়ী থেকে যে দশ সের ডাল এনেছ বড়ি দিতে, তা কি ভুলে গিয়েছ নাকি? ধুতে বাটতে কত বেলা হবে বল দেখি? বড়ি দেওয়া হবে কখন? এই বড়িগুলি তুলে দিলে পাঁচ আনা পয়সা পাওয়া যাবে, তবে আমাদের তেল নুন কেনা হবে, ঘরে একটুও যে নেই।"

বউয়ের কথা শুনিয়া শাশুড়ীর নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল। বার কতক এপাশ ওপাশ করিয়া হাই তুলিলেন, তারপর তুড়ি দিতে দিতে ও অনুচ্চস্বরে প্রাতঃস্মরণ করিতে করিতে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। বউ ইতিমধ্যে দুয়ারের আগড় খুলিয়া ফেলিল; ঘরে আলো দেখিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "তাই তো, সকাল হয়ে গিয়েছে যে!"

দুই ধারে ঝোপ ও আগাছার বন, তাহার ভিতর দিয়া নদীর পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, দুইজনে ডালের ধামা লইয়া সেই পথে চলিলেন। তখন দুই-একজন লোক উঠিয়াছে। মাঠে খেজুর গাছ হইতে রস পাড়িবার জন্য চাষীরা কেহ গাছের উপর উঠিয়াছে, কেহবা ভাঁড় হাতে নীচে দাঁড়াইয়া আছে। নরেশের মা অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন, হেমাঙ্গিনী বেলা হইবার আশঙ্কায় আগেই চলিয়াছে; এমন সময় "ওগো, মা গো!" এই চীৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল;—তাহার পর আর কোন শব্দ নাই।

চীৎকার শুনিয়া নরেশের মা, "ওগো দেখ, কি হ'ল" বলিয়া ছুটিয়া গেলেন। মাঠে যাহারা ছিল তাহারাও দৌড়িয়া গেল। একটু গিয়াই সকলে দেখিতে পাইল, ঘাটের উপর হেমাঙ্গিনী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ধামার ডাল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বধূকে এই অবস্থায় দেখিয়া শাশুড়ী ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আঃ অভাগীর ঝি! তোর কপালে এত দুঃখ ছিল? এত লোক মরে, তোর কেন মরণ হয় না, তা হ'লে যে আমি নিশ্চিন্ত হই। দেশে কি মানুষ নেই রে, নিত্যি নিত্যি এই রকম অত্যাচার? গরীবের উপর এত অত্যাচার ধর্মে সইবে না।"

"দিদি, শুনেছ? নরেশের বৌ আজ ভোরে ঘাটে ডাল ধুতে গিয়েছিল, আর বাঁশবন থেকে কে নাকি বেরিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরেছিল! বৌটা ভয় পেয়ে 'আঁউ-মাউ' ক'রে তখনি ঘাটের উপর ভিরমি গিয়ে পড়েছিল। ওদের হ'ল কি দিদি? সে দিন নাকি রাতে চাল কেটে কে মটকা ব'য়ে ঘরে নেমেছিল, পড়বি তো পড় একেবারে গিয়ে ধানের ডোলের উপর। আবার রোজ সন্ধ্যার পর নাকি ওদের বাড়ীর উঠানে ঢিল গোহাড় এই সব পড়ে, কিন্তু জনমনিষ্যি দেখতে পাওয়া যায় না। হ'ল কি দিদি? বৌটাকে ভূতে-টুতে পায় নি তো?"

"তুইও যেমন ক্ষেপী, তাই ওই সব কথা শুনিস। নরেশের বৌয়ের রীত-চরিত্রির সবই তো জানিস, তবে আবার ন্যাকা সাজিস কেন? বৌটা যেন মিট্‌মিটে ডান, দেখতে কত শিষ্টশান্ত, এদিকে ভেতরে ভেতরে ছেলে খাবার রাক্ষস। কুমুর মুখে আমি শুনেছি, এ তো আর মিথ্যে হবার নয়? লোক-দেখানো কাঁথা সেলাই ক'রে,

দড়ির শিকে ক'রে বিক্রি করা হয়। যারা নাকি শিকে ভেঙে, কাটনা কেটে, পরের ঘরের বড়ি আমসত্ত্ব দিয়ে দিন গুজরান করে, তাদের ঘরে এত আতর গোলাব আসে কোত্থেকে? কাঁথার সুতো বার করতে বেতের ঝাঁপি খুলেছিল, কুমু স্বচক্ষে দেখে এসেছে। যেদিন আমি এ কথা শুনেছি, সেই দিনই বলেছি, ওর স্বভাব কখনও ভাল নয়। তা না হ'লে, এত রাজ্যের লোক থাকতে যত লোক যায় ওর বাড়ীর মটকায় উঠতে, আর ওরই ঘরের বেড়া কাটতে! কই, কত লোকের বৌ-ঝি ঘাটে যাচ্ছে, কারু তো কেউ হাত চেপে ধরে না, ওরই বা হাত চেপে ধরে কেন?"

"সত্যি দিদি তাও বটে, আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু দিদি বৌটিকে দেখলে তো মন্দ ব'লে মনে হয় না, আহা, মুখখানি যেন দিনরাত মলিন ক'রেই আছে।"

"ও-সব ঢং লো ঢং! শাশুড়ী মাগী আবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গাল দেয়। আমি যেন আর বুঝতে পারি নে যে, আমাকেই বলছে। ভুবো আমার সুবোধ ছেলে, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, কেউ কোন দিন তার উঁচু নজরটি দেখে নি। আমার সেই ছেলের উপর ঠেস দিয়ে কথা বলে। আবার বলে, 'ভগবান বিচার করবেন.' ভগবান যেন ওর হাত ধরা!"

"হ্যাঁ দিদি, ভুবোর কথা আর মেজদার কথা, দুজনের কথাই বলেছে শুনেছি। নরেশের মা নাকি একদিন তাদের ঘরের কানাচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।"

"দেখেছিল দাঁড়িয়ে থাকতে! বিষ্টি হচ্ছে কোথায় যাবে? ঘরের কানাচে দাঁড়ালেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! আঃ, মাগীর আস্পদ্দা দেখ একবার! চাল কেটে ওদের গাঁ থেকে বিদেয় ক'রে দিক না গা! আপদ রাখা কেন?"

"কি লো কার কথা হচ্ছে?" বলিয়া রেবতী পিসি আসিয়া আসরে অবতীর্ণা হইলেন।

মেনী বলছিল, "নরেশের বৌ নাকি ঘাটের পথে ভূত দেখে ভিরমি গিয়েছিল!"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া পিসি বলিলেন, "ধর ধর ললিতে, আর না পারি চলিতে!" কথা শেষের সঙ্গেই একটা হাসির রোল উঠিল।

অঘোরের মা পিছন হইতে বলিলেন, "দিদি, ওদের কথা আর ব'লো না, যেমন শাশুড়ী তার তেমনি বৌ হয়েছে। চৌধুরীকে বললেন নরেশের মা, 'কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমার ছেলে পড়াতে হবে,' কর্তা অমনি তটস্থ। আর আমি যে এত পায়ে ধ'রে সাধলাম, 'আমার অঘোরকে নিয়ে যাও,' তা কই শুনলে? এতেই বোঝ দিদি, আর বেশী কি বলব! বাছার আমার কোন দোষ নেই, কেবল একটু গাছে চড়তে, পাখী পাড়তে, আর একটু সাঁতার দিতে ভালবাসে। আর, হ'ল, খেলতে গিয়ে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়লে, কদাচ কখনও যদি কারও কলসী ভাঙল তা হ'লে আর রক্ষে নেই। তা, কলকাতায় তো আর গাছও নেই, পুকুরও নেই, কলসী নিয়ে ঘাট থেকে জল আনাও নেই। বাছার আমার কোন ঝঞ্ঝাট নেই, খেলা পেলে তো সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া মনেই থাকে না। কর্তা বললেন, ওর পড়া-শুনো হবে না। পড়াশুনো হবে কেবল সেই হাড়হাবাতীর ছেলের! যেমন ছেলের

বিদ্যের অহঙ্কারে চোখে দেখতে পেতেন না, তেমনি হয়েছে। দর্পহারী মধুসূদন আছেন।"

রেবতী পিসি বলিলেন, "ছি! ছি! ওদের মুখ দেখলে প্রাচিত্তির কত্তে হয়, দত্তরা নিঘিন্নে, তাই ওদের হাতের জল খায়।"

যেদিন বিকালে মুখুয্যেদের রোয়াকে এইরূপ মেয়ে-মজলিস বসিয়াছিল, সেইদিন রাত্রে অন্ধকার ভাঙ্গা ঘরে শাশুড়ী-বৌতে সুখ-দুঃখের কথা হইতেছিল। শাশুড়ী বলিতেছিলেন "কি করব মা, উপায় তো ভেবে পাই না। দেশে এমন লোক নেই যে, গরীবের মুখের দিকে চায়। কেবল এক দত্তরা আছে ব'লে এখনও ভিটেয় আছি, না হ'লে কোন্ দিন ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'ত। তা দত্ত-গিন্নিও তো পশ্চিমে চ'লে যাচ্ছে, আর কার ভরসায় দেশে থাকব মা! এ জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ, যাই কোথা?"

হেমাঙ্গিনী কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমরা কার কি করেছি মা, কেন আমাদের উপরেই লোকে এত অত্যাচার করে? এই গ্রামে তো কত লোক বাস করছে, আমাদেরই বা কোন্ অপরাধে লোকে ভিটে-ছাড়া করতে চায়? মা, এই ভিটে—" বলিতে বলিতে হেম আর বলিতে পারিল না, তাহার দুই চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতে লাগিল।

"আমাদের কি অপরাধ, মা! আমাদের অপরাধ আমরা গরীব, আমাদের অপরাধ আমরা অনাথ, আর আমাদের অপরাধ আমরা কখনও কারো মন্দ করি নি। এ অপরাধ ছাড়া আর কি অপরাধ আছে, তা জানি না। আর এক অপরাধ—" বলিয়া কাত্যায়নী কি বলিতে গিয়া একবার বধূর দিকে চাহিয়া থামিলেন।

কিন্তু তিনি না বলিলেও হেমাঙ্গিনী তাহা বুঝিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে শান্তস্বরে বলিল, "মা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু মরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পাই না। মা, মরলে হয় না? তা হ'লে তো তোমার আর দিন দিন আমাকে নিয়ে এত কষ্ট ভুগতে হয় না!"

শাশুড়ী বধূর কথায় চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাড়াতাড়ি তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ছি মা, ও-কথা আর মনে এনো না। আত্মঘাতী হওয়ার বাড়া আর পাপ নেই। ভগবান এত লোককে রক্ষা করছেন, আমাদেরই কি উপায় করবেন না? দত্ত-গিন্নি পশ্চিমে যাচ্ছে, চল, না হয় ঘর-দুয়োর বিক্রি ক'রে ঐ সঙ্গে কাশী চ'লে যাই।"

হেমাঙ্গিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মা, আমি কাশী যাব না। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সেখানে গিয়েও শান্তি পাবে না। বরং তুমি দাদাকে ভাল ক'রে একখানা চিঠি লিখে দেখ, তিনি যদি নিয়ে যান।"

শাশুড়ী মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাইরা সাত জন্মে খোঁজ নেয় না, সেই ভাই আবার নিয়ে যাবে!" কিন্তু মনে মনে বধূর সহিত বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়াই জগৎ শূন্যময় দেখিলেন।

সকালবেলায় হেমাঙ্গিনী দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া পূর্বরাত্রে সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাই ভাবিতেছিল। স্বপ্নে সে নরেশকে দেখিয়াছিল, যেন তিনি তার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; সেই কাপড় জামা, সেই কপালে লম্বা চুল পড়িয়া কপালের আধখানা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সেই হাসি-হাসি চোখ, তেমনি সব। মাথায় হাত দিয়া তিনি যেন হেমের এলোথেলো চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে কত কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত কিছুই মনে পড়িতেছে না, তবু একটা সুবিমল তৃপ্তি ও সুগভীর আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আজ যেন তার আর কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না, কলরবপূর্ণ সংসারের ভাষা আর কর্ণে স্থান পাইতেছে না, চোখে যাহা দেখিতেছে, কর্ণে যাহা শুনিতেছে, সে সমস্তই যেন নদীর স্রোতের উপরে পত্ররাশির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, শুধু কোন্ দূর আকাশের পূর্ণচন্দ্র নদীতরঙ্গে বিম্বিত হইয়া হিল্লোলে হিল্লোলে শত চন্দ্রের রূপ ধরিয়া খেলা করিতেছে! আজ আর তাহার নিজের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া শঙ্কা হইতেছে না, আপনাকে দুর্ভাগিনী মনে করিয়া ক্ষোভও হইতেছে না। গত রাত্রির স্বপ্ন যেন সমস্ত জগৎকেই স্বপ্নের সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া আজ তাহার চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে। যে জগতে সে বাস করে, যে জগতের সঙ্গে তাহার প্রতিদিনের সম্বন্ধ, এ যেন সে জগৎ বলিয়া মনে হইতেছে না।

গতরাত্রে হেমাঙ্গিনীর জ্বর হইয়াছিল, শাশুড়ী আজ তাই তাহাকে সকালে স্নান করিতে দেন নাই, ভোরে উঠিয়া বাসি পাট সারিয়া তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। ডাকহরকরা চিঠি দিতে আসিয়াছিল, হেমাঙ্গিনীকে একা দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, দুই-একবার "মা ঠাকুরুণ কি বাড়ী আছেন?" বলিয়া ডাকিয়া "একখানা চিঠি আছে" বলিয়া চিঠিখানি উঠানে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

একমুহূর্তে হেমাঙ্গিনীর মন স্বপ্নজগৎ হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল। নীচজাতীয় ডাকহরকরার এই ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল। মুহূর্তের মধ্যে জীবনে সে যত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, সকলই তাহার মনে পড়িয়া গিয়া তাহার মনের অভিমানসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এতদিন সে কাহারও উপর অভিমান করে নাই। আজ এ অভিমান কাহার উপর? বোধ হয় যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাঁহারই উপর।

হেমাঙ্গিনী পত্র কুড়াইয়া লইয়া দেখিল, তাহার দাদার পত্র। কাত্যায়নী হেমকে লইয়া যাইবার জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, এ তাহারই উত্তর।

হেমাঙ্গিনীর দাদা তাহাকে লিখিয়াছেন, "তোমার শাশুড়ীর পত্র পাইলাম। তোমার সমস্ত বিবরণ আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। যাহার জন্য বংশে কলঙ্ক পড়িয়াছে, তাহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার এখন মরণই মঙ্গল। আমরাও ভাবিব, তুমি মরিয়া গিয়াছ।"

পত্র পড়িয়া হেমের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শাশুড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, অপূর্ব কি লিখেছে?"

হেমাঙ্গিনী নীরব।

শাশুড়ী ভীতা হইয়া বলিলেন, "সকলে ভাল আছে তো?"

গৃহিণী চৌধুরী মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলেন, "ওগো, নরেশের বৌ আর তার মা এসেছে।"

চৌধুরী মহাশয় চমকিত হইয়া বলিলেন, "নরেশের বৌ!—কলকাতায়? সে কি? সে কেন আমার বাড়ীতে?"

গিন্নি বলিলেন, "থাকবে ব'লে এসেছে।"

কর্তা মহা উগ্র হইয়া বলিলেন, "না, না, তা হবে না। আমার বাড়ীতে স্থান হবে না। এখনি বিদেয় কর। গ্রামে কলঙ্ক রাখবার স্থান নেই, আবার কলকাতায় আসা হয়েছে!"

গিন্নি বলিলেন, "রাগ কর কেন? আগে সব কথা শোন।"

"তুমিই শোনগে, আমার কিছু শোনবার দরকার নেই।"—বলিয়া কর্তা চটিয়া উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী তাঁহার কন্যা কমলকে ডাকিলেন। কমলকে দেখিলে এখন আর সে কমল বলিয়া চেনা যায় না। এক বৎসর হইল কমল বিধবা হইয়াছে। মুখখানি যেন সন্ধ্যাবেলার পদ্মের মত,—তেমনি সুন্দর, তেমনি মলিন।

গৃহিণী বলিলেন, "এ যে বিষম দায় হ'ল মা, কি করি বল দেখি?"

কমল বলিল, "মা, ওরা দুদিন উপোস ক'রে এসেছে, এই মাত্র দুটি ভাত মুখে দিয়ে শুয়েছে, এখন আর ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে যেও না। বাবা যদি বকেন, সব দোষ আমি ঘাড়ে নেব।"

"ওঁর রাগ তো জানিস, হয়তো বলবেন, দারোয়ান দিয়ে বার ক'রে দাও। দেখি একবার ঘুমিয়েছে কিনা?" বলিয়া গৃহিণী নরেশের মা বধূকে লইয়া যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে গেলেন।

তিন রাত্রি জাগরণের পর হেম আজ নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কমল মায়ের পিছনে পিছনে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া হেমের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার চিন্তাবিবর্ণ ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবিল, "হে ভগবান, এ ঘুম যদি আর না ভাঙত!" গৃহিণীর চিন্তার গতি কিন্তু অন্যদিকে ছিল, সচকিতা গৃহিণী বলিলেন, "ওলো কমল, দেখ্ তো মা, এ আবার কি? ওমা, এ যে কাগজের বাক্সে করা খোসবোর শিশি! লোকে যা বলে তা তবে মিথ্যে নয়? ছুঁড়ির গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে দেখি ঘুমে একেবারে এলিয়ে পড়েছে, আর দেখি কি না বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকোনো ছোট একটা কাগজের বাক্স। দেখে আমার হাত পা কাঁপছিল, মা, কি জানি কার কি চুরি ক'রেই বা এনেছে! বাইরে গিয়ে বাক্স খুলে দেখি কিনা, দুটো শিশি! আমি ছুঁড়িকে দেখে ভেবেছিলাম, বুঝি ভাল, এসেছে, থাক্ এখানে। কর্তাকে ব'লে ক'য়ে না হয় রাখিয়েই দেব।

খাবে পরবে, অতুলের খোকাকে রাখবে, হ'ল বা ঝি না থাকলে দুখানা কাজই ক'রে দিলে। তবুও একটা লোক তো প্রতিপালন হবে। হাজার হোক নরেশ আমার ছেলের মত ছিল, তারি তো বৌ, দেখে মায়া হয়েছিল। ওমা, তা নয়! পেটের ভেতর হারামের ছুরি! বিধবা হয়েছে, এখনও গন্ধ মাখবার শখ যায় নি, তাই বুকের কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে এনেছে। আমি বাপু ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এমন ডাইনি রাখতে পারব না।"

কমল আলোর কাছে বাক্স লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ মা, বাক্সর গায়ে কার হাতের লেখা।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কার?"

কমল বলিল, "নরেশদাদার।"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে তাহার চোখ হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটিতে পড়িল। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণীর চক্ষুও অশ্রুময় হইয়া উঠিল।

('কুন্তলীন পুরস্কার', ১৩০৯)

ঘড়ি চুরি

সকাল ছয়টা। আকাশটা তেমন পরিষ্কার ছিল না, এজন্য সেদিন সকালবেলা বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। শেখরবাবু তখন রাস্তার দিকের জানালার কাছে ইজিচেয়ারখানি সরাইয়া লইয়া একখানি বই হাতে করিয়া একমনে পড়িতেছিলেন; আমি তাঁহার সোফাখানি অধিকার করিয়া ছিলাম। তখন সবে মাত্র চায়ের পেয়ালা খালি হইয়াছিল, সেটি আমার সম্মুখের টিপায়ার উপর পড়িয়া ছিল।

ঘরখানি ইংরাজি ফ্যাশানের। ঘরের মেঝে মাদুরমোড়া, চেয়ার টেবিল কোচে ঘরখানি পরিপূর্ণ, একপাশে একটি আলমারি, সেটি নূতন পুরাতন পুস্তক, সংবাদপত্র, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। এই ঘরটি শেখরবাবুর বসিবার ঘর।

শেখরবাবুর পূর্ণ নাম সুধাংশুশেখর বসু। আমরা উভয়ে বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছি, একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং আজ পর্যন্ত তাঁহাকে যেমন ভালবাসি, বন্ধুদের মধ্যে এমন আর কাহাকেও বাসি কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এমন দুর্বোধ্য যে, আমিও এতদিনে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন, তখন কাহারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন না, কিন্তু সকলের সঙ্গেই অমায়িকভাবে ব্যবহার করিতেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া শিক্ষকগণ চমৎকৃত হইতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সকল বালক বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, (তার মধ্যে আমি একজন) তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট স্বাস্থ্য বিসর্জন ও উপাধি অর্জন করিয়া বিদায় লইল, কিন্তু তিনি কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর শেখরবাবু পুলিসের ডিটেক্‌টিভ বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন; যে কয়েক বৎসর তিনি কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতির সীমা ছিল না; কিন্তু কেন জানি না, অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমি সবেমাত্র একটি চুরুট ধরাইয়া দিব্য আরামে সোফায় হেলান দিয়া খবরের কাগজখানি হাতে লইয়াছি, এমন সময় দেখি, দুটি ভদ্রলোক সদর-দরজার ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। শেখরবাবুও তাহা লক্ষ্য করিয়া বইখানি রাখিয়া দিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু আসছেন দেখছি। তুমি বোধ হয় ওঁকে চেন?"

ভদ্রলোক দুইটি প্রবেশ করিলে শেখরবাবু মধুর হাস্যের সহিত তাঁহাদের সম্বর্ধনা করিলেন, তাহার পর মহেন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু, আজিকার সকালটা বড়ই বাদ্‌লা, এক পেয়ালা চা আনিতে বলিব কি?"

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটা বড় দরকারী কাজের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমি এখন পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের ডিটেক্‌টিভ। এই ভদ্রলোকটি একটি ঘড়ি পার্শেল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেটি চুরি গিয়াছে, এ পর্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

শেখরবাবু আগন্তুক ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বসুন মশায়, ব্যাপারটি কি ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনি বিস্তারিত করিয়া বলুন।"

"ব্যাপার এমন বিশেষ কিছু নয়। যেটি হারাইয়াছে, সেটি অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ঘড়ি, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতির কথা এই যে, সেটি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিচিহ্ন। আপনি ঘড়িটি উদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে আমি চিরদিন আপনার নিকট ঋণী থাকিব।"

শেখরবাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ঘড়ি চুরি সম্বন্ধে কি বলিতেছিলেন?"

"ঘড়িটি আমার দাদার নিকট থাকিত। সম্প্রতি দাদা এখান হইতে যাইবার সময় ঘড়িটি একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মেরামত করিয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য আমার কাছে রাখিয়া যান। ঘড়ি মেরামত হইয়া গেলে, আমি তাঁহার নিকট ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ফেরত ডাকে তাঁহার যে পত্র আসিল, তাহা পড়িয়াই আমি অবাক হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'তুমি ঘড়ি পাঠাইয়াছ এবং আমিও ঘড়ি পাইয়াছি বটে, কিন্তু সে ঘড়ির বদলে একটি অতি অল্পদামের বাজে ঘড়ি পাইয়াছি।' এই দেখুন, তাঁহার পত্র।" বলিয়া ভদ্রলোকটি একখানি খামে-ভরা পত্র শেখরবাবুর হাতে দিলেন।

শেখরবাবু খামখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "আপনার দাদা বোধ হয় রাজবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনে কাজ করেন?"

"হ্যাঁ, তিনি রাজবাড়ীর স্টেশনমাস্টার। আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় আছে?"

"না, খামখানি দেখিয়া এই রকমই অনুমান হইতেছে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "খাম দেখিয়া এ কথা কিরূপে অনুমান করিলেন?"

শেখরবাবু খামখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন না, খামখানি দেখিয়া কিছু বুঝা যায় কিনা?"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে খামখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভায়োলেট কালিতে নাম ও ঠিকানা লেখা, আর এখানকার ও রাজবাড়ীর পোস্টমার্ক, ইহা ভিন্ন খামে এমন কোন চিহ্ন নাই, যাহা হইতে পত্রপ্রেরক কি কাজ করেন, তাহা বুঝা যায়।"

"পোস্টমার্কটি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন?"

"হ্যাঁ, পোস্টমার্কে রাজবাড়ীর পর R. S. লেখা আছে বটে, কিন্তু অন্য লোকেও তো স্টেশনে চিঠি দিয়া যাইতে পারে।"

"চিঠিখানা কোন্ সময় সেখান হইতে রওনা হয় সেটা বুঝিয়াছেন তো?"

"ঠিক কথা, চিঠিখানা দেরিতে রওনা হইয়াছে, কিন্তু 'লেট ফি'র ছাপ নাই।"

শেখরবাবু বলিলেন, "ইহা হইতেই অনেকটা অনুমান হয় না কি যে, যিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তিনি লেট ফি না দিয়াও চিঠিখানা পাঠাইতে পারেন?"

"তিনি স্টেশনের কর্মচারী না হইয়া পোস্টাল কর্মচারীও তো হইতে পারেন।"

"ঠিক কথা! ভায়োলেট রংয়ের কালি সচরাচর কোথায় ব্যবহার হয় বলুন দেখি।"

মহেন্দ্রবাবু আশ্চর্য হইয়া শেখরবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "শেখরবাবু, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, এই কপিং ইঙ্ক রেলওয়ে স্টেশনে ব্যবহারের জন্য আজকাল চলিত হইয়াছে।"

শেখরবাবু বলিলেন, "রেলের স্টেশনে দরকারী কাগজপত্রের নকল রাখিবার জন্য যে কালির ব্যবহার হয়, তাহা ডাকঘরে লইয়া গিয়া এই পত্র লিখিতে ব্যবহার করিয়াছে, এরূপ যুক্তি নিতান্ত অসার।"

চিঠিখানি এতক্ষণ খামের মধ্যেই ছিল, এখন শেখরবাবু খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িবার পূর্বে একবার নাকে আঘ্রাণ লাইলেন, তারপর কাগজখানি মহেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কাগজটা দেখিয়া কি মনে হয়?"

"বেশ মোটা রুলটানা কাগজ, হাফশিট। কাগজখানি ছিঁড়িবার সময় বোধ হয় তাড়াতাড়ি ছেঁড়া হইয়াছিল, কেন না পরিষ্কার ছেঁড়া হয় নাই। চিঠির এক পৃষ্ঠা ভায়োলেট কালিতে লেখা, অপর পৃষ্ঠায় কালো কালো দাগ আছে। কাগজখানি দেখিয়া বোধ হয়, কোন একখানা লেখা চিঠির এক পৃষ্ঠা সাদা ছিল, সেই সাদা কাগজখানি ছিঁড়িয়া লইয়া এই চিঠিটা লেখা হইয়াছে।"

শেখরবাবু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "বেশ মহেন্দ্রবাবু, আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। এখন বলুন দেখি, যে চিঠির এক পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই চিঠিখানি স্ত্রীলোকের কি পুরুষের? আপনার কি বোধ হয়?"

"চিঠির অপর পৃষ্ঠায় লেখার যে ছাপ পড়িয়াছে, সেটা বাংলা লেখার ছাপ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইতেই স্ত্রীলোকের চিঠি বলিয়া ঠিক করা অনেকটা কষ্টকল্পনা। পুরুষেও তো বাংলায় পত্র লিখিয়া থাকে।"

"নিশ্চয়ই লেখে, কিন্তু চিঠিখানি যে পুরুষের লেখা নয় সে বিষয়ে কষ্টকল্পনা ব্যতীতও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। চিঠিখানি একবার নাকের কাছে ধরুন দেখি।"

"বাঃ, চমৎকার এসেন্সের গন্ধ!"

"হ্যাঁ, উহা খস্‌খসের গন্ধ। ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কাজ করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধের পার্থক্য অনুভব করিবার ক্ষমতা বিশেষ আবশ্যক। এখন ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের পক্ষেই হাতবাক্সে এসেন্স রাখিবার অধিক সম্ভাবনা। তাহার পর আরও দেখুন, এসেন্সের গন্ধ ছাড়া যে বিশেষ একটি গন্ধ ইহাতে পাওয়া যাইতেছে, এইরূপ একটা গন্ধ টাকা পয়সা ও এসেন্স প্রভৃতি একসঙ্গে মিশাইয়া রাখার জন্য মেয়েদের বাক্সে প্রায়ই পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন। আর লিখিবার সময় কালি ব্লট না করার জন্য কাগজের অপর পৃষ্ঠায় ছাপ পড়িয়াছে, এরূপ অপরিষ্কার লেখাও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষেই অধিক সম্ভব। আর ইহা ব্যতীত হাতের লেখা সম্বন্ধে আমি অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতেই লেখার এই উল্টা ছাপ দেখিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহা স্ত্রীলোকের লেখা।"

হরিভূষণবাবু বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, এই ডাকের কাগজ দেখিয়া এখন আমার মনে হইতেছে, বৌদিদি এই রকম ডাকের কাগজ ব্যবহার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই চিঠির আধখানা কাগজে দাদা এই চিঠি লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সমস্ত বৃথা বিষয় লইয়া আপনার এই অদ্ভুত ক্ষমতার অনর্থক অপব্যবহার হইতেছে, ইহাতে চুরির কোন সন্ধান হইতেছে না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "দেখুন, এইসব কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদিগকে সকল তথ্যই সংগ্রহ করিতে হয়, কিছুই অবহেলা করা উচিত নয়। যাহা কিছু সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা প্রয়োজনীয় হউক অথবা নাই হউক, যতদূর সম্ভব তাহা তলাইয়া দেখা উচিত। আর ইহাতে চুরির সম্বন্ধেও কতক সাহায্য হইল বইকি! এই সমস্ত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, রাজবাড়ী স্টেশনে পার্শেল পোঁছিয়াছে ও সেখানে আপনার দাদাও উপস্থিত ছিলেন, অতএব সেখান হইতে চুরি যাইবার সম্ভাবনা খুব অল্প। যাক্, আপনি ঘড়ি কিরূপে ও কাহাকে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন ?"

হরিভূষণবাবু বলিলেন, "ঘড়িটি রেজেস্ট্রি কি ইন্সিওর করিয়া পাঠাই নাই, বেয়ারিং পার্শেল কখনও খোয়া যায় না জানিতাম, তাই বেয়ারিং করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ঘড়ি আমি নিজে হাতে প্যাক করিয়া আমাদের বাড়ীর বিশ্বাসী ঝির হাতে দিয়া পোস্টাফিসে পাঠাইয়াছি। পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহা ঝির জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারপর ঘড়ির সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

শেখরবাবু হরিভূষণবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার দাদার চিঠি দেখিতেছিলেন। বলিলেন, "আপনার দাদা লিখিয়াছেন, চলন্ত ঘড়ি পাইয়াছিলেন, আপনি কি এখানে ঘড়িতে চাবি দিয়া দিয়াছিলেন ?"

"হ্যাঁ, আমার মনে কেমন একটা খেয়াল হইয়াছিল যে, এখান হইতে দম দিয়া পাঠাইলে ঘড়ি চলন্ত অবস্থায় পোঁছায় অথবা কোন্ সময় বন্ধ হয় তাহা পরীক্ষা করিব, সেইজন্য আমি ঠিক দশটার সময় দম দিয়া দিই, এবং দাদাকেও ঘড়ি চলিতেছে অথবা কয়টা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে, তাহা জানাইতে লিখিয়াছিলাম।"

মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেখরবাবু, আপনি বোধ হয় ঝির উপরেই সন্দেহ করিতেছেন, কিন্তু আমি ঝির ও তাহার আত্মীয়গণ কলিকাতায় যে যেখানে আছে, তাহাদের এমন ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছি যে, তাহারা চুরি করিলে নিশ্চয় ধরা পড়িত।"

হরিবাবু বলিলেন, "আমারও মনে হয় না যে, বামা চুরি করিয়াছে। সে আমাদের অতি বিশ্বাসী ঝি। বিশেষতঃ পার্শেলে যে ঘড়ি আছে তাহাই সে জানিত না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "অবশ্য আপনি কাহাকেও বলিয়া দেন নাই যে পার্শেলের ভিতর ঘড়ি পাঠাইতেছেন, কিন্তু পার্শেলের ভিতর একটা চলন্ত ঘড়ি পাঠাইলে যাহার হাতে পড়ে সে কি আর বুঝিতে পারে না ?"

"ঘড়িটি প্যাক করার পর একথা আমার মনে হইয়াছিল, সেই জন্য পাঠাইবার আগে কানের নিকট ধরিয়া খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, কিছুই শুনা যায় না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "ঘড়ির শব্দ অনেক সময় কানে শোনা অপেক্ষা স্পর্শের দ্বারা বেশী বুঝা যায়। আপনি যদি পার্শেলটা চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে কোন না কোন অবস্থায় ঘড়ির শব্দ বুঝিতে পারিতেন। এই দেখুন, এই ঘড়িটির উপর এই ছড়িখানি ছোঁয়াইয়া রাখিলাম, অন্য দিকটা আপনি দাঁতে করিয়া ধরুন। শব্দ পাইতেছেন?"

হরিবাবু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। তাহার পর দাঁতের ছড়িটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "একটা কথা আপনাকে আগে বলি নাই, ঘড়ির সঙ্গে আমি একটা থার্মমিটারও পাঠাইয়াছিলাম। সেটি চুরি যায় নাই।"

শেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে কৌটায় প্যাক করা হইয়াছিল, তাহা কত বড়?"

হরিবাবু বলিলেন, "তাহা থার্মমিটারটির মতই লম্বা ছিল। থার্মমিটার তাহাতে ঠিক আঁটিয়াছিল।"

"তাহা হইলে তো এ বিষয় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, থার্মমিটারের খাপের সঙ্গে ঘড়ি লাগিয়াছিল ও তাহার প্রান্ত দুইটি টিনের কৌটার গায়ে লাগিয়াছিল, তাহারই উপর হয়তো হঠাৎ চোরের হাত পড়িয়াছিল, এবং তাহাতেই সে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এইসব প্রমাণে বামার উপরেই সন্দেহ হয় বটে; কিন্তু বামা ঘড়ি পাওয়ার পনেরো মিনিট পরেই পোস্টাফিসে দিয়া আসিয়াছে, এ খবর ঠিক জানিতে পারিয়াছি। যদিও ঘড়ি ডাকে দিতে যাইবার সময় পথে তাহার ভাইপোর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তথাপি তাহার দ্বারা এ কাজ হয় নাই, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

শেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তবে কাহার উপর সন্দেহ হয়?"

"আমার অনেকটা এই রকম বিশ্বাস হইয়াছিল, আর এখনও মনে হয় হরিবাবুই পাঠাইবার সময় একটা গোলমাল করিয়াছেন।"

হরিবাবু ম্লানভাবে হাসিলেন, বলিলেন, "আজকাল পুলিসে যাওয়া বিষম বিড়ম্বনা। যিনি অভিযোগ করিতে যাইবেন, পাকেপ্রকারে তাঁহাকেই অভিযুক্ত হইতে হইবে। মহেন্দ্রবাবু যেরূপভাবে আমাদের বাড়ী খানা-তল্লাশী করিয়াছিলেন তাহাতে উনি যদি আমার বিশেষ বন্ধু না হইতেন, তবে উঁহার সঙ্গে আমার বিষম মনোবিবাদ হইত।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কর্তব্যের অনুরোধেই আমাদের এই সব অসন্তোষকর কার্য করিতে হয়।"

"যে ঘড়িটি পাওয়া গিয়াছে, সেটি কোথায়?" হরিবাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটি দাদা ফেরত পাঠাইয়াছেন।"

"কবে পাঠাইয়াছেন?"

"তিনি ঘড়ি পাইয়াই যখন দেখিলেন, তাঁহার ঘড়ি নয়, তখন সেইদিনই যে ট্রেনে তাঁহার চিঠি ফেলিয়াছিলেন সেই গাড়ির গার্ডের হাতে আমার নিকট ফেরত দিবার জন্য ঘড়িটি দিয়াছিলেন, গার্ড আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"পোস্টাফিসে সন্ধান করিয়া কি জানিতে পারিলেন?"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "পোস্টাফিস হইতে চুরি যাওয়া সম্ভব নয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন। পোস্টমাস্টার রাজকৃষ্ণবাবুর নিকট জানিতে পারিলাম যে তিনি দুইটার সময় দার্জিলিং মেলে দিবার জন্য পার্শেল রওনা করিয়া দিয়াছিলেন।"

শেখরবাবু বলিলেন, "তিনি বারোটার সময়েও তো ডাক রওনা করিয়া নির্দোষ হইতে পারিতেন।" তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বড় ছেলের নাম রাজকৃষ্ণ নয়?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, তিনিই তো সিমলা পোস্টাফিসে কাজ করেন।"

শেখরবাবু ভাবিতে ভাবিতে ঘড়িটির চারিদিক মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে একটু চিন্তিতভাবে হরিবাবুকে বলিলেন, "আপনার ঘড়িটি পাইলেই আপনি বোধ হয় সন্তুষ্ট হন, চোরকে ক্ষমা করিতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নাই, কারণ যে চুরি করিয়াছে, তাহার বয়স অতি অল্প, এ সময় তাহাকে জেলে দিলে তাহার ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইতেছে, চোর ধরা না পড়িলে ঘড়িটি কি করিয়া পাইবেন বুঝিতে পারিতেছি না; আর আপনি কোন অনুসন্ধান না করিয়া এ সমস্ত কি প্রকারে জানিলেন?"

শেখরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই ঘড়িটাই চোরকে দেখাইয়া দিতেছে।"

মহেন্দ্রবাবু এই কথা শুনিয়া ঘড়িটি হাতে লইলেন এবং খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন।

"ঘড়ির উপর কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে এবং ঘড়ির রিংয়ে একটু সুতা বাঁধা আছে দেখিতে পাইতেছি, চিহ্নের মধ্যে তো এই!"

শেখরবাবু বলিলেন, "উপরের দাগ কিছুই নয়, ঘড়ির সঙ্গে এক পকেটে টাকা কি অন্য রকম পদার্থ ছিল, দাগ দেখিয়া তাহাই বুঝা যায়, বরং ঘড়ির ভিতরে যেখানে ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয়, সেখানে যে দাগ পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে পারেন যে, ঘড়িটি যাহার নিকট ছিল, তাহার মদের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ জন্মিয়াছে, মাতালদের হাত কাঁপে বলিয়া চাবি দিবার সময় ঘড়িতে এইরূপ দাগ হয়, তবে রিংয়ে যে সুতা আছে, সেটিও একটি সূত্র বটে, কিন্তু সর্বপ্রধান সূত্র এখনও আপনি ধরিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পোস্টমাস্টারবাবুকে কাল সন্ধ্যার সময় আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আমি তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া ঘড়ির সম্বন্ধে মীমাংসা করিব, আপনাদের কাহারও তাঁহার সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় পোস্টমাস্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শেখরবাবুর সদাপ্রসন্ন মুখখানি আজ একটু বিমর্ষ বোধ হইল। রাজকৃষ্ণবাবুকে বাড়ীর সংবাদ

প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পকেটে হাত দিয়া যেন আশ্চর্যভাবে বলিলেন, "আমার ঘড়িটা কোথায় গেল?" তার পর রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, "আপনার ঘড়িটি দিন তো, সময়টা দেখি।" রাজকৃষ্ণবাবু ঘড়িটি বাহির করিয়া দিলেন। ঘড়িটি একটা কালো রঙের কারে বাঁধা ছিল। শেখরবাবু ঘড়ি না দেখিয়া ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়া কারের গিরা-বাঁধা জোড়ার জায়গাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

পরীক্ষা শেষ হইলে রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, "দেখুন, আপনার পিতা আমাদের সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আপনি সেই দেবতুল্য পিতার সন্তান। কলিকাতায় আসিয়া ও নূতন চাকরীতে প্রবেশ করিয়া আপনার স্বভাবের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। এ কথা নিশ্চয় জানিবেন যে, পাপ কখনও লুকানো থাকে না। আমাদের কর্তব্য আপনাকে রাজদ্বারে সমর্পণ করা, কিন্তু আপনার বয়স অল্প, ক্ষমা পাইলে আপনার স্বভাব ক্রমশ সংশোধিত হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবার আপনাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ফণিভূষণবাবুর ঘড়িটি অবশ্যই আপনি ফিরাইয়া দেবেন।"

পোস্টমাস্টারবাবু যেন কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন, "আপনারা আমাকে কেন যে এরূপ বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

শেখরবাবু বলিলেন, "আমি বুঝাইয়া দিতেছি। আমার নিকট এই যে ঘড়ি রহিয়াছে, এটি আপনার ঘড়ি। ইহার রিংয়ে এই যে রেশমটুকু বাঁধা আছে তাহা আপনার ওই কারের। ঘড়ি বদলাইবার সময় তাড়াতাড়িতে কারটি না খুলিতে পারিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। আপনি এ সব কার্যে তেমন পাকা নহেন, কাজেই রিং হইতে কারের এটুকু অংশ কাটেন নাই। তার পর দেখুন, ফণিবাবু যে ঘড়ি পাইয়াছেন, সেটি তখন চলিতেছিল, চলন্ত অবস্থাতেই তিনি তাহা সেই দিন ফেরত পাঠান, এখানে আসিয়া সাতটা বাজিয়া ঘড়িটি বন্ধ হয়। কাল আমি ঘড়িটিতে চাবি দিয়া দেখিয়াছি ঘড়িটি ঠিক ত্রিশ ঘণ্টা সময় রাখে। অতএব একটার সময় ঘড়িতে চাবি দেওয়া হইয়াছিল বেশ বুঝা যাইতেছে। মহেন্দ্রবাবু আমাকে বলিয়াছেন, পোস্টাফিসের খাতাপত্রেও প্রকাশ এবং আপনিও স্বীকার করিয়াছেন, ঘড়ি দুইটা পর্যন্ত আপনার কাছেই ছিল, তাহার পর তাহা মেলে পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনি একটার সময় চাবি দিয়া ঘড়িটি প্যাক করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই প্রমাণ যে কোন আদালতে আপনাকে দোষী করিবে তাহা বোধ হয় এখন বুঝিয়াছেন।"

পরদিন বৈকালে মহেন্দ্রবাবু ও হরিবাবু উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবু একটু বিদ্রূপের সহিত বলিলেন, "শেখরবাবু, ব্যাপার কি? সেই অল্পবয়স্ক চোর ও চোরাই ঘড়ির কোন সন্ধান পাইয়াছেন না কি?"

শেখরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "চোরটির সন্ধান আপাততঃ দিতে পারিতেছি না, ঘড়িটির সন্ধান পকেটেই আছে।"—বলিয়া পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দিলেন।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্প

ঘরের লক্ষ্মী

"আমার ভাই বড় লজ্জা করে।"

"তোর এক কাপের লজ্জা।"

শ্রাবণ মাস। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আর্দ্র-পক্ষ নিরুপায় কাকগুলি গাছের ডালে বসিয়া চুপ করিয়া ভিজিতেছে। পত্রের অগ্রভাগ বাহিয়া মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ সলিলবিন্দুগুলি ভূমে পড়িতেছে। এমনি এক বর্ষার দিনে, নির্জন ঘরে দুই সইয়ে কথা হইতেছিল। চারুবালা মা-বাপের বড় আদরের মেয়ে। আদরের মেয়ে বলিয়া, সে আবদারে কি দুষ্ট নয়। এত ভীতু ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইত না। কেহ যদি বড় করিয়া ডাকিত, অমনি অভিমানে চারুর বড় বড় চক্ষু দুইটি জলে পুরিয়া যাইত। কেহ আদর করিয়া ডাকিলে লজ্জায় চারু মাথা তুলিতে পারিত না। চারুর সই ঠিক চারুর বিপরীত প্রকৃতির। সেই গাছ-কোমর বাঁধিয়া পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়ায় তৎপর, সেই আড়াআড়িতে সুনিপুণ, সেই চঞ্চলার শিরোমণি, মেয়েলি শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা সইটি যে কি করিয়া ঠিক চারুর মনের মত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া উঠা দুষ্কর। সইটি চারুর অপেক্ষা ছোট হইলেও চারুর মন্ত্রণা ও সাহস-দাত্রী। কোন কথা বুঝিতে না পারিলে চারুর সইকে বিশেষ আবশ্যক পড়িত। শনি-মঙ্গলবারে কোন্ গাছ-তলায় যাইতে নাই, এলোচুলে অমাবস্যার রাত্রে থাকিলে কি হয়, রাক্ষুসে বেলায় ভাত খাইতে নাই কেন, এ সকলের মীমাংসায় চারুর সই পাড়ার মেয়েদের সর্বাগ্র-গণ্যা। তাহা ছাড়া তাহার আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, কোন্ গাছে শাঁকচুন্নি থাকে, কোন্ গাছে ভূত থাকে, তাহা সে গাছ দেখিলেই টের পাইত, আর ভূত-ছাড়ানো মন্ত্রও যে জানিত না, তাহাও নয়। যাহা হউক, এমন সর্বগুণসম্পন্না সইয়ের কথা অবশ্য চারু কখনই অগ্রাহ্য করিত না। কিন্তু আজ একটি বিষয়ে সে অপরাধী হইয়াছে—তাহাই লইয়া দুই সইয়ে কথাবার্তা হইতেছিল।

আগামী কল্য রথ। তাই চারুর বরটি নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ী আসিবেন। চারুর মোটে দুই মাস বিবাহ হইয়াছে, বরের সহিত তাহার বড় একটা আলাপ-পরিচয় নাই। তাই বর আসিবে শুনিয়া আহ্লাদে গলিয়া না গিয়া ভয়ে সারা হইতেছে। মেয়েটি স্বাভাবিক কিছু ভীতু, তাহার পর বর জিনিসটা যে কি, তাহা বড় বোঝে না, স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ 'বর' ভাবিতেই ভয়ের ভাবটা আগে মনে হয়; যথার্থ কথা বলিতে কি, প্রেমের ভাবের সূত্রপাতও যে তাহার মনে হইয়াছিল, তাহা বলিতে গেলে নিতান্তই মিথ্যা কথা বলা হয়। বর ভাবিতেই শ্বশুরবাড়ী মনে আসে, শ্বশুরবাড়ী মনে আসিলেই, বাপ-মা ছাড়িয়া যাওয়ার কথা, খেলাঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কথা, আরও কত কথাই মনে পড়ে। মনে পড়িলেই বড় বড় চোখে এক চোখ জল হয়। কাজেই চারুকে বড় দোষ দেওয়া হয় না।

আসল কথা কি না, সই বলিতেছিল, বরের সঙ্গে কথা কহিতে হইবে, আর কি

কথা হয়, তা আবার সইকে শুনাইতে হইবে, কাজেই চারু বড় বিপদে পড়িয়াছে। সইয়ের কথা বেদবাক্য, তাই বা কি করিয়া লঙ্ঘন করিবে,—আর বরের সঙ্গে কথা কওয়া! ওমা, সে আবার কি? চারু জন্মেও (অর্থাৎ এগারো বৎসরের মধ্যে) কখনও এমন বিপদে পড়ে নাই। সইকে ইহার অসম্ভাবিতা নানারূপে বুঝাইতে গিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিতেছিল না। কেন না, সইয়ের যুক্তি চিরকালই চারুর কাছে অখণ্ডনীয়। সইও যে এ বিষয়ে বুঝিতে পাকা তাহাও নয়,—তবে সবই বুঝি বলিয়া সইয়ের মনে একটা বিলক্ষণ আত্মগরিমা আছে, কাজেই এ বিষয়েই বা পশ্চাৎপদ হইবে কেন? কিন্তু চারুকে সে যাহা বলিতেছিল, তাহা যদি আবার কেহ তাহাকে বলিতে আসিত, তবে ক্ষেমা আর তাহাকে আস্ত রাখিত না। আর নিজেও সারাদিন কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিত। পৃথিবীতে পরের বিষয়ে জ্ঞান সকলেরই বড় কম। সই কেন আমার কথা রাখিতে চাহিতেছে না, তাহা ক্ষেমা ভাবে নাই, সে বোধ হয় ভাবিতেছিল, আমার কথা রাখাই সইয়ের উচিত।

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে এমন সময় বৃষ্টি বড় জোরে আসিল। বাতাসে গাছগুলো মড় মড় করিয়া উঠিল, কাক বেচারিরা একবার কাতরস্বরে কা-কা-ধ্বনি করিল, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতে লাগিল, বালিকা দুইটি জানালা বন্ধ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দরজায় একটু গোলমাল শুনা গেল। ক্ষেমা হাসিয়া সইয়ের গা টিপিয়া বলিল, "ঐ লো, ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে তোর বাদুলে বর এসেছে।" চারুর বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল।

বিপদ নানা রকম। আর পথে ঘাটে খেলা করিবার যো নাই। দরজার চৌকাঠ পার হইলেই মা বকেন, বলেন, "হলি কি? এত বড় মেয়ে হ'ল, একটু জ্ঞান নাই! ওমা, জামাই বাড়ীতে,—আর তুই কিনা পাড়ায় পাড়ায় টো টো ক'রে বেড়াবি?" চারুর মার কথা শুনিয়া কান্না আসে, কিন্তু ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে, কেমন কথা কহিতে লজ্জা করে। সারাদিন বাড়ীর মধ্যে বন্ধ থাকা কি কষ্ট! আমতলার খেলাঘর ক'দিন নিকানো হয় নাই, ক'দিন পূজার ফুল তুলিতে যাওয়া হয় নাই। রথের সময় "বেয়ানের" বাড়ী হইতে মেয়েটি আনিবে, রথের তত্ত্ব করিবে, তাহার কিছুই হয় নাই। বেয়ান আসিলে—চারু কি জানি কেন যে লজ্জায় ঘাড় তুলিতে পারে না। আর "আমার মেয়েটি কেমন আছে বেয়ান?"—এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। মনের মধ্যে মহা একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। ভয়ের ভাবটা অনেক কমিয়া সেইখানে লজ্জার ভাবের বিশেষ আধিপত্য হইয়াছে। যেন সে সকলের কাছে মস্ত অপরাধী, যেন সকলে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে, যেন সকলে তাহার বিষয়েই কথা কহিতেছে। এমন কি সইয়ের কাছে পর্যন্ত লজ্জা করে, এ রোগের ঔষধ কি?

ভূষণদিদি বেড়াইতে আসিয়া বলিলেন, "কি কাকিমা, তোমার জামাই এসেছে! তা, দেখে এলাম—দিব্য জামাইটি, চারুরই বরের যুগ্যি বটে।" চারু সেখানে

বসিয়া ছিল, তাহার মুখ চোখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মা উত্তর করিলেন, "তা বাছা ভূষণ, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে চারু যেমন আমার একটি মেয়ে, তেমনি জামাইটি বেশ হয়েছে। তা বলি, কলকাতার ছেলে, মেয়ের তো ঐ দেখতে পাচ্ছ, কেবল টো-টো ক'রে বেড়ানো। তুমি নাকি কি নূতন রকম চুল বাঁধতে জান, চারুর চুল ক'টা বেঁধে দিয়ে যাও। সহরের ছেলে কত রকম দেখে শোনে, আমরা মা, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, অতশত তো জানি না। তা, তুমি চুল ক'টা বেঁধে দিয়ে যাও।" এমন সময় ক্ষেমা "কি হচ্ছে সই" বলিয়া উপস্থিত হইল। তারপর ভূষণকে চুল বাঁধিতে দেখিয়া বলিল, "ভাল ক'রে বেঁধে দিও দিদি, বরের মনে ধরানো চাই।" চারুর এ কথা শুনিয়া সইয়ের উপর অত্যন্ত অভিমান ও রাগ হইল। কেন না, চারুর যে লজ্জা করিতেছে, তা সই পর্যন্ত বুঝিল না, সেও ঠাট্টা করিতে লাগিল!

আবার যখন মনে হয়, মনে করিতে চারু আপনিই লজ্জায় মরিয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটু সুখ হয়। সেই হাত দুইখানি ধরিয়া আদর করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন, "চারু, লজ্জা কি, কথা কও না।" তিনি কে? তিনি চারুর বর। অমনি বুকের মধ্যে ঢেঁকি পড়িতে থাকে। আবার মনে হয়, কথাগুলি বড় মিষ্টি। এত মিষ্ট কথা কেন? সহরের লোক হইলেই কথা কি মিষ্ট হয়? আচ্ছা, তাঁকে কি রকম দেখিতে? চারু তো তাঁহাকে দেখে নাই, কেবল কথাই শুনিয়াছে। কথা শুনিয়া,—যতটা ভয়ের জিনিস ঠাহরাইয়া রাখিয়াছিল, এখন আর ততটা বোধ হয় না।

ক্ষেমা সকালবেলা মার সঙ্গে কি লইয়া ঝগড়া বাধাইয়াছিল, মা তাই রাগ করিয়া বলিতেছিলেন, "লোকের যদি মেয়ে হয়, তবে যেন চারুর মতই মেয়ে হয়। এত আদরের, তবু মুখে কথাটি নাই। ভয়েই সারা হয়। আহা, মেয়ে নয় তো, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আর আমার অদৃষ্টের দোষে এমন মেয়েও হয়েছিল, একটা কথা শুনবে না, কথায় তো এঁটে উঠা ভার। চারুর কাছে থেকেও যদি তার একটু স্বভাব পায়! দুবেলা একটু করিয়া চারুর পা-ধোয়া জল খাস্।" ক্ষেমা রাগে গস্ গস্ করিতেছিল, এমন সময় ভুবন আসিয়া খবর দিল, চারু শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। ভুবন চারুর বেয়ান, চারুর মেয়েটিকে সাজাইয়া গুজাইয়া মাটির পাল্কী করিয়া নিজে বেহারা হইয়া লইয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অমনি ক্ষেমার কাছে খবর দিয়া গেল। খবর পাইয়া ক্ষেমার রাগ মাথায় উঠিল, তৎক্ষণাৎ মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া মিটিয়া গেল। "মা আয়!" বলিয়া ক্ষেমা চারুদের বাড়ীর দিকে দৌড়িল। ক্ষেমার মাও তাহার অনুগামিনী হইলেন।

ছোট গ্রামখানি, বোসেদের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবে শুনিয়া সকলেই প্রায় দেখিতে আসিয়াছে। চারু পরিচিত সকলের মুখ দেখিতেছে, আর তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে। আর কিছুক্ষণ পরে ইহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইবে না, এই চির-পরিচিত স্নেহময় গৃহ ছাড়িয়া কোথায় কোন্ অপরিচিত কঠোর রাজ্যে গিয়া পড়িবে! সই আর কাহার সঙ্গে গল্প করিবে, খোকার ঘোড়া আর কে হইবে, সন্ধ্যাবেলা মা দাওয়ায় বসিয়া কাহাকে গল্প শুনাইবেন, মেনি বিড়ালটিকে কে

দুধভাত মাখিয়া দিবে? হায়, হায়, চারু এ সব ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? চারু নীরবে অবনত বদনে কাঁদিতে লাগিল, চারুর বেয়ান চারুর মেয়েটিকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুতুলটি কাঁদিয়াছিল কি না, তাহার ঠিক খবর রাখি না,—কিন্তু হিন্দুগৃহের কন্যা-বিদায়ের করুণ দৃশ্যে পাথরও গলিয়া যায়, মাটির পুতুল গলিবে আশ্চর্য কি?

নিজের দেশ সকলের কাছেই ভাল লাগে, কলিকাতাবাসীরা দুইদিন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করা কষ্টকর মনে করেন, কিন্তু পাড়াগেঁয়েরা যে মনে মনে কলিকাতার বড়ই সুখ্যাতি করেন, তাও নয়। অনেক পাড়াগেঁয়ে প্রকাশ্যরূপেই কলিকাতার নিন্দা করেন। নূতন স্থানে আসিয়া নূতন নূতন জিনিস দেখিয়া দুই চারি দিন মন লাগে বটে, কিন্তু যতই দিন যায়, ততই দেশের জন্য মন খাঁ-খাঁ করে। দেশের এটি উটি খুঁটিনাটি কত কি মনে পড়ে, আর সবই যেন মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। যিনি শখের জন্য বেড়াইতে আসেন, তাঁহারই এই দশা হয়, তা চারুর যে হইবে, তাহার আর আশ্চর্য কি? দুই-একদিন চারু কলিকাতার ঘর বাড়ী লোকজন দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অত লোক দেখিয়া মনে একটা বড় ভয় উপস্থিত হইল। এত লোকের মধ্যে কেহ যদি হারাইয়া যায়? আর পাড়াগাঁর রাস্তা মনে পড়িলে মহাতৃপ্তি হইত। কখন ভাবিত, এখানে যে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, ভালই করে, অত লোকের মধ্য দিয়া যাইতে কাঁহার না ভয় হয়? আবার মনে করিত, যদি নদীতে স্নান করিতে যাইতে হইত, তবে কি হইত? ওই লোকের মধ্য দিয়া তো যাইতে হইত, উহার মধ্যে যদি হারাইয়া যাইতাম?

বউ ঘরে নামিলেই শাশুড়ী "এস, আমার মা এস, আমার লক্ষ্মী এস" বলিয়া মহাযত্নে উপরে লইয়া গেলেন। ননদেরা সকলে তাহাকে কোথায় রাখিবে, কি করিবে, ভাবিয়া ঠিক পায় না। এই সব দেখিয়া চারু অবাক হইল। বিবাহের সময় দিন-কয়েক শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন কাহাকেও চেনে নাই। যে কয়েকদিন ছিল, কাঁদিয়াই কাটাইয়াছিল। এবার ক্রমে ক্রমে সকলকে চিনিল। শাশুড়ী কখনও কিছু বলেন না, যদি বলেন মিষ্টি কথায়। ননদেরা অতিশয় যত্ন করে। চারু এই অপরিচিত রাজ্যেই ক্রমে মন বাঁধিল। সই ও মার কথা মনে পড়িয়া মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়, আর অত্যন্ত দেখিবার ইচ্ছা হয়, তখন নির্জনে বসিয়া একা একা কাঁদে। ননদেরা দেখিতে পাইলে ভারি ব্যস্ত হইয়া "বউ, কাঁদ কেন, কাঁদ কেন?" বলিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করে।

শ্বশুরগৃহে এই আদরে চারুর কিছু দিন কাটিল। ঝি, রাঁধুনি পর্যন্ত বউমা বলিতে অজ্ঞান, যেন তাহারা বউমাকে পাইয়া সাত রাজার ধন এক মাণিক পাইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা চারু নির্জনে একা বসিয়া আছে, শাশুড়ী ঠাকুরঘরে মালা জপিতেছেন, দুই ননদ নীচে রান্নাঘরে আছে। চারুর অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিল। অবশেষে একা থাকিতে না পারিয়া নীচে রান্নাঘরের নিকট গেল, কিন্তু পাছে নীচে আসিয়াছে বলিয়া ননদেরা কিছু বলে, এই ভয়ে ঢুকিতে সাহস হইল না। এমন

সময় শুনিল, এক ননদ বলিতেছেন, "এমন আহ্লাদে মেয়ে গৃহস্থঘরে পোষায় না। ছোট বউয়ের সবই বাড়াবাড়ি। আমরা এত আদর যত্ন করি, তবু রাঙা চোখে জল টস্ টস্ করে, আমি বাপু এত আহ্লাদ দেখতে পারি না। শ্বশুর-ঘর কে না করে? আমরা নূতন বউ গিয়েই কত কাজ করেছি, আর উনি সংসারের কুটোখানি দুখানি করতে পারেন না।" ননদ বিবেচনা করিলেন না যে, তাঁহারাই ছোট বউকে কোনও কাজ করিতে দেন না। চারুর শুনিয়া সর্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল, সেই অভিমানপূর্ণ নয়ন জলে ভরিয়া গেল, আর রান্নাঘরের দরজায় না দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। বড় ননদ বলিলেন, "কে গেল রে? ঝি, দেখ্ তো, রমেশ বুঝি?" ঝি দেখিয়া বলিল, "ছোট বউমা উপরে উঠে গেলেন।" অমনি চক্ষে চক্ষে একটা রহস্যপূর্ণ কথা হইয়া গেল। কেহ আর কিছু না বলিয়া নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত হইলেন। চারু যখন শুইতে যাইবে, তখন শাশুড়ী ডাকিয়া বলিলেন, "ছোট বৌমা, একটা কথা শুনে যাও তো।" চারু সন্ত্রস্ত হইয়া শাশুড়ীর নিকটে গেল। তখন শাশুড়ী বলিলেন, "তুমি এতটুকু মেয়ে, তোমার এত বুদ্ধি হয়েছে? আড়ি পেতে লোকের কথা শোন? ও অভ্যাস তো ভাল নয়। তোমা হতে কি শেষে আমাদের ঘর ভাঙবে!" চারু নীরব হইয়া শুনিল, কিন্তু এ তিরস্কারের মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না। শাশুড়ী আবার বলিলেন, "এমনি আড়ি পেতে তুমি কথা শুনবে, আর খুঁটিনাটি সব যে নগেনের কানে লাগিয়ে দেবে, শেষে তোমা হতে কি আমার ছেলে পর হবে? আমার বাছা স্পষ্ট কথা! কে কোথা কি বলে তাই লুকিয়ে শুনতে যাও, তুমি তো সামান্য মেয়ে নও। আমি মনে করি শান্ত শিষ্ট। ও মা! এদিকে পেটে পেটে বুদ্ধি, মিটমিটে ডান।" বলিয়া শাশুড়ী চলিয়া গেলেন। এরূপ সম্ভাষণ চারুর পক্ষে এই নূতন, কাজেই তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অভিমান-ভরা চারু যে বড় করিয়া ডাক সহিতে পারিত না, তাহাকে এত বড় কথা সহিতে হইল! কুসুমে বজ্রাঘাতই বিধির বিধি।

স্বামী আদর করিয়া বলিলেন, "চারু, কাঁদিতেছ কেন?" চারু কিছু উত্তর দিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। তখন কিছু দুঃখিতস্বরে স্বামী বলিলেন, "চারু, আমার একটি কথার উত্তর দিবে না? আমি কি তোমার এত পর? কেবল তুমি বাপের বাড়ীর জন্যই কাঁদ। মা এত যত্ন করেন; সুরো, রাজ এত ভালবাসে, এতেও কি তোমার মন উঠে না? আমার কাছে থাকিতে তোমার একটুও ভাল লাগে না।" চারু কি উত্তর দিবে? স্বামীর কাছে আসিতে ভাল লাগে কি না, তাহা তাহার মনই জানে। যে দুঃখের বোঝা লইয়া স্বামীর কাছে আসিয়াছিল, আসিয়া তাহা দ্বিগুণ ভারি হইল।

পরদিন চারুর বড় জা বাপের বাড়ী হইতে আসিলেন। দুই-চার দিনের মধ্যে চারু বড় জার "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা" হইল। যে কোন একটা দোষ চারুর মাথায় চাপাইলেই নিষ্কৃতি। ননদেরাও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। দশ দিন না যাইতেই যে বউকে শাশুড়ী "আমার ঘরের লক্ষ্মী এস" বলিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন, সেই ঘরের অলক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইল। যে চাকর চাকরানীরা ছোট

বউমাকে সাত রাজার ধন মাণিক পাইয়াছিল, তাহারাই আবার অত্যন্ত হতশ্রদ্ধ করিতে লাগিল। শাশুড়ী বউয়ের যে একটি আধটি দোষের কথা ছেলের কাছে তুলিতে ত্রুটি করিলেন, তাহাও নয়। এমনি করিয়া দিন দিন ছোট বউয়ের নানা দোষ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে কান্না এক প্রধান দোষ হইয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী প্রায় প্রতি কথাতেই বলিতেন, "এমন ঘ্যানঘ্যানে বউ ঘরে এনেছিলাম!"

দুপুরবেলা চারু ঘরের জানালাটিতে একা বসিয়া আছে, আর বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া আপনা-আপনি চোখে জল আসিতেছে, কিছুতে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। গাল দিয়া জল গড়াইয়া আসিতেছে, আর ভয়ে ভয়ে অমনি মুছিয়া ফেলিতেছে। পাছে কেহ আসিয়া দেখে! এমন সময় নীচে বড়জার গলা শুনিতে পাইয়া বারান্দায় আসিল। শাশুড়ী চারুকে দেখিয়া বলিলেন, "কি, দুধ বেড়ালকে দিয়ে খাইয়েছ? বেশ: এখন নরেন খিদেয় মারা পড়ুক।" চারু আস্তে আস্তে বলিল, "আমি তো দুধের কিছু জানি না।" তাই শুনিয়া বড় জা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "নরেনের দুধ আমি ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, তুমি তো ঢাকা লইয়া গিয়াছ, এখন আবার জানি না, ভাল মানুষ আর কি?" চারু বলিল, "আমি তো লই নাই, ঠাকুরঝি তরকারী ঢাকা দিতে নিয়ে গিয়েছেন।" ইহাতে ঠাকুরঝি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো বড় মানুষের বোন, ঠাকুরঝির নামে তো দোষ দিবেই। এখনকার বউরা কি আর ঠাকুরঝি লইয়া ঘর করিতে পারে, নানা ফন্দিতে তাড়াইতে পারিলে বাঁচে। আমার পোড়া কপাল, তাই বাপের বাড়ীতে থাকি। শ্বশুরবাড়ীতে কি একমুঠো অন্ন জোটে না? স্বামীই যেন নাই, দেওর, ভাসুর তো আছে। আমি তখনই বলিয়াছিলাম, বড়দাদা, ছোটদাদা বউয়ের বাক্য সহ্য করিয়া আমি থাকিতে পারিব না। তা দাদারা তখন বলিলেন, 'কার সাধ্য কি যে তোমায় কিছু বলে।' আর এখন বলিবেন, আমার বউকে বলিবার তুই কোথাকার কে? মা! পায়ে পড়ি—আমাকে পাঠিয়ে দাও, আমি শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাকিব। ভাসুর দেওর এক মুঠো খাইতে দিবেই।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শাশুড়ীও সেই সঙ্গে "আমারই কপাল মন্দ, নহিলে তোর এমন অদৃষ্ট হইবে কেন? আমার সোনার চাঁদ মেয়ে, "ইত্যাদি বলিয়া কন্যার সুরে যোগ দিলেন। বাড়ীতে মহা হুলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। বড় বউ শাশুড়ী ও ননদকে নানারূপে থামাইতে লাগিলেন। আর চারু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। দাস দাসী সমস্ত জড় হইল। পুত্রদ্বয় বাড়ীতে আসিয়া বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক্ হইলেন। অনেক করিয়া দুইজনে মা ও ভগিনীকে শান্ত করিলেন। ছোটবাবু সেদিন আর রাত্রে আহার করিলেন না। রাত্রে যত মনের আক্রোশ স্ত্রীর দ্বারা মিটাইবেন ভাবিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য! চারুর বিষাদমাখা মলিন মুখখানি দেখিয়া কিছু মনে থাকিল না।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চারু, সুরোকে তুমি কি বলেছিলে?"

সরলতার প্রতিমা চারু কেমন করিয়া নিজের ওকালতি নিজে করিতে হয়,

কেমন করিয়া কথা-কাটাকাটি করিতে হয়, কিছুই জানিত না। চারু কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল, "কিছু না।"

ছোটবাবু কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কিছু না? তবে কি তারা মিথ্যা ক'রে তোমার নামে বললে? মা কি মিথ্যা ক'রে বললেন?"

চারু চুপ করিয়া রহিল।

ছোটবাবু বলিলেন, "মার তো ভারি দায়—তোমার নামে মিথ্যা করিয়া বলেন! আর তোমার দোষ না থাকিলেই কি এতটা হয়?"

চারু নীরব হইয়া রহিল।

ছোটবাবু বিরক্ত হইয়া আবার বলিলেন, "চারু, উত্তর দাও না কেন? উত্তর বুঝি ভাবিয়া ঠিক করিতেছ?" চারু আর পারিল না, কাঁদিয়া বলিল, "আমাকে মার কাছে পাঠাইয়া দাও।"

ছোটবাবু রাগিয়া বলিলেন, "কালই পাঠাইয়া দিব, আর কখনও আনিব না। জানি আমি, তুমি আমাকে ভালবাস না। মিছামিছি তোমাকে ধরিয়া রাখিয়া কি হইবে? তোমার মন তো ধরিয়া রাখিতে পারিব না।"

পরদিন ছোটবাবু উদ্যোগ করিয়া বউকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

আনন্দময় হৃদয় চারু বাপের বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিল; আসিয়া আর ফিরিয়া পাইল না। আবার মার কোল পাইল, সই আসিল, বেয়ান আসিল, ভূষণদিদি আসিল,—কিন্তু সেই স্নেহমুখগুলি চারুর তপ্ত হৃদয় শান্ত করিতে পারিল না। স্বামীর কথাগুলি আগুন হইয়া অহোরাত্র চারুর বুকে জ্বলিতেছিল। মেনি বিড়ালটা চারুকে দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিল, কিন্তু চারু আর তাহাকে কোলে লইল না। আমতলার খেলাঘরে হাঁড়িকুড়ি গড়াগড়ি যাইতেছে, চারু আর গুছাইয়া রাখিল না। চারুর মেয়ে কতদিন শ্বশুর বাড়ী রহিয়াছে, চারু আসিয়া তাহাকে আনিল না। তিন মাসের মধ্যে চারুর এত পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইলেন। মা শুনিলেন, জামাই মেয়েকে রাগ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে; শুনিয়া মুখখানি ভার করিলেন, চারুকে কিছু বলিলেন না। চারু মার গৃহ-কার্যে মন দিল। সর্বদা মার কাছে কাছে বেড়ায়, মা তাহাতে বড় সুখী নন, মেয়ে একটু খেলা-টেলা করিয়া বেড়াইলে বড় আনন্দিত হন। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাস গেল, জামাই কোন খবর লইল না, চারু ঈষৎ রুগ্ন হইয়া পড়িল। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাস গেল, তথাপি কোন সংবাদ নাই। জ্যৈষ্ঠ মাস, চারু বড় পীড়িত হইল। চারুর পীড়ার সংবাদ কলিকাতায় শ্বশুরবাড়ী গেল। শাশুড়ী বলিলেন, "এখন মেয়ে পাঠাবার পথ না পেয়ে ব্যামোর ফিকির করেছে। আবার পায়ে ধ'রে পাঠাতে তো হ'ল। বড় যে দর্প ক'রে এতদিন ঘাড়ে ক'রে রেখে যায় নি, এখন কেন? ব্যামো হয়েছে সেরে যাবে, হুট্ বলতেই নগেন যাবে, ওদের চাকর না কি? নিতে এল না, নিমন্ত্রণ পাঠালে না, জামাইকে হুকুম ক'রে পাঠালেন, অমনি জামাই যাবে, এত কেন? নগেন, লিখে দে, এখন যাবার সময় নাই, এখানে যেন তারা রেখে

যায়।" ননদেরও ঐরূপ মত হইল। কিন্তু নগেন বেচারি কি করে? চারুর উপর রাগ কোন্ দিন তাহার পড়িয়া গিয়াছে। মায়ের ভয়ে এতদিন কিছু বলে নাই। এখন চারুর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া বড় কাতর হইয়া পড়িল। সেই সুন্দর মলিন মুখখানি যতবার মনে পড়িতে লাগিল, ততবারই আপনাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দিন কয়েক হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া অবশেষে শ্বশুরবাড়ী যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। মা এই কথা শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "ওমা! তুই কি তাদের চাকর না কি? তাই 'তু' ব'লে ডাকতেই যাবি?" ইত্যাদি ইত্যাদি বলিতে থাকিলেন। নগেন নানারূপে মাকে বুঝাইয়াছিল। ছেলের কথা বুঝেন না, এমন মা খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই অবশেষে গৃহিণীকে নগেনের শ্বশুরবাড়ী যাত্রায় মত দিতে হইল।

রথের পূর্বদিবস নগেন শ্বশুরবাড়ী রওনা হইলেন। আর-বৎসরের সুখ-স্মৃতি পথে মনে জাগিতে লাগিল। আর-বৎসর ঠিক এই দিনে কি ভাবে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছিলেন, আর এ বৎসরই বা কি ভাবে যাইতেছেন! চারুর সেই সুকুমার বিষাদ-মাখা মুখখানি মনে পড়িয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দারুণ আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আপনাকে মনে মনে শত শত ধিক্কার দিলেন, আর কি বলিয়া চারুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তাহাও ঠিক করিয়া লইলেন। সমস্ত পথ কল্পনা করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় শ্বশুরবাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। সহসা কল্পনা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শাশুড়ী অন্তরালে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। সেই রথের পূর্ব-দিবস, সেই সুশ্যামা সন্ধ্যাবেলা, সেই শ্বশুরবাড়ী, সবই সেই—কেবল চারু নাই। সংসারের কঠোর আঘাতে চারুরূপ কুসুমটি না ফুটিতে ফুটিতেই ঝরিয়া গিয়াছে। জাগ্রত সংসার। কৃষকেরা হালস্কন্ধে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী আসিতেছে, পক্ষীকুল ঝাঁকে ঝাঁকে রব করিয়া কুলায়ে ফিরিতেছে, ছেলেমেয়েরা আনন্দে রথের বাঁশী বাজাইতেছে, গৃহিগণ ঘরে ঘরে মঙ্গল-আরতি করিতেছে ও সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতেছে। কিন্তু চারু কোথায়? চারু এ সংসারে চির-নিদ্রিত।

—'সাহিত্য,' কার্তিক, ১২৯৯

সঙ্গিনী

প্রভাত-অরুণালোক তখনও ঘাটে আসিয়া পড়ে নাই, কেবল জলের উপর ঊষার আলো পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। চান্দেরী নদী নাচিয়া নাচিয়া যেন কোন্ অনন্ত উদ্দেশে নিশিদিন অবিরাম ভাবে চলিতেছে। তীরে নাগকেশর গাছের উপর একটা কোকিল ডাকিতেছিল, নীরব বনের মাঝে তাহার মধুর সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া মিশাইয়া যাইতেছিল। দূরে অর্বলী অটলভাবে যেন জগতের সুখ-দুঃখের, ভাঙ্গা-গড়ার, কত অতীত কীর্তির সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সংসার তখনও নিদ্রাশ্রান্ত নয়ন ভাল করিয়া উন্মীলন করিতে পারে নাই, অর্ধজাগ্রত হইয়া অলসভাবে ধীরে ধীরে নয়ন মেলিতেছে। এমন সময় দুইটি বালিকা ছোট ছোট দুইটি কলস লইয়া ঘাটে আসিল। ভাদ্র মাস, আকাশ নীল নির্মল। নিকটের বনশ্রেণী ক্রমে ক্রমে দূরে গিয়া যেন আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। চান্দেরী পূর্ণযৌবনা রমণীর ন্যায়, হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-মালা লইয়া, কূলে কূলে কানায় কানায় টল টল করিতেছে। ধীরে ধীরে আধখানা সূর্য পূর্বগগনে জাগিয়া উঠিতেছে। মধুরতার সহিত গাম্ভীর্যের মিলন হইয়াছে।

বালিকা দুইটির বড়টির বয়স বারো-তেরো বৎসর হইবে, তাহার নাম রমা। রমা সুন্দরী, তাহার সৌন্দর্যের কথা পল্লীতে বিখ্যাত। দৃষ্টি আনন্দমোহপূর্ণ, নব-যৌবনের বিকাশে চঞ্চল। মুখে প্রফুল্লতা উৎকণ্ঠায় মিশ্রিত। চোখে, মুখে, দৃষ্টিতে যেন আবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাল্যযৌবনের সন্ধিস্থলে অপূর্ব শ্রীতে রমার সুকুমার তনু পূর্ণ হইয়াছে।

ছোটটির নাম সরস্বতী। সে এগারো-বারো বছরের। দলিত কুসুমের যেমন একটু করুণ সৌন্দর্য থাকে, প্রভাত-শুকতারার যেমন পাণ্ডুশ্রী থাকে, তেমনি কেমন একটু মাধুর্য তাহার মুখে, দৃষ্টিতে, লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে সৌন্দর্যে তীব্রতা নাই, তাই সকলে তাহা বুঝিতে বা উপভোগ করিতে পারে না। বালিকার চপলতা বিন্দুমাত্রও তাহার মুখে নাই, তাহার পরিবর্তে গম্ভীর শান্ত ভাব। নয়ন দুইটির বিষণ্ণ স্থির দৃষ্টি।

রমা ঘাটে আসিয়া একবার আকাশের দিকে, একবার পরপারের তরুশ্রেণীর দিকে, মাঝে মাঝে চমকিত ভাবে ঘাটের পথের দিকে, ফিরিয়া চাহিতেছিল। একটু পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মোহন আজ আর আসিল না!"

সরস্বতী সোপানে বসিয়া নতদৃষ্টিতে জল-কল্লোলের খেলা দেখিতেছিল। সম্প্রতি তাহার একটি ভাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে, সেই কথা মনে পড়িয়া বিন্দু বিন্দু চোখের জল জলে মিশাইতেছিল। এমন সময় রমার কথা কানে গেল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, "মোহন আজ আসিবে বলিয়াছিল?"

রমা হাসিয়া বলিল, "না, মোহন আসিবে বলে নাই, তাহা হইলে সে এতক্ষণ আসিত।"

সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি?"

রমা কথার উত্তর দিল না, একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। দূরে তরুশ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যের মত একজন দেখা যাইতেছিল, রমা একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ছিল। যখন সে ক্রমে নিকটে আসিল, তখন রমা "মোহন!" এই কথাটি বলিয়া একটু আগ্রহের ভাবে অগ্রসর হইয়া গেল। সরস্বতী ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিল।

মোহনলাল শ্রীমান ও বলিষ্ঠ। বয়স আঠারো বৎসর। মুখে ও পরিচ্ছদে কিছু বিলাসিতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই মোহনই রমার ভাবী স্বামী। তাহার সহিত রমার বিবাহসম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তবু বাল্যকালের খেলার সঙ্গী বলিয়া রমা মোহনকে লজ্জা করিত না।

মোহন আসিলে রমা বলিল, "আজ এত দেরী কেন মোহন? এতক্ষণ কি করিতেছিলে?"

মোহন বাম হস্তের সাজি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বলিল, "এই দেখ রমা, তোমার জন্য আজ কত ফুল তুলিয়া আনিয়াছি।"

রমা বলিল, "তাই তো, সকাল হইতে বুঝি ফুল তুলিতেছিলে? অনেক ফুল তো তুলিয়াছ মোহন? সরস্বতী, ভাই দেখিয়া যা, মোহন কত ফুল আনিয়াছে।"

সরস্বতী রমার কথা শুনিয়া, রমার রাগ করিবার ভয়ে সেই দিকে পা বাড়াইতে গেল, কিন্তু পা অবাধ্য হইয়া তাহার বিপরীত দিকে অগ্রসর হইল। রমা সরস্বতীর বিপদ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "তোর ভাই এত লজ্জা? মোহনের কাছেও তোর লজ্জা করে?"

সরস্বতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে এক পা এক পা করিয়া জলে পা বাড়াইতে লাগিল। মোহন তাহার সেই লজ্জারক্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। শেষে বলিল, "রমা, আমি যাই। সরস্বতী আমার জন্য লজ্জায় বুড় কষ্ট পাইতেছে।" বলিয়া মোহন চলিয়া গেল।

মোহনকে যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, রমা নিমেষবিহীন চক্ষে সেই বনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। যখন মোহন একেবারে বনের ভিতর মিশাইয়া গেল, তখনও রমা সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

সরস্বতী জল হইতে ডাকিল, "রমা!"

রমা চমকিত ভাবে পিছনে ফিরিয়া চাহিল।

সরস্বতী একটু হাসিয়া বলিল, "মোহন আসিলে তোমার তো জ্ঞান থাকে না, দেখ দেখি, কত বেলা হইয়া গিয়াছে। স্নান করিবে না?"

প্রথম প্রেমের বিকাশ কি মধুর! তখন জগৎ যেন শুধু মধুময় বলিয়া বোধ হয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে অসৌন্দর্য যে কিছু আছে, তাহা মনে থাকে না। জীবন যেন কেবল সুখ-স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। রমার কোমল হৃদয় এই প্রণয়মোহে আচ্ছন্ন। মোহনের কথা তো ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখন যেমন মধুর বোধ হয়, এমন মধুর তো কখনও লাগিত না। মোহনের হাসি কি

মধুর! মোহন যাহা করে, সকলই সুন্দর, সকলই মধুর! মোহনের যে কিছু দোষ থাকিতে পারে, এ কথা রমার হৃদয়ে এক মুহূর্তও স্থান পাইত না।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যখন সংসার নিদ্রিতের মত নীরব শ্রান্তভাবে থাকিত, যখন পশুপক্ষীরা রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া নিজ নিজ আশ্রয়ে বিশ্রাম করিত, কেহ কোথাও থাকিত না, সেই সময় নদীর ধারে, নাগকেশর তরুর ছায়ায়, পাথরের উপর বসিয়া, মোহন আর রমা কত গল্পই করিত! ছেলেবেলা হইতে দুইজনে চিরদিন একত্র ছিল, তাই এ প্রণয়ে লজ্জার বাধা নাই। তখনও বালিকার প্রেম, ইহাতে যৌবনের সঙ্কোচ, অভিমানের ছলনা প্রভৃতি কিছু নাই। সেই চান্দেরী নদীর তীরে, সেই নির্জন নাগকেশর তরুতলে, শিলাসনে, চারিধারে প্রকৃতির মধুর স্নেহ, তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া বালিকা ভাবিত, "বুঝি মোহন আর আমি ছাড়া জগতে আর কেহ নাই। বুঝি মোহনের জন্যই আমি, আমার জন্যই মোহন।"

আর মোহন! সে নিজে নিজের হৃদয় বুঝিতে পারে নাই। রমা সুন্দরী, তাহার বাল্যসহচরী. তাই সে ভাবিত, সে রমাকে ভালবাসে; কিন্তু সেই সঙ্গে, কি জানি কেন, সরস্বতীর লজ্জারক্ত মুখকান্তিও তাহার মনে জাগিত। মোহন আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে নাই, তাহার নিজের হৃদয় তাহাকে প্রতারণা করিতেছিল।

সেই নির্জন দ্বিপ্রহরে তরুতলে বসিয়া দুইজনে কত কথা হইত! রমা চরণের কবিতা শিখিয়াছিল, তাহাই মোহনের নিকট আবৃত্তি করিত। চান্দেরী নদীর কল কল তরঙ্গ-প্রবাহের সঙ্গে বালিকার মধুর কণ্ঠনিঃসৃত রাজপুতানার অতীত গৌরবকাহিনী মিশিয়া যাইত।

গাহিতে গাহিতে যখন রমা থামিত, তখন তাহার সেই চিরহাস্যময় মুখ গম্ভীর হইত, সে মোহনকে আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "মোহন, সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে না?" মোহন রমার ভাব বুঝিতে পারিত না, সে বলিত, "কোন্ দিন?" রমার তখন আর সে বালিকার চপল ভাব থাকিত না; নয়ন উজ্জ্বল হইত, মুখে দৃপ্ত ভঙ্গী বিকশিত হইত। সে গম্ভীর ভাবে বলিত, "সেই দিন, যে দিন হামীর ছিলেন, যে দিন প্রতাপসিংহ ছিলেন, সঙ্গ ছিলেন, সেই দিন কি আর ফিরিবে না? এখন কি করিলে সে দিন ফিরিয়া আসে?"

মোহনের ও-কথা বড় ভাল লাগিত না। সে কথার উত্তর না দিয়া মোহন অন্য কথা তুলিত।

"রমা, আমাদের কেমন নূতন দোলনা হইয়াছে, তা তুমি দেখিয়াছ? কাল তুমি দুলিবে না?"

রমা বলিত, "না মোহন, আমার দুলিতে ইচ্ছা করে না, আমার কিছুই ভাল লাগে না, যখন এ সকল কথা মনে পড়ে। আহা, কেন সে দিন গেল?"

মোহন হাসিয়া বলিত, "তা, তুমি কি সে দিন ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না?"

রমা মোহনের কথা শুনিয়া খানিক নীরব হইয়া থাকিত, শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত চিত্তে বলিত, "না মোহন, তুমি হাসিও না, আমার বড় কষ্ট হয়।" ধন্য সেই দেশ, যে দেশে বালিকারও এমন স্বদেশপ্রেম!

আবার কোনদিন রমা পুষ্পের মালা গাঁথিত, চঞ্চল অলকদাম মুখের উপর বার বার পড়িয়া তাহাকে বিরক্ত করিত। রমা একমনে পুষ্পহার গাঁথিত, মোহন রমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রমা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গুনগুন স্বরে গান গাহিত।

যখন সে গাহিত, তখন মোহন রমার মধুর ও আবেগপূর্ণ স্বর শুনিতে শুনিতে মুগ্ধচিত্তে অবাক হইয়া থাকিত। নদী কুলু কুলু রবে অবিশ্রাম বহিয়া যাইত। সরস্বতী তখন কোথা?

সরস্বতী ও রমা দুইজনে জ্ঞাতিভগিনী, ব্রাহ্মণকন্যা। রমা অল্পবয়সে মাতৃহীনা হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ীর ভিতর সে কেবল একটি সন্তান, তাই সে সকলের বড় আদরিণী। সে যখন যাহা চাহিয়াছে, তখনই তাহা পাইয়াছে। কখনো তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে নাই; তাই সে স্বভাবতঃ কিছু অভিমানিনী আর গর্বিতস্বভাব হইয়াছিল।

আর সরস্বতী? সে ছেলেবেলা হইতে কখনও কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিত না। সকলের নিকটই যেন সে কত অপরাধিনী! সর্বদাই তাহার সঙ্কোচ। মানুষের দৃষ্টিভারে লজ্জাবতী লতার মত সে সঙ্কুচিত। এমন মধুর শান্ত স্বভাব, যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

সরস্বতী কেবল রমাকে সঙ্কোচ করিত না। রমা তাহার প্রাণের প্রাণ। যদি কখনো রমা অন্যায় করিয়া তাহাকে কিছু তিরস্কার করিত, তখন সরস্বতী কাঁদিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু তাহার জন্য রমার উপর তাহার কখনো রাগ হইত না। রমাও সরস্বতীর চোখে জল দেখিয়া অনুতপ্ত হইত। এই দুই সঙ্গিনীতে কখনো বিবাদ কি মনোমালিন্য হয় নাই। একবার রমার অসুখ করিয়াছিল, তখন পনরো দিন সরস্বতীর আহার-নিদ্রা ছিল না। ইহার মধ্যে সে এক মুহূর্তও রমাকে ছাড়িয়া অন্যস্থানে যায় নাই, যখন রমা মোহনের সঙ্গে গল্প করিত, তখন সরস্বতীর কোন কাজ না থাকিলে সে তাহার একটু দূরে আড়ালে বসিয়া থাকিত। মোহনের সম্মুখে তাহার যাইতে লজ্জা করে, অথচ রমাকে ছাড়িয়া একাও সে থাকিতে পারে না, কাজেই সে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। যখন রমা জ্ঞানহারা হইয়া মোহনের সঙ্গে গল্প করিত, তখন সরস্বতী অনিমিষ নয়নে তাহাদের দেখিত। কে বলিবে, এমন লুকাইয়া দেখিয়া তাহার কি সুখ?

সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, সরস্বতী ঘরে প্রদীপ দিয়া ভাইটিকে কোলে করিয়া প্রাঙ্গণে আসিল। কাল রমার বিবাহ, সরস্বতীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। সে রমাদের বাড়ী যাইতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে "সরস্বতী, কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া এক মুখ হাসি লইয়া রমা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

রমাকে দেখিয়া সরস্বতীর চোখে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল, "আজ সমস্ত দিন তোমার দেখা পাই নাই কেন?"

রমা উত্তর দিল না।

সরস্বতী আবার একটু হাসিয়া বলিল, "কাল তোমার বিবাহ বলিয়া আস নাই, না? তা, এখন আর কি আমাদের দেখা দিবে, এখন মোহনই তোমার সঙ্গী হইবে।" সরস্বতী আজ আনন্দে উচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, শেষে আপনিই লজ্জিত হইল।

রমা বলিল, "তুই মোহনকে কেন লজ্জা করিস্ সরস্বতী?"

সরস্বতী বলিল, "কি জানি ভাই, এই খোকা সব জানে। কেমন খোকা-ভাই?" বলিয়া ভাইয়ের মুখে একটা চুম খাইল।

রমা বলিল, "তোর সকলই অনাসৃষ্টি! মোহনকে আবার কিসের লজ্জা? আর এরই মধ্যে তোর এত লজ্জা কোথা হইতে আসিল?"

সরস্বতী একটু হাসিয়া বলিল, "রমা রাগ করিও না। আমি কি করিব? আমি মোহনের সম্মুখে যাইতে পারি না, কেন তা বলিতে পারি না।"

রমা মৃদু তিরস্কার ছলে বলিল, "যাঃ, তবে তুই মোহনকে ভালবাসিস্ না।"

রমার এই কথায় অপরাধিনীর ন্যায় সরস্বতীর প্রফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "রমা, আমি মোহনকে ভালবাসি। তুমি মোহনকে ভালবাস, আমি কেন বাসিব না? তুমি যখন মোহনের কাছে থাক, তখন আমার তাহা দেখিতে ইচ্ছা করে। তাই দূরে হইতে দেখি, কাছে গিয়া তোমাদের কথায় বাধা দিতে ইচ্ছা হয় না।"

মোহনলাল অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, কিন্তু অভিভাবক কেহ নাই। কাজেই মোহন কুসঙ্গে পড়িয়াছিল। অল্পবয়স্ক বালক অতুল ঐশ্বর্য হাতে পাইলে তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা থাকে না, মোহনেরও তাহা হইয়াছিল। বিশেষতঃ পারিষদ্-গণের সদুপদেশে মোহন দিন দিনই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তবে তাহার হৃদয় বড় কোমল ছিল, তাই সঙ্গীগণের সৎপরামর্শেও সহজে তাহার হৃদয়ের সে মধুর ভাবটুকু অন্তর্হিত হয় নাই।

তরল ও বিলাসী চিত্তে কখনো ভালবাসা স্থান পাইত না, সে কেবল রমার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। যখন রমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল, তখন কিছু দিনেই তাহার সেই মোহ ফুরাইয়া গেল, তখন রমা তাহার নিকট নিতান্ত বিরক্তির সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। সরস্বতীর আরক্ত সুন্দর মুখ, তাহার যৌবন স্বপ্নে জাগিতেছিল, এখন সরস্বতীই কেবল তাহার একমাত্র আরাধনার বস্তু হইল। কি করিলে সরস্বতীকে পাইবে, কেবল তাহাই মোহনের একমাত্র চিন্তা—রমা এখন আর ভাল লাগে না।

রমা মোহনের এ পরিবর্তন প্রথম প্রথম তেমন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। তখন তাহার হৃদয় নবানুরাগের আনন্দে বিভোর, কিন্তু রমা ক্রমে ক্রমে যেন স্বামীর কেমন কেমন ভাব দেখিতে লাগিল। প্রথম ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না।

এখন কি আর মোহন রমাকে তেমন ভালবাসে না? কই, এখন রমা কাছে গেলে তাঁহার মুখে তো আনন্দের চিহ্ন দেখা যায় না; বরং তাহার পরিবর্তে তাঁহার

যেন বিরক্ত বিরক্ত ভাবই বোধ হয়, এখন রমা প্রেম-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে "মোহন!" বলিয়া ডাকিলে, কই, তিনি তো উত্তর দেন না? রমা মোহনের নিকট কি অপরাধ করিয়াছে?

রমা কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া এক দিন মোহনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি কিছু অসুখ করিয়াছে?"

মোহন স্তব্ধ ভাবে বলিল, "না।"

রমা আর কিছু কথা খুঁজিয়া পাইল না। হায়, সেই অফুরান কথা এখন কোথায় গেল?

রমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দেখিল, তাহার কথায় মোহনের মন নাই, তিনি অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছেন।

রমা আবার বলিল, "তবে তোমায় এমন বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

মোহন সেইভাবে উত্তর দিল, "বিষণ্ণ আবার কোথা?"

রমা আর পারিল না, সে কাতর স্বরে বলিল, "আমার কথায় ভাল করিয়া উত্তর দাও না কেন? আমি কি কিছু দোষ করিয়াছি?"

মোহন অন্যমনস্ক ছিল, বুঝি রমার কথা শুনিতে পাইল না। সে কথার উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রমা কি করিবে? রমার রোদন ছাড়া আর উপায় কি?

ছেলেবেলা হইতে দুঃখ যে কাহাকে বলে, অনাদর কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। আজ মোহনের অনাদর তাহার সহ্য হইবে কেন? অভিমানিনী বালিকার কখনো দুঃখ, কখনো অভিমান আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

কিন্তু অভিমান কাহার উপর? মোহনকে কথা জিজ্ঞাসা না করিলে আপনি কোন কথা বলিবে না। কখনো কখনো কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাওয়া যায় না। কাজেই রমা আর একদিন অনেক কষ্টে বুক বাঁধিয়া, মোহনকে অনুনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেন কথা কও না, বল। আমি কি অপরাধ করিয়াছি, বল।"

আজ রমার সৌভাগ্যক্রমে মোহন মিষ্টস্বরে উত্তর দিল, "তুমি কি অপরাধ করিবে রমা?"

মোহনের আদরে রমার হৃদয়ের দুঃখ-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল। "তবে তুমি আমার কোন কথার উত্তর দাও না কেন? আমি তোমার কাছে কি করিয়াছি?" বলিয়া রমা কাঁদিয়া ফেলিল।

রমার চোখে জল দেখিয়া মোহনের হৃদয় কোমল হইল, মনে অনুতাপ হইল। সে বলিল, "তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহি নাই? সেটা তো আমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে? তাহাতে কি তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ রমা?"

রমা এক মুহূর্তে সব ভুলিয়া গেল, তাহার আর কোন কথা মনে থাকিল না। আনন্দে পূর্ণ হইয়া সে মোহনের সহিত কত কথাই কহিতে লাগিল! মোহনও ক্ষণিক মোহে রমার সেই প্রেমপূর্ণ অনিন্দনীয় মুখ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে ক্রমে ক্রমে ছেলেবেলার কত কথা উঠিল, কতদিনকার কত ছোট ছোট

কাহিনী মনে পড়িয়া সুখে লজ্জায় হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল। শেষে রমা বলিল, "আহা, সরস্বতীকে আমার একবার দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কতদিন দেখি নাই!"

মোহন শুনিয়া আবার অন্যমনস্ক হইল, সরস্বতীর লজ্জারক্ত সুকুমার মুখচ্ছবি আবার তাহার মনে পড়িল।

রমা বলিল, "সরস্বতী আমায় কত ভালবাসিত, কি শান্ত লাজুক মেয়ে! অমন সুন্দর মুখ আমি কোথাও দেখি নাই। সরস্বতীর বিবাহ-সম্বন্ধ কি কোথাও হইয়াছে, বলিতে পার?"

মোহন অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমা মোহনের সে ভাব লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "সরস্বতীর বিবাহের সময় কি আমোদই হইবে! আমি সে সময় সেখানে যাইব। মোহন, এবার বোধ হয় সরস্বতী আর তোমাকে লজ্জা করিবে না। ও কি, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

মোহন উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া রমা মোহনের সঙ্গে সঙ্গে গেল। গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইতেছ?"

মোহন অপ্রসন্নভাবে বলিল, "তুমি ঘরে যাও।"

রমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে?"

মোহন বলিল, "আমাকে বিরক্ত করিও না।" বলিয়া মোহন চলিয়া গেল।

হায়, রমার সে মাহেন্দ্রমুহূর্তের আনন্দস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সেই সঙ্গে বুঝি অভিমানিনীর হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া গেল।

ফাল্গুন মাস, সায়াহ্ন কাল। নববসন্তসমাগমে বৃক্ষের নবপত্রবিকাশ ও নব-মুকুলোদ্গম হইতেছে, মানবের হৃদয়েও বুঝি নব আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি যেন রূপডালি ফুলে ফলে সাজাইয়া বিশ্বপতির চরণে উপহার দিতেছেন। চারি দিক কাঞ্চন ফুলের বর্ণে আলো হইয়া উঠিয়াছে। পার্বতীয় প্রদেশে বসন্তের শোভা কি সুন্দর, তাহা বঙ্গদেশে থাকিয়া বুঝা যায় না, সেই নবপত্রশোভিত শাল-অরণ্যময় পর্বতশৃঙ্গ, স্থানে স্থানে শত শত বনপুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী হাস্যময়ী, পুষ্পভূষণা! এক-একটা গাছ সর্বাঙ্গ ফুটন্ত পরগাছায় ঢাকিয়া উচ্চশির তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপরে সুনীল নির্মল আকাশ, নিম্নে পুষ্পভূষিতা আনন্দময়ী ধরণী।

কাল হোলী উৎসব হইয়া গিয়াছে। রাজপথে এখনও ধূলা দেখা যাইতেছে না, চারিদিকেই ফাগে লালে-লাল হইয়াছে। রাজপথ দিয়া রমণীগণ হোলীর গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। রঙ্গিন বস্ত্র পরিয়া, ছোট ছোট ছেলে কোলে করিয়া, যুবতীর দল কাতারে কাতারে চলিয়াছে। আজ সকলেরই পরিধানে রক্তবস্ত্র, সকলেরই মুখে আনন্দ-চিহ্ন।

এমন সুখের দিনে একটি যুবতী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছে? কপোল বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জলবিন্দুগুলি ভূমিতল সিক্ত করিতেছে। সে উৎসবের বস্ত্র পরে নাই, উৎসবে তাহার আনন্দ নাই।

এই কি রমা? এই কি সেই চঞ্চল হাস্যময় নয়নের দৃষ্টি? সেই অর্ধস্ফুট মুকুলের এই কি বিকশিত কুসুম? রমাকে আর চেনা যায় না, সে একেবারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুন্দর বদন কালিমাময় হইয়াছে।

হায়, রমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। স্ফুটনোন্মুখ বালিকা-হৃদয়ে প্রণয়মোহ-কল্পনায় সে যে নন্দনকানন গড়িয়াছিল, কঠোর মতের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন সে মোহনকে চিনিয়াছে, এত দিন পরে মোহনের প্রকৃত ছবি তাহার চক্ষে পড়িয়াছে। হায়, পৃথিবীর গতিই এই।

এমন সময় মোহনলাল গৃহে প্রবেশ করিল। মোহনের আর সেই পূর্বের মত বিশুষ্ক মুখচ্ছবি নাই, যেন কোন কার্যের সফলতায় তাহা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মোহন আসিয়া বলিল, "আজ যে উৎসবের বসন পর নাই? রমা, কাঁদিতেছিলে নাকি?"

রমার চোখের জল তখনই শুকাইয়া গেল। পরিষ্কার কণ্ঠে গম্ভীরস্বরে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ কবে স্থির হইয়াছে?" এ কথা সকলেই জানিত। মোহনের গোপন করিবার দরকার ছিল না, তথাপি বিস্মিতের মত বলিল, "কাহার বিবাহ রমা?"

রমা সেইভাবে বলিল, "তোমার বিবাহ।"

মোহন হাসিয়া বলিল, "সে কি? আমার বিবাহ? কাহার সঙ্গে?"

রমা বলিল, "সরস্বতীর সঙ্গে।"

মোহনলাল উত্তর না পাইয়া নীরব হইয়া রহিল।

মোহনলালের ধনের অভাব ছিল না, দেখিতেও তিনি সুরূপ, তিনি ইচ্ছা করিলেই শত শত সুন্দরীকে বিবাহ করিতে পারেন। তিনি যখন বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন, তখন সরস্বতীর দরিদ্র পিতা মাতা মহানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন। মোহনলালের মত এমন সুপাত্র সরস্বতীর কপালে যে হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল? তবে যদি সতীনের কথা বল, তা সতীন এমন কাহারই বা না থাকে? বিশেষতঃ, রমার মত সতীন, তাহাতে আপত্তির কোনও কারণ নাই। রমার সহিত যে সরস্বতীর বিবাদ হইবে না, কেহ কাহারও সৌভাগ্যে হিংসা করিবে না, ইহা স্থিরনিশ্চয়। অতএব, এমন বিবাহে সম্মতি দিতে সরস্বতীর পিতামাতার তিলার্ধও বিলম্ব হয় নাই। বিবাহের দিনও স্থির হইয়াছিল, কিন্তু সরস্বতী এ পর্যন্ত এ কথা কিছু জানিত না।

মোহনলাল একটু চুপ করিয়া শেষে হাসিয়া বলিল, "সরস্বতীর সঙ্গে আমার বিবাহ, এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?" রমা উত্তর দিল না, বুঝি উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তখন মোহনলাল আবার বলিল, "সরস্বতীকে তুমি না বড় ভালবাস? সরস্বতী যদি তোমার সপত্নী হয়, তাহাতে আর তোমার দুঃখ কেন? ভালই তো হইবে, দুইজনে চিরকাল একত্রে থাকিবে।"

রমার উত্তর না পাইয়া বলিল, "রমা, তুমি যে আমার কথায় উত্তর দিতেছ না? আমার উপর কি রাগ করিয়াছ?" বলিয়া রমার হাত ধরিল।

রমার সর্বশরীরে যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বাল্যের গর্বিত

স্বভাব যেন তাহার ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে হস্ত মুক্ত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "মোহন, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি আর তোমার স্ত্রী নাহি।"

তেমনি মধুর ঊষা। সেই চান্দেরী নদীতীরের বনশ্রেণী। সেই রমা ও সরস্বতী। কিন্তু হায়, সে দিন কোথা? সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

চারিধারেই সেই শৈশবের স্মৃতিচিহ্ন, নীরব ভাষায় যেন কতদিনের কত কাহিনী বলিতেছে। কিন্তু হায়, সে মধুময় শৈশবকাল কোথা? শৈশবের সে সরল মধুসিক্ত অন্তর কোথায়?

ধীরে ধীরে প্রভাতের বায়ু রমা ও সরস্বতীর অলক কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। রমার মুখ শুষ্ক, গম্ভীর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম শোভা পাইতেছে। সরস্বতীর মুখ ম্লান, বহু রোদন হেতু চক্ষু রক্তবর্ণ।

তেমনি আধখানা সূর্য ধীরে ধীরে পূর্বগগনে দেখা দিতেছে। এই সোপানে একদিন মোহন বসিয়া ছিল, রমা মালা গাঁথিতেছিল। সেও এমনি সময়। এমন সময় সরস্বতী না জানিয়া ঘাটে আসিয়া কি লজ্জাই পাইয়াছিল! রমা সরস্বতীকে হাসিয়া হাসিয়া কত উপহাস করিতেছিল, সে দিন আর সরস্বতীর লজ্জা রাখিবার স্থান ছিল না।

এই সব স্মৃতিতে আজ রমা ও সরস্বতীর হৃদয় মথিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে রমা অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "সরস্বতী, তুমি মোহনকে বিবাহ করিবে না কেন? মোহন কি অপাত্র? তিনি কি তোমার স্বামী হইবার যোগ্য নন? সরস্বতী, তাহা নয়। তাঁহার গুণ অনেক আছে, কিন্তু কেবল আমারই অদৃষ্টদোষ।" হায় রমা, এখন তোমার গর্ব, অভিমান কোথা?

সরস্বতী রুদ্ধস্বরে বলিল, "রমা, তুমিও কি আমাকে ঐ কথা বলিবে? তোমার কি মনে নাই, এক বছর আগে তুমি একদিন বলিয়াছিলে, 'সরস্বতী, তুই মোহনকে ভালবাসিস্ না?' আমি বলিয়াছিলাম, 'তুমি মোহনকে ভালবাস, তবে আমি কেন বাসিব না?' এ কথার অর্থ তুমি বুঝিতে পার নাই। আমার আবার বিবাহ কি? তোমার সুখ দেখিলে আমার সুখ হয়, তোমার কষ্টে আমার বুক ফাটিয়া যায়। লোকে স্বামীকে কেমন ভালবাসে, জানি না; কিন্তু আমি সূর্যদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, আমি তোমাকে যত ভালবাসি, এত আর কাহাকেও নয়।" বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। অজস্র অশ্রুধারে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর দুইজনে কেহ আর কোন কথা কহিল না। দুইজনে নীরব হইয়া রহিল। দুইজনের নীরব হৃদয় দুইজনে অনুভব করিতে লাগিল। আকাশ অবাক হইয়া দুইজনের এই পবিত্র সখিপ্রেমের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ক্রমে সূর্য সম্পূর্ণরূপে আকাশে উদিত হইলেন। কনক রৌদ্র অরণ্যে,

বৃক্ষপত্রে, সলিলে, রমা ও সরস্বতীর মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। মাঠ দিয়া কৃষকসন্তান গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

এক নজর তোম্‌কো না দেখ্‌নেসে হাম মর্‌ যাওয়েংগে
জানি জানি মর্‌ যাওয়েংগে।
জানি তেরা শির্‌কা কসম
সৌবি জহর খাওয়েংগে,
জানি জানি মৌরি জহর খাওয়েংগে।

সংগীতের মধুর স্বর আসিয়া রমার শ্রবণে প্রবেশ করিয়া কত তরঙ্গই তুলিতে লাগিল! সরস্বতী নীরব জ্ঞানহীনের মত বসিয়া রহিয়াছে। সহসা রমা বলিল, "সরস্বতী, স্নান করিয়া আয়, বেলা হইয়া গেল।"

সরস্বতী তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া জলের ভিতর একটি একটি করিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিল, শেষে শেষ সোপানে গিয়া দাঁড়াইল। তখন আকাশের দিকে চাহিয়া বিকৃতকণ্ঠে সরস্বতী বলিল, "ভগবান্‌ সূর্যদেব! আমার পাপ লইও না। তুমি অন্তর্যামী, আমার হৃদয়ের ব্যথা দেখিতে পাইতেছ। ভগবতী চান্দেরী দেবী, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।" বলিয়া সরস্বতী শেষ সোপান হইতে পা বাড়াইল।

রমা দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "সরস্বতী, করিস্‌ কি, করিস্‌ কি?"

"দিদি, বিবাহে অমত করা আমার সাধ নহে, আমি বিবাহ-বন্ধনও পরিতে পারিব না, আমাকে ক্ষমা কর!" বলিতে বলিতে সরস্বতী ডুবিয়া গেল। রমাও সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া ডুবিল। অন্য ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বহু কষ্টে রমাকে তুলিল, কিন্তু সরস্বতীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

এই ঘটনার পর প্রায় দুই-তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মোহনলাল ইতিমধ্যে এক সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, রমা আর তাঁহার গৃহে যায় নাই। সে নীরবে জীবনভার বহন করিতেছে। কাহারও অসুখ হইলে সুশ্রূষা করিতে যায়, কাহারও বিপদে ছুটিয়া যায়, বৃদ্ধ পিতার সেবা করে, আর অবসর পাইলেই ঘাটে আসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চান্দেরী নদীর অগাধ কৃষ্ণ সলিলের দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। তাহার কি অমূল্য রত্নই এই নদীতলে হারাইয়া গিয়াছে! কখনো চিন্তামগ্ন হইয়া আপনা আপনি অস্ফুটস্বরে বলে, "এই নদীতলে, এই শান্ত শীতল শয্যায়! হায়, কবে তাহার কাছে যাইব? কবে এই শীতল সলিলে হৃদয়ের জ্বালা নিবিবে?"

—'সাহিত্য,' চৈত্র, ১২৯৯

নববর্ষের স্বপ্ন

['ভারতী ও বালক' (আশ্বিন ১২৯৯) পত্রিকায় "নববর্ষের স্বপ্ন" নাম দিয়া এক "নূতন ধরনের উপন্যাসে"র সূচনা করিয়া সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী লেখেন—

"ভারতীয় পাঠকপাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে ইংলণ্ড হইতে মিস্ মরিস্ 'বিলাতের সচিত্র সংবাদপত্র ও তাহাদের কার্যপ্রণালী' নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে জেণ্টলউম্যান্ নামক পত্রিকায় সম্প্রতি যে একটী নূতন বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহা এই—

'এক সংখ্যা পত্রিকায় একটী উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদক বিজ্ঞাপন দেন যে যাঁহারা ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার মধ্যে যাঁহার লেখা সম্পাদক অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কয়েক সপ্তাহ ক্রমাগত এই প্রকারে কার্য হইয়া এ উপন্যাসটী সম্পূর্ণ হয়। পরে প্রথম উপন্যাসলেখকের উপন্যাসের সহিত বিভিন্ন লেখকগণের উপন্যাস মিলাইয়া দেখা যায় যে প্রথমখানির অপেক্ষা দ্বিতীয়খানি ভাল হইয়াছে। এই প্রথম বোধ হয় একটী উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক লিখিত হইয়াছে।'

আমরা ইচ্ছা করিয়াছি ভারতীতে একটী উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায় ঐরূপে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব কিরূপ দাঁড়ায়। 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামক একটি উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় এবারে প্রকাশিত হইল। আগামী ২০শে আশ্বিনের মধ্যে যাঁহারা ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহাদের মধ্যে যাঁহার লেখা সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর চারখানি গ্রন্থ উপহার দেওয়া যাইবে—দীপনির্বাণ, হুগলীর ইমামবাড়ী, গাথা ও বসন্ত-উৎসব। উপন্যাসলেখক পাঁচ অধ্যায়ে তাঁহার উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় উপন্যাসখানিও পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইলে ভাল হয়, প্রত্যেক অধ্যায়ের লেখক-গণ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এইরূপে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত উপন্যাসখানি শেষ হইলে আমরা প্রথম উপন্যাসখানি সমস্তটা একবারে এক সংখ্যায় প্রকাশ করিব।"

এই "নূতন ধরনের উপন্যাসে"র প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনা করেন সরলা দেবী। পরবর্তী চার অধ্যায়ের লেখক-লেখিকা যথাক্রমে শ্রীঅঃ, দীনেন্দ্রকুমার রায় ও শশীভূষণ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠান চারিজন লেখক। তাহার মধ্যে "শ্রীঅঃ"-এর লেখা প্রকাশিত হইলেও, নির্দিষ্ট সময়ে তাহা হস্তগত না হওয়াতে পুরস্কার পান নাই। আটজন লোকের নিকট হইতে তৃতীয় পরিচ্ছেদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একজনের ভাষাবিন্যাস ও অপরের উপাখ্যান অংশ ভাল হওয়ায় উভয়কে সমান পুরস্কার দেওয়া হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে যোগ দিয়াছিলেন তিনজন লেখক। পঞ্চম পরিচ্ছেদও তিনজনের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার লিখিত মাত্র পঞ্চম পরিচ্ছেদটি এখানে মুদ্রিত হইল।]

ক্রমে ক্রমে শরীরে বল পাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে পূর্ব ঘটনা অস্পষ্ট স্বপ্নের মত স্মরণ হইতে লাগিল। আমার কি পীড়া হইয়াছিল,—আমি কেমন করিয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলাম? সত্যই কি লতিকার বিবাহ হইয়াছে? সত্যই কি লতিকার বিবাহের পত্র নরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম? সত্যই কি সেই রাত্রি—সেই যন্ত্রণাদায়ক রাত্রি আমি রেলগাড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছিলাম? না, এ সব আমার অসুস্থাবস্থার স্বপ্ন? চিন্তাশক্তি পুনরাগমনে ধীরে ধীরে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ক্রমে সকল কথাই মনে পড়িল। অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থায় সহসা গভীর রাত্রে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসা, আর আসিয়াই সেই বজ্রোপম সংবাদ শুনা, এই সকলই যে আমার এই সাংঘাতিক পীড়ার হেতু তাহা বুঝিলাম। বজ্রাঘাত এখন সহিয়া গেল। আমি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। শুধু একটি নিঃশ্বাস!

শিয়রে প্রভা বসিয়া ছিল। রাত্রি জাগরণে, চিন্তায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুষ্ক ও মলিন। প্রভার এমন মলিন মুখ কখনও দেখি নাই।

প্রভা ধীরে ধীরে আমার কপালে শীতল হাতখানি রাখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "দাদা!"

আমি প্রভার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, প্রভার মুখ বিষণ্ণ ও চক্ষু জলভারাক্রান্ত।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভা?" আর কিছু নয়, শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রভা?" সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না।

প্রভা আমার প্রশ্ন বুঝিল, কিছু উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে জানালা খোলা। বাগানের গাছপালা দেখা যাইতেছে। অস্তমান রবির কনক কিরণ বৃক্ষশিরে কোমল পত্রে প্রতিভাত। রাস্তা হইতে বালকদের চীৎকারধ্বনি ও গাড়ীর শব্দ কানে আসিতেছে। পৃথিবী চিরতরুণ চির-আনন্দপূর্ণ। কত লোকের হৃদয়ে শুধু চিতাভস্ম মাত্র অবশেষ রহিয়াছে, কত জনের হৃদয় শূন্য, কিন্তু পৃথিবী চিরতরুণ। কেহ বা নবীন আনন্দস্রোতে পথে ভাসিয়া যাইতেছে, কেহ বা নব আনন্দ শ্মশানে বিসর্জন দিয়া আসিতেছে, কিন্তু পৃথিবী চির-আনন্দপূর্ণ। যেমন নদী পূজার পুষ্প বুকে লইয়া, দগ্ধ অস্থি বুকে লইয়া সমান আনন্দে সমান কলকল গীতে অবিশ্রাম চলিয়াছে, পৃথিবীও সেইরূপ। আমি কি ভাবিতেছিলাম? প্রভা কেন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল? আমার লতিকা কোথায়? "আমার লতিকা?" ছি ছি, আমি কি পাগল হইলাম? লতিকার কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে? অবশ্যই হইয়াছে। "কল্য বিবাহ" সে বিবাহে কি বাধা হইতে পারে? দূর কর, আর ও সব ভাবিব না। কিন্তু ভাবিব না যত মনে করি, ততই ভাবনা আসে।

সহসা পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত সেই মধুর মুখখানি মনে পড়িল। সে

মুখ তো লতিকার ছাড়া আর কাহারো নয়! লতিকা এখানে কোথা হইতে আসিল? তবে বোধ হয় আমার স্বপ্ন।

সন্ধ্যা হইল। চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল। এমন সময় মা আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। ডাক্তার আমার সহিত বেশী কথা কহিতে, কিম্বা আমাকে কথা কওয়াইতে নিষেধ করিয়াছিল। মা নীরবে বসিয়া রহিলেন। শুধু সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন, আর ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তখন আমার হৃদয়ের অনেক ভার কমিয়া গিয়া মন অনেক শান্ত হইল।

রোগের দিন কি দীর্ঘ! কোনমতে সারাদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, এ-বইখানি ও-বইখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া, কখনো জানালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নানাবিধ অস্থির চিন্তায় আমার দীর্ঘ দিন কাটিয়া যায়। প্রভা কাছে বসিয়া গল্প করে, তাহার কতক বুঝিতে পারি, কতক পারি না। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেহ কোন কথা বলেও নাই। আর জিজ্ঞাসাই বা কি করিব?

কত কথাই ভাবি। কখনো খেয়ালে পরিচালিত হইয়া ভাবি, লতিকার বিবাহ হয় নাই। এমনি সন্ধ্যায়—একা, একা, আমি নিতান্ত একাকী। যদি সহসা লতিকা আসিয়া আমার বিছানার পাশে দাঁড়ায়? তেমনি মধুর সলজ্জনম্র শ্রী লইয়া কাছে আসিয়া যদি দাঁড়ায়? সেই মুখ কত ভাবিলাম, সম্পূর্ণ মনে আনিতে পারিলাম না। তখন কবির এই কয় ছত্র মনে পড়িয়া গেল—

রূপ খুঁজি পাতি পাতি, ভাঙি গড়ি দিবারাতি
তবু তো হয় না ছবি-আঁকা।
যে রূপ হৃদয়ে রাজে ভাবিতে পারি না তা যে
নয়নে দেয় না সে তো দেখা।
ভাবিয়া পাই না হাসিটুকু,
যে হাসি প্রাণের মাঝে লেখা।

আবার কখনো মনে করি তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ি।

প্রভার চতুর চক্ষু এসব লক্ষ্য করিত। আর আমার মা! কেবল স্নেহপূর্ণ নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কেবল ব্যাকুল হইয়া দেবতার নিকট আমার সুস্থ শরীর ভিক্ষা করিতেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার কাছে বসিয়া থাকিতেন।

ক্রমে শরীর সারিয়া আসিল। আমি ঘরের সম্মুখের বারান্দায় একটু একটু বেড়াইতে পারি। কখনো রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া উদ্যানপালক দম্পতির গার্হস্থ্য-কলহ দেখি। দেখিয়া হৃদয় ধীরে ধীরে একটু প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠে। পূর্বে বিবাহ সম্বন্ধে মনে মনে একটা অন্ধভাব গড়িয়া রাখিয়াছিলাম, এখন এই দম্পতি-কলহ, ইহাও যেন কত মিষ্ট, কত উপভোগ্য সামগ্রী বলিয়া মনে হয়। মালি-বধূর

পালিত পশু-সন্তানগণের ইতস্ততঃ-বিচরণ ও আহার করিবার সময় পরস্পরের মহাবীরের ন্যায় বলের মর্যাদা-রক্ষা, ইহাই এখন আমার নিত্য দৃশ্য।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আমি আমার ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়াছি। অনন্ত নক্ষত্র-খচিত কৃষ্ণাকাশ আমার চোখের সম্মুখে বিস্তৃত। আকাশ অনন্ত, উদার। আমার জীবনের শেষ কোথা? সীমা কোথা? শুধু দিগ্দিগন্তব্যাপী ছায়াহীন মরুময় শ্মশান জীবন!—আমার কবিত্বের কিছু বাকি রহিল না। বন্ধুবরের শেলি আওড়ানো ও হা-হুতাশে আমার অধরপ্রান্তে হাস্যরেখার আবির্ভাব হইয়াছিল, এখন আমার দশা দেখিয়া কে হাসে!

চমকিয়া দেখি, প্রভা আমার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে জানি না। হয়তো প্রভা আমার পাগলামি কিছু শুনিয়াছে।

প্রভার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে একটা কি বিশেষ কথা বলিতে চায়।

প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা!"

সে কি বলিবে? আমার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। উত্তর দিতে পারিলাম না।

প্রভা ডাকিল, "দাদা, ও দাদা!" আমি প্রভার মুখের দিকে চাহিলাম।

"একটা কথা শোন।"

কি কথা প্রভা বলিবে? আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

প্রভা বলিল, "দাদা, মা আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি একটি বড় সুন্দরী 'কনে' ঠিক করিয়াছেন।" বলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি কিছু বলিলাম না।

প্রভা বলিতে লাগিল, "বেশ সুন্দর মেয়েটি, আমি দেখিয়াছি, আমার বড় পছন্দ হইয়াছে। এবার আর অমত করিও না। লক্ষ্মী ভাই, বিবাহ কর না!"

আমি ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলাম, "প্রভা, চুপ কর্।" প্রভা চুপ করিল না, বলিল, "আমি মাকে কনের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নাম শুনিবে?" .

আমি কেমন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "কি নাম?" প্রভা বলিল, "লতিকা।"

"লতিকা!" বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া উঠিল। মাথার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। "লতিকা!" সে কি? আমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছি! নয়তো স্বপ্ন দেখিতেছি।

পর-মুহূর্তেই স্থির হইলাম। মনে করিলাম, লতিকা কি আর কাহারও নাম থাকে না? তাড়াতাড়ি বলিলাম, "সে কোথায়, কাহার মেয়ে?"

প্রভা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার মুখের ভাব দেখিতেছিল। একটুখানি হাসিয়া বলিল, "এই কাছেই, নরেন্দ্রবাবুকে চেন, তাঁহারই মেয়ে। তুমি নাকি একবার তাহাকে বাঁচাইয়াছিলে? তোমার বড় অসুখের সময় নরেন্দ্রবাবু প্রায়ই তোমাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বেশ মেয়েটি। আমি মাকে সেই দিনই বলিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার তখন ভয়ানক অসুখ, তাই কোনও কথাবার্তা হয় নাই।"

আমার তখন বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু কথাটা ভাল

করিয়া আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। কেবল সংশয়াকুলিতভাবে এক-একবার প্রভার মুখের দিকে চাহিতেছিলাম।

প্রভা আমার প্রশ্ন বুঝিল। কথা উলটিয়া লইয়া বলিল, "তুমি যে-দিন হঠাৎ পশ্চিম থেকে চ'লে এলে দাদা, সেই দিন নরেন্দ্রবাবুর মেয়ের বিয়ের কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ বরের অসুখ করায় কিছুদিন বিয়ে স্থগিত থাক্‌বার কথা হয়। এমন সময় পাত্রের বাপের সঙ্গে নরেন্দ্রবাবুর কথায় কথায় মনোবিবাদ হয়, তাই সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। সেখানে লতিকার বিয়ে হ'ল না। তোমারও সেই অবধি অসুখ। তুমি একটু ভাল হ'লে কাকা নরেন্দ্রবাবুকে বলেছিলেন, তাতে নরেন্দ্রবাবু বলেছেন, 'আমার লতিকাকে সুরেশই বাঁচিয়েছে। নইলে বোধ হয় ফিরে পেতুম না। সুরেশের সঙ্গে লতির বিবাহ হয়, তার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে! আমি প্রথম দিনই এ কথা মনে করেছিলুম, কিন্তু সুরেশ বিবাহ করতে চায় না, তাই আমি এতদিন কোন কথা বলি নাই।' কাকা বলেছেন, 'সুরেশ কি আর আমার কথার অবাধ্য হবে?' "

বলিয়া প্রভা আর দাঁড়াইল না, একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। প্রভার সেই হাসিটুকু আমার নিতান্ত লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

সকালবেলায় যেন শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছে বোধ হইতে লাগিল।

বহুদিন পরে বাগানে বেড়াইতে গেলাম। প্রকাণ্ড জামগাছের ছায়ায় বসিয়া পাঁড়ে ঠাকুর সুর করিয়া তুলসীদাস পড়িতেছেন, আর আর দ্বারবানবর্গ চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া শুনিতেছে। সাদা সাদা পাগড়ী মস্ত একটি চক্রের আকার ধারণ করিয়াছে। শরৎ-প্রভাতের নির্মল জ্যোতির্ময় রৌদ্রতপ্ত আকাশ, আকাশের দেবতাও এমনি জ্যোতির্ময়, নির্মল, স্পষ্টানুভূত। আর আমার হৃদয়ের দেবতা, এতদিন নিরাশার কুয়াশাবরণে অস্পষ্ট ছিল, আজ আশার আলোকে সেও এমনি উজ্জ্বল, উত্তপ্ত ও স্পষ্টানুভূত।

একদিন খেলার ছলে একটি আমগাছ পুঁতিয়াছিলাম, আজ সেটি কত বড় হইয়াছে। এই পেয়ারাগাছের তলায় আমি ও প্রভা পেয়ারা লইয়া ঝগড়া করিতাম। আজ ছেলেবেলার কত স্মৃতি, কত দিনের কত কথাই মনে উঠিতেছে!

আর একদিনের কথা আজ মনে পড়িতেছে, যে দিন নববর্ষের স্বপ্নে, সেই প্রথম, প্রেম যে মধুর তাহা জানিলাম। তাহার পর জাগ্রত স্বপ্নে সেই প্রণয়িনীর মুদিত পদ্মের ন্যায় ম্লান অথচ মধুর মুখখানি দেখিলাম।

সেণ্টিমেণ্ট্যালিটির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় আমার পূর্ব-বন্ধু, উদ্যানপালিকার জীব-শিশুগণ আসিয়া আমাকে ঘিরিল। তাহাদের মধ্যে দুই-চারিটি নূতন প্রাণী বৃদ্ধি হইয়াছে।

এইসকল পরিবার লইয়া উদ্যানপালকের গৃহলক্ষ্মী আসিয়া আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও নানাবিধ সাদরসম্ভাষণ করিলেন। পরে বলিলেন, "দাদাবাবুর বিয়ে নাকি শিগগির হবে, মাঠাকরুণের কাছে শুনলাম। আহা, হোক হোক, বাড়ীতে কচি-কাচা নেই, বাড়ীটে যেন খাঁ-খাঁ করে।"

মধ্যাহ্নে আহারের সময় মা আমার প্রফুল্লমুখে সজলনেত্রে বলিলেন, "ঠাকুর-দেবতার কাছে কত মেনেছি বাবা, কত মাথা খুঁড়েছি! আমার ছেলে ছিল, আমি মেয়ে পাব, এই ৬ই অগ্রহায়ণ দিন ঠিক করেছি। আহা, বাছার রঙে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে, কি কাল রোগই বাছার হয়েছিল!"

প্রভা ঈষৎ হাসিল, কোনও কথা বলিল না।

তারপর? তার পর আর কি শুনিবে? লতিকার সহিত আমার বিবাহ হইল, সত্য সত্যই লতিকা "আমার লতিকা" হইল। বৌঠাকরুণের অভিশাপ বা আশীর্বাদ সফল হইল। তবে তাঁহার রসনাকে আমার বড় ভয়। ভয় আমার মত বঙ্গবীর বোধ করি আর বড় কিছুতে ভয় পান না। বিশেষতঃ এখন তিনি বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন। তিনি এখন মাঝে মাঝে বলেন, "কেমন বিদ্রুপবাগীশ! এখন আর ঠাট্টা শুনি না কেন?" প্রভা শুধু একটু হাসে, আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "বৌ কেমন দাদা?"

সুন্দর রাত্রি। লতিকার সুন্দর মুখে সুন্দর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িতেছে। সেই ঢুলঢুলু নবানুরাগবিহ্বল সুন্দর নয়ন। নববর্ষের সেই স্বপ্ন, আজ আমার জীবন্ত স্বপ্ন। অপ্রেমিক গর্বিত আমি প্রেমের কাছে আজ শিক্ষা পাইয়া শিখিয়াছি, প্রেম মধুর, প্রেম সুন্দর, প্রেম পবিত্র, প্রেম অবিনশ্বর। তোমরা সকলে মিলিয়া প্রেমের জয় গাও।

('ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৯)।

যোগেশ

আজ অনেক দিনের পর যোগেশের সেই শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তিখানি মনে পড়িতেছে। সেই মলিন মধুর মুখচ্ছবি, সেই ওষ্ঠে লুক্কায়িত ঈষৎ ম্লান হাস্য, সেই নয়নের করুণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি আজি যেন জীবন্ত ছবির ন্যায় মনে জাগিতেছে। হারানো রতন কি আর ফিরিয়া পাইব?

ছেলেবেলা হইতে যোগেশের সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। আমি যেখানে যাইতাম, যোগেশ ছায়ার ন্যায় সর্বদা আমার সঙ্গে থাকিত। একত্র বিচরণ, একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন, সর্বদা একসঙ্গে বাস। যোগেশকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম, কিন্তু তাহাতে আমার গুণ কিছু ছিল না। আমি স্বেচ্ছায় তাহাকে ভালবাসি নাই। সে আমার ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছিল। কেই বা তাহাকে ভাল না বাসিত?

গ্রামে আমার মত দুরন্ত বালক আর দইটি ছিল না। হায়, কোথায় সে সুখের বাল্যকাল! সমস্ত দিন ছুটাছুটি আর অশান্তপণা! কখনো নগার পিঠে একটা চড় মারিয়া পলাইতেছি, কখনো ঘোষেদের কুলগাছে উঠিয়া কুল পাড়িতেছি, কখনো রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতেছি, মার সহস্র ডাকেও ভ্রুক্ষেপ নাই। স্নান করিতে যদি একবার নদীতে নামিলাম, তবে আমাকে কাহার সাধ্য উঠায়! একবার এপার একবার ওপার করিয়া ক্ষীণা স্রোতস্বিনীকে চঞ্চল করিয়া তুলিতাম। যাহা কিছু সহজপ্রাপ্য তাহাতে কখনো আমার মন উঠিত না। আমার এই দুরন্ত স্বভাবে আমার জননীকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তবু মা আমার কখনো আমাকে তিরস্কার করেন নাই। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই মা বলিতেন, "পাঁচটি ছেলে ভগবান দিয়া আবার কাড়িয়া লইয়াছেন, ও-ই কি বাঁচিবে? দিদি, আমার আর শাসন করিতে মন সরে না।"

পিতামাতা আমাকে কখনো শাসন করেন নাই, কিন্তু আমার আর একজন শাসক ছিল, সে যোগেশের দুইটি করুণ নয়ন। সে নয়নের দৃষ্টি আমি কখনও অবহেলা করিতে পারিতাম না। যখনই আমি কোন অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনই সেই দুইটি নয়ন আমাকে নিবৃত্ত করিত। এজন্য যতক্ষণ যোগেশের সহ-বাসে থাকিতাম, ততক্ষণ আমার প্রকৃতি কিছু শান্ত থাকিত।

মার উপর আমার দণ্ডে দণ্ডে রাগ হইত। রাগ করিয়া বসিয়া আছি, কিছু খাইব না, মা কিছুতেই আমার সহিত না পারিয়া যোগেশকে ডাকিয়া আনিতেন। যোগেশ আসিবা মাত্র আমার সে রাগ, সে আবদার কোথা যাইত! জানি না যোগেশ কি যাদুমন্ত্র জানিত!

আমার বয়স তখন দশ বৎসর, যোগেশের নয় বৎসর মাত্র। এই অল্প-বয়সে যোগেশের শান্ত মধুর প্রকৃতি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইতেন। তাহার মুখে কেহ

কখনও মন্দ কথা শুনে নাই, গ্রামের কোন ছেলের সহিত তাহার কখনও বিবাদ হয় নাই।

আমাদের দুই বন্ধুর যেমন বিভিন্ন প্রকৃতি, তেমনি আবার দুজনের অবস্থাতেও অত্যন্ত পার্থক্য ছিল। আমি আশৈশব সুখের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছি, দুঃখ যে কি তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। যোগেশও তেমনি জন্মাবধি দুঃখ পাইয়াছে, সুখের মুখ দেখা তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। "চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?"— কবির এ উক্তি জীবন্ত সত্য। আমি আমার প্রাণের বন্ধুর দুঃখ অনুভব করিতে পারিতাম না। আহা, কি কষ্টেই না জীবন অতিবাহিত হইয়াছে! অভাগিনী জননী দুই মাসের পিতৃহীন শিশুসন্তান বক্ষে করিয়া লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া শিশুটিকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তখনো তো মার কোলটুকু যোগেশের জুড়াইবার স্থান ছিল, কিন্তু এক বৎসর হইল যোগেশ তাহার সে আশ্রয়ও হারাইয়াছে।

আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে রাধাকৃষ্ণ বসুর বাটী। বসুজ মহাশয় সদাশয়, ধার্মিক ও সঙ্গতিপন্ন। পিতৃমাতৃহীন বালকের ভার তিনি স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনাথ জননী-অঙ্কচ্যুত অষ্টমবর্ষীয় বালক বসু-পরিবারের অন্নভুক্ত হইল।

রাধাকৃষ্ণবাবুর একটি মাত্র পাঁচ বৎসরের বালিকা কন্যা। যোগেশের উপর সেই বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। কন্যাটির নাম সুলোচনা; কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে শুধু যে তাহার লোচন দুইটিই সুন্দর, এ কথা বলা যায় না; তাহার শ্রী, গঠন, মুখমাধুর্য, গমনভঙ্গী, ঈষৎ হাস্য এ সকলই অতি সুন্দর—গ্রামের ভিতর সে-ই কেবল সর্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা। রাধাকৃষ্ণবাবুর সেই আদরিনী ভুবনমোহিনী কন্যার সহিত অতি শৈশবাবধি আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির ছিল। আমার জননীর সুলোচনাকে বধূ করিবেন বড়ই সাধ, আর রাধাকৃষ্ণবাবু এবং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীরও আমাকে জামাতা করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল।

সুলোচনাদের বাড়ী আর আমাদের বাড়ী পাশাপাশি, আমি জানিতাম সে আমার কনে, কিন্তু অতটুকু ক্ষুদে মেয়েকে আমি গ্রাহ্যের ভিতর আনিতাম না। বালক-বালিকার প্রণয় কেমন তাহা উপন্যাস-লেখকেরাই ভাল বুঝেন, কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আমি স্বরূপ বলিতেছি, সুলোচনার সহিত আমার কোনরূপ প্রণয়ের নামগন্ধ ছিল না। বরং কিছু বিদ্বেষই ছিল—কেন না সেও বড় আদরের। অন্যের আদর আমার সহ্য হইত না।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী যোগেশের উপর তাদৃশ প্রসন্ন ছিলেন না। যোগেশের অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি তাঁহার নিকট "মিট্‌মিটে ডাইনি" বলিয়া বোধ হইত, তাহা ব্যতীত যোগেশের আরও অনেক দোষ ছিল। রাধাকৃষ্ণবাবু যোগেশকে অত্যন্ত ভালবাসেন—এ একটি প্রধান দোষ। সকলে যোগেশের সুখ্যাতি করে—আর একটি দোষ, এইরূপ আরও অনেক দোষ। কিন্তু প্রসন্ন না থাকিলেও অগত্যা যোগেশকে বাটীতে স্থান দিতে হইত, তাড়াইয়া দিলে রাধাকৃষ্ণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন,

আবার সুলোচনা যোগেশদাদার সঙ্গ ব্যতীত এক মুহূর্ত থাকিবে না। যোগেশ-দাদা বেড়াইতে লইয়া যাইবে, যোগেশদাদা খাওয়ার সময় খাবার মুখে তুলিয়া দিবে, ঘুমাইবার সময় যোগেশদাদা শিওরে বসিয়া গল্প করিবে। সুলোচনার সম্পূর্ণ ভারই যোগেশের উপর। ইহাতে যদি কোন দিন কিছু ত্রুটি পাইতেন, সে দিন অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ঘণ্টাখানেক বাক্যবর্ষণ করিয়া কিছু মন খোলসা করিতেন।

সে দিন অক্ষয়-তৃতীয়া। মা এবং পল্লীবাসিনী অপর জন কয়েক রমণী মহা-উৎসাহের সহিত সরিষা কুটিতেছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া মা শঙ্কিত ভাবে বলিলেন, "বাপ আমার, এ ঠাকুরের জিনিস, হাত দিও না।" যদিও বা হাত না দিতাম, এ কথা শুনিয়া কি আর থাকিতে পারি, তখনই এক মুঠা সরিষাগুঁড়া তুলিয়া মুখে দিলাম। নিষিদ্ধ কার্যে আমার পরম আমোদ ছিল, কখনও তাহা না করিয়া ছাড়িতাম না। এইরূপ অবাধ্যচরণ করিয়াও কখনো আমাকে শাস্তি পাইতে হয় নাই। আজ কিন্তু অবাধ্যতার বিলক্ষণ শাস্তি পাইলাম। সরিষা মুখে দিবামাত্র আমার নাক মুখ গলা অত্যন্ত জ্বালা করিতে লাগিল, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু সর্বসমক্ষে অপমানে আরও গুরুতর শাস্তি হইল। সকলে আমার এই অবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন, মা ছুটিয়া জলের ঘটি আনিতে গেলেন, আমি অমনি দৌড়িয়া পলাইলাম।

পৃথিবীর এরূপ নিষ্ঠুরতায় মনে অত্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাগ হইতে লাগিল; কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ আমারই, কাজেই কাহার উপর রাগ করিব খুঁজিয়া না পাইয়া স্থির করিলাম, "দূর হোক, আর বাড়ীতে যাইব না।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নদীর ধারে বনের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

ক্রমে ক্রমে রৌদ্রটুকু পশ্চিম আকাশে মিলাইয়া গেল, অমনি পূব ধারে আকাশের গায়ে রেখার মত একখানি চাঁদ উঠিল। পাখীরা সকলে চেঁচামেচি করিয়া সকলের উদ্দেশ লইতে লাগিল, কিন্তু আমার উদ্দেশ এখনও কেহ লইতে আসিল না। সন্ধ্যাকালে, বনের ধার, আবার ঐ বটগাছে নাকি কি আছে শুনিয়াছিলাম, একা কেমন করিয়া থাকি, উদরও বৈরাগ্যের প্রতিকূল পক্ষ লইলেন। অবশেষে অগত্যা কি করি, বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম—এমন সময় দেখি, যোগেশ সুলোচনার হাত ধরিয়া বেড়াইতে আসিতেছে।

আমার হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল আসিল। গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকি, হঠাৎ যোগেশের সম্মুখে গিয়া পড়িব, সে কেমন চমকিয়া উঠিবে, বড় আমোদ হইবে, স্থির করিয়া ঝোপের ওপাশে গিয়া লুকাইলাম।

সেদিনের সন্ধ্যার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। অস্ফুট চন্দ্রালোকে বনশ্রেণী ছায়ার মত দেখা যাইতেছে, আর সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা করতোয়া নদী। আকাশ নক্ষত্রপূর্ণ, যেন কে একটা কালো কাপড়ে রাশি রাশি হীরার ফুল ছড়াইয়া দিয়াছে।

সুলোচনা এক দুই করিয়া তারা গণিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ক্ষান্ত হইয়া কোন্ তারাটি বড়, কোন্ তারাটি ভাল ইহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল।

যোগেশ বলিল, "ঐ যে বড় তারাটা সুন্দ, ঐটি আমার মায়ের চোখ। আমার মা আকাশে গিয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে যোগেশের গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া আসিল।

সুলোচনা বলিল, "তোমার মা আকাশে গিয়াছেন? হ্যাঁ যোগেশদাদা, তোমার মা কেন ওখানে গেলেন?"

যোগেশ ভগ্নস্বরে বলিল, "সকলে বলে, মা ঐ আকাশে গিয়েছেন। সুলোচনা, আমার মা ঐখানে আছেন। আর এখন কেউ আমাকে তেমন ক'রে ডাকে না, কেউ আর আদর করে না, আর কেউ কোলে নেয় না। হয়তো আমি মার কথা শুনি নি, তাই মা রাগ ক'রে চ'লে গেছেন।"

"যোগেশদাদা, ও কি? তুমি অত কাঁদছ কেন যোগেশদাদা? আর আমি কখনো মাকে তোমার নামে কোন কথা বলব না, আর তোমার উপর রাগ করব না, তুমি যা বলবে তাই শুনব। যোগেশদাদা, কেঁদো না, বাড়ী চল।"

সুলোচনা আর যোগেশ যখন চলিয়া গেল, তখন আমার মোহভঙ্গ হইল। আজ আমি প্রথম যোগেশের দুঃখ বুঝিলাম। কি জানি কেন, আমার চোখে জল আসিল। নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীতে চলিলাম।

তার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই পাঁচ বৎসরে আমার স্বভাবের কত পরিবর্তন হইয়াছে। এখন কি আর কেহ আমাকে সেই দুরন্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বালক বলিয়া অনুমান করিতে পারে? এখন আর কেহ আমার নিন্দা করে না, সকলের মুখেই আমার সুখ্যাতি। আমার সুখ্যাতি শুনিয়া যোগেশের আনন্দের সীমা থাকিত না।

সুলোচনা আর এখন আমার সম্মুখে আসে না। আমাকে দেখিলে পলাইয়া যায়। আমারও যেন তাহাকে দেখিলে কেমন লজ্জা করে, কিন্তু দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হয়। হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়িলে সে যখন ছুটিয়া পলাইয়া যায়, তখন আমার বিদ্যুতের সহিত তুলনা মনে পড়ে। দুই বৎসরের ভিতরই তাহার সহিত আমার শুভবিবাহ হইবে—একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

বালককালে গ্রামস্থ সমুদায় বালক-বালিকার ভিতর যোগেশই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল, বয়োবৃদ্ধিতেও আমার সে ভাবের পরিবর্তন হইল না। যোগেশ সর্বদাই আমার সঙ্গী, একত্র পাঠ, একত্র শয়ন, একত্র ভ্রমণ। আমার যখন যাহা মনে হইত, তৎক্ষণাৎ যোগেশকে বলিতাম, আর কাহাকেও বলিয়া তৃপ্তি হইত না।

কার্যে যোগেশের তিলমাত্র আলস্য ছিল না। যখন যাহার যে কার্য উপস্থিত হইত, যোগেশ উপযাচক হইয়া সাহায্য করিত। বিপদে আপদে যোগেশ গ্রামবাসীর দক্ষিণহস্ত। কিন্তু ভ্রমেও সে স্বকৃত কর্মের কথা উল্লেখ করিত না। এজন্য

সকলেরই তাহার উপর যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তথাপি তাহার সেই মলিন মুখ কখনো আমি প্রফুল্ল দেখি নাই।

গ্রাম্যবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইল, অতএব পিতা আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন স্থির করিলেন। তখন সহসা মন বড় বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিব, বিদ্বান হইব, গ্রামের ভিতর যশস্বী হইব, রাজধানীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব, নূতন নূতন দ্রব্য দেখিব, মাদকের ন্যায় এই সকল চিন্তা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। এই চিন্তাতেই দিন কাটিত—আর প্রত্যহ দিন গণিতাম। তবে যোগেশকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এটি একটি গুরুতর কষ্ট বটে, কিন্তু সে বিষয়টা ভাবিবার আমার বড় একটা অবসর রহিল না।

সাধ পূর্ণ হইল, কলিকাতায় আসিলাম। আসিবার পূর্বে কলিকাতা মহানগরী সম্বন্ধে যেরূপ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে কল্পনা সত্য হইল না বটে, কিন্তু তথাপি কলিকাতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি জন্মিল। যতই কলিকাতার শ্রী-সমৃদ্ধি দেখিতে লাগিলাম, ততই আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিতে থাকিল। দিনের অধিকাংশ সময়ই পাঠে অতিবাহিত হইত, যেটুকু বিশ্রামের সময় সেইটুকু ভ্রমণে ব্যয় করিতাম। ভ্রমণসময়ে সঙ্গীর অভাব অনুভব হইত। আমি স্বভাবতঃই অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে ভালবাসি না। সমপাঠীগণের সহিত আলাপ হইল বটে, কিন্তু মিত্র-লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। যখন যে কিছু নূতন সুন্দর দ্রব্য দেখিতাম, অমনই যোগেশকে মনে পড়িত, ভাবিতাম, যোগেশ আমার সঙ্গে আসিলে বড়ই ভাল হইত। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া পড়িতে বসিতাম, আর কিছু ভাবিবার অবসর থাকিত না।

এমনি করিয়া দুই বৎসর কলিকাতায় কাটিল। নানা কারণে ইহার ভিতর একবারও বাড়ী যাওয়া হইল না। এই দুই বৎসরে আমার সাধের কলিকাতা আমার নিকট পুরাতন হইয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই কলিকাতা আমার নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে আমার দীনা জন্মভূমির ভূষণহীন সৌন্দর্য মনে উদয় হইত। আর বিশেষ কতদিন মাকে দেখি নাই, কতদিন যোগেশকে দেখি নাই! বাড়ী যাইবার জন্য মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চৈত্র মাসের শেষে বাবা লিখিলেন, "বৈশাখ মাসে তোমার শুভবিবাহ স্থির করিয়াছি, অতএব তুমি পত্রপাঠ সত্বর আসিবে।" চিঠি পড়িয়া আমার একটি দৃশ্য মনে পড়িল। আমাকে দেখিলে সুলোচনা কেমন ছুটিয়া পলাইত—যেন একখানি বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইত। সেই সুলোচনা আমার জীবন-সঙ্গিনী, যুগপৎ কতকটা আনন্দ লজ্জা ও গাম্ভীর্যে হৃদয় ভরিল।

বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি বাটী আসিলাম। কতদিন পরে কুহকিনী রাজধানীর ক্রোড় হইতে স্নেহময়ী জন্মভূমির ক্রোড়ে আসিলাম। মেঠো পথ, পথের

দুই ধারে ফলভারনত আম্রকানন, কানন-শিরে প্রদোষের ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঐ মল্লিকদের শিবালয়, ঐ দত্তদের পেয়ারা-বাগান, এই যে ঘোষেদের পুকুর দেখা যাইতেছে। কামিনী ঘাটে বাসন মাজিতেছে, আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। পথের মাঝে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম, "বিজুদাদা, কখন এলে ?" আক চিবাইতে চিবাইতে রসসিক্ত উদরে তাহার ছোট ভাইটি দিগম্বর বেশে ছুটিয়া আসিল, গোলমাল শুনিয়া রাইপিসি বাহিরে আসিলেন, এইরূপে বাটী পেঁাছিতে না পেঁাছিতে আমার আগমন-বার্তা গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। যে যেখানে ছিল, সকলেই আমাকে দেখিতে আসিল।

আশীর্বাদ-প্রণামকাণ্ড শেষ হইলে মা আমার চিবুক তুলিয়া অভিনিবেশ-সহকারে মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "বাছা আমার একেবারে কাহিল হয়ে গেছে। সে রঙ নেই, সে মুখ নেই, সে চেহারাই নেই। আহা, সেখানে যত্ন করবার কে আছে, বাছার কত কষ্ট হয়েছে!" গ্রামস্থ বৃদ্ধগণ একবাক্যে মার কথা সমর্থন করিলেন। কেহ বলিলেন, "আহা, বাছার যত্নের শরীর, অযত্ন সইবে কেন ? তা কষ্ট না হ'লে কি বিদ্যা লাভ হয় ? কথায় বলে 'কষ্ট পেলে কৃষ্ণ মেলে'।" কেহ বলিলেন, "আহা, বেঁচে থাক্। সোনার চাঁদ ঘরে এল, এখন বিয়ে দিয়ে বউ-বেটা কোলে নিয়ে জন্ম সার্থক কর।" এইরূপে বহুক্ষণ আলাপের পর সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

এতক্ষণ আমি যোগেশের সহিত আলাপ করিবার অবকাশও পাই নাই। এখন তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে মাঠের দিকে চলিলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী' যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহাকে আর চেনা যায় না। শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, তজ্জন্য যোগেশকে কিছু অধিক দীর্ঘ বোধ হইতেছে। বদনমণ্ডল একেবারে রক্তশূন্য, চক্ষু নির্জীব। দেখিলে বোধ হয় যেন যোগেশ সম্প্রতি কোন গুরুতর পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "যোগেশ! তুমি এমন হইয়াছ কেন ? তোমার কিছু অসুখ হইয়াছিল ?" যোগেশ হাসিয়া বলিল, "কিছুই না।"

১৭ বৈশাখ। আজ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আজ আমার সুলোচনার সহিত বিবাহ। এই বিবাহোৎসবে গ্রাম আজ আনন্দময় হইয়াছে। গ্রামবাসীগণ সকলেই আমোদে মাতিয়াছে। আর আজ একবার যোগেশের দিকে চাহিয়া দেখ! শরীর ঘর্মসিক্ত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে তবু তাহার তিলার্ধ অবকাশ নাই। সে একাই আজ বরকর্তা, কন্যাকর্তা। যেদিকে যাও যোগেশকে দেখিতে পাইবে, সর্বত্রই সে পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাদেবী কৌতুক দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে দর্শন দিলেন। আমাদের বাটী আলোকাকীর্ণ হইল, চারিদিকে তুমুল বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। যোগেশ তখন সর্বকার্য ত্যাগ করিয়া আমার বেশভূষা করিতে আসিল। যোগেশের অনুরোধ আমি ছাড়াইতে পারি না। মস্ত এক ঢিলা-পোশাক পরিয়া,

মাথায় তাজ দিয়া সঙ সাজিলাম। অলঙ্কারেরও অভাব হইল না, তাহার উপর একরাশ ফুলের মালা গলায় দেওয়া হইল। এইরূপে যোগেশের মনোনীত বেশ হইলে নিষ্কৃতি পাইলাম। সেই বাদ্য কোলাহল, আলোকমালা ও সাজসজ্জাসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া রাধাকৃষ্ণবাবুর বাটী পেঁৗছিলাম।

আমার বাল্যসহচরীটি বস্ত্রালংকারে আচ্ছাদিত হইয়া আমার পার্শ্বে আনীত হইল। অন্তঃপুরে ঘন ঘন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। আমার হাতের উপর একখানি কোমল ঘর্মাক্ত হস্ত স্থাপিত হইল, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, আত্মীয়গণ সকলেই উপস্থিত; কিন্তু যোগেশ কোথায়, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

বিবাহোৎসব সাংগ হইল। জনক-জননীর চিরবাঞ্ছিত সাধ পূর্ণ হইল। এ কয়েক দিন যোগেশের সহিত একবারও দেখা হয় নাই। বধূ-আশীর্বাদ করিবার সময়ে যখন আত্মীয়গণ সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যোগেশ তখন আসে নাই। আমারও যোগেশের কথা বড় একটা মনে পড়ে নাই। আজ সহসা মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইল, যোগেশের সন্ধানে বাহির হইলাম। পথে সুলোচনার পুরাতন ভৃত্যের নিকট শুনিলাম, যোগেশ কাল বিদেশে যাইবে। সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া সে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাদিগের বাটী গিয়াছে। শুনিয়া আমি তো অবাক, আবার বাটীর দিকে ফিরিলাম, আসিয়া দেখি, যোগেশ একা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে।

আমি আসিয়াই বলিলাম, "যোগেশ, তুমি নাকি কাল চলিয়া যাইতেছ?"

যোগেশ নতমুখে বলিল, "হাঁ ভাই, কালই যাইব স্থির করিয়াছি। এতদিন আমি চলিয়া যাইতাম, কেবল তোমার সহিত দেখা হইবার আশায় ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সে কি ভাই, তুমি কি বলিতেছ? বিদেশে যাইবে কেন? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

যোগেশ ক্ষীণস্বরে বলিল, "বিজয়, চিরদিনই কি রাধাকৃষ্ণবাবুর অন্নে প্রতি-পালিত হইব? আপনার উন্নতি চেষ্টা করিব না? এখানে থাকিয়া আর কি করিব? ভাই, তুমি অনুমতি কর, বিদেশে গিয়া কার্যের চেষ্টা করি।"

আমি কাতর হইয়া বলিলাম, "তবে আর কিছু দিন থাক, আমি যখন কলিকাতা যাইব আমার সহিত যাইও।"

যোগেশ মিনতি-স্বরে বলিল, "ভাই বিজয়, আর আমাকে বাধা দিও না। কাল যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি বারণ করিলে যাইতে পারিব না।"

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। বিষণ্ণ মনে নীরব হইয়া রহিলাম। তখন যোগেশ বলিল, "কাল প্রত্যুষে যাত্রা করিব, হয়তো কাল আর দেখা হইবে না। চল, দুইজনে একবার নদীর ধারে যাই।" বিষণ্ণমনে ধীরে ধীরে যোগেশের সহিত চলিলাম। পথে কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিলাম না। নীরবে দুইজনে নদীতীরে একটি অশ্বত্থতলে বসিলাম।

সেই একদিন আর এই একদিন! এখানে কতদিন যোগেশের সহিত বসিয়াছি দুইজনে দুইজনের কথায় বিভোর হইয়া সন্ধ্যা কাটাইয়াছি, আজ শেষ সুখের দিন। হৃদয় উদ্বেলিত উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল।

যোগেশের হাতখানি ধরিয়া বলিলাম, "যোগেশ, ভাই, আবার কবে তোমার সহিত দেখা হইবে? তুমি কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ?"

যোগেশ বলিল, "কোথায় যাইব এখনও স্থির নাই, ভগবান যেখানে লইয়া যান সেই স্থানেই যাইব। হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা, হয়তো আর কখনও দেখা হইবে না।" যোগেশের স্বর অতি মৃদু ও কম্পিত। স্বরে বুঝিলাম, যোগেশ কাঁদিতেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। নদীর জলরাশিতে গভীর কৃষ্ণছায়া পড়িয়াছে, যেন অন্ধকার নদী-দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। নদীর অতি অস্ফুট কলধ্বনি শুনা যাইতেছে। সহসা এক-একটা উচ্ছৃঙ্খল বাতাস আসিয়া হা-হা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পাখীদের কোলাহল নীরব হইয়া গিয়াছে। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি ও যোগেশ নীরবে নদীতীরে বসিয়া থাকিলাম।

একটু পরে আমি বলিলাম, "তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলাম না। ভাই, আমাকে সর্বদা সংবাদ দিও, আমি তোমার জন্য বড় উদ্বিগ্ন থাকিব।"

যোগেশ কিছু উত্তর দিল না। কেবল আমার হাতের উপর তাহার এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল।

আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। এ ছয় বৎসরে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ডাক্তারখানা হইয়াছে, পূর্বতন স্কুলটি পরিবর্তিত হইয়া এখন "মডেল স্কুল" নাম ধারণ করিয়াছে, মেঠো পথের পরিবর্তে পাকা রাস্তা হইয়াছে, আর গ্রামবাসীগণেরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঘোষেরা দুই ভাই সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, চক্রবর্তীদিগের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রে বিবাদ চলিতেছে, এবং অন্য সকল ব্যক্তি সেই দলাদলিতে পরম আরামে আছেন।

আমি একজন গ্রামবাসী, অতএব আমারও অবশ্য পরিবর্তন হইয়াছে। পিতৃ-বিয়োগে সংসারভার আমার স্কন্ধে সহসা অবতরণ করিলে সেই সঙ্গে আমার প্রকৃতির গাম্ভীর্যও বর্ধিত হইল। এখন আর সে আমোদপ্রিয়তা, সে চাপল্য নাই। এখন সর্বদাই আমি কর্মে ব্যস্ত, যেটুকু অবকাশ, তা আমার একটি ক্ষুদ্র কন্যার মনস্তুষ্টিতেই ব্যয়িত হয়।

শোভার সহিত আমার মায়ের বড় বিবাদ, কেননা শোভা আমার উপর আর মার কোনো দখল রাখিতে দেয় না। খাওয়ার সময় মার অনুকরণে আমার সম্মুখে বসিয়া "আর ভাত নিবি, এটা একটু খা, ওটা একটু খা" এই সকল বলিয়া তিনিই আমার জননী—এ কথা সপ্রমাণ করেন। মা দাঁড়াইয়া দেখেন আর হাসেন। এইরূপে আমার দিনগুলো পরম সুখে কাটিতেছে।

মানুষ এমন স্বার্থপর! যে যোগেশ কেবল আমার সুখেই সুখী ছিল, আজ তাহার কথা দিনের ভিতর কয়বার স্মরণ করি? সে কি আর এ পৃথিবীতে আছে? জীবিত থাকিলে কি আর এতদিন আমার সংবাদ না লইয়া থাকিতে পারিত? আজ ছয় বৎসর হইল যোগেশ বিদেশে গিয়াছে, এ ছয় বৎসর তাহার কোনো সংবাদ পাই নাই। অনেক অনুসন্ধানেও কেহ কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

যোগেশ যখন নিকটে ছিল, আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখন তাহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু এখন প্রায়ই তাহার জন্য আক্ষেপ করেন, "বাছা সেই যে কি ক্ষণে গেল আর এল না। আহা, মুখে কথাটি ছিল না, এমন গুণের ছেলে কি আর হয়!" গ্রামের সকলেই যোগেশের জন্য দুঃখিত, তাহার গুণে কেই বা বশ না ছিল! সকলেই বুঝিয়াছিল যে, সে আর এ পৃথিবীতে নাই। কেবল সুলোচনা বলিত, "আমার মনে হয় যোগেশদাদা ভাল আছে। যদি একদিন হঠাৎ একখানা তাঁর চিঠি আসে! ঠাকুর করেন যেন শীঘ্র আসে।" তাহার বিশ্বাস দেখিয়া আমার চোখে জল আসিত।

সুলোচনার কথা যথার্থ হইল। একদিন প্রাতে একখানি পত্রের উপর দেখি যোগেশের হস্তাক্ষর। আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলাম। পত্র আর খুলিতে পারি না, হাত কাঁপিতে লাগিল। এতদিন কেন যোগেশ সংবাদ দেয় নাই? না জানি পত্রের ভিতর কি আছে?

পত্র পড়িয়া আমার সে ক্ষণিক আনন্দ ফুরাইয়া গেল। যোগেশ লিখিয়াছে, "ভাই বিজয়, আমি বড় পীড়িত হইয়াছি, তোমাকে একবার দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, যদি তুমি একবার আস, তাহা হইলে বড়ই সুখী হই।" পড়িয়া বুঝিলাম, পীড়া সামান্য নহে। আমি আর এক দিনও বিলম্ব করিতে পারিলাম না। সেই দিনই বাটীর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যোগেশকে দেখিতে যাত্রা করিলাম।

ছয় বৎসর পর যোগেশের সহিত আমার দেখা হইল। দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। একটি নিম্নতলের অন্ধকার ঘরে যোগেশ রোগশয্যায় পড়িয়া আছে। শরীর এত শীর্ণ যে শয্যায় কেহ আছে কি না বুঝা যায় না। কেবল একখানি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। চক্ষু এরূপ দীপ্তিহীন যে, দেখিলে জীবিতের চক্ষু বলিয়া বোধ হয় না। নিকটে একটু জল দিবে এরূপ কেহ নাই। আমি হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া বলিলাম, "যোগেশ, ভাই, এ কি? এই জন্যই কি আমাকে ডাকিয়াছিলে?" যোগেশ স্থির-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল, ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা স্ফুরিত হইল। আর অমনই চক্ষুকোণে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল (স্বর শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম), "ভাই, আমি তোমার আসিবার আশায় ছিলাম, বড় সাধ ছিল আর একবার তোমাকে দেখিব, ভগবান কৃপা করিয়া সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "ভাই, আমি কি অপরাধ করিয়াছিলাম? কেন আমাকে পরিত্যাগ

করিয়া আসিলে? কেন আমাকে এতদিন পত্র লিখিলে না?" আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া যোগেশ তদ্রূপ ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর ভাই, দুঃখিত হ'য়ো না। যদি পরলোক থাকে, আবার আমাদের দেখা হবে।" এই কয়টি কথা বলিয়াই যোগেশ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। আমি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম, যোগেশ তন্দ্রাভিভূত হইয়া আসিল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব হইয়া রহিল। একবার তাহার পাংশু ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বড় কারুণ্যের সহিত একটি অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হইল—"সুলোচনা"—শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, কিছুই আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। অন্তরে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। সেই দেবদুর্লভ মুমূর্ষু মুখের দিকে চাহিয়া আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রুপ্রবাহ আর বাধা মানিল না। ললাটে উষ্ণ জল স্পর্শে যোগেশ নয়ন মেলিল, আর একবার আমার দিকে চাহিল। সেই শেষ দৃষ্টি! এ জীবনে আর সে করুণ নয়নের দৃষ্টি দেখিতে পাইব না।

—'ভারতী', শ্রাবণ ১৩০৩

রেলে চুরি

সাড়ে বারোটার গাড়ীতে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনে চড়িলাম। স্লো প্যাসেঞ্জার ঢিকাইতে ঢিকাইতে চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া মনে মনে উত্তরাঞ্চল-বাসীদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে ছিলাম। সেখানকার কোন এক বুদ্ধিমান জমিদার মহাশয়ের গৃহে একজন সন্ন্যাসী কৃপা করিয়া পদধূলি দিয়াছিলেন। সাধু-সেবাপ্রিয় জমিদার দুই দিন কায়মনোবাক্যে সাধুসেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিতেছিলেন। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ জমিদারের ক্যাশ-বাক্সটি লইয়া গিয়াছেন। আমার কর্মভোগ ছিল, সেই জন্য জমিদার মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তার ফল আমাকেও কিছু ভোগ করিতে হইতেছে, কারণ সেই অন্তর্হিত সন্ন্যাসী মহাশয়কে খোঁজ করিবার কার্যটা আমার উপরেই পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেহারা সম্বন্ধে জমিদার যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে জ্ঞাত হইয়াছি, সন্ন্যাসীর বর্ণ সাধুজনোচিত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বুদ্ধি-পরিচায়ক প্রশস্ত ললাট, নাসিকা সুবঙিকম, চক্ষু ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল, দৃষ্টি তীক্ষ্ম এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি অস্ত্রাঘাতের দাগ আছে। অস্ত্রাঘাতের দাগ বোধ হয় তাঁহার পূর্বের গুণপনার নিদর্শন হইবে।

দার্জিলিং মেলে যাইলে সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু রাণাঘাটে শবশুরালয়ে নামিয়া একবার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য স্লো ট্রেনে যাইতেছি। রাণাঘাটে এ ট্রেন ছাড়িয়া দার্জিলিং মেলে চড়িবার মনস্থ করিয়াছি।

কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে গাড়ী থামিবা মাত্র, দেখিলাম একটি লোক স্টেশন-মাস্টারের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। গোলমাল দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, লোকটি অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে; তাঁহার ক্রন্দনের ভাবার্থ সংগ্রহ করা কিছু দুষ্কর হইল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝিলাম যে এই লোকটি লাটুদহের জমিদারের নায়েব। কলিকাতা হইতে দশ হাজার টাকার নোট লইয়া একটি জমিদারি কিনিবার জন্য কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাইতেছিল। নোটগুলি তাহার গলায় ঝুলানো কারেন্সি ব্যাগে ছিল, সেই নোটগুলি সমস্তই চুরি গিয়াছে। সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিলাম :—

"আমি শিয়ালদহ হইতে যখন গাড়ীতে উঠি, তখন চাবিওয়ালাকে কিছু দক্ষিণা দিয়া অপর কেহ কামরায় উঠিতে না পারে এজন্য চাবি বন্ধ করাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় একটি ভদ্রলোক পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া আমার কামরা খুলিয়া তাহাতে উঠিলেন এবং উঠিয়াই পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভদ্রলোকটির সঙ্গে মোট বেশী ছিল না, কেবল একটি-

মাত্র ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল, সেটি একজন মুটে বহিয়া আনিয়াছিল। বেশভূষায় তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হইল। তিনি গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন তিনি যেমন ব্যস্ত হইয়া মুটিয়াকে ব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিয়া দিবেন অমনি তাঁহার ব্যাগ হইতে একটি শিশি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হইল। যখন দমদম স্টেশনে গাড়ী থামিল, তখন তিনি দুই খিলি পান কিনিলেন এবং তাহার এক খিলি সুজনোচিত ব্যবহার অনুসারে আমাকে প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার এই ভদ্র ব্যবহারে অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম।

"এরূপ কিছুকাল কথোপকথনের পর ট্রেন যখন বারাকপুর হইতে ছাড়িল তখন আমি সেই ভগ্ন শিশিটির মধ্যস্থ পদার্থের গন্ধে বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় এ শিশিতে কি ছিল?'

"তিনি বলিলেন, 'সে কি মহাশয় আপনি কুন্তলীন তৈলের নাম জানেন না? কুন্তলীনের জন্যই আজকাল এইচ. বসুর নাম বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এসেন্স দেলখোস যদি আপনি আঘ্রাণ করেন তাহা হইলে আপনি ইহা অপেক্ষাও মোহিত হইবেন।' এই বলিয়া কয়টা সুন্দর ক্ষুদ্র শিশি পকেট হইতে বাহির করিলেন।

"আমি অত্যন্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া বলিলাম, 'মহাশয়, এইটিই কি এসেন্স দেলখোস?'

"'হাঁ মহাশয়' বলিয়া শিশিটি তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি ছিপি খুলিয়া নাকের কাছে ধরিলে প্রথম একটি মিষ্ট গন্ধ পাইলাম, কিন্তু সর্ব শরীর অবশ হইয়া আসিল, হাত হইতে শিশিটি পড়িয়া যাইতেছিল তিনি ধরিলেন। তাহার পর কি হইল কিছুই বলিতে পারি না। কাঁচড়াপাড়ার নিকট আসিয়া যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন আর সে লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না, ব্যাগ খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে একখানি নোটও নাই।"

এই কথা বলিয়া সে লোকটি বালকের মত ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার নিকট হইতে এইরূপ বিবরণ শুনিয়া সেখানকার দুই-একজন বুদ্ধিমান পুলিস অফিসার সাব্যস্ত করিলেন যে, এই ব্যাটা মনিবের টাকা চুরি করিয়া এরকম ধুয়া তুলিয়াছে। আমার মত কিন্তু তাঁহাদের সহিত মিলিল না। আমি ইত্যবসরে সেই কামরাটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিক একটি শিশি ভাঙ্গিয়া এক প্রকার গন্ধ-তৈল গাড়ীর মেঝেয় পড়িয়া আছে। বিশেষ-রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, একটি তৈলাক্ত নূতন রবারের জুতার ছাপ গাড়ীর অপর দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর ফুটবোর্ডের উপরও কয়েকটি ছাপ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস গাড়ীর জানালা পর্যন্ত গিয়া ফুটবোর্ডের উপর আর দাগ পাওয়া গেল না দেখিয়া, আমি সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। প্ল্যাটফরমে আসিয়া ট্রেনের টিকিট-পরীক্ষককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম

যে, তিনি ফার্স্ট ক্লাসে কোন আরোহীকে দেখিয়াছেন কিনা? তিনি বলিলেন যে, ফার্স্ট ক্লাসে একটি সাহেব ছিলেন, তাঁহার টিকিট হারাইয়া গিয়াছিল, তিনি টিকিট-পরীক্ষককে পোড়াদহ পর্যন্ত ভাড়া ধরিয়া দিয়াছিলেন। ট্রেন শ্যামনগরের নিকটস্থ হওয়ার সময় টিকিট-পরীক্ষকের সহিত এই সাহেবটির দেখা হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, ফুটবোর্ড দিয়া বাঙ্গালীবেশে চলিলে নিশ্চয় ধরা পড়িবেন, সাহেবের বেশ ধরিলে লোকে টিকিট-পরীক্ষক অথবা গার্ড ভাবিয়া লইতে পারে তাহাতেই হয়তো এই সাহেবী বেশ।

আমি তখনই কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ্ হইতে একটি ট্রলি লইয়া নৈহাটি স্টেশনে আসিলাম। হুগলীর প্ল্যাটফরমে যে দুইজন পুলিস-অফিসার হুগলীর লাইনের যাত্রীদিগের প্লেগ পরীক্ষার জন্য থাকেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, কোন সাহেব নৈহাটি হইতে হুগলীর লাইনে গিয়াছেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "না।"

আমি বলিলাম, "আপনারা তো সমস্ত টিকিটই প্লেগের ছাপের জন্য পরীক্ষা করিয়াছেন, বিনা টিকিটের কোন যাত্রীকে হুগলীর যে ট্রেন ছাড়িল সেই ট্রেনে যাত্রা করিতে দেখিয়াছেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "একটি ভদ্রলোক বোধ হয় হিন্দুস্থানী হইবেন টিকিট করিবার সময় না পাওয়াতে বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গার্ডকে মূল্য ধরিয়া দিয়াছেন।"

এই যাত্রীটিই যে আমার শিকার, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ফিরত ট্রেনে হুগলীতে যাইতে হইলে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সেই জন্য আমি আর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নৈহাটি বাজারের রাস্তা দিয়া খেয়াঘাটে গিয়া গঙ্গা পার হইলাম।

স্টেশনে যাইয়া গাড়োয়ানদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, পূর্বের ট্রেনে আগত একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক প্রতাপপুর গিয়াছেন। আমি সেই বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া নিকটবর্তী পুলিস-অফিসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে বেশ পরিবর্তন করিয়া পাড়াগেঁয়ে ইতর লোকের বেশ ধারণ করিলাম।

নম্বর চিনিয়া গাড়োয়ানের কথিত বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই বাবুর সাক্ষাৎ পাইয়া ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইয়া পড়িলাম; করুণ-স্বরে নিবেদন করিলাম যে, "হুজুর, আমার বাড়ী বাঁকুড়ো, আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই। আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা, যদি দয়া ক'রে স্থান দেন, আপনার সেবা ক'রে পেসাদ পেয়ে শেষ কটা দিন কাটাই। আর গঙ্গার তীরে থাকব, মরণকালে গঙ্গা পাব।"

বাবুজীর মন সেদিন কিছু প্রফুল্ল ছিল, তিনি বলিলেন যে, "বাপু হে, আজ-কালকার দিনে বালাম চালের দাম দেয় কে? আচ্ছা, থাক, দেখা যাবে তুমি কেমন কাজের লোক!"

আমিও মনে মনে বলিলাম, যদি কপালে থাকে তাহা হইলে আমি যে কাজের লোক তাহার পরিচয় পাইবে।

তাঁহার চাকরের সঙ্গে আমার অবস্থানের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। চাকরটার সেদিন অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল। আমার বোধ হইল, সেই জন্যই এই ভদ্রলোকটি আমার উপর এত অনুগ্রহ করিয়া বেগার ধরিলেন।

কথায় কথায় বাবুর চাকরের নিকট জানিতে পারিলাম যে, একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এখান হতে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

কর্তাবাবুটি একজন কৌল অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ; কারণ অর্থাৎ মদ্য এবং শুদ্ধি অর্থাৎ মাংস প্রভৃতিতে বিশেষ অনুরাগ। পেশা দালালি ও মহাজনি অর্থাৎ টাকা সুদে খাটানো। যাহা হউক, দুই-চারিদিন সেখানে থাকাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, ঠাকুরের অন্য কোন পেশা আছে। গঙ্গার ওপারে গৌরীপুর কাকিনাড়া জগদ্দলে যে সমস্ত কল আছে, সেই কুলী মজুর প্রভৃতির দ্বারা প্রায় চুরি ডাকাতি হইয়া থাকে। কর্তাবাবুর আড়তে সেই চোরাই মাল জমা করিয়া লওয়া ও তাহার বিলি-বন্দোবস্ত করা বাবুর একটি বিশেষ কার্য তাহা বুঝিতে পারিলাম।

বাবুর বাটীতে একটি কাঠের লেটার-বাক্স ছিল। হরকরা সেই লেটার-বাক্সে চিঠি রাখিয়া যাইত। বাবু পরে খুলিয়া পড়িতেন। সেই বাক্স হইতে চিঠি চুরি করিয়া পড়া আমার প্রধান কার্য হইল।

ডিটেক্‌টিভ কর্মচারীদিগের চিঠি খুলিয়া পড়িতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। সীল-করা চিঠিগুলি মদে রুটি ভিজাইয়া মোহরের ছাপার প্রতিলিপি তুলিয়া রাখিয়া, খুলিয়া পড়িয়া আবার পূর্বের মত শীল করিয়া দেওয়া যায়। আমি তাহা অপেক্ষাও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। চিঠির খামের একধারে একচুল কাগজ কাটিয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া লইতাম। তাহার পর সিরিশ দিয়া জুড়িয়া দিতাম যে কাহারও সাধ্য নাই ধরিতে পারে।

যতগুলি চিঠি পড়িয়াছিলাম তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই পাই নাই। চার দিনের দিন একখানি চিঠি পড়িয়া মন কিছু সন্দেহযুক্ত হইল। চিঠিখানি এই :—

প্রণাম পূর্বক নিবেদনমিদং

চৌধুরী মহাশয় আপনকার কথামত **চারি** পাঁচ দিন বিলম্ব করিয়া **রাজা** বাবুর বাগানে যাই। দেখিলাম **বাগান** ঘাস এবং আগাছায় ও **নোটের** শাকে ভরিয়া আছে; আর **লেটার** খানি বাবুকে দিয়াছি এখানকার **নম্বর পঞ্চান্ন**। পুকুরের অবস্থা ভাল **নাই**। আপনি নিয়ম মত চারি **পাঁচ** দিন বাদে এক এক **খানি** পত্র অবশ্য অবশ্য করিয়া **পাঠাইবেন**। যে সকল ইট ভাঙ্গিতে **বাকি** আছে সে গুলি সমস্ত **কলে** লইয়া গিয়াছে। এবং কতক **ভাঙ্গাও** হইয়াছে। নিবেদন ইতি

শ্রীকরমচাঁদ সিং

চিঠিখানির ভাবার্থ বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না। যাহা হউক "নোটের" "লেটার" "নম্বর" এই সমস্ত কথাগুলি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে এই চিঠির মধ্যে হারানো নোট সম্বন্ধে কিছু গূঢ় রহস্য আছে, এবং ইহা মনে করিয়া আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বারম্বার চিঠির লিখিত শব্দগুলি পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। সহসা আমার নিকট চিঠিখানির রহস্যোদ্ঘাটন হইয়া গেল।

তখন আমার বিনা মাহিনার চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলাম এবং ডাক-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাবাগান ডিবিশনের পিয়নের কার্যে নিযুক্ত হইলাম। নিযুক্ত হইবার পরদিনই আমি যাহা আশা করিতেছিলাম তাহা পাইলাম, অর্থাৎ চুঁচড়া প্রতাপপুর হইতে সাধুচন্দ্র খাঁ চৌধুরী প্রেরিত করমচাঁদ সিংহের নামীয় একখানি রেজেস্টারী চিঠি আমার হস্তগত হইল।

রেজেস্টারী চিঠি লইয়া আমি চার নম্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। রেজেস্টারী চিঠির সংবাদ পাইয়া বাটীর কর্তা বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার নিকট হইতে রসিদখানি লইয়া সই করিয়া আমার হাতে ফেরত দিলেন। আমি দেখিলাম, পূর্বোলিখিত পত্রের লেখা ও এই হাতের লেখা ঠিক একপ্রকার। তখন আমার সঙ্কেতে চারিজন পাহারাওয়ালা আসিয়া করমচাঁদকে গ্রেপ্তার করিল।

তারপর সেই রেজেস্টারী চিঠিখানির উপর ডেড-লেটার আপিসের ছাপ দিয়া একজন সহকারীর দ্বারা প্রতাপপুরে সাধুচন্দ্র খাঁ চৌধুরীর ওখানে পাঠাইয়া দিলাম। ডাকওয়ালা গিয়া খবর দিল যে, কলিকাতার একখানি রেজেস্টারী চিঠি ডেড-লেটার আফিস ঘুরিয়া ফেরত আসিয়াছে, চৌধুরী মহাশয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিদখানিতে সই করিয়া ফেরত লইলেন। সেই সময় পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল এবং পূর্বোক্ত রেজেস্টারী চিঠি খোলায় তাহার মধ্য হইতে পাঁচখানি চোরাই নোট বাহির হইল এবং তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাশী করায় অপহৃত নোটের আরো কয়েকখানি পাওয়া গেল।

পূর্বোক্ত করমচাঁদই যে সন্ন্যাসী সাজিয়া ক্যাশ-বাক্স চুরি করিয়াছিল এবং রেলে নায়েবকে দেলখোসের পরিবর্তে ক্লোরোফর্ম দ্বারা হৃতচেতন করিয়া তাহার ব্যাগ হইতে নোটগুলি চুরি করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে পূর্বোক্ত চিঠিখানির "নোটের" "লেটার" "নম্বর" এই তিনটি কথা হঠাৎ চোখে পড়িয়া আমার মনে প্রথম সন্দেহের উদয় হয়। সেই সময় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, এই কয়েকটি কথা ঠিক চারিটি চারিটি কথার অন্তরে আছে। এই ইঙ্গিত অনুসারে পত্রের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক পঞ্চম কথা একত্রে পড়িয়া দেখিয়াছিলাম যে কথাগুলি এইরূপ দাঁড়ায় "চারি রাজাবাগান নোটের লেটার নম্বর নাই পাঁচখানি পাঠাইবেন বাকি কলে

ভাঙ্গাও"। অতএব পত্রলেখক যে এই কথাগুলি লিখিবার জন্যই এরূপ সুকৌশলে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল, তাহাতে আমার আর সন্দেহ ছিল না।

বাঙ্গালীর পেটে কোন কথা থাকা বোধ হয় বিধাতার নিয়ম নহে। সেই কারণে হারানো নোটের যে সিরিয়াল নম্বর নাই, এ কথা কলিকাতা শহরময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। কাজেই জুয়াচোরদের এ কথা জানিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই।

নায়েব নিষ্কৃতি পাইয়া আমার নিকট আসিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে উপদেশ দিলাম যে, যদিও তিনি লাটুদহের জমিদারের নায়েব, কিন্তু তথাপিও রাস্তার প্রত্যেক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করাটা ঠিক হয় নাই।

—'কুন্তলীন পুরস্কার' ১৩০৬

অদৃষ্টের উপহাস

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল তাঁহার মাতৃহীনা কন্যা উমা। প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া যখন গঙ্গাস্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ইচ্ছামতীতীরে গমন করিতেন, তখন ব্রাহ্মণের হৃদয়ে শৈলসুতা উমার, অথবা তাঁহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা উমার—কাহার মুখচ্ছবি যে উদিত হইত বলা কঠিন। কিন্তু স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় যখন লাল চেলির কাপড়-পরিহিতা হাস্যময়ী উমারাণীকে পুষ্পচয়ন করিয়া ঘরে ফিরিতে দেখিতেন, তখন যে ব্রাহ্মণ সুরধুনী-স্তোত্রের ফল হাতে হাতে পাইতেন—এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি।

ছোট একখানি নিকানো মাটির প্রাচীর-ঘেরা অঙ্গন, দুইখানি শয়নের ঘর, একখানি রন্ধনের ঘর, আর একখানি গরুর চালা—এই তো চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ। পরিবারের ভিতর তিনি, একটি দাসী, একটি রাখাল, দুইটি গরু, তিনটি বাছুর। এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী তাঁহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা উমা। বড় বড় সুগৃহিণীগণ, চাটুজ্যে-বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া উমার গৃহিণীপণার সুখ্যাতি করিতেন। উঠানটি এমনি তক্‌তকে যে সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়, বাসনগুলি জলচৌকীর উপর ঝকঝক করিতেছে। যেখানে যে জিনিসটি রাখিলে সহজে পাওয়া যায় আর সাজানো দেখা যায়, সেখানেই সেই জিনিসটা গুছানো রহিয়াছে। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া উমা পিতার পুষ্পসজ্জা করিয়া রাখিয়া ঘরের দাওয়ায় গাড়ু ও গামছা, দড়িতে কোঁচানো কাপড়খানি রাখিয়া তবে অন্য কার্যে যাইত। আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, যখন-তখন ঘরে আসিয়া স্নেহ-কম্পিত স্বরে "মা উমো!" বলিয়া ডাকিতেন, তখন মনে হইত যেন খেলাধুলা করিয়া ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিল।

গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্না-রাত্রে দাওয়ার উপর মাদুর বিছাইয়া পিতার নিকট গল্প শুনিতে শুনিতে উমা তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। তখন ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে সেই নিদ্রিত মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিতেন, সে সময় তাঁহার মনের ভিতর কত তরঙ্গই উঠিত। পাঁচটি সন্তান কাড়িয়া লইয়া ভগবান এই কন্যা-রত্নটি শোকার্ত ব্রাহ্মণের তাপিত হৃদয় শীতল করিতে রাখিয়াছেন. এই কি বাঁচিবে? আহা! উমা বড় দুঃখিনী. মা কেমন তাহা জানে না। ছয় মাসের মাতৃহীন শিশুকে ব্রাহ্মণ বুকের উপর রাখিয়া ঘুম পাড়াইতেন, শিশু পিতার বুকে স্তন খুঁজিত, আর না পাইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইত। কত যত্নে কত কষ্টে যে উমাকে লালন-পালন করিয়াছেন, তাহা কেবল পিতার হৃদয়ই জানে। হায়! দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমার এই দরিদ্রের ধন, জীবনের সম্বল কাহার হাতে তুলিয়া দিবে? উমাকে পরগৃহে পাঠাইয়া কেমন করিয়া শ্মশানতুল্য অন্ধকার ঘরে অন্ধকার জীবন যাপন করিবে?

কিন্তু তবু তো বিবাহ দিতে হইবে, কন্যা পাত্রস্থা না করিলে নয়, কাজেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাত্র অন্বেষণে মন দিয়াছেন।

আষাঢ় মাসের বৈকাল। এইমাত্র এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। নববর্ষ-সমাগমে ক্ষীণাঙ্গী ইচ্ছামতী কুল-প্লাবনা চঞ্চলা মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। নদীর ঘাটে কয়েকখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, আর এই বৃষ্টির দিনেও জনকয়েক গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ নদীর ঘাটে সমবেত হইয়াছেন। আজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা-বিদায়ের দিন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের ভিতর একজন প্রাচীন সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নৌকারোহী এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মুখুয্যে মশায়! দুর্যোগটা দেখিয়া গেলে হইত না? বিশেষ সময়টা বারবেলা।"

মুখুয্যে মহাশয় নৌকার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "শ্রীগুরু! আবার এই গ্রামে রাত্রি যাপন করিব? ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, নৌকা ডুবিয়া যাউক, যাহাই হউক না কেন, আমি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিব না।"

"মুখুয্যে মহাশয়! শুভবিবাহের কার্যে অনর্থক বিবাদ করাটা কি ভাল? আদিনাথ ভায়া যে তেমন সঙ্গতিপন্ন নহেন, উপযুক্ত যৌতুকাদি দিয়া আপনার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না,—এ কথা তো আপনি পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন।"

মুখুয্যে মহাশয় এবার নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "যান যান মশায়, আপনারা কেমন লোক খুব বুঝিয়াছি। আপনাদের কথাতেই তো আমি এই ছোটলোকের ঘরে কার্য করিতে আসিয়াছিলাম, নহিলে পূর্বে এরূপ জানিলে কে এ গ্রামে পদার্পণ করিত! কন্যা সুন্দরী! সুন্দরী কন্যা কি আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের জুটিত না? কত কত সুন্দরী কন্যা পায়ে ধরিয়া সাধিয়া দিতে আসিয়াছিল। যাহা হউক, যেমন প্রবঞ্চনা করিয়া কন্যাদায় উদ্ধার হইলেন, তেমনি এ কথাটি স্মরণ রাখিবেন যে, কেহ কন্যা আনিতে আমার বাড়ী পশিলে অপমান হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। মাঝি, নৌকা ছাড়িয়া দাও।"

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। ইচ্ছামতীর তরঙ্গে তরঙ্গে নৌকা ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সেই সঙ্গে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শেষ জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ—সমস্তই ইচ্ছামতীর স্রোতে ভাসিয়া গেল। যতক্ষণ নৌকা দেখা গেল, ততক্ষণ সকলেই নীরবে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে একজন বলিলেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ভাবিয়া আর কি হইবে, কন্যা-সন্তান কেবল বৃথা! এখন গৃহে চলুন।"

"নারায়ণ" বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শূন্য গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিলেন।

অনেক খুঁজিয়া উমার পিতা উমার জন্য পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। সুন্দর, সংস্বভাব, বিদ্বান, অল্পবয়স্ক, সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্তান, লোকে যাহা খুঁজে সকলই মিলিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্টের কথা কে গণিয়া বলিতে পারে? পাত্রের পিতা ছিলেন না কিন্তু পিতৃতুল্য খুল্লতাত বর্তমান, এমন সম্বন্ধ কে খুঁজিয়া পায়?

কিন্তু নিন্দুকেরা কাহার নামে না নিন্দা রটায়? কাজেই তাহারা যে পরম ধার্মিক হরিহর মুখোপাধ্যায়ের নামেও দুই-চারি কথা বলিবে, এ কিছু আর আশ্চর্য নয়। নিন্দুকেরা বলিত, হরিহর মুখুয্যে নির্বোধ ভ্রাতৃজায়াকে ভুলাইয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষয়গুলি একে একে বেনামী করিয়া হস্তগত করিতেছে। কিন্তু মূর্খেরা বুঝে না যে, নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা কত কঠিন, কাজেই যে বেনামী করিতে হয়। আর বেনামী করিলেই বা দোষটা কি? বেনামেই থাক্, আর স্বনামেই থাক্, দেবেশের সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া না দিয়া আর তিনি মরিবেন না। তাঁর মুখে দিন-রাতই শুনা যাইত, "আগে আমার দেবেশ, তবে তো অবিনাশ।" এমন লোককেও কি এমন কথা বলিতে আছে?

নিন্দুকের কথাই স্বতন্ত্র। এমন প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে উপযুক্ত যৌতুক না পাইলে, কোন্ স্নেহময় খুল্লতাতের হৃদয়ে দারুণ দুঃখ উপস্থিত না হয়? কাজেই নববধূর কৃপণ পিতার সহিত বিবাদ হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নিন্দুকেরা কানাকানি করিল, পাছে বৈবাহিক আসিয়া জামাতার পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে তাহাকে কোন পরামর্শ দেন, এজন্য চতুর মুখোপাধ্যায় প্রথমেই ছল ধরিয়া বৈবাহিকের কন্যার শ্বশুর-গৃহে আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বর-কন্যার তো হাতে হাতে বন্ধন হইয়া গিয়াছে। এখন ভগবান উমাকে স্বামীর সুখে সুখিনী করুন। আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অন্তিম জীবন সুখে অথবা দুঃখে একরূপ কাটিয়াই যাইবে।

বৈকালে উমা যখন শাশুড়ীর মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছিল, তখন আদুরীর মা চুপি চুপি তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীর একখানি চিঠি দিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেখানি তখন পড়িবার সময় নয় বলিয়া উমা খোঁপার ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময় তাহার একটি ছোট খুড়তুতো দেবর ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "ওগো জেঠাইমা, বৌঠাকরুণের বাপের বাড়ী থেকে লোক এসেছে গো, তার নাম ছিরাম মণ্ডল।" শুনিয়া অন্নপূর্ণা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "যাও তো শচী, বসবার একটা যায়গা দাওগে, আর ঠাকুরপো এই বাড়ী এলেন ব'লে, ততক্ষণ তুমি একটু তার কাছে গিয়ে ব'স বাবা। হাজার হোক কুটুম-বাড়ীর লোক।"

উমা তখন সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া, প্রথমে তুলসীতলায়, তার পর ঘরে ঘরে প্রদীপ দিয়া রন্ধন-গৃহের দিকে যাইতেছে দেখিয়া, শাশুড়ী ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁগা বৌমা, আজ রাঁধতে যাবার এত তাগাদা কেন? আমার গাছকতক চুল গুছিয়ে যাও। এই খেইটা শেষ হ'লেই দড়িগাছটা হয়ে যায়, তা আর হয়েই

ওঠে না।" অগত্যা উমা তাড়াতাড়ি চুল গুছাইয়া দিতে গেল। এমন সময় নূতন ঘর হইতে ছোট গিন্নী কাত্যায়নী ঠাকুরাণী বাহির হইয়া বলিলেন, "বলি বাছা তোমার কি আর রাঁধতে যাওয়ার বার হয়ই না? বাছারা আমার দুপুর রাত হয়ে যায় তবু চারিটি ভাত পায় না। দুই শাশুড়ী-বৌয়ে ব'সে ব'সে চুলের দড়ি বিনুলেই কি গেরস্থের পেট ভরবে? সব কাজেই তো একটা সময় অসময় আছে।" শুনিয়া অন্নপূর্ণা দেবী বধূকে বলিলেন, "তবে থাক্, তুমি রাঁধতেই যাও।" এই বলিয়া আপন মনে আস্তে আস্তে কি বলিতে বলিতে চুলগুলি তুলিয়া রাখিলেন।

দেখিয়া ছোট বৌ পঞ্চমে উঠিলেন, "এত গজ্‌গজানই বা কিসের? তবু যদি ছেলে রোজগেরে হ'ত, তা হ'লে না জানি কি হ'ত?"

অন্নপূর্ণা কাঁদ-কাঁদ হইয়া উত্তর করিলেন, "এত কথা শোনানো কেন ছোট বৌ? বাছা আমার বিদেশে, তার কথা নিয়েই বা পাঁচ কথা বলা কেন? ছেলে রোজগার করে না-করে তা তোমরাই জান। রোজগার করে না-করে তবু তো বছর ঘুরে গেল বৌটাকে বিয়ে ক'রে ফেলে রেখে সেই কোন্ বিদেশে গিয়ে প'ড়ে রইল, আজও দেশে এল না। আর রোজগার যদি নাও করে, সে তো আর ভেসে আসে নি; তারও তো ভাগের ভাগ বিষয় আছে?"

ছোট বৌ এবার পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে চড়িলেন। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি দত্তপুকুর ধার হইতে বসুদের চন্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। উমা অবাক হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল, খুড়শ্বশুরকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিল।

হরিহর মুখোপাধ্যায় অন্তঃপুরের অঙ্গনে পদার্পণ করিয়াই ব্যাপার কি বুঝিলেন। অলক্ষিতে একটু হাস্যরেখা তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি ভ্রাতৃজায়ার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "থাম থাম বড় বৌ, ব্যাপারটা কি? ও একটা পাগল ছাগল বোকা মানুষ, আর ওর কথায় জবাব দেওয়া কি তোমার শোভা পায়? তা যাক, এদিকে যে কুটুম্ববাড়ীর লোক এসে ব'সে আছে, বৌমাকে নেবার জন্যে, কি বল, পাঠাবে? ছোটলোক! কে একটা মণ্ডল, সদ্গোপ না হাড়ী বাগ্দী কি একটা হবে, তিনি এসেছেন নিয়ে যেতে! সে আবার বলে কিনা, 'একবার দিদিঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করব।' এমন ছোটলোকের ঘরেরও মেয়ে এনেছিলাম! হায়! হায়! দেবু আমার হীরের টুকরো ছেলে, সোনা এক দিকে আর দেবুকে এক দিকে ওজন ক'রে কত লোক পরীর মত মেয়ে পায়ে ধ'রে দিতে এসেছিল। যেমন আমার কুগ্রহ! তাই গেলাম সেই ছোটলোকের ঘরের মেয়ে আনতে। তখনই ব'লে এসেছিলাম যে, মেয়ে আনতে পাঠালে অপমান হয়ে ফিরতে হবে। তার কি সে লজ্জা আছে? ব'লে পাঠানো হয়েছে 'বড় পীড়া, অন্তিমকালে একবার কন্যাকে দেখিবার বাসনা।' সব জুয়াচুরি, আর মিথ্যা কথা। এমন জুয়াচোর কি দুটি আছে? কি বল বড় বৌ, বৌ পাঠাবে?"

দেবরের মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া উমার শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণীর অন্তর বিগলিত হইয়া গেল। ইতিপূর্বে কনিষ্ঠা মাতার প্রতি যে ক্রোধবজ্র উদ্যত

হইয়াছিল, তাহা এখন নিরুপায় বধূর পিতার মস্তকে পতিত হইতে লাগিল। সে যে তাঁহার সোনার চাঁদকে ফাঁকি দিয়া পঞ্চ হরিতকী দিয়া মেয়ে গছাইয়া দিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে বড়মানুষ শ্বশুরের যৌতুক ও আদর-যত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই পুরাতন দুঃখসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। মনের দুঃখে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "সে যমের বাড়ী যাউক, অথবা যথায় ইচ্ছা যাউক, সেই দগ্ধাননের গৃহে কখনো তাহার বধূকে পাঠাইবেন না।"

যদিও কথাগুলি খুব উচ্চৈঃস্বরে বলা হইতেছিল, কিন্তু উমা রন্ধন-গৃহ হইতে তাহা শুনিতে পায় নাই, কেননা সে তখন চুল্লীর আলোকে পিতৃ-প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। উমা পিতার নিকট একটু একটু পড়িতে শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু হাতের লেখা ভাল করিয়া পড়িতে পারিত না। এজন্য গ্রামের ঠাকুরদাদার হাতের জড়ানো লেখা পড়িতে তাহার বড়ই কষ্ট হইতেছিল, যাহা হউক তবুও অনেক কষ্টে এক রকম পড়িতেছিল, কিন্তু পাছে কেহ আসিয়া দেখে এই ভয়ে বার বার দুয়ারের দিকে চাহিতে গিয়া তাহার আরও গোলমাল হইয়া যাইতেছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাকে লিখিয়াছেন, "উমা, আজ এক বৎসর হইল তোমাকে বিদায় দিয়া অন্ধকার ঘরে বাস করিতেছি। এই এক বৎসরের মধ্যে তোমার কোন সংবাদ লইতে পারি নাই বলিয়া তুমি কি মা, তোমার কাঙ্গাল পিতার উপর অভিমান করিয়াছ? মা লক্ষ্মী, তুমি দরিদ্র পিতার এ কথা সর্বদা মনে রাখিবে। পিতার দারিদ্র্য-দোষে যদি তোমাকে কষ্ট পাইতে হয় তাহাতে বিরক্ত কিংবা ক্রুদ্ধ হইও না। শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে দেবতা বলিয়া মনে করিবে। তাঁহারা অযথা বাক্য বলিলে, অথবা বিনা দোষে তিরস্কার করিলেও বিরক্ত হইতে নাই। মা লক্ষ্মী আমার, আমি ভরসা করি তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, মূর্তিমতী সহিষ্ণুতার ন্যায়, শ্বশুরালয়ে কালযাপন করিতেছ।

"সম্প্রতি আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি, এজন্য নিজ হস্তে তোমাকে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তোমাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য তোমার শ্বশুরের নিকট পত্র লিখিয়াছি তিনি তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন কিনা জানি না। যদিই আর তোমার সহিত দেখা হওয়া বিধির লিখন না থাকে তুমি আমার উপদেশগুলি সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

"মা, স্বামী স্ত্রীজাতির জীবন-মরণের দেবতা। তিনি সুন্দর অথবা কুৎসিত, প্রিয়ম্বদ অথবা কটুভাষী, সচ্চরিত্র অথবা রূঢ়প্রকৃতি, যাহাই হউন না কেন, তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মনে করা উচিত। সেই স্বামীর পদে যেন তোমার মতি চিরদিন অচলা থাকে—এই আমার শেষ আশীর্বাদ।"

পত্র পড়িতে পড়িতে উমার বিন্দু বিন্দু চোখের জল জ্বলন্ত কাষ্ঠের উপর পড়িতেছিল। কত কথা একসঙ্গে মনের ভিতর উঠিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল! আহা! একা একা বিছানায় পড়িয়া পিতা এখন কি করিতেছেন? কে তাঁহাকে পিপাসার সময় জল দিতেছে, গায়ের জ্বালা করিলে

কে গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে? উমা যদি পাখী হইত, এখনই উড়িয়া তাহার বাবার কাছে যাইত।

শ্রীরাম মণ্ডল যখন কল্যাণপুরে ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের ঘরে ঘরে সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিয়া আবার থামিয়া গিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যার শঙ্খ বাজে নাই, উমা নাই—কে বাজাইবে? সেই তক্‌তকে উঠানে ঘাস জন্মিয়াছে ও এক পাশে কাঁটানটের জঙ্গল হইয়াছে। বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া মণ্ডলপুত্রের পা আর অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। কি বলিয়া সে বাড়ীতে ঢুকিবে? যখন মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতা জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমার উমা কই?" তখন সে কি উত্তর দিবে?

উমা পিতার ঘরখানিকে কত যত্নে সুসজ্জিত করিয়া রাখিত, এই সেই ঘর! ঘরময় ঝুল ঝুলিতেছে, আরসুলা গিরগিটি নিশ্চিন্তমনে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। আড়ে ঝুলানো লেপ-তোষকগুলা ইঁদুরে কাটিয়া রাশীকৃত তুলা জড়ো করিয়াছে। দুয়ারের সম্মুখে উমার হাতের গাঁথা একটি কড়ির ঝাড় ঝুলিতেছে, ঘরে মিটমিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে তাহার আলো উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে। মরণাপন্ন আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া উমার মুখখানি স্মরণ করিতেছিলেন। যেন সে তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, ধীরে ধীরে তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে কোমল হস্তখানি বুলাইয়া দিতেছে, স্নেহাকুল একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁহার রোগশীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া আছে। একাকী শয্যায় পড়িয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই সুখের কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময় কাহার ছায়া আসিয়া ঘরের ভিতর পড়িল! চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?"

মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আমি ছিরাম মণ্ডল।"

আগ্রহে প্রাণপণ শক্তিতে মুমূর্ষু আদিনাথ বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন, রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমা আসিয়াছে?"

"না বাবাঠাকুর, দিদি-ঠাকুরানীকে তাঁহারা পাঠাইলেন না।"—এই বলিয়া শ্রীরাম মণ্ডল বালকের ন্যায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"নারায়ণ!" বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিলেন। বোধ হইল যেন সেই একটি নিশ্বাসের সহিত তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

যথাসময়ে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ উমার শ্বশুরালয়ে পেঁৗছিল। শুনিয়া উমা "বাবা গো" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হরিহর মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃজায়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বাড়াবাড়িটা কিছুতেই ভাল নয়, বাপ মা আর কাহার চিরকাল বাঁচিয়া থাকে? বিশেষ দেবু বিদেশে, তাহারও তো কুশল-অকুশল দেখা চাই!"

উমা সেই হইতে একেবারে নীরব হইয়া গেল। তাহার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিত, কিন্তু কে যেন একখানি গুরুভার শিলা বুকের উপর চাপাইয়া দিয়াছে তাই সে বাহির হইতে পারিতেছে না। নীরবে পূর্বের ন্যায় দৈনিক কার্য করিত, বোধ হইত যেন একখানি ছায়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

স্বামীর কথা উমার বড় একটা মনে নাই। সেই বিবাহের সময় দেখা, সে আর কয় দিন? তখন নূতন শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া ভয়ে ও দুঃখে উমা একেই দিন-রাত ক্রন্দন করিত, তাহার পর দিবা-নিশি পিতার ব্যয়কুণ্ঠতার সমালোচনায়, তাহার ন্যায় লক্ষ্মীহীনের কন্যার পক্ষে এমন লক্ষ্মীমন্ত সংসারে বিবাহিত হওয়া কতদূর সৌভাগ্যের বিষয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তাহার চক্ষুপ্রবাহিতা ধারা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এজন্য দেবেশ ঘরে আসিয়া উমাকে প্রায়ই কাঁদিতে দেখিতেন, আর তখন কত মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া উমার চোখের জল মুছাইয়া দিতেন, সে কথা কি উমা এ জীবনে ভুলিতে পারিবে? পাকস্পর্শের দিন দেবরের মুখে পুত্রের গুণবর্ণনা ও সেই সঙ্গে বধূর পিতার চাতুরী করিয়া কন্যাদায় উদ্ধারের কথা শুনিয়া উমার শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরানী অনুপস্থিত অপরাধী সম্বন্ধে উপস্থিত নববধূর নিকট যে দীর্ঘ চারি ঘণ্টা অনর্গল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে উমা যখন শয্যায় শয়ন করিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, আর শত চেষ্টা করিয়াও থামিতে পারিতেছিল না, তখন যে দেবেশ উমার মুখ মুছাইয়া দিয়া মধুর স্বরে বলিয়াছিলেন, "ছি! মায়ের কথায় কি কাঁদতে আছে?" সে কথা কি অমৃতময়! ইষ্টমন্ত্র যেমন লোকে অতি গোপনে হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া রাখে, উমাও তেমনি কথাগুলি অতি যত্নে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যখন পিতার কথা মনে করিয়া বড় কষ্ট হইত, হয়তো তিনি পিপাসার সময় জল চাহিয়াও পান নাই, হয়তো গায়ের জ্বালায় কতই ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন, বাতাস করিবার কেহ ছিল না, উমাকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কতই না আকুল হইয়াছিল—এই সকল কথা মনে পড়িয়া যখন উমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইত, তখন সেই অমৃতময় কথা কয়েকটি উমার হৃদয়ের দাবানলে অমৃত ঢালিয়া দিত। উমা যদি মরিয়াও যায়, তবু সে কথাগুলি ভুলিতে পারিবে না।

দেবেশচন্দ্র দুই বৎসর হইল বাড়ী আসেন নাই। ইতিপূর্বে তিনি যখন কলিকাতায় পাঠাভ্যাস করিতেন, তখন গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটির সময় বাড়ী আসিতেন। কিন্তু এবার দুই বৎসর একেবারেই বাড়ী আসেন নাই। অন্নপূর্ণা দেবরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, দেবেশ এখন উকিলের বাড়ী কাজ শিখিতেছেন। হরিহর বলিতেন, "দেবু আমার হীরের টুকরো ছেলে, কত তপস্যায় অমন ছেলে পাওয়া যায়! ও যদি না এর পর একটা লোক হয়, তবে আমার নামই মিথ্যা। কাজ শেখায় এমন মন কোন ছেলের দেখি নি।"

বড় বৌ বলিতেন, "তা কাজ শিখুক, তা ব'লে কি একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে হয়? আমারও তো আর পাঁচ নেই, সাত নেই, একটি ছেলে, এতদিন না দেখে কি ক'রে থাকি?"

হরিহর সাহাস্যবদনে উত্তর দিতেন, "বাড়ী আসবার জন্যে লিখতে কি আর

কম করেছি? তা, ছেলের ঝোঁক হয়েছে, কাজটা না শিখে বাড়ী আসবে না। এমন ছেলে কি আর আজকালের দিনে হয়?"

দেবরের কথায় অন্নপূর্ণা পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিতেন; ভাবিতেন, এত দিনই যখন দুঃখে কষ্টে কাটিয়া গিয়াছে, আর মাস কতকও তেমনি করিয়াই কাটিয়া যাইবে, দেবুর যাহাতে ভাল হয় তাহাই ভাল।

বৈকালে বৈকুণ্ঠপুরের নদীর ঘাটে একটি মহা মহিলা-সমিতির অধিবেশন হইত। সেই সমিতিতে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা হইতে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা পর্যন্ত সকলেই যোগদান করিত। সভার প্রধান উদ্দেশ্য, গ্রামস্থ প্রত্যেক নরনারীর চরিত্র সমালোচনা করা, তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য আলোচনাও সভার অঙ্গীভূত ছিল। রেবতীদিদিই প্রায় সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতেন। গ্রামের ভিতর স্পষ্ট-বাদিনী বা মুখরা বলিয়া তাঁহার একটা সুখ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল, কিন্তু তিনি যে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী—এ কথা পুরুষেরাও স্বীকার করিতেন, গ্রামস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ভাদ্র মাসের কোন একদিন সন্ধ্যাসমাগমে যখন এই বৈকালিক মহাসভার সভ্যগণ সভাভঙ্গ করিয়া একে একে সিক্তবস্ত্রে, জলপূর্ণ কলসী কক্ষে, কেহ বা সন্তান ক্রোড়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় অন্নপূর্ণা ঘাটে আসিলেন।

রেবতীদিদি তখন পিতল কলসে জল ভরিতেছিলেন, অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যা লা বড় বৌ, একেবারে যে সন্ধ্যে লাগিয়ে ঘাটে এলি?"

অন্নপূর্ণা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর ঠাকুরঝি, দেরির কথা কেন বল? ঘরকন্না উনকুটি চৌষুট্টি সারব তবে তো আসব? ছোট বৌর কোলে কাঁখে ছেলে, আজ এটার অসুখ, কাল ওটার অসুখ। তাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, ধোয়ানো; নিজেও তো ন'ড়েও বসতে পারেন না, ভাগ্যে আমার বৌটা ছিল তাই। একটু দাঁড়িয়ে যাও ঠাকুরঝি, আমি শীগ্‌গির কাপড় কেচে নিচ্ছি।"

রেবতী বলিলেন, "দাঁড়াব বইকি, তুই নে না। তা বৌ, তোর বৌটি বড় লক্ষ্মী বৌ হয়েছে।"

অন্নপূর্ণা একগাল হাসিয়া বলিলেন, "দিদি, তোমাদেরই আশীর্বাদে। বাছার মুখে কথা নেই, রাত দিন রান্না-বান্না ঘরকন্নার কাজ নিয়েই আছে; আর সকলের উপর ভক্তি-ভালবাসা খুব। এমন বৌ আজকের দিনে হয় না।"

রেবতী বলিলেন, "তা দেবু আর কতকাল বিদেশে থাকবে? বাড়ী আসবে না? আর তুই বা কেমন মা, ধন্যি যা হোক তোর মায়ের প্রাণ; কেমন ক'রে এতদিন ছেলেকে দেশান্তরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস? আহা, বাছার জন্য আমারই মন যে কেমন করে, তা তুই তো মা।"

অন্নপূর্ণা কলসী মাজিতে মাজিতে উত্তর করিলেন, "কি করি ঠাকুরঝি, ছেলে বাড়ী আসতে চায় না। বলেছে নাকি, একেবারে কাজ শিখে তবে বাড়ী আসবে। তা, তাতেই যদি ওর ভাল হয়, তাই করুক, আমার আর সুখ-দুঃখ কি?"

"আ মর্ নেকী! তাই বুঝি ভেবে রেখেছ? ছেলে বাড়ী আসতে চায় না, তোকে কে বলেছে? হরিহর মুখুয্যে বলেছে বুঝি? এমনই তোমাকে বোকা বুঝিয়ে রেখেছে বটে! এদিকে দেবু বাড়ী আসতে চাইলেই যে তাকে বারণ ক'রে পাঠায়, তা বুঝি জান না? সুবোধ ছেলে, তাই কাকার কথা অমান্য ক'রে বাড়ী আসতে পারে না, অন্য কোন ছেলে হ'লে কি বারণ শুনত?"

অন্নপূর্ণা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কই ঠাকুরঝি, এসব কথা তো আমি কিছুই শুনি নি? দেবুকে বাড়ী আসতে ঠাকুরপো বারণ করেছেন? কেন, বারণ করার মানে কি?"

রেবতী বলিলেন, "মানেই যদি বুঝবে তবে তোমার এমন দশা কেন? এদিকে যে গুণের দেওর তলে তলে দেবুর ভাগের বিষয় সব নিলেমে উঠিয়ে দিচ্ছে, তার কিছু খবর রাখিস? ওলো বড় বৌ, অত নেকী হ'স নে, একটু সেয়ানা হ। এখনও দেবু যাতে বাড়ী আসে তাই কর্, নইলে বাছার আর খুঁদকুড়ো কিছুই থাকবে না।"

বড় বৌ আকুল হইয়া রেবতীদিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি করব ঠাকুরঝি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন ক'রে তাকে বাড়ী আনব? আমার কথায় সে কি আসবে? তোমার কথা শুনে আমার গা কাঁপছে, বাছা আমার প্রাণে প্রাণে মঙ্গলে থাকলে বাঁচি।"

সেদিন অন্নপূর্ণার বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া জলের কলসীটি নামাইবামাত্র কোথা হইতে ছোট বৌ বলিয়া উঠিলেন, "খুব ঘাটে যাওয়া যা হোক! অর্ধেক রাত ঘাটে পুইয়ে এলে যদি কোন দোষ না হয়, তবে সারা রাত কাটিয়ে এলেই হ'ত।"

অন্যদিন হইলে অন্নপূর্ণা ছোট বৌয়ের কথায় উত্তর দিতেন, কিন্তু আজ কিছুই না বলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। রাত্রে রন্ধনগৃহের কাজ ও সকলের আহারাদি শেষ হইলে প্রতিদিনের ন্যায় তেলের বাটি লইয়া উমা যখন শাশুড়ীর পদতলে গিয়া বসিল, তখন দেখিল, তিনি দুই হাতের ভিতর মুখ রাখিয়া আকুল ভাবে রোদন করিতেছেন। দেখিয়া উমা কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ব্যথিত হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা শান্ত হইলেন। মুখ তুলিয়া দেখিলেন, বধূ পদতলে বসিয়া আছে, তখন আবার তাঁহার দুঃখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। "তুমি যে এমন ক'রে অনাথিনী ক'রে যাবে তা তো স্বপ্নেও ভাবি নি। তোমার দেবুর মুখ চাইতে কে আছে? তোমার এত সাধের দেবুর বৌ, তুমি একবার দেখলে না,' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আজ, বহুদিন পরে, তাঁহার বিস্মৃতপ্রায় স্বামীশোক আবার উথলিয়া উঠিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে ধৈর্য ধারণ করিয়া অন্নপূর্ণা বধূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিলেন। তাহার ঘোমটা খুলিয়া অযত্ন-বিন্যস্ত চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে দেবেশকে বাড়ী আনিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহা শুনাইলেন।

মিথ্যা করিয়া নিজের গুরুতর পীড়ার সংবাদ লিখাইয়া পাঠাইয়াছেন, দেবেশ যে মাতৃভক্ত ছেলে, মায়ের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ শুনিলে সে সেই মুহূর্তেই রওনা হইবে সন্দেহ নাই।

সে রাত্রে শাশুড়ী ও বধূ কাহারও নিদ্রা হইল না। অশ্রুজলে, শোকে, উদ্বেগে, আশায়, নিরাশায় সারা রাত্রি কাটিয়া গেল।

মধ্যাহ্ন-আহারের সময় হরিহর মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃজায়াকে ডাকিয়া বলিলেন "দেবু নাকি বাড়ী আসছে?"—বলিয়া তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

অন্নপূর্ণা দেবরের প্রশ্নের ভঙ্গী শুনিয়া শঙ্কিত ভাবে উত্তর করিলেন, "দেবু বাড়ী আসবে নাকি? তোমাকে খবর পাঠিয়েছে বুঝি?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিলেন, "খবরাখবর কিছু আসে নি, একেবারে ভৈরবপুরের বাজারের ঘাটে নৌকা এসে লেগেছে, সেখানে তারা খাওয়া-দাওয়া করছে, আমার লোক দেখে এসেছে। সন্ধ্যা নাগাদ বোধ হয় বাড়ী পৌঁছবে।"

সে দিন সন্ধ্যার পর শাশুড়ী বধূকে বলিলেন, "বৌমা, একখানি ভাল কাপড় পর্ মা। আমি শাশুড়ী বলছি, আমার কথা শুনতে হয়। আহা, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! গাখানিতে একবার হাত দেওয়া নেই, চুলগাছটা সোর করা নেই, রাতদিন সংসারের কাজ নিয়ে আছেন, তবু মায়ের কাছে পাড়ার কোন্ বৌটা দাঁড়াতে পারে? দেবু বড় পান ভালবাসে, এক ডিবা ভাল ক'রে পান সেজে রেখো। দেবু আমার হাতের তরকারি খেতে বড় ভালবাসে, আহা, দু বছর বাছা আমার হাতের রান্না খায় নি। আজ তারই জন্য দুখানা রেঁধেছিলাম, বাটিতে বাটিতে তুলে রেখেছি, রান্নাঘরে ধ'রে নিয়ে যাও। যাও, যাও, বড় ঝড় উঠল, যাও শীগগির রান্নাঘরে যাও। ভাতে ব্যান্নুনে ধুলো পড়বে।"

পরদিন রাত্রি-প্রভাতে আবার সূর্যালোকে চারিদিক হাসিয়া উঠিল। আকাশের শান্ত ভাব দেখিলে গত রাত্রে যে ভয়ানক দুর্যোগ গিয়াছে তাহার কিছুই বুঝা যায় না, কিন্তু রাত্রের নিদারুণ ঝটিকা যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহাতেই গত রাত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। সেই এক রাত্রির দুর্যোগে কত দরিদ্রের একমাত্র আশ্রয় গৃহখানি ভূমিস্মাৎ হইয়াছে, কত বড় বড় গাছ উপড়াইয়া গিয়াছে, কত গাছের ডাল ভাঙিগয়া পড়িয়াছে, কত চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে!

চারিদিকে আলো হইলে কাত্যায়নী ঘরের বাহিরে আসিলেন। উমা এখনও স্নান করিয়া রন্ধন-গৃহে যায় নাই দেখিয়া ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন অন্নপূর্ণা "দেবেশের খবর লইবার জন্য ভৈরবপুরের বাজারে শীঘ্র একজন

লোক পাঠানো হউক” বলিয়া দেবরকে অনুনয় করিতেছিলেন। এমন সময় কে উঠানে আসিয়া বিকৃত স্বরে ডাকিল, “মা ঠাকরুন!”

বড় বৌ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি রে কছিম?”

কছিম হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর করিল "হোটলগঞ্জের উত্তর পারে ছোট বাবুর না ডুবী হয়েছে।”

(‘অন্তঃপুর,’ ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৬)

গোমতীতীরে

সকালবেলা অমূল্যবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। অমূল্যবাবু তখন বৈঠকখানার সম্মুখের বারান্দায় একখানি ইজি-চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার শিশুপুত্র অমরকুমার একখানি ছবির বই হাতে করিয়া পিতার চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আধ আধ ভাষায় অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। অমূল্যবাবু সস্নেহনয়নে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া তাহার অর্থহীন কথাগুলি একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন। আমাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "অতুল, এসেছ? আমি তোমারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি।"

আমাকে দেখিয়া অমর তাহার নূতন ছবির বইখানি দেখাইতে ছুটিয়া আসিল।

অমূল্যবাবু বলিলেন, "তোমার সে কাজটির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। হইবার খুব সম্ভাবনা।"

আমি বলিলাম, "আমার অবস্থা আপনি তো সকলই জানেন। সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার বিশেষ অনুরোধে বিবাহ করিয়া আরও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি।"

অমূল্যবাবু কোমলস্বরে বলিলেন, "হাঁ ভাই, আমি সে সমস্তই জানি। কাল সকালে তুমি আসিও। যাহা হয় কাল নিশ্চয়ই জানা যাইবে।"

কতকটা আশ্বাম্বিত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বড় বধূ তখন রন্ধন করিতেছেন, রন্ধনগৃহের দুয়ারের কাছে রানী দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়া লুকাইল। আমি দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "বড়বৌ, তোমার তো দাসী আনিয়া দিয়াছি, তবে কেন এখনও নিজে এত পরিশ্রম কর?"

বড়বৌ ছলছলনেত্রে রানীকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "ও-কথা আমাকে ব'লো না ঠাকুরপো, বরং বল, তোমার ছোট বোনটি এনে দিয়েছি।"

এই বলিয়া বড়বৌ আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। চক্ষে জল, ওষ্ঠে হাসি! বলিলেন, "আমার দাসী, না, তোমার রানী?"

পরদিন ঠিক সময়ে অমূল্যবাবুর বাটী উপস্থিত হইলাম। অমর আজ হাতে কালি মুখে কালি মাখিয়া আপনার লিপিকুশলতার পরিচয় দিতেছিল। অমূল্যবাবু একখানি খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "ভাই অতুল, আজ সুলতানপুর হইতে পত্র পাইয়াছি, কাজটি ঠিক হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য রাত্রের গাড়ীতেই তোমাকে রওনা হইতে হইবে।"

আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "যে উপকার আপনি আজ করিলেন, কি বলিয়া যে—"

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্, আমার কাছে ওসব কথা কেন ভাই!"

আমি নীরবে, পূর্ণ অন্তরে বসিয়া রহিলাম, আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না। অমূল্যবাবুও নীরব। সৎকার্যে যদি আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তবে আমার ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্তের একটা উপায় করিয়া দিয়া তিনি যে সে সময় আত্মপ্রসাদ-সুখ অনুভব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে অমূল্যবাবু বলিলেন, "অতুল, তোমাদের বাড়ীখানিও কি বন্ধক পড়িয়াছে ?"

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "দাদার অসুখের সময় সমস্তই বন্ধক দিতে হইয়াছিল। যদি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতাম, তাহা হইলে সমস্তই সার্থক হইত। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না।"

তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ওঃ! আমার তখন ভয়ানক মাথার অসুখ, কিছুই জানিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "অতিরিক্ত অধ্যয়নেই বোধ হয় আপনার মস্তিষ্ক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল!"

এই কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইল, মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্তিম হইল। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, মনের ভিতর যেন কি একটি প্রবল আবেগ তিনি যথাসাধ্য দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ঈষৎ রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মস্তিষ্কের পীড়া? না অতুল, তাহা নহে, আমি একেবারেই উন্মাদ হইয়াছিলাম। কেন যে আমার এ পীড়া হইয়াছিল অনেকেই জানে না, তুমিও জান না। যদিও তুমি আমার অপেক্ষা পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট, তথাপি তুমি ভিন্ন জগতে আর আমার বন্ধু বলিবার কেহই নাই। যে ভয়ানক যন্ত্রণা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা তোমার কাছে বলিয়া একটু শান্তি লাভ করিব।"

অমূল্যবাবু বলিতে লাগিলেন—

তোমার বোধ হয় মনে আছে পাঠদ্দশায় আমি সর্বদা নির্জনে থাকিতেই ভালবাসিতাম, লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হইত। হাসি, গল্প, আমোদ—এ সকল আমার কিছুই ভাল লাগিত না। মনে হইত, জগতে এমন কেহ নাই, যে আমার কথা বুঝিবে, আমি যাহার কথা বুঝিব, যাহার সহিত আমার মনোভাবের মিলন হইবে।

জগতে আমি একা। এই নির্বান্ধব জগৎ আমার নিকট সুখশূন্য, আশাশূন্য, মরুভূমির ন্যায় বোধ হইত। সেই সময় তোমার সহিত দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই তোমার উপর স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তুমি আমাপেক্ষা অনেক ছোট, এজন্য তোমার সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ হইত।

হৃদয়ের ভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইতাম, আত্মীয়েরা আনন্দ প্রকাশ করিতেন,

আমার পিসীমা কতই সুখী হইতেন, কিন্তু আমার মনে বিন্দুমাত্রও আনন্দ হইত না।

বৃথা, সমস্ত বৃথা! জীবন ধারণই বৃথা! কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া, কতকগুলি কথা শিখিয়া, নামের পার্শ্বে কতকগুলি অক্ষর যোগ করিয়া আমার কি লাভ হইবে? কিছুই না।

পিসীমা আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, অগত্যা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য বিবাহে সম্মতি দিলাম। শুভদিনে, শুভক্ষণে, বিবাহ করিয়া জীবনসঙ্গিনী গৃহে আনিলাম। জীবনসঙ্গিনী! এ কি উপহাস! আমার হৃদয়ের এ গভীর শূন্যতা সে ক্ষুদ্র বালিকা কিসে পূরাইবে?

জানি না, বিবাহের মন্ত্রে কি শক্তি আছে, অথবা ইন্দুরই কি ক্ষমতা ছিল! বিবাহের দিন হইতেই কেন জানি না, ধীরে ধীরে আমার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ইন্দুকলা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া মধুর জ্যোৎস্নায় আমার অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করিল। আমার জীবন ইন্দুময় হইয়া গেল।

নির্জন বাস পরিত্যাগ করিয়া আমি জগৎসংসারে বাহির হইলাম। কর্মময় জীবনে কত আনন্দ, ইন্দুই তাহা আমাকে শিখাইল। কি সাধনায় মানুষ 'মানুষ' হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী আমি প্রথমে তাহা ক্ষুদ্র বালিকা ইন্দুর নিকট শিক্ষা করিলাম।

পিসীমার মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য আমরা লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম। গোমতীর তীরে আমাদের একখানি ছোট বাঙ্গলো ছিল, একখানি ছোট জালিবোট প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, সেখানির নাম রাখিয়াছিলাম, 'ছায়াপথ'। জ্যোৎস্না-রাত্রে আমি ও ইন্দু ছায়াপথে নদীবক্ষে ভ্রমণ করিতাম।

একদিন আমি আর ইন্দু ছায়াপথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। তখন ভাদ্র মাস, গোমতী কূলে কূলে পূর্ণা: আকাশের জ্যোৎস্না নদীর জলে মিশিয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে, আকাশে আর পৃথিবীতে দুইটি যেন জ্যোৎস্নার নদী! ইন্দু হালের কাছে বসিয়া ছিল, মৃদুস্বরে বলিল, 'মৃত্যু যে কত মধুর আজিকার রাত্রে তাহা বুঝা যায়।' আমি বলিলাম, 'যদি দুইজনে একসঙ্গে মরিতে পারি।' অতি কোমল করুণ দৃষ্টিতে ইন্দু আমার দিকে চাহিল, সে দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ন ছুরিকার মত আজিও আমার হৃদয়ে বিঁধিয়া আছে। ইন্দু বলিল, 'আমার মত সুখী জগতে কে আছে? আজকাল মনে হয় আমার জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে, জীবন সার্থক হইয়াছে। এমনি জ্যোৎস্না-রাত্রে তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারি, তবে—' তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে, হঠাৎ কেমন করিয়া জানি না, উল্‌টিয়া সশব্দে জলে পড়িয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিলাম। তাহার পর কি হইয়াছিল, মনে নাই।

যখন জ্ঞান হইল, তখন মনে হইতে লাগিল, কেবল ঢেউ,—আমার চারিদিকেই ঢেউ। ঢেউগুলি আমার মুখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর আমার নিশ্বাস

রোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। ঢেউ আসিতেছে, যাইতেছে—ছোট ঢেউ, বড় ঢেউ, চারিদিকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ। আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। আবার যখন জ্ঞান হইল, তখন সেই তরঙ্গমালা, তেমনি প্রবল সলিল-উচ্ছ্বাস। প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে, আমি যেন আর ইন্দুকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না, ইন্দু যেন আমার হস্তস্খলিত হইয়া জলের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! 'ইন্দু' 'ইন্দু' বলিয়া চিৎকার করিয়া আবার আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

এইরূপ অবস্থায় কত দিন ছিলাম, বলিতে পারি না। একদিন সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে দেখিলাম, কলিকাতার বাড়ীতে বৈঠকখানায় কোচের উপর শুইয়া আছি। সকলেই বলিলেন, 'আমার মস্তিষ্কের গোলমাল হইয়াছে।' ডাক্তার ও কবিরাজগণ নিয়মমত আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করিতে লাগিলাম, কিন্তু সময়ে সময়ে মস্তকে ও বুকের ভিতর যে এক প্রকার ভয়ানক যন্ত্রণা হইত, সেটা কিছুতেই গেল না।

প্রায় ছয় মাস গত হইল, একদিন আমি বাড়ীর ভিতর গিয়াছিলাম। অনেক দিনের পর আমার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। অনেকক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কি জানি কি ভাবিয়া, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলাম। ইন্দুর নিজের হাতে কত যত্নে সাজানো ঘর, এখন ধূলা ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জানালার কছে গিয়া দাঁড়াইলাম, ঝুপ ঝুপ করিয়া এক পসলা বৃষ্টি আসিল, আমার কাপড় ভিজিয়া গেল। এই কি আমার ইন্দুর চোখের জল? সেই ধূলি-আবর্জনাপূর্ণ গৃহতলে আমার দুই বৎসরের পুত্র অমরকুমার খেলা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এক বৎসর পরে আজ তাহাকে প্রথম দেখিলাম। আমার ইন্দুর হৃদয়ের ধন অযত্নে অবহেলায় কতই কৃশ ও মলিন হইয়া গিয়াছে! তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলাম। মনে হইল, যেন হৃদয়ের গুরুভার অনেকটা কমিয়া গেল।

হঠাৎ তাকের উপরিস্থিত একটি শিশির দিকে দৃষ্টি পড়িল। শিশিটি কুন্তলীন তৈলের। যখন প্রথম কুন্তলীন বাহির হয়, তখন আমিই এটি ইন্দুকে কিনিয়া দিয়াছিলাম। দেখিলাম, শিশির গায়ের কাগজে ইন্দুর হাতের ছোট ছোট লেখা—'আমার স্বামীর প্রথম উপহার'।

অমরকে বুকে করিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন। বোধ হইল, অমরকে আমার নিকটে দেখিয়া তিনি একটু খুশী হইলেন। দুইটি একটি কথার পর তিনি বলিলেন, 'এইচ. বসুর কুন্তলীন তৈলে মস্তিষ্ক খুব শীতল রাখে, দিন কতক ব্যবহার করিয়া দেখুন না, ক্ষতি কি?'

আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, এ কি আমার ইন্দুর পরামর্শ? যথাসময় সেই দিন হইতে কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া মস্তিষ্কের যন্ত্রণার অনেক উপশম হইয়াছে। আর আমার অমর—অমরই আমার হৃদয়-বেদনার একমাত্র ঔষধ। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, কোলাহলপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া পুণ্যতোয়া গোমতীতীরে বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকি। দিন রাত্র গোমতীতরঙ্গের কল-কল্লোল শ্রবণ করি। কিন্তু আমার অমর—অমরই আমাকে সংসারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।"

সে দিন বাড়ী ফিরিতে আমার অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল, এজন্য বড় বধূর নিকট কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনা লাভ করিলাম। অন্যমনস্ক ভাবে স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলাম, মনের ভিতর কেবল অমূল্যবাবুর কাহিনীই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেই জ্যোৎস্নারাত্রের গোমতী-তরঙ্গের দৃশ্য যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছিল। যে উদ্দেশে অমূল্যবাবুর কাছে গিয়াছিলাম তাহা যে সিদ্ধ হইয়াছে—এ কথা বড় বধূকে বলিতেও মনে ছিল না।

আহারাদির পর উপরে গিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার একটু পরে রানী আমার নিকট আসিল। বলিল, "আজ তোমার কি হয়েছে?"

আমি বলিলাম, "হবে আবার কি?"

রানী হাসিয়া বলিল, "তবে মুখখানি অমন বিভীষণের মত ক'রে আছে কেন?"

আমি সংক্ষেপে অমূল্যবাবুর কাহিনী রানীকে শুনাইলাম। রানী শুনিয়া বলিল, "সেই ইন্দুর মত ভাগ্যই যেন সব মেয়ের হয়।"

আমি বলিলাম, "রানী, তুমি হয়তো কোন্ দিন অমনি করিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইবে।"

"তোমারও দেখছি, মাথা খারাপ হয়েছে।" বলিয়া রানী কোথা হইতে এক শিশি "দেলখোস" আনিয়া খানিকটা আমার মাথায় ঢালিয়া দিল।

('কুন্তলীন পুরস্কার', ১৩০৭).

অপয়া মেয়ে

দারুণ বর্ষা। তাহাতে পল্লীগ্রাম। ঘাটের পথের দুই ধারে ঘন বেতের বন। পথে এক হাঁটু কাদা। কাদার মাঝে মাঝে দুই-একখানি ইট পাতা। সেই পথ দিয়া রায়েদের বাড়ীর নূতন বৌ পিতলের কলসী কাঁখে লইয়া ঘাটে জল আনিতে যাইতেছে। পিছনে তাহার ছোট ননদ অলকা বধূর রক্ষী হইয়া চলিয়াছে।

বৌটির নাম চিন্ময়ী। বাপের বাড়ীতে তাহাকে সকলে 'চিনু' বলিয়া ডাকিত। এখানে আসিয়া অবধি তাহার যে কোনও নাম আছে, সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, সে যে কোনও দিন কোমরে কাপড় বাঁধিয়া ছুটাছুটি করিত, সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের সহিত জল-ডিঙ্গাডিঙ্গী খেলা করিত, ভাত খাইবার সময় মনের মত তরকারি না হইলে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিত, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঘুমে ঢুলিয়া পড়িত, মা অনেক করিয়া জাগাইলে নিদ্রাজড়িতনেত্রে মায়ের গল্প শুনিতে শুনিতে মায়ের হাতে ভাত খাইত, সে সকল কথাও সে যেন ভুলিয়া গিয়াছে। আজ এক বৎসর হইল, সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। এক বৎসরে 'দস্যি' চিনু কি শান্ত শিষ্ট নূতন বৌ হইয়াছে, চিনুর মা দেখিলেও হয়তো তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

চিন্ময়ী আজ স্নান করিতে আসিবার সময় বাড়ীতে শুনিয়া আসিয়াছে, আজ পাঁচুই শ্রাবণ। গত বৎসর পাঁচুই শ্রাবণ তাহার বিবাহ হইয়াছে। ঘাটের পথে চলিতে চলিতে তাহার সেই কথাই মনে হইতেছিল। বিবাহের পর এই এক বৎসর সে আর বাপের বাড়ী যাইতে পায় নাই। কারণ, রায়েদের বাড়ীর বৌ বাপের বাড়ী পাঠানো নিয়ম নয়। তবে যাহারা বড়মানুষের মেয়ে, অথবা যাহাদের স্বামী কিছু স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া রায়-পরিবারের বনিয়াদী চালের ততটা খাতির রাখিতে ইচ্ছুক নহেন, সেই সকল বধূদেরই মাঝে মাঝে ভাগ্য প্রসন্ন হয়। কিন্তু চিন্ময়ীর মা বিধবা ও দুঃখিনী; তাঁহার এমন কি ক্ষমতা যে, তিনি রায়বাড়ীর বধূকে লইয়া যাইবেন?

বিবাহের দিনের কথা মনে করিয়াই চিন্ময়ীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, সে মায়ের উদ্দেশে মনে মনে ক্রমাগত বলিতেছিল, 'তা, কেন আমার বিয়ে দিলে মা, কেন আমার বিয়ে দিলে?' যে চিনু মা ছাড়া একদিনও থাকিতে পারিত না, খেলার আমোদে মাতিয়া থাকিয়াও মাঝে মাঝে 'দাঁড়া ভাই, মা কি করছে দেখে আসি' বলিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিত, বিছানায় মা কাছ হইতে একটু সরিয়া গেলে ঘুমের ঘোরে বিছানা হাতড়াইত, সেই চিনু এক বৎসর মাকে দেখে নাই। এই এক বৎসর কি করিয়া গিয়াছে, সে কেবল তার প্রাণই জানে।

যখন চিনু ছোট ছিল, বিয়ে হইয়া মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যায়—এই কথা শুনিলেই তাহার আতঙ্ক হইত। তাহার জ্যাঠতুতা ও খুড়তুতা বোনেদের বিবাহের সময় কন্যা-বিদায় দেখিয়া তাহার সেই ভয় আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি, পথে

বাজনা শুনিয়া 'বর আসছে' বলিয়া যখন ছেলে মেয়েরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিত, চিনু তখন মায়ের আঁচল মুঠো করিয়া ধরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইত, যেন তাহাকেই কে তাহার মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। মা মেয়ের এই ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। অন্য সকলে তো বিষম অসন্তুষ্ট হইতেন। চিনুর জ্যাঠাইমা উঠিতে বসিতে তাহাকে 'মা-আদুরে মেয়ে' বলিয়া গঞ্জনা দিতেন, চিনুর মাকেও বলিতেন, 'ছোট বৌ, ধেড়ে মেয়ে হ'ল, কতদিন আর অমন আঁচল-ধরা ক'রে রাখবি? মেয়ে কি পরের ঘরে পাঠাতে হবে না?'

মেয়েছেলে, পরের ঘরে দিতেই হইবে।—উপায় নাই, উপায় নাই। দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল, বুকের ধন, তাহাকে বুকে রাখিবার উপায় নাই। চিনুর মা বুঝিতেন, বুঝিয়া নিশ্বাস ফেলিতেন। কিন্তু অবুঝ মেয়েকে সে কথা কেমন করিয়া বুঝাইবেন? লোকে দেখিতেছে, চিনু বড় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মা তাহার শিশুতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন। যে নিজে বুঝে না, কেমন করিয়া তাহাকে বুঝানো যায় যে, 'তুই এখন বড় হইয়াছিস?'

চিনু জ্যাঠাইমার দুই চক্ষের বিষ ছিল। তাহার কারণ, চিনু বড় অপয়া মেয়ে। তাহার জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই প্রথমে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের ও পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে চক্‌বন্দী পরগণাও বাকী খাজনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। চিন্ময়ীর জ্যাঠামহাশয় বলিতেন, চক্‌বন্দী পরগণা আমার লক্ষ্মীর আড়ি। সেই চক্‌বন্দী পরগণা বিক্রয় হইয়া যাইবার পর সংসারের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল, একসঙ্গে দারিদ্র্য ও মৃত্যু সংসারে প্রবেশ করিয়া সাজানো সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। চিন্ময়ীই যে এই আকস্মিক অবস্থা-পরিবর্তনের একমাত্র হেতু, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সেই অবধি 'অপয়া মেয়ে' বলিয়া চিন্ময়ীর একটা খ্যাতি হইয়া গিয়াছে। সে খ্যাতি লোকমুখে তাহার শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

বহুদূরে পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ উভয় পক্ষই পিতৃহীন বলিয়া বাহাদুরপুরে বিবাহ দিতে চিন্ময়ীর মায়ের মন সরিতে ছিল না; কিন্তু সকলের মুখেই শুনিলেন, এমন সম্বন্ধ আর পাওয়া যাইবে না। ঘর বর দুই সমান। মেয়ের বহু ভাগ্যে এমন সম্বন্ধ জুটিয়াছে। চিন্ময়ীর কাকা হরিশ চক্রবর্তী স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, "এই বিবাহের সম্বন্ধে যদি মেজ বধূঠাকুরাণীর অমত থাকে, তবে আমি আর চিনুর বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই করিব না। তিনি চিন্ময়ীকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়া মনের মত পাত্র স্থির করিয়া যেন বিবাহ দেন।"

ইহার পরে আবার যখন মেজ ঠাকুরঝি আসিয়া ফুস ফুস করিয়া চিনুর মার কানের কাছে বলিলেন, "মেজ বৌ! করছিস কি? রাজার ঘর থেকে মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে, পাড়াগাঁ ব'লে কি এমন সম্বন্ধ ছাড়ে? একটু দূর বটে; তা ব'লে আর কি করবি? মেয়ে তো সুখে থাকবে, তুই না হয় চোখে নাই দেখবি।" তখন আর মেজ বৌ কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বিবাহের সময় জামাই দেখিয়া চিনুর মার মনের সকল দুঃখ ঘুচিয়া গেল। কি সুন্দর বর! দেখিতে যেমন সুন্দর, হাসিটিও তেমনই মিষ্ট! বিবাহমণ্ডপে

সকলে বর দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বাসরঘরে চিনুর শান্তিপুরের ঠাকুরমা তাহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিয়া যখন বলিয়াছিলেন, 'ওলো! দেখ্ লো দেখ্, কেমন রাঙা বর পেয়েছিস!' চিনুও চকিতের মত তখন একবার বরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল যে, সত্যই রাঙা বর কি না!

আজ ঘাটের পথে চিনুর সেই সমস্ত কথাই মনে হইতেছিল। যাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে সেই বিবাহ পর্যন্তই সম্বন্ধ, তার পরে আর চিনু তাহাকে চোখে দেখে নাই; তাহার কথা এখন আর চিনুর বড় একটা মনে নাই। এখন রাত্রে শুইতে যাইবার সময় সে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শোয়—'হে ঠাকুর! খুব ভোরে যেন উঠতে পারি।' ঘাটে যাইবার সময় ঠাকুরকে মনে মনে বলে, 'হে ঠাকুর, পিছল পথে যেন ঘড়া নিয়ে প'ড়ে না যাই।' রাঁধিতে যাইবার সময় উনুনকে প্রণাম করিয়া রাঁধিতে বসে, 'হে ঠাকুর, ব্যান্নুনে যেন আমার নুন না বেশী হয়।' তাহার ক্ষুদ্র মনটি এখন কেবল এই সকল চিন্তাতেই পরিপূর্ণ থাকে। কখনও কখনও কাজের অবসরে চকিতের মত যখন এক বৎসরের পূর্বের কথা স্মরণ হয়, তখন তাহার বুকের মধ্যে কান্নার ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে,—'ওগো মা গো মা, কবে তোর কাছে যাব মা!'

চিনু ঘাটে নামিয়া ঘড়া মাজিয়া ঘড়া জলে ডুবাইয়া রাখিল,—পাছে ঘড়া ভাসিয়া যায়। চিনু একটু মাথায় ছোট, ঘড়াটিও একটু বড়, এই জন্য প্রথম প্রথম ঘড়া কাঁখে করিয়া জল আনিতে তাহাকে মাঝে মাঝে আছাড় খাইতে হইত। আজকাল অনেকটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

ঘাটের উপর অলকা চিনুর পাহারা হইয়া বসিয়া আছে। চিনু একবার সভয়ে তাহার দিকে চাহিল। জলে ডুব দিবার সময় ঘড়া উপুড় করিয়া লইয়া ঘড়াটিকেও ডুবাইতে হইবে, নিজেও সেই সঙ্গে ডুবিতে হইবে, এখানে স্নানের এইরূপ নিয়ম। এইরূপ স্নান না করিলে স্নান শুদ্ধ হইবে না। ডুবিতে গিয়া যদি মাথা কি কাপড় ভাসিয়া উঠে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য অলকা ঘাটে বসিয়া পাহারা দিত। এই ঘড়া লইয়া ডুব দেওয়া চিনুর বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইত। হয়তো ঘড়া ভাসিয়া উঠিত, নয়তো তাহার মাথা ভাসিয়া উঠিত। সেই জন্য অলকা একটু অন্যমনস্ক হইলে সে তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িত।

অলকা অন্যমনস্কভাবে একটা মাছরাঙ্গা পাখী কেমন জলের উপর ছোঁ মারিতেছে, একমনে তাহাই দেখিতেছিল। চিনু দেখিয়া ভরসা পাইয়া তাড়াতাড়ি ডুব দিয়া উঠিয়া জল হইতে ঘড়া তুলিয়া লইল। সে ঘড়ার জল ফেলিয়া দিয়া যেমন ঘড়া ডুবাইয়া জল ভরিতেছে, অমনই অলকার চমক ভাঙ্গিল। অলকা বলিল, "ও কি বৌঠাকরুণ, ঘড়া নিয়ে তো ডুবলেন না, আমি বুঝি দেখি নি? দাঁড়ান, বাড়ী গিয়ে মাকে বড়মাকে সব ব'লে দেব।"

চিনু ভয়ে কাঁটা হইয়া গেল; বলিল, "লক্ষ্মী ভাই, ব'লো না ভাই, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এই ডুব দিচ্ছি।"

"না যদি ব'লে দি, আমাকে কি দেবেন? আমাকে আপনার সেই মুক্তা-দেওয়া মাথার জালটা দেবেন?"

জালটি চিনুর মায়ের নিজের হাতের তৈরী। চিনুর চোখে জল আসিল। চোখের জল মুছিয়া বলিল, "দেব ভাই, দেব, তুমি ব'লে দিও না।"

"আচ্ছা, তবে আবার ঘড়া নিয়ে ডুব দিন। ওই মাথা উঠেছে, হ'ল না। আবার ডুব দিন। ওই কাপড় ভাসল। কাপড় শক্ত ক'রে ধ'রে ডুব দিন না কেন? আপনি কিছুই জানেন না! তাই তো সকলে আপনাকে শহরের মেয়ে ব'লে মুখ করে।"

"অলি লো অলি! কি কচ্ছিস?" বলিয়া অলকার এক সই কলসী লইয়া ঘাটে আসিয়া দেখা দিল। চিনু বুঝিল, অলকা আর বাড়ী ফিরিবে না। সকাতরে বলিল, "ঠাকুরঝি, ভাই, আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে এস, আমি একলা যেতে পারব না।"

"উঃ, একলা যেতে পারবেন না! দিনের বেলায় বেতবন থেকে ভূত এসে ধ'রে খাবে না কি? আপনি বলতে বলতে যান—

ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি,
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?"

শুনিয়া, দিনের বেলা হইলেও, চিনুর বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। দুই ধারে বেতের ঝাড়, মাঝখানে সরু পথ, কি জানি যদিই ভূত দেখা যায়!

অলকার সই চিনুর মুখের দিকে চাহিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিল, "যা না লো অলি, বৌ-ঠাকরুণকে বাড়ী রেখে আয়। কিন্তু যাবি আর আসবি, নইলে ভাই আমি ঘাটে থাকব না।"

বাহাদুরপুরে রায়েদের এককালে রাজার মত সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য ছিল। এখন ক্রমশঃ হীন ভগ্নাবস্থা হইয়া আসিয়াছে। ভগ্নাবশেষ অট্টালিকা ও বনিয়াদী চালচলন কেবল পূর্বকালের লুপ্ত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছে।

বড় তরফ, মধ্যম তরফ ও ছোট তরফ—তিন সরিকের বাড়ী একেবারে গায়ে গায়ে লাগালাগি। তিন সরিকের বাড়ী একই রকম গঠনের চক-মিলনো দ্বিতল ।। ভূমিকম্প ও মেরামতের অভাবে অট্টালিকার অনেক অংশই অব্যবহার্য স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে কয়েকটি কোঠাঘর এখনও ব্যবহারের যোগ্য আছে, তাহা এখন কোনরূপে ব্যবহার করা চলিতেছে। কিন্তু দুই-চারি বর্ষা বেমেরামত থাকিলে তাহাও আর জীর্ণ দেহ খাড়া করিয়া রাখিতে পারিবে কি না সন্দেহ। বাড়ী সারানোর দিকে সরিকদের কাহারও মনোযোগ দেখা যায় না, বরং সকলেই ঘরের অভাব-পূরণের জন্য কাজ-চালানো-গোছ খড়ের ঘর তুলিয়া লইতেছেন।

বাড়ীতে নারায়ণশিলা আছেন, এবং নিত্য অতিথিসেবারও ব্যবস্থা আছে। পূর্বে যখন এই পরিবারের সৌভাগ্যসূর্য মধ্যাহ্ন-আকাশে বিরাজিত ছিল, তখন প্রতিদিন ঠাকুরবাড়ীতে অন্ততঃ পঞ্চাশজন অতিথির পাতা পড়িত। এখন অতিথি

বড় একটা আসে না, যদি বা আসে, মধ্যাহ্ন-আহারের পর আসিলে তাহার প্রসাদ পাইবার আশা বড় একটা থাকে না। কেন না, যে সরিকের যখন 'সেবার পালি' পড়ে, তখন তিনি ঠাকুরের ভোগের জন্য যতটি চাল মাপিয়া দেন, নিজের সংসারের ততগুলি চাল কম করিয়া লইয়া থাকেন। কাজেই ঠাকুরবাড়ীতে এখন আহূত, অনাহূত, রবাহূত—কোনও প্রকারেরই অতিথি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিন পুরুষ পূর্বে সকল সরিকই একত্র ছিলেন। প্রকাণ্ড একান্নবর্তী পরিবার প্রায় আধখানি গ্রাম জুড়িয়া ছিল। এখন অনেকে বিদেশে গিয়া বাস করিতেছেন, অনেকে বংশহীন, দুই-একটি বিধবামাত্র তুলসীতলায় প্রদীপ দিবার জন্য ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া আছেন। আরতির সময় আর এখন কীর্তনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। পূজারী কোনরূপে ঘণ্টা নাড়িয়া আরতি শেষ করে। রথ-দোলে কোনরূপে নিয়মরক্ষা হয়। বড় তরফের দুই সরিক এখন পর্যন্ত একান্নবর্তীই আছেন। জ্যেষ্ঠ পরেশ রায় সেকালের সেরেস্তাদার ছিলেন; তিনি প্রায় বিদেশেই থাকিতেন। কনিষ্ঠ ভবেশ বাড়ী থাকিয়া জোতজমা দেখাশুনা করিতেন। পরেশ রায়ের পর পর সাত-আটটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর একমাত্র শিশুপুত্র দেবেশ ও বিধবা পত্নীকে রাখিয়া তিনিও ভগ্নহৃদয়ে পরলোক প্রস্থান করেন। ভবেশ রায়ের এখন পুত্র-কন্যায় সাত-আটটি সন্তান। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া জানে। মামলামোকদ্দমায় পরামর্শ দিতে তিনি একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। ভ্রাতৃজায়াকে সংসারের কর্তৃত্ব দিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেশকে বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয় হেতুবাদে দূরদেশে রাখিয়া, তিনি একরূপ নিজ সংসারের মামলারও নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। উঠিতে বসিতে প্রায়ই ভ্রাতৃজায়াকে শুনাইয়া বলেন, "এই ছোঁড়াছুঁড়ীগুলোর কি আর আমি ভরসা রাখি? দেবু আমার বংশের তিলক। যদি সংসার বজায় থাকে, সে কেবল সে-ই রাখিবে। এগুলো কেবল মাটির ঢেলা বই তো নয়!"

দেবেশের বিবাহ দিতে তাঁহার খুল্লতাতের বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভ্রাতৃজায়া যখন অন্নজল ত্যাগ করিয়া রোদন সম্বল করিলেন, পাড়ার পাঁচজনে 'ছি ছি' করিতে লাগিল, তখন দেখিয়া শুনিয়া বিধবার কন্যা চিন্ময়ীকেই তিনি মনোনীত করিলেন। অনেকে 'অপয়া মেয়ে' বলিয়া আপত্তি তুলিলে তিনি সে কথা কানেও করিলেন না, বরং দেবেশের ভাগ্যে যাহা অপয়া, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই হয়তো পয়া হইতে পারে—এ আশাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে হয়তো উদিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভাগ্যগুণে বিবাহের পর দেবেশ পরীক্ষায় ফেল হওয়াতে এবং একটি দুগ্ধবতী গরু মরিয়া যাওয়াতে, চিন্ময়ীর 'অপয়া' নামটি শ্বশুরবাড়ীতে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেবেশের মা যখন-তখন পাড়া-প্রতিবাসী পাঁচজনের কাছে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "ছোট ঠাকুর দেখে-শুনে এ কি কুলের ধুচুনী ঘরে নিয়ে এলেন? যা হবার তা তো হ'ল, এখন দেবু আমার প্রাণগতিকে কুশলে থাকলে যে বাঁচি।"

সহজেই বুঝা যায় যে, চিন্ময়ী শাশুড়ীর তেমন সুনজরে পড়ে নাই। যত

কিছু সংসারের আপদ-বালাই 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা' চিন্ময়ীর ঘাড়ে গিয়া চাপিত। রান্নাঘরের পাশে পাঁকাটির গাদার কাছে কৃষাণ তামাক খাইয়া কল্কের আগুন ঢালিয়াছিল, সেই আগুন ক্রমশঃ পাঁকাটির স্তূপ হইতে রান্নাঘরে ধরিয়া গেল। কৃষাণের তাহাতে বিশেষ কোনও দোষ হইল না, দোষ হইল চিন্ময়ীর ! "ওরে! কি ঘর-পোড়ানো বৌ ঘরে এনেছে রে!"—খুড়শাশুড়ীর মুখোচ্চারিত হইয়া এই রব পল্লীর প্রত্যেক রমণীর কানে গিয়া প্রতিহত হইল। সকলেই মুখ-চাওয়াচায়ি করিয়া বলিল, "তাই তো ভাই, কি বউই ঘরে আনলে!" দেশে অজন্মা, তাহাও চিন্ময়ীর দোষ। আর দেবুর যদি কোনও অসুখ হইবার সংবাদ আসিত, তাহা হইলে আর কথাই নাই।

চিনু কলসী কক্ষে লইয়া দুয়ারে পা দিতেই খুড়শাশুড়ী বলিলেন, "নবাবের মেয়ের এতক্ষণে জল নিয়ে আসা হ'ল? ঘাটে গিয়েছ তো বাছা সে আজকের কথা নয়, উনুন যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ছেলেরা ভাত পাবে কখন? সকল ভুঁই মাড়িয়ে পথ চল না কি?"

চিনু নিরুত্তরে কলসী লইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। যদি পিত্রালয়ে আর এক বৎসর পূর্বে তাহাকে কেহ এইরূপ বলিত, তাহা হইলে সে তখনই হাত-মুখ নাড়িয়া উত্তর দিত, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সকল ভুঁই মাড়িয়েই তো চলি। চলি তো চলি, তাতে তোমার কি হয়েছে?' কিন্তু এক বৎসরে তাহার স্বভাবের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, এখন হয়তো পিত্রালয়ে গেলেও আর সে আগের মত কথার উত্তর দিতে পারে না।

"অলি কোথায়? সে যে তোমার সঙ্গে ঘাটে গেল, ঘাটের জলেই ডুবে মোলো নাকি? ভাল এক আপদ হয়েছে আমার! সকালে উঠে একবার ছেলেটার নড়া ধরবে, তাও যদি তাকে দিয়ে হয়! কোন্ দিকেই বা আমি কি করব, সবই যেন আমারই দায়।"

"কি লো ছোট বৌ, সকাল বেলায় গজ গজ ক'রে বকছিস কি?" বলিয়া মালা হাতে করিয়া তাঁহার এক জ্ঞাতিসম্পর্কীয়া বিধবা জা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন।

"আর বকছি দিদি! আপনার দুঃখের ধান্দায় মরছি। বৌমা তো বেলায় স্নান ক'রে বাড়ী ফিরলেন, অলি তো কোন্ চুলোয় গিয়েছে, তার ঠিক নেই। কোলের ছেলেটা যে ধরবে, এমন মনিষ্যি নেই। আবার কাল থেকে বাদলার মার জ্বর এসেছে, সে আজ আর বাসন মাজতে আসে নি।"

"ওমা, বাদলার মাও আসে নি, তবে বাসন মাজবে কে?"

"কে আর মাজবে ভাই, বৌমা বুঝি তার শাশুড়ীর ঘরের বাসন কখানা মেজে রেখে গিয়েছিলেন, আর ওই দেখ না—সব প'ড়ে রয়েছে। মনে করছি, বাদলা ছুঁড়ীকে দিয়ে মাজিয়ে নেব। এই বর্ষার দিনে কি ক'রে ভিজে ভিজে বাসন মাজি? আমার না হয় যা হয় হ'ল, মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি? কোলে যে আবার একটা আপদ আছে, তার আবার দুদিন থেকে জ্বর হচ্ছে।"

"তা তো বটেই, কোল-ছোয়ালে মানুষ, তুমি আর কি করবে? তা বাদলাকে দিয়েই মাজিয়ে নাও, ছুঁড়ী এখন বেশ কাজ-টাজ করতে শিখেছে। তা, হাঁ ছোট-বৌ! তোদের ঘরে নারকোল আছে, আজ দুটো পিঠেপুলি গড়ব ভাবলুম. তা ঘরে আমার নারকোল নেই।"

"হ্যাঁ ভাই, তা নারকোল দেখি আছে কি না"—বলিতে বলিতে ছোট বধূর মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এসেছেন যখন, তখনই বুঝতে পেরেছি—"

এমন সময় দেবেশের মা কোথা হইতে একখানি পত্র হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীতে আসিয়াই উচ্চঃস্বরে বলিলেন, "ওলো ছোট বৌ, দেবু আসছে বাড়ীতে। চিঠি লিখেছে। মঞ্জরীকে দিয়ে এখনি আমি পড়িয়ে শুনে এলাম।"

ছোট বৌ শুনিয়া সেইরূপ অস্ফুটস্বরে আপন মনে বলিলেন, "কেতার্থ করলেন।" তাহার পর নারিকেল-প্রার্থিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "না দিদি, নারকোল তো ঘরে নেই, দেখি গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে—বড় গিন্নির হবিষ্যিঘরে যদি থাকে।"

অগত্যা নারিকেল-প্রার্থিনী আবার বড় বধূর ঘরের দুয়ারে গিয়ে বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, দেবেশ চিঠি লিখেছে? বাড়ী আসছে? আহা! আসুক, আসুক। বাছা আমার বিয়ে ক'রে অবধি ঘর-ছাড়া। কি যে পাঁশের পাস হয়েছে, ফেল হ'ল তো আর বাড়ীতে মুখ দেখাবে না। আহা! আসুক আসুক, কবে আসবে ভাই?"

দেবেশ বাড়ী আসিবে, এই আনন্দে দেবেশের মা বধূর উপর কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইলেন। আহারান্তে বধূ যখন তাঁহার মুখশুদ্ধি লইয়া নতমুখে আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল, তখন বধূর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া বলিলেন, "আ আবাগীর ঝি, চুলগুলোও একটু সোর্ করতে জান না!"

অন্য দিন হইলে শাশুড়ীর এই আদরে চিন্ময়ীর চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ দুই দিন হইতে তাহার মায়ের জন্য মন কেমন করিতেছিল, কোনও কাজেই সে আর মন দিতে পারিতেছিল না। কোনও কথাই যেন ভাল করিয়া তাহার মনে প্রবেশ করিতেছিল না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া পাখীগুলি দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, আমি যদি পাখী হইতাম, তাহা হইলে এখনই মার কাছে উড়িয়া চলিয়া যাইতাম।

কে জানে, কেমন করিয়া শত ক্রোশ দূর হইতে এক ব্যাকুল হৃদয়ের তরঙ্গ আর এক হৃদয়ে আসিয়া প্রতিঘাত করে! এই দুই-দিন যে চিন্ময়ীর মা 'ছোট বৌ! ঠাকুরপোকে বল চিনুকে একবার আমার কাছে এনে দিতে। একবার আমি মরবার সময় তার মুখখানা দেখে মরি' বলিয়া বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, চিনু তো তাহা জানিত না। কিন্তু না জানিলেও মায়ের ব্যাকুল আকর্ষণ বহু দূর হইতে তাহার মন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল।

চিন্ময়ীর খুড়ীমার জায়ের উপর যে বিশেষ টান ছিল, তাহা নহে। বরং কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইত বলিয়া কিছু বিরক্তিই ছিল। কিন্তু আজ মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া সে কাঁদিয়া গিয়া স্বামীর কাছে পড়িল, "ওগো, দিদি হয়তো আর বাঁচবে না, আমার গয়না বিক্রি ক'রেও যদি চিনুকে আনতে পার, তবে গিয়ে নিয়ে এস। এ আকুলি-বিকুলি যে আমি আর দেখতে পারি না। জান যদি মেয়ে আটকে রাখবে, তবে কেন তুমি অমন ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে?"

হরিশ চক্রবর্তী মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আসিয়া মেজ বধূর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "মেজ বৌ-ঠাকরুণ ভাল হয়ে যাবেন বই কি। ভয় কি? আমি পার্বতী কবিরাজকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি।"

ছোট বৌ আবার তাহার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "কবিরাজ আনতে পাঠাও আর যা কর, তুমি নিজে একবার চিনুকে আনতে যাও। দিদি যদি চিনুর মুখ না দেখে মরে, তবে আমার সে দুঃখ ম'লেও যাবে না।"

হরিশ চক্রবর্তী ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন, "যাব তো আনতে ছোট বৌ, কিন্তু পাঠাবে কি তারা? তেমন তো মনে হয় না।"

দেবেশের যে দিন বাড়ী পেঁৗছিবার কথা, সেই দিন সকালে হরিশ চক্রবর্তী বাহাদুরপুরে গিয়া পেঁৗছিলেন। অলকা তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে খবর দিতে ছুটিয়া গেল,—"ওগো! বৌ-ঠাকরুণের খুড়ো এসেছে গো, বৌ-ঠাকরুণকে নিতে এসেছে।"

চিন্ময়ী রান্নাঘর নিকাইতেছিল, অলকার কথা শুনিয়া তাহার বুকের ভিতরে ধড়াস করিয়া উঠিল। প্রথমে কি যে শুনিতেছে, তাহাই যেন সে বুঝিতে পারিল না। গোবরমাখা হাতে তাড়াতাড়ি দাওয়ায় আসিয়া ডাকিল, "অলি ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি ভাই, শুনে যাও ভাই।"

কিন্তু ঠাকুরঝির সে কথা কানেও পঁহুছিল না। সে তখন নূতন খবর আনিয়াছে, তাহাকে আর কে পায়! "ও বড় মা, শুনেছ গো, বৌ-ঠাকরুণের খুড়ো এসেছে।" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চিন্ময়ী কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়ালের কাছে গিয়া "হে ঠাকুর, হে ঠাকুর, আমার যেন যাওয়া হয়" বলিয়া দেওয়ালে মাথা কুটিতে লাগিল, ঘরের মেঝে সদ্য-নিকানো, সেখানে এখন 'গড়' করিবার উপায় নাই।

বধূর খুড়া বধূকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া বড় কর্ত্রী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, তা আর নয়? এলেন আর মেয়ে নিয়ে গেলেন! আমি আমার বৌ পথে বসিয়ে রেখেছি আর কি! দেবু আজ সংবৎসরের পর বাড়ী আসছে, আর আমি আমার ঘরের বৌ পাঠিয়ে তার অকল্যাণ করি! আক্কেলের বলিহারি যাই।"

ক্রমশঃ পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, "নূতন বৌয়ের খুড়া নূতন বৌকে লইতে আসিয়াছে।" পল্লীগ্রামে এরূপ নূতন সংবাদ সচরাচর দুর্লভ। রায়-বাড়ীর প্রাঙ্গণে

ঘরের দাওয়ায় দলে দলে স্ত্রীমন্ডলীর বৈঠক বসিতে লাগিল; নানারূপ তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার মধ্যে ছেলেমেয়েগুলি 'মা, বাড়ী চল, বেলা হ'ল,' বলিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিয়া মধ্যে মধ্যে চপেটাঘাত লাভ করিতে লাগিল।

"শুনলাম যে নূতন বৌমার মায়ের বড় অসুখ। আমাদের নীলমণি শুনে এসে বলছিল—"

"অসুখ ব'লে অসুখ, বাঁচেই না। একেবারে নাকি এখন-তখন।"

"আহা! ওই একটি মেয়ে বই আর নেই।"

"তা তো বটেই দিদি, মায়ের প্রাণ, প্রাণের ভিতর কি যে করে, তা যার পরের ঘরে মেয়ে আছে, সেই জানে।"

যিনি এ কথা বলিলেন, তিনি সম্প্রতি কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার কথার উত্তরে অমনই তৎক্ষণাৎ আর এক প্রাচীনা হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলছিস তো বটে, কিন্তু যম আর পর এদের কাছে কি আর মায়া-মমতা আছে! এই যে আমি ন বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে এসেছিলাম, আর কি বাপের ভিটেয় পা দিতে পেরেছি? মা ম'লো, তাও দেখতে পেলাম না। ভাই নিতে এসে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। কি করব, জোর তো নেই। যাদের ঘর করতে দিয়েছে, তাদেরই ঘর করছি, পিণ্ডি রেঁধে রেঁধে তাদের গেলাচ্ছি। এই জন্য বলে যে, মেয়ে-সন্তান মিথ্যে সন্তান, একটু আগুনের পিত্যেশও নেই। ওগো বৌমা, গুঁড়োর কৌটাটা এখানে দিয়ে যাও না বাছা। মানুষ বাড়ীতে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ না?'

ছোট কর্ত্রী এ সমস্ত কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া নির্লিপ্তের মত নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত ছিলেন। বড় কর্ত্রী ঘাট হইতে আসিবামাত্র আসর জমকাইয়া উঠিল।

চিন্ময়ীর শাশুড়ীর চিরকালই একটু কর্তৃত্ব করা অভ্যাস। বরাবর বিদেশে নিজের সংসারে নিজেই কর্ত্রী ছিলেন। বিধবা হইয়া দেশে আসিয়াও সংসারে কর্তৃত্বের আসনই পাইয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি তেমন প্রখর ছিল না। এ কর্তৃত্বের যে মূল্য কি, তাহা না বুঝিয়াই দেবর সর্ব বিষয়ে অনুগত হইয়া থাকেন, এই অভিমানেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। বুদ্ধিমান দেবরও পরোক্ষে যাহাই করুন, প্রত্যক্ষে কখনও ভ্রাতৃজায়ার আদেশ অমান্য করিতেন না; স্ত্রীর উপরও তাঁহার এ সম্বন্ধে বিশেষ শাসন ছিল। তিনি মনে মনে বেশ জানিতেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই বড়বধূর এই কর্তৃত্বাভিমানের সহায়তাতেই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইতে পারিবেন।

বড় কর্ত্রী আসিবার পরই আসরের সুর একটু বদলাইয়া গেল। "তাই তো সংবৎসরের পর ছেলে ঘরে আসবে, কেমন ক'রেই বা বৌ পাঠায়!" "মায়ের ব্যামো, তা ব'লে কি হবে, পরের ঘরে যখন মেয়ে দিয়েছে, তখন কি আর নিজের এক্তার আছে?" ইত্যাদি—

কেবল একজন স্পষ্টবক্তা সাহসে নির্ভর করিয়া বড় কর্ত্রীকে বলিলেন, "হ্যাঁ, দিদি, তা শুনছি, বৌমার মা এখন-তখন, যদি নাই বাঁচে! আহা এক সন্তান,

মেয়ের মুখ দেখতে পাবে না! আনতে পাঠিয়ে হয়তো সে পথের দিকে হা-পিত্যেশ ক'রে চেয়ে আছে!"

"হ্যাঁ মরবে! ম'লেই হ'ল আর কি! বিধবার মরণ এত সহজে হয় না। তা হ'লে আমরা কোন্ কালে ম'রে ভূত হয়ে যেতাম। তুই বলিস কি লো, আজ রাত্তিরে আমার দেবু বাড়ী আসবে, আজ দুপুরে কিনা ঘরের বৌ পাঠিয়ে দেবো! মরণ তার এসে থাকে, সে মরবে। মেয়ে-জামাই রেখে মরে, সে তো ভাগ্যের কথা।"

চিন্ময়ী যখন শুনিল যে, তাহার মায়ের বড় অসুখ বলিয়া কাকা লইতে আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে পাঠানো হইবে না, তখন আর তাহার ধৈর্য রহিল না, সে ছুটিয়া গিয়া শাশুড়ীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, দুই পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল। বধূর এই নির্বাক আবেদনে শাশুড়ী কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও, দেবেশ আজ বাড়ী আসিবে, বধূ কাঁদিয়া তাহার অকল্যাণ করিতেছে ভাবিয়া, আবার তাঁহার মন কঠিন হইয়া গেল। বলিলেন, "দেবু আজ বাড়ী আসবে, এ কি কাণ্ড মা! সক্কালবেলা বাসী হাত, বাসী মুখ, আবাগীর ঝি কেঁদে মরছেন, ওঁর মা যেন এখনি ম'লো। দিন নেই, ক্ষণ নেই, হেট বললেই তো আর ঘরের বৌ পাঠানো যায় না? এমনই তো কত আয় পয়! ব্যারাম হ'লেই মানুষ মরে না। দু দিন কি আর তর সয় না? ভাদ্দর মাস পড়বার আগে একটা ভাল দিন দেখে না হয় আবার এসে নিয়ে যাবে।"

ভবেশ রায় বৈবাহিককে গিয়া বলিলেন, "কি করি বেয়াই, মেয়েদের ব্যাপার জানেন তো, দিনক্ষণ না দেখে তারা কিছুতে পাঠাতে চায় না। তায় দেবেশ আজ বাড়ী আসছে। আজ তো পাঠানো অসম্ভব। এ সব কাজে আমার তো হাত নেই, কিছু বলতে গেলে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে। তা আপনি না হয় দু-দশ দিন থাকুন, শ্রাবণের শেষ নাগাদ একটা ভাল দিন দেখে বৌমাকে নিয়ে যাবেন।"

ক্ষোভে হরিশ চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল। তাঁহার মনে হইল, ভ্রাতৃজায়ার আপত্তি সত্ত্বেও মেয়ে সুখে থাকিবে বলিয়া তিনিই জোর করিয়া এ ঘরে মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। আর মনে হইল, আজ যদি লক্ষ্মীর আড়ি চক্‌বন্দী পরগণা থাকিত, আজ যদি যাঁর নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিতেন, তবে কি আর তাঁহাকে দীনহীনের মত বাহাদুরপুরের রায়েদের বাড়ী আসিয়া এইরূপ অপমানিত হইতে হয়!

বৈবাহিকের কথার উত্তরে চক্রবর্তী বলিলেন, "আমার কি থাকবার উপায় আছে! আমি যে বাড়ীতে এখন-তখন রুগী রেখে এসেছি। আজকের দুপুরের জোয়ারেই আমাকে নৌকা ছাড়তে হবে। তা হ'লে সন্ধ্যা নাগাদ বদনগঞ্জে পেঁ'ছে যাব। বাড়ীতে গিয়ে যে কি ব'লে দাঁড়াব, তাই কেবল আমি ভাবছি!" বলিতে বলিতে আবার তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সংযত হইয়া বলিলেন, "বাবাজীর সঙ্গে তো দেখা হ'ল না, কি আর করব বলুন! যাক, ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে। মাসের শেষে নিয়ে যাবার কথা বলছেন, রুগী যে ততদিন টি'কে থাকে, এমন তো মনে হয় না।"

ভবেশ রায় উত্তর শুনিয়া অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং খুশীই হইলেন। দেবেশের সঙ্গে তাহার শ্বশুরবাড়ীর কোনও ঘনিষ্ঠতা ঘটে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

হরিশ চক্রবর্তী চিন্ময়ীকে অনেক প্রবোধ দিয়া গেলেন, "এই যে মা, আমি ঘুরে এসেই তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার মার অসুখ, অদিনে যাওয়া তো ভাল নয়। ত্রয়োদশীর দিন ভাল, সেই দিন তোমাকে নিয়ে যাব। সে আর কটা দিন? আজ হ'ল পঞ্চমী, আর দিন সাতেক। কেঁদো না মা আমার, চুপ কর।" মুখে এই সমস্ত প্রবোধবাক্য বলিতেছেন বটে, কিন্তু চিনু যখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, 'না, আমি মাকে না দেখে এক দিনও থাকতে পারব না। আমি সাত দিন থাকতে পারব না। আমাকে এখনি নিয়ে যান, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে যান খুড়ো মশাই। আপনার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে নিয়ে যান,' তখন তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

নায় পশ্চিমের আকাশে খুব মেঘ করিয়া আসিতেছে দেখিয়া চিন্ময়ীর শাশুড়ী চিন্ময়ীকে বলিলেন, "বৌমা! হাট থেকে মাছ এসে প'ড়ে আছে, বেলা-বেলি রান্না সেরে এসো, হয়তো এখনি বৃষ্টি এসে পড়বে।"

চিন্ময়ী তাহার খুড়া মশাই চলিয়া যাইবার পর সেই যে বড় ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, এ পর্যন্ত আর একবারও উঠে নাই। অন্য দিন হইলে এ জন্য তাহাকে শাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইতে হইত, কিন্তু আজ বড় কর্ত্রী কি মনে করিয়া বধূকে আর কিছু বলিলেন না, বরং চিনুর খুড়শাশুড়ী আপনার মনে গজ-গজ করিতেছিলেন, "আজকালকার বৌদের আস্পর্ধা দেখে আর বাঁচি নে। খুড়োর সঙ্গে যাওয়া হ'ল না ব'লে দাওয়ার খুঁটি ধরে ব'সে রইলেন। আমাদের কত নিতে এসেছে, কত ফিরে গিয়েছে। আমরা এমন করলে ঠাকরুণ কি আর রক্ষে রাখতেন? সমস্ত দিন গেল, ছেলেটা ধরবার নাম নেই, কুটোগাছটিও দুখানা করবার নাম নেই।"

চিনু শাশুড়ীর আদেশে যন্ত্রচালিতের মত মাছ কুটিবার জন্য উঠিল; এমন সময় সহসা ধূলায় দশ দিক অন্ধকার করিয়া প্রবল ঝড় আসিয়া পড়িল। চোখে ধূলা বালি পড়িয়া ঝড়ের ঝাপটে সে হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোনও রকমে খুঁটা ধরিয়া বাঁচিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ঝড় একটু কমিল; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহার পরই আবার এত প্রবলবেগে ঝড় আসিল যে, লোকের রান্না-খাওয়া দূরে থাক্, প্রাণ বাঁচানোই দায় হইল। দেখিতে দেখিতে দুম-দাম করিয়া গাছ পড়িতে আরম্ভ হইল। তাহার পর মজুমদারের আটচালা ভূমিসাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে একটা আর্তনাদ উঠিল। "ওরে! গরুগুলোর দড়া কেটে দে রে! ঘর চাপা প'ড়ে মরবে।" "ওরে! বড় ঘরের চাল মড়-মড় করছে, নূতন ঘরে চল্।" "ওরে! ক্যাব্লা কোথায় গেল? ও ক্যাব্লা! ছোট খোকা যে উপরের ঘরে শুয়ে আছে, নামিয়ে নিয়ে আয়—ঘর পড়ল ব'লে!" ইত্যাদি ভয়ার্তের কলরব ঝড়ের গর্জনের সহিত মিশিতে লাগিল। বড় কর্ত্রী শয়নঘরে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া

একমনে কেবল 'মধুসূদন মধুসূদন' জপ করিতেছিলেন, আর এক-একবার চোখ মেলিয়া "ওমা কি হ'ল মা, ওমা দেবু যে আমার নৌকায় আছে মা! আমি বড় পোড়াকপালী, তোমার নোয়ার জোরে তুমি আমার দেবুকে বাঁচিয়ে ঘরে আন মা।" বলিয়া ব্যাকুলভাবে বধূর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন।

মজ্জমান ব্যক্তি যেমন জলে পড়িয়া কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, এ যেন ঠিক সেইরূপ। থাকিয়া থাকিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিতেছিলেন, "ওরে! বাছার যে জলে ডোবার রিষ্টি ছিল, আমি পোড়াকপালী বর্ষার দিনে বাড়ী আসতে কেন বারণ ক'রে পাঠালাম না? ছোটঠাকুর যে আমাকে আগেই সে কথা বলেছিল।"

চিন্ময়ী শাশুড়ীর এই ব্যাকুলতা দেখিয়া কি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, বুঝিতে না পারিয়া কেবল কোলের কাছে ঘেঁষিয়া বসিতেছিল। এক-একবার ঝড়ের গর্জন শুনিতেছিল, আর এ সময় যিনি নৌকায় আছেন, তাঁহার অবস্থা কল্পনা করিতেছিল। এক-একবার তাহার ঘুম আসিতেছিল, আবার ঝড়ের শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল; ক্রমশঃ ঢুলিতে ঢুলিতে শাশুড়ীর হাঁটুর কাছে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দুর্যোগের রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সূর্যকিরণে আবার দশ দিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল। দেখা গেল, গ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয়। দুই-তিন জন ঘর-চাপা পড়িয়া মরিয়াছে, গরু-ছাগলও অনেক মরিয়াছে; গাছ যে কত পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ছোট তরফের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপের পাশে লোকজন জড় হইয়া বাঁশ কাঠ সরাইতেছিল। বড় তরফের প্রজা কছিমদ্দি সেই পথের ধার দিয়া মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে ছুটিয়াছে দেখিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে কছিম! অমন ক'রে ছুটছিস কোথায়? তোর আবার কি হ'ল?"

"কন্ কি, ছোট বাবুর লা ডুবী হয়েছে। মাঝি কাঠ ধ'রে কোন গতিকে কিনারা ধরেছে, তিন জন মাল্লা আর আমার ছোট বাবু—" বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কছিম ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদ শুনিয়া কিছুক্ষণ সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর একজন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভবেশ রায়ের কি জোর কপাল! যে প্রার্থনা করিতেছিল, ভগবান তাই তার কপালে মিলিয়ে দিলেন! এই সে দিন দেবেশের রিষ্টি কাটানোর নাম ক'রে বড় বৌর কাছে পাঁচ শো টাকা আদায় ক'রে নিয়েছে, রিষ্টি কাটিয়েছে মাথামুণ্ডু।"

বড় কর্ত্রী সকাল হইতে পাগলের মত এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছিলেন, আর কেবল বলিতেছিলেন, "ওরে! একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে খবর নে।" "ওরে! তোরা কি বলাবলি করছিস? তোরা কি কোনও খবর পেয়েছিস?" "ওরে! ছোটঠাকুর কোথায় গেল? বাদলার মা! একবার ডেকে দে না মা।" সকলে তাঁহাকে দেখিয়া চোখে চোখে কথা কহিতেছিল, মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিতেছিল না।

ইতিমধ্যে যে হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া রান্নাঘর পরিষ্কার করা হইয়াছে—দেবেশের

মা তাহা দেখিতে পান নাই; এখন সহসা হাঁড়ি বাহির করিতে দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন "ওরে! হাঁড়ি বার করছিস কেন তোরা? কি খবর পেয়েছিস বল্ আমাকে! ওরে বাবা রে! আমার কি হ'ল গো!" বলিয়া মূর্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া গেলেন।

যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, চোখ চাহিয়াই দেখিলেন, এ যে তাঁহার অঞ্চলের নিধি দেবেশ—তাঁহার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া আছে! এ কি স্বপ্ন না কি? দেবেশের এখনও ভিজা কাপড়, মুখে চোখে উদ্বেগ ও শ্রান্তি যেন মাখানো রহিয়াছে। কর্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গিয়া আবার ঘুরিয়া পড়িতেছেন দেখিয়া দেবেশ দুই হাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। কর্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেবেশ! বাবা আমার, মাণিক আমার! আমি তবে স্বপ্ন দেখছি নে! ওরে, আমার মা-লক্ষ্মীর সিঁথের সিঁদুরের জোরে আমি হারানিধি ফিরিয়ে পেয়েছি। ওলো! তোরা দেখ্ লো দেখ্। কে বলে, আমার মা অপয়া? আমার বৌমা যে পূর্ণলক্ষ্মী। ওরে, নৌকা সাজা, এখনই নৌকা তোয়ের কর্। এখনই আমি দেবুর সঙ্গে বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠাব। মরণকালে সন্তানের মুখ দেখায় বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম, সেই পাপে আমার সোনার চাঁদকে হারাতে বসেছিলাম।"

('সাহিত্য', কার্তিক ১৩২৩)

কলঙ্কিতা

পল্লীগ্রামের জমীদার-বাড়ী।

পুরানো প্রকাণ্ড চক-মিলানো বাড়ী, বহুদিন সারানো হয় নাই। অনেক জায়গায় ছাদের উপর ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বথগাছ জন্মিয়াছে। স্থানে স্থানে ভাঙিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। দেউড়ী পার হইয়া প্রকাণ্ড উঠান ও কাছারী-বাড়ী। অন্দর-মহলে যাইতে হইলে কাছারী-বাড়ীর মধ্য দিয়াও যাওয়া যায়, আবার কাছারী-বাড়ীর গা ঘেঁষিয়া যে পথটি চলিয়া গিয়াছে, সে দিক দিয়াও অন্দরের দিকের দরজায় পেঁছানো যায়। কাছারী-বাড়ী এককালে আমলা, পাইক, বরকন্দাজ ও প্রজাগণে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত, এখন ক্বচিৎ জনসমাগম হয়। পাল-পার্বণ উপলক্ষে কি পুণ্যাহের সময় কাছারী-বাড়ীতে জনসমাগম হয় বটে, কিন্তু আগের দিনের তুলনায় কিছুই নয়।

অন্দর-মহলে উঠানের চারিপাশে দ্বিতল অট্টালিকা-শ্রেণী। এই অট্টালিকায় বহু শরিকের অংশ আছে। শরিকগণের অনেকেই এখন বিদেশবাসী, তাঁহাদের অংশ কতক অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, কতক অন্য শরিকেরা ব্যবহার করেন।

অন্দরে প্রবেশের দ্বার দক্ষিণ-মুখে, তাহার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাড়ীর উত্তরে খিড়কীর পুকুর। প্রকাণ্ড দীঘির মত পুকুর, বহুদিন সংস্কার অভাবে পাঁক, পানা ও কলমীদলে পরিপূর্ণ। শোনা যায়, এখান হইতে মাটি কাটিয়া যে ইঁটের পাঁজা প্রস্তুত হয়, সেই পাঁজার ইঁটেই এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও তৎসংশ্লিষ্ট ঠাকুর-বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই মাটি-কাটা গর্ত আবার ভাল করিয়া কাটাইয়া জমিদার-বংশের পূর্বপুরুষ রামরাম রায়চৌধুরী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। লোকে বলে, আগে এই পুকুরের জল কাকচক্ষুর মত নির্মল ছিল এবং পাশাপাশি চারিখানি গ্রামের লোক এই জল পানের ও রন্ধনের জন্য ব্যবহার করিত। এখনও অনেকগুলি ভাঙা ভাঙা ঘাট আছে, কেবল একটি ঘাট অভগ্ন অবস্থায় আছে, সেটি বড় তরফের ঘাট। আর কয়েকটি ঘাটে তালগাছ ও খেজুর-গাছ কাটিয়া খুঁটি দিয়া বাঁধিয়া সিঁড়ির মত ধাপ করা হইয়াছে। ঘাটের কাছে কাছে বাঁশ দিয়া পানা আটকাইয়া খানিকটা জল আচ্ছাদনহীন করা হইয়াছে, সেইখানে জলশৌচ, মুখধোওয়া, বাসনমাজা ও স্নান প্রভৃতি সমস্ত কার্যই চলে এবং সেই জলই সমস্ত গ্রামের পানীয় জল। পুকুরের চারিধারে গাছ-গাছড়া: এই বৃক্ষের বেষ্টনী-ঘেরা পুকুরে বৌ-ঝিরা নিঃশঙ্কমনে স্নান করে, কোনও পুরুষের সেখানে আসিবার অধিকার নাই।

শোনা যায়, এই জমিদার-বংশের আদি-পুরুষ মুর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে চাকুরি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এককালে এই জমিদার-বংশের এ অঞ্চলে প্রবলপ্রতাপ ছিল। তাঁহাদের তাঁবে বহু লাঠিয়াল

থাকিত, লাঠিয়ালদিগকে চাকরান-জমি দেওয়া ছিল। এই লাঠিয়ালগণ দিনে পাইকের কাজ ও রাত্রে ডাকাতি করিত। এখন সে লাঠিয়াল-বংশের বড় কেহ অবশিষ্ট নাই। ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ স্ফীতোদর দুই-চারিজন যাহারা আছে, তাহাদের দেখিলে তাহাদের পূর্বপুরুষগণের বীরত্বের কাহিনী কেবল কাহিনী বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন খাজনা আদায়ের কাজ করে, দুই-একজন চৌকিদারের কাজও করে। জমিদার-বংশের আধুনিক বংশধর যাঁহারা এখন গ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের আদেশে অথবা বিনা আদেশেও এই লাঠিয়ালের বংশধরগণ মাঝে মাঝে নিরীহ প্রজার উপর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কোনমতে আজিও বংশের সম্মান রক্ষা করিতেছে।

গ্রামটি এককালে যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল—এখনও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারপাড়া, বারুইপাড়া, তাঁতিপাড়া, নাপিতপাড়া, মালোপাড়া, বামুনপাড়া —প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বহু পল্লীর নাম এখনও শোনা যায়, কিন্তু সর্বধ্বংসী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অনেক পল্লীই এখন জনশূন্য ও জঙ্গলময়। বামুনপাড়ায় কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে, ইঁহাদের বেশীর ভাগই জমিদারদিগের পুরোহিত-বংশ, অন্য দুই-এক ঘর ব্রাহ্মণও আছেন। গয়লাপাড়ায় ও জেলেপাড়ায় কয়েক ঘর গয়লা ও জেলে আছে, তাহারা এখন পর্যন্তও জমিদার-বাড়ীতে নিয়মিত দই, দুধ ও মাছ যোগান দেয়। তাহারা চাকরান-জমিতে বাস করে, এজন্য খাজনা দিতে হয় না। ভুঁইমালী প্রত্যহ সকালে জমিদার-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান ঝাঁট দিয়া যায়, পূজার সময় প্রত্যেক শরিকের নিকট হইতে এক-একখানি করিয়া কাপড় ও কিছু পার্বণী পায়। শোনা যায়, পূর্বে বারুইপাড়া হইতে পান ও কুমারপাড়া হইতে এক ঝাঁকা হাঁড়ি প্রত্যহ জমিদার-বাড়ীতে যোগান আসিত, কিন্তু এখন আর তাহা আসে না।

জমিদার-বাড়ীতে এখন আর বারো মাসে তেরো পার্বণ নাই, তবে দুর্গাপূজা, দোল ও রাসের সময় এখনও কিছু ঘটা হয়। পূজার সময় শহর হইতে যাত্রাগান কিংবা বাইজী আসে। ভাসানের দিন বাচখেলাও হয়।

গ্রামের পার্শ্ব দিয়া নদী গিয়াছে, নদীর নাম চন্দনা। গ্রামের অবস্থা যেমন জীর্ণ-শীর্ণ—নদীর অবস্থাও সেইরূপ। বিজয়ার দিনে এই নদীতেই প্রতিমা বিসর্জন ও বাচখেলা হয়। নদীর সহিত অনেক বিলের যোগ আছে; এই বিলে বর্ষায় নৌকা চলে, আবার শীতে ধান জন্মায় ও শীতের প্রারম্ভে জেলেরা বাঁধ দিয়া মাছ ধরে।

বিজয়ার সন্ধ্যা। গ্রামের বধূরা প্রতিমা বরণ করিয়া জমিদার-বাড়ী হইতে ঘরে ফিরিতেছেন। নদীর ধার হইতে বিসর্জনের বাজনা শোনা যাইতেছে।

বড় তরফের গৃহিণীর হাতে যাত্রার সিঁদুর-কৌটা। প্রতি বৎসর পল্লীবধূরা দেবীর যাত্রার সময় সিঁদুরের কৌটায় প্রসাদী সিঁদুর ও একটি করিয়া টাকা, অপারগ পক্ষে আধুলি রাখেন। এই কৌটাকে যাত্রার কৌটা বলে। জমিদার-বাড়ীতে

আগে যাত্রার কৌটায় আকবরী মোহর রাখা হইত, এখন একটি করিয়া গিনি রাখা হয়। তবে সব শরিক গিনি রাখিতে পারেন না, কেহ কেহ টাকাও রাখেন।

বড় তরফের অবস্থা অস্বচ্ছল নয়। বড়বাবুরা দুই ভাই, ছোট ভাই পশ্চিমে চাকরি করেন, বড়বাবু বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়-আশয় দেখেন। গৃহিণী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বয়সের অনুপাতে কিছু গম্ভীর-স্বভাব। গৃহিণীর একটি পুত্র হইয়াছে, আগের পক্ষের একটি কন্যাও আছে। ইঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, সুতরাং ইনিই এখন কর্ত্রী।

মধ্যম তরফের কর্ত্রী আজিও জীবিতা। জমিদারি বড় তরফের বেশী হইলেও অর্থের দিক দিয়া মধ্যম তরফই অধিক ধনবান। কর্তা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন এবং বহু অর্থ আমোদ-প্রমোদে খরচও করিয়াছেন। শোনা যায়, কোন এক নিন্দিত পল্লীতে মত্ত অবস্থায় চৌবাচ্চায় পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স খুব বেশী হয় নাই, কিন্তু অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কর্ত্রী নিজ হস্তে জমিদারি ও সম্পত্তির ভার লইয়া খুব যোগ্যতার সঙ্গেই সমস্ত চালাইয়া আসিয়াছেন। সকলে বলে—কর্ত্রীর হাতে অনেক টাকা আছে। তাঁহার তিন ছেলের মধ্যে বড় দুটি বিদ্বান ও চরিত্রবান হইয়াছিল, কিন্তু অল্প বয়সেই মারা গিয়াছে এবং দুই বিধবা বধূ ও গুটি তিন-চার পিতৃহীন শিশুর ভার জননীর উপর চাপাইয়া গিয়াছে। ছোট নরেন্দ্রনাথ কর্ত্রীর কোলের ছেলে ও অতি আদরের সন্তান, সে-ই কেবল বাঁচিয়া আছে।

আজ বিজয়া-দশমীর দিনে প্রণাম ও আশীর্বাদ উপলক্ষে বৃহৎ অঙ্গনে অনেকেই একত্র হইয়াছেন। বড় তরফের গৃহিণী মাধবী দেবী-যাত্রার কৌটাটি সিন্দুকে তুলিবার জন্য ঘরে যাইতেছেন, এমন সময় হরির মা বৈষ্ণবী ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বড় মা, বাবু নদীর মধ্যে পা পিছলিয়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন। ভরা নদী, আর একটু হ'লেই সর্বনাশ হ'ত, মা-দুর্গা রক্ষা করেছেন। সনাতন আর ভোলা তাঁকে ধ'রে তুলছে, এখনই আমি দেখে এলাম।"

হরির মা বৈষ্ণবী, বড়বধূ মাধবীর প্রিয় দাসী। এক হিসাবে তাহাকে সংবাদ-বাহিকাও বলা যায়। যেখানে যে কথাই হোক না কেন, হরির মার কানে গেলেই গৃহিণীর কানে উঠিবে ইহা অবধারিত। এজন্য হরির মাকে অনেকে ভয় করিয়া চলিত।

হরির মার আনীত এই সংবাদ শুনিয়া বড়বধূ আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "প'ড়ে গেলেন? কি ক'রে প'ড়ে গেলেন? কতটা জলে পড়েছিলেন? নদীর এখন যে টান—এদিকে আবার সর্বাঙ্গে বাত। ও ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি কোথায় গেল? শোন, এদিকে এস, তোমার দাদা নাকি জলের মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলেন! মাখনকে একবার পাঠিয়ে দাও ভাই, দেখে আসুক, কি হ'ল! মা-দুর্গা, এ কি বিপত্তি ঘটালে মা!"

মাখনের জ্বর হইয়াছে বলিয়া তাহার মা নদীর ঘাটে যাইতে দেয় নাই, এখন মামিমার কথা শুনিবামাত্র মহাস্ফূর্তিতে সে নদীর দিকে ছুট দিল। তাহার স্ফূর্তি

দেখিয়া মোটেই বুঝা যায় না যে, তাহারই সকালে তিনখানা লেপ চাপা দিয়া জ্বর আসিয়াছিল।

এমন সময় দূরে সনাতন খানসামাকে আসিতে দেখা গেল। বড়বধূ তৎক্ষণাৎ পাঁচ টাকা হরির লুট মানিলেন, যেন সনাতন আসিয়া ভাল খবর দেয়। অন্য সকলেও ব্যগ্রভাবে সনাতনের আসিবার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

কিন্তু সনাতনের চালচলনে গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে সেরূপ মনে হইল না। বাহিরের দেউড়ী পার হইয়া অন্দরের উঠানে পা দিয়াই সনাতন হাঁক দিল, "হরির মা, হরির মা ওখানে আছে? মা-ঠাকরুণকে বল—বড়বাবুর কাপড়জামা চাই, তাঁর কাপড় গাঙের জলে ভিজে গিয়েছে।"

বড়বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী সুরধুনী মাথায় কাপড় টানিয়া আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সনাতনদাদা, দাদা নাকি গাঙের জলে প'ড়ে গিয়েছিলেন? কি ভাবে পড়লেন? কোথায়ও লাগে নি তো? এখন কেমন আছেন?"

সনাতন প্রশ্ন শুনিয়া হাসিল। বলিল, "ছাড়ান দ্যান দিদি, ওসব কথায় আপনাদের কি কাম? বাচের সময় গাঙের ঘাটে কত কি হয়! বাড়ীর মধ্যে এ খবর দিলে কে? হরির মা বুঝি?"

"সে কি সনাতনদাদা? দাদা জলে প'ড়ে গেলেন, আর তুমি বল আমাদের সে খবরের কাজ নেই?"

সনাতন সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া—"কই, কাপড়জামা এনেছেন? দ্যান" বলিয়া কাপড়জামা লইয়া প্রস্থান করিল। ততক্ষণে মাখন ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়া আসিয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

বৃত্তান্তটি এইরূপ: শহর হইতে বাচের আমোদের জন্য বজরায় করিয়া নৃত্য-কারিণীগণ এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি তরল পানীয়পূর্ণ বোতলও আসিয়াছিল। এ সমস্ত না হইলে বিজয়ার আমোদ সম্পূর্ণ হয় না, তাই বড়বাবু শহরে লোক পাঠাইয়া আনাইয়াছেন। পানীয়ের গুণে অনেকেরই নৃত্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। বড়বাবুর পায়ে বাতের ব্যথা, সুতরাং তিনি একজন নৃত্যকারিণীর বাহু অবলম্বন করিয়া নাচিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নৃত্যের তালে পদক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি ও নৃত্যকারিণী উভয়েই জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ আঘাত কিছু লাগে নাই, তখনই সনাতন ও ভোলা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাদের তুলিয়া ফেলিয়াছে।

মাখন বলিল, "মা, প্রতিমা এখনও বিসর্জন হয় নি, বড়মামা জলে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিনা, তাই বিসর্জনের দেরি হয়ে গেল। এইবার বাচ আরম্ভ হবে। পটলা বলছে কি জান মা, বলছে আগে হ'ল বড়বাবু-বিসর্জন, পরে হবে প্রতিমা-বিসর্জন।"

সুরধুনী দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিলেন, "বালাই ষাট্! দাদার শত্রুর বিসর্জন হোক। পটলা ভারি ডান্‌পিটে হয়েছে তো! ওর মাকে ব'লে মার খাওয়াব।"

বড়বাবুর ভাবনা হইতে সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু মাখনের আনীত

সংবাদ শুনিয়া বড়বধূর তৎক্ষণাৎ ফিট হইয়া পড়িল। বড়বধূ মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার হাত হইতে যাত্রার কৌটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া মাটিতে পড়িল।

বড়বধূর এই ফিট নূতন নয়। বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই তাঁহার ফিট হইয়াছিল।

এ দেশের নিয়ম—বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বধূকে আট দিন শ্বশুরবাড়ী থাকিতে হয়। আট দিনের দিন 'অষ্টমঙ্গলা' বলিয়া একটি বিবাহের অঙ্গীভূত নিয়ম আছে, তাহা শেষ হইলে বধূ বাপের বাড়ী যাইতে পারে।

কিন্তু বড়বধূ বড়বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, এজন্য অষ্টমঙ্গলার পর বধূকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে বড়বাবুর জননীর ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলিলেন, "বাপের বাড়ী এখন না-ই বা গেলে! মেয়ে তো ছোট মেয়ে নয়, ঘর-সংসার বুঝে নেবে ব'লে বড় দেখে আনা হয়েছে। আর দু দিন বাদেই পৌষ মাস পড়বে। বাড়ীর লক্ষ্মী-পুজা, লক্ষ্মীপুজোর সময় বাড়ীর বৌ বাড়ী থাকবে না, সেটা কি ভাল হবে? ওকেই তো এর পর পুজো-আচ্চার যোগাড় করতে হবে, আমি আর কদিন? অঘ্রাণের আর দু দিন মোটে আছে, মাঝে পৌষ মাস, মাঘ মাসের প্রথমে ভাল দিন দেখে পাঠিয়ে দেব, দিন পনেরো সেখানে থেকে আসবে।"

দরদালানে এই কথা হইতেছিল, ততক্ষণে ঘরের ভিতর বধূর ফিট হইয়াছে। বধূর সঙ্গে পাড়ার দুই-একটি মেয়ে ও বধূর এক ননদ ছিল, তাহারা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। বধূর ননদ—"বৌদি, শুনছ ভাই, মা বলছেন—তোমার এখন বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না"—বলিতে বলিতে "ও কি ভাই, এ-রকম করছ কেন?" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

অপর একজন বলিল, "বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না শুনে বৌদিদি 'কল্লা' করছে।" কিন্তু সেও একটু পরে ভয় পাইয়া গেল। তখন তাহারা বাড়ীর সকলকে ঘরে ডাকিয়া আনিল। সকলে ঘরে আসিয়া দেখিল, বৌ অচেতন, দাঁত লাগিয়া গিয়াছে, হাত-পা ছুঁড়িতেছে, মাথায় কাপড় নাই। অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ রোঝা আনিতে পরামর্শ দিল, কিন্তু হিস্টিরিয়া-ফিট পাড়াগাঁয়েও একেবারে অজানা নয়, সুতরাং রোঝা না আনিয়া শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকাই হইল। অতি শীঘ্রই পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল, "নূতন বৌয়ের ফিটের ব্যারাম আছে।"

শাশুড়ী সখেদে বলিলেন, "আমার যেমন কপাল! ঘরের লক্ষ্মী ঘরণী-গৃহিণী বৌ ভরা-ঘরে দোর দিয়ে চ'লে গেল, আবার যাকে ঘরে আনলাম সেও হ'ল ফিটের ব্যারামী।"

যাহা হউক, জমিদার-বাড়ীতে ডাক্তারের ভাবনা নাই, বাড়ীতেই ডিস্পেন্সারি, আর মাহিনা-করা ডাক্তার, সেজন্য প্রথমে কথা হইল বধূকে বাপের বাড়ী না পাঠাইয়া এখানেই রাখা হইবে। কিন্তু ডাক্তারের ঔষধে ফিটের প্রতীকার হইল না, বরং ঘন ঘন ফিট হইতে লাগিল, তখন ডাক্তার হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "রোগিণীকে বাপের বাড়ী পাঠানোই ভাল। মন ভাল না থাকিলে ফিট বন্ধ হইবে না।"

ইহার পর ক্রমশঃ তাঁহার ফিট বাড়ীর লোকের গা-সহা হইয়াছিল, তবে মাঝে মাঝে ফিটের আক্রমণ প্রবল হইত। আজিকার ফিটও সেইরূপ প্রবল ফিট, আক্রমণের প্রথম অবস্থা দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল।

অন্য দিন হইলে সংবাদ পাইবামাত্র বড়বাবু ছুটিয়া আসিতেন এবং গৃহিণীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু আজ আর তিনি আসিলেন না, ফিটও সহজে ভাঙ্গিল না। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সকলের রোগিণীকে লইয়া কাটিল, কিন্তু পূজার খাটুনিতে সকলেই শ্রান্ত, ক্রমশঃ সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল এবং সম্ভবতঃ রোগিণীরও ঘুম আসিল, কেননা তাঁহার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সে রাত্রে বড়বাবু বাড়ীতে আসিলেন না।

পরদিন সকালে মাধবী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, হরির মা খোকাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই খোকার "মা যাব, মা যাব" বলিয়া চীৎকার থামাইতে পারিতেছে না। মাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া খোকা হাত বাড়াইয়া ঝাঁপাইয়া মায়ের কোলে গেল। মাধবী তাহাকে দুই হাত দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

হরির মা গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এক রাত্রে মুখ যেন কালির বর্ণ হয়ে গিয়েছে, মুখ-চোখ ধুয়ে দশবার জপ ক'রে আগে একটু মুখে জল দাও মা, কাল রাত্রে তো আর কুটোটি দাঁতে কাট নি।"

গৃহিণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "হরির মা, কাল তোদের বাবু বাড়ী আসেন নি, না রে?"

"না মা, বাবু আর বাড়ী এলেন কোথায়? কাছারি-বাড়ীতেই শুয়ে পড়েছিলেন। এ ক'দিন খাটুনি তো কম যায় নি।"

মাধবী একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সেই—সেই তারা?"

হরির মা যেন বুঝিতে পারে নাই, এই ভাব দেখাইয়া বলিল, "কাদের কথা বলছ মা! ও! সেই নাচুনী মাগীগুলো? তাদের দাওয়ানজী সকালেই নৌকা ক'রে বিদেয় ক'রে দিয়েছেন।"

এই বলিয়া হরির মা যে কথা বলিবার জন্য এতক্ষণ ছটফট করিতেছিল, সেই কথার উপক্রমণিকা আরম্ভ করিবে কিনা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তোমার তো মা অসুখ—সেই নিয়েই ভেবে মরছি, এদিকে আবার আর এক কাণ্ড! যাকগে, তোমার মুখ-ধোয়ার জল নিয়ে আসি।" বলিয়া যেন জল আনিবার জন্যই যাইতেছিল, বড় বধূ ডাকিয়া ফিরাইলেন, বলিলেন, "কাণ্ডটা কি?"

"সে এখন থাক্ মা, তুমি মুখে-চোখে জল দাও, একটু সুস্থ হও, শুনবে এখন পরে।"

"না, তুই ব'লে যা। আদ্ধেক কথা ব'লে চ'লে যাওয়া তোর এক অভ্যেস। কাণ্ডটা কি হ'ল আবার?"

"কি জানি মা, নিবারণ ঠাকুরের বৌকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না!"

"সে কি? কাল যে সে প্রতিমা-বরণের সময় আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ী ফিরবার সময় মালতী তার সঙ্গে যায় নি? কার কাছে এ কথা শুনলি?"

হরির মা বলিল, "শুনব আর কার কাছে? পাড়ায় একেবারে হৈ-হৈ প'ড়ে গিয়েছে। শুধু তো তাই নয়, মধ্যম তরফের ছোট বাবুকেও কাল থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচের সময় হুড়োহুড়িতে জলে প'ড়ে গিয়েছেন ব'লে কেউ কেউ সন্দ করছে, কিন্তু আবার কেউ কেউ বলছে—ভাসানের সময় গাঙের ঘাটে তিনি যান নি। ঠাকুরমা তো কেঁদে কেটে শয্যে নিয়েছেন। আহা, 'সবে ধন নীলমণি' ঐ একটি ছেলে।"

মাধবী হরির মার শেষের কথাগুলির দিকে কান না দিয়া বলিলেন, "কি সর্বনাশের কথা! ঠাকুরঝিকে ডাক্ শীগগির, সব কথা ভাল ক'রে শুনি। তোদের বাবু এ সব কথা শুনেছেন?"

"শুনেছেন বইকি। তিনি তো জেলে নিয়ে খিড়কির ঘাটে জাল ফেলতে গিয়েছেন। চক্কোত্তি ঠাকুরের বৌ নাকি বাড়ী ফিরবার সময় এক কলসী জল নিয়ে যাবে ব'লে কলসী এনেছিল। মালতীকে নাকি বলেছিল যে, 'মালতী, ঘাটে একটু দাঁড়াবি, আমি এক কলসী জল নিয়ে যাব।' কিন্তু মালতী ছেলেমানুষ, ঠাকুর দেখতেই মত্ত। সে নাকি বলেছিল—'সন্ধ্যেবেলায় পুকুর ঘাটে আবার ভয় কি? তোমার সব তাতেই ভয়!' ব'লে পালিয়ে গিয়েছিল। বৌটা কাউকে না পেয়ে একাই ঘাটে গিয়েছিল।"

হরির মার বর্ণনা শুনিয়া বড়বধূর চক্ষু স্থির হইল। তিনি বলিলেন, "যা, ঠাকুরঝিকে ডেকে নিয়ে আয় শীগগির ক'রে।"

কিন্তু হরির মা যাইতে চাহে না; সে বলিল, "তিনি এখন বোধ হয় ঠাকুরমার কাছে গিয়েছেন, তিনি বড় কাঁদাকাটি করছেন কিনা। আর তোমাকে বলতে পিসিমা মানা করেছিলেন, তোমার অসুখ শরীর।"

বড়বধূ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ধমক দিবার স্বরে বলিলেন, "তোকে যা বলছি তাই কর্। যা শীগগির, ডেকে নিয়ে আয়। বলবি—মা তোমাকে এখনি ডাকছে।"

হরির মা চলিয়া গেল। বড়বধূ খোকাকে কোলে লইয়া ঘরের ভিতর গিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িলেন। এ কি ভয়ানক সংবাদ! নরেন্দ্রনাথের নামে দুর্নাম মাঝে মাঝে শুনা যায় বটে। গ্রামের বৌ-ঝিরা তাঁহার সম্মুখে বড় একটা বাহির হয় না। গ্রামে ভুঁইমালী-পাড়াতেও মাঝে মাঝে তিনি রাত্রি যাপন করিয়াছেন এমন সংবাদও শোনা গিয়াছে। কিন্তু উচ্চবংশীয়া, বিশেষতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশীয়া কুলবধূর দিকে তিনি যে এমন ভাবে হস্তপ্রসারণ করিবেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখিলে তাহা ছাড়া আর কি হইবে! পুকুর-ঘাটের চারদিকে গাছপালার ঝোপ, সেখানে লোক অনায়াসেই লুকাইয়া থাকিতে পারে। বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যায় ঘাটে বৌ-ঝিরাও বড় কেহ থাকিবে না, ইহাও জানা কথা। সুষমা ঠাকুর-বরণ দেখিতে আসিবার সময় কলসী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহার বাড়ী একটু দূরে, কাজেই প্রতিমা-বরণ শেষ হইলে বাড়ী ফিরিবার সময়

জল লইয়া না গেলে রাত্রে আবার তাহার জল আনিতে আসিতে হইত।—বোধ হয় সেই কথা ভাবিয়াই সে ঘড়া লইয়া আসিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ তাহার এই ঘড়া লইয়া আসা বোধ হয় দূর হইতে দেখিয়াছিল, অথবা কোন উপায়ে জানিতে পারিয়াছিল। তাই সে বাচের সময় গাঙের ঘাটে না গিয়া ঘাটের ধারে লুকাইয়া ছিল, সঙ্গে সম্ভবতঃ তাহার আরও লোকজন কেউ ছিল। ওঃ, এ যে একেবারে দিনে-ডাকাতি ব্যাপার!

আর সুষমা, নিবারণ চক্রবর্তীর স্ত্রী! আহা! কি লক্ষ্মী মেয়েই সে! দেখিতে যেমন সুন্দর, স্বভাবও তেমনি সুন্দর! দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি ভালবাসা! যেন চখা-চখীর মত আছে। সেবার নিবারণ ঠাকুরের অসুখ হইলে ঐটুকু মেয়ে, কি সেবাই না করিয়াছে! সে যে ইচ্ছা করিয়া নরেন্দ্রনাথের প্রলোভনে ভুলিয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে যদি সন্ধ্যাবেলায় জলে ডুবিয়া গিয়া থাকে! কিন্তু ডুবিয়া গেলে এতক্ষণে কি মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিত না? আর ছোটবাবুই বা কোথায় গেল!

বড়বধূর আরও ভাবনা হইতেছিল বড়বাবুর কথা ভাবিয়া। তিনিই তো নিবারণ চক্রবর্তীকে মহাল-সরগাছিতে পাঠাইয়া দিলেন। বধূকে একা বাড়ী রাখিয়া চক্রবর্তী কিছুতেই যাইতে চাহে নাই, কিন্তু বড়বাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—বৌয়ের জন্য তাহাকে কিছু ভাবিতে হইবে না, প্রতিবেশিনী মালতীর মাকে বলিয়া দিলে সে মেয়ে লইয়া রাত্রে নিবারণ ঠাকুরের বাড়ী থাকিবে। একজন বিশ্বাসী পাইকও বাহিরের দাওয়ায় থাকিয়া বাড়ী পাহারা দিবে। অসুখ-বিসুখ হইলে বড়বাবু তাহার ব্যবস্থা করিবেন। জমিদার-বাড়ী মাহিনা-করা ডাক্তার আছে এবং ডিস্পেনসারিতে কুইনিনও যথেষ্ট আছে। হরির মাও সব সময় দেখিয়া শুনিয়া আসিবে। বড়বাবুর এই আশ্বাস পাইয়া নিবারণ চক্রবর্তী নিশ্চিন্ত মনে মহালে গিয়াছে, নিবারণ ফিরিলে বড়বাবু তাঁহাকে এখন কি বলিবেন?

বাস্তবিক, গ্রামের সকলেই বড়বাবুকে বিশ্বাস করিত ও শ্রদ্ধা করিত। বড়বাবু শহর হইতে পূজা, রাস ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে বাইজী আনান বটে, কখনও কখনও বিলাতী-জল পান করিয়া মত্তও হন বটে, কিন্তু গ্রামের লোকে তাহা এমন কিছু দোষের মনে করে না। সেটা জমিদারী চালের একটা অঙ্গমাত্র। তাঁহার উপর তাঁহার প্রজাদের বিশেষ আস্থা ছিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিত— বড়বাবু কথার মানুষ, গরীবের মা-বাপ এবং গ্রামের বৌ-ঝিদের তিনি অভিভাবকস্বরূপ। সেই বড়বাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেই এমন একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেলে তাঁহার মান-মর্যাদা আর কি থাকিবে? এই সমস্ত ভাবনায় বড়বধূ দশদিক অন্ধকার দেখিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত ভাবনাতেও তাঁহার আর ফিট হইল না।

বড়বধূ চিন্তায় জর্জরিত হইয়া যেন অকূল-পাথারে ভাসিতে লাগিলেন, আর সুরধুনী আসিতেছেন কিনা—পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। এই ননদটির উপর তাঁহার একান্ত নির্ভর ছিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। নিবারণ চক্রবর্তীর স্ত্রী ও ছোটবাবুর এখনও কোন সন্ধান হয় নাই। বড়বাবু পুকুরে জাল ফেলিয়া পুকুর তোলপাড় করাইয়াছেন, মৃতদেহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। কৌতূহলী গ্রামবাসী অনেকে পুষ্করিণীর ধারে দুপুর পর্যন্ত ধরনা দিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, এবং ফিরিবার পথে—"ছুঁড়ী আবার মরবে? ও-সব মেয়ের মরণ আছে?" "না না, ও কথা ব'লো না, বৌটা বড় ভাল ছিল।" "ভাল ছিল! ভাল মানুষটি ডুবে ডুবে জল খান। ভর-সন্ধ্যেবেলা ঘাটে যাবার তোর কি দরকার ছিল বাপু, আগে সড় না থাকলে কি এ রকমটা হয়?" "মেজকর্ত্তি আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথাটি একেবারে খেয়েছেন, বামুনের ঘরের বৌ পর্যন্ত মানে না।" "চুপ চুপ, মেজকর্ত্তির কানে গেলে সর্বনাশ হবে।"—প্রভৃতি নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে।

মধ্যম তরফে রান্নাঘরে আজ হাঁড়ি চড়ে নাই। কর্ত্রীর একাদশী, তাঁহার দুই বধূরও—একাদশী। কনিষ্ঠা বধূ নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী, তাঁহাকেও কেহ জলস্পর্শ করাইতে পারে নাই। ছেলেমেয়েগুলিকেও অন্য তরফের গিন্নীরা ডাকিয়া লইয়া খাওয়াইয়া দিয়াছেন। কর্ত্রী শয্যাগতা, বিছানায় শুইয়াই মাঝে মাঝে বড়বধূকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বড়বৌমা, ওকে কিছু মুখে দিতে বল, এমন ক'রে আর অকল্যাণ করে না যেন।"

ছোট জাকে অনুরোধ করিবার দুঃসাহস বড় জার নাই, তথাপি শাশুড়ীর আদেশে মাঝে মাঝে অনুরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ছোট জায়ের মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া অনুরোধ করিতে সাহসে কুলাইতেছে না। একবার মৃদুস্বরে কিছু মুখে দিবার কথা তুলিতেই ছোট জা উগ্রচণ্ডী মূর্তিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জল খেতে বলতে এসেছ, জান না, আজ একাদশী একাদশীর দিন রাঁড়ীর জল খেতে আছে নাকি? তোমার দেওর যে মরেছে আমি যে বিধবা হয়েছি; তা জান না নাকি! জেনে-শুনে ন্যাকা সেজে জল খেতে বলতে এসেছ কোন্ মুখে?"

বড় জা মহামায়া শান্ত-প্রভৃতি ও বড়ই ভীরু-স্বভাবা। ছোট জায়ের মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়া বলিল, "কনক, লক্ষ্মী দিদি, চুপ কর, ও কথা কি বলতে আছে? ও-ঘরে মা আছেন, শুনতে পাবেন। এমন ক'রে স্বামীর অলক্ষণ করতে নেই। একটু যা হোক মুখে দাও।"

কনক কাঁদিয়া ফেলিল, "আমার আবার লক্ষণ-অলক্ষণের কথা বলছ দিদি!' আবার তখনই চোখের জল মুছিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "মা ও ঘরে আছেন, মা শুনতে পাবেন! ওরে আমার মা! ও কি মা নাকি, ও তো ডাইনী! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথা ওই তো চিবিয়ে খেয়েছে। ডাইনীর আবার কিসের পুত্রশোক! অমন ছেলের আবার বাঁচা-মরা, কল্যাণ-অকল্যাণ! মরাই তো ওর কল্যাণ।"

বলিতে বলিতে কনক আবার কাঁদিল, "তুমি কি বুঝবে দিদি! দেবতার মত স্বামী পেয়েছিলে, আমার যে দুঃখ তুমি তার কি বুঝবে? যাও, সমুখ থেকে যাও, না হ'লে এখুনি অকথা কুকথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।"

এই কনক মেয়েটি বড়ই দুর্দান্ত প্রকৃতির। শাশুড়ীর অপর দুই বধূ শাশুড়ীর ভয়ে সর্বদা তটস্থ। শাশুড়ীই কিন্তু ছোট বধূকে ভয় করিয়া চলেন। ছোট বৌ রাগের মাথায় যাহা মুখে আসে শাশুড়ীকে তাহাই বলে। শাশুড়ী সে কথা বড় একটা গায়ে মাখেন না, বলেন—আমার নরুর বৌ যদি আমার মুখে তিনটে লাথি মারে, তোমাদের পায়ে তেল দেওয়ার চেয়ে সেও আমার ভাল। নরুকে আমার সে যে বাঁচিয়ে রেখেছে—এই গুণেই তার কেনা হয়ে আছি। তোমাদের তো তিন বছর, কারুর চার বছরও পেরুল না, হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর ঘুচিয়ে বসে থাকলে। লোকে বলত 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' তোমার দুই বৌ। আরে আমার রূপ আর গুণ! রূপ-গুণ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? তোমাদের মুখ দেখলে অঙ্গ জ্ব'লে যায়। মনে হয়, হয় তোমরা মর—নয় আমি মরি, সাত-কাল ব'সে এক বোগনোয় বৌয়ের সঙ্গে পিণ্ডি গেলা আমার ঘুচে যায়।"

বিধবা বধূদের কর্ত্রী যে একেবারে ভালবাসেন না তাহা নয়; কিন্তু তাহারা বিধবা হইয়াছে, তাহাদের এই দারুণ অপরাধ কিছুতেই তিনি মার্জনা করিতে পারেন না। থাকিয়া থাকিয়া বলেন, "তারা কি আমার যাবার ছেলে ছিল? কি চেহারা, কি বুকের ছাতি! সেই ছেলে আমার যেন কর্পূরের মত উবে গেল।" বধূরা রাত্রে জল খাইবে সেজন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখেন, গুড়ের নাগরি ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখেন, একটু দুধও ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া রাখেন; কিন্তু খাওয়ার সময় তাহাদের সীমানায়ও আসেন না। তাঁহাকে কখনও বড় দুই বধূকে মিষ্ট কথা বলিতে কেহ শোনে নাই, অথচ তাহারা কাছে না থাকিলে তাঁহার এক দণ্ডও চলে না।

তাঁহার বড় ছেলে প্রমথনাথ ও মেজ ছেলে জগদীশনাথ দুইজনেই কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই দুই ভাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল এবং দুই ভাই-ই বি. এ. পাস করিবার অল্পদিন পরে মারা যান। সেই জন্য কর্ত্রী নরেন্দ্রনাথকে পড়াশুনা করিতে দেন নাই। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময়ই তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি বিবাহ দেন যে, তাঁহার ভাগ্যে ছেলের বাঁচার আশা নাই, বৌয়ের ভাগ্যে যদি ছেলে বাঁচে। ইহাতেই বুঝা যায়—"আমার ভাগ্যে তো যায় নি বিয়ে দিয়েই আমার লোহার ভীম গ'লে গেল" বলিয়া যদিও তিনি বধূদের ভাগ্যেরই দোষ দিতেন, কিন্তু মনে মনে নিজের ভাগ্যেও তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। আগের দুইটি বউ সুন্দরী ও লেখাপড়া-জানা মেয়ে। এবার তিনি বলিয়াছিলেন, "সুন্দরে আর আমার রুচি নেই, কপাল সুন্দর হ'লেই হ'ল।" বোধ হয় সেই কারণেই ছোট বউ সুন্দর নয়, লেখাপড়া সে মোটেই জানে না, তবে কপাল সুন্দর বটে, কেন না নরেন্দ্রনাথ বাঁচিয়া আছেন।

ছোট বৌয়ের যখন বিবাহ হয় তখন তাহার দশ বৎসর বয়স; এখন তাহার বয়স আঠারো। এই আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে সে বাপের বাড়ী দুই-একবারের বেশী যায় নাই। বাপের অবস্থা ভাল নয়, আর কর্ত্রী বৌ বাপের বাড়ী পাঠানো পছন্দ করেন না। কনকের তিনটি সন্তান হইয়াছিল—একটি আঁতুড়ঘরেই মারা গিয়াছে—এখন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—দুইটাই রুগ্ন। বড় ছেলে শম্ভু

বেলা দ্বিপ্রহর। নিবারণ চক্রবর্তীর স্ত্রী ও ছোটবাবুর এখনও কোন সন্ধান হয় নাই। বড়বাবু পুকুরে জাল ফেলিয়া পুকুর তোলপাড় করাইয়াছেন, মৃতদেহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। কৌতূহলী গ্রামবাসী অনেকে পুষ্করিণীর ধারে দুপুর পর্যন্ত ধরনা দিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, এবং ফিরিবার পথে—"ছুঁড়ী আবার মরবে? ও-সব মেয়ের মরণ আছে?" "না না, ও কথা ব'লো না, বৌটা বড় ভাল ছিল।" "ভাল ছিল! ভাল মানুষটি ডুবে ডুবে জল খান। ভর-সন্ধ্যেবেলা ঘাটে যাবার তোর কি দরকার ছিল বাপু, আগে সড় না থাকলে কি এ রকমটা হয়?" "মেজকর্ত্তি আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথাটি একেবারে খেয়েছেন, বামুনের ঘরের বৌ পর্যন্ত মানে না।" "চুপ চুপ, মেজকর্ত্তির কানে গেলে সর্বনাশ হবে।"—প্রভৃতি নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে।

মধ্যম তরফে রান্নাঘরে আজ হাঁড়ি চড়ে নাই। কর্ত্রীর একাদশী, তাঁহার দুই বধূরও—একাদশী। কনিষ্ঠা বধূ নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী, তাঁহাকেও কেহ জলস্পর্শ করাইতে পারে নাই। ছেলেমেয়েগুলিকেও অন্য তরফের গিন্নীরা ডাকিয়া লইয়া খাওয়াইয়া দিয়াছেন। কর্ত্রী শয্যাগতা, বিছানায় শুইয়াই মাঝে মাঝে বড়বধূকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বড়বৌমা, ওকে কিছু মুখে দিতে বল, এমন ক'রে আর অকল্যাণ করে না যেন।"

ছোট জাকে অনুরোধ করিবার দুঃসাহস বড় জার নাই, তথাপি শাশুড়ীর আদেশে মাঝে মাঝে অনুরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ছোট জায়ের মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া অনুরোধ করিতে সাহসে কুলাইতেছে না। একবার মৃদুস্বরে কিছু মুখে দিবার কথা তুলিতেই ছোট জা উগ্রচণ্ডী মূর্তিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জল খেতে বলতে এসেছ, জান না, আজ একাদশী! একাদশীর দিন রাঁড়ীর জল খেতে আছে নাকি? তোমার দেওর যে মরেছে, আমি যে বিধবা হয়েছি; তা জান না নাকি! জেনে-শুনে ন্যাকা সেজে জল খেতে বলতে এসেছ কোন্ মুখে?"

বড় জা মহামায়া শান্ত-প্রভৃতি ও বড়ই ভীরু-স্বভাবা। ছোট জায়ের মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়া বলিল, "কনক, লক্ষ্মী দিদি, চুপ কর, ও কথা কি বলতে আছে? ও-ঘরে মা আছেন, শুনতে পাবেন। এমন ক'রে স্বামীর অলক্ষণ করতে নেই। একটু যা হোক মুখে দাও।"

কনক কাঁদিয়া ফেলিল, "আমার আবার লক্ষণ-অলক্ষণের কথা বলছ দিদি!" আবার তখনই চোখের জল মুছিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "মা ও ঘরে আছেন, মা শুনতে পাবেন! ওরে আমার মা! ও কি মা নাকি, ও তো ডাইনী! আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথা ওই তো চিবিয়ে খেয়েছে। ডাইনীর আবার কিসের পুত্রশোক! অমন ছেলের আবার বাঁচা-মরা, কল্যাণ-অকল্যাণ! মরাই তো ওর কল্যাণ।"

বলিতে বলিতে কনক আবার কাঁদিল, "তুমি কি বুঝবে দিদি! দেবতার মত স্বামী পেয়েছিলে, আমার যে দুঃখ তুমি তার কি বুঝবে? যাও, সমুখ থেকে যাও, না হ'লে এখুনি অকথা কুকথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।"

এই কনক মেয়েটি বড়ই দুর্দান্ত প্রকৃতির। শাশুড়ীর অপর দুই বধু শাশুড়ীর ভয়ে সর্বদা তটস্থ। শাশুড়ীই কিন্তু ছোট বধুকে ভয় করিয়া চলেন। ছোট বৌ রাগের মাথায় যাহা মুখে আসে শাশুড়ীকে তাহাই বলে। শাশুড়ী সে কথা বড় একটা গায়ে মাখেন না, বলেন—আমার নরুর বৌ যদি আমার মুখে তিনটে লাথি মারে, তোমাদের পায়ে তেল দেওয়ার চেয়ে সেও আমার ভাল। নরুকে আমার সে যে বাঁচিয়ে রেখেছে—এই গুণেই তার কেনা হয়ে আছি। তোমাদের তো তিন বছর, কারুর চার বছরও পেরুল না, হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর ঘুচিয়ে ব'সে থাকলে। লোকে বলত 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' তোমার দুই বৌ। আরে আমার রূপ আর গুণ! রূপ-গুণ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? তোমাদের মুখ দেখলে অঙ্গ জ্ব'লে যায়। মনে হয়, হয় তোমরা মর—নয় আমি মরি, সাত-কাল ব'সে এক বোগনোয় বৌয়ের সঙ্গে পিণ্ডি গেলা আমার ঘুচে যায়।"

বিধবা বধূদের কর্ত্রী যে একেবারে ভালবাসেন না তাহা নয়; কিন্তু তাহারা বিধবা হইয়াছে, তাহাদের এই দারুণ অপরাধ কিছুতেই তিনি মার্জনা করিতে পারেন না। থাকিয়া থাকিয়া বলেন, "তারা কি আমার যাবার ছেলে ছিল? কি চেহারা, কি বুকের ছাতি! সেই ছেলে আমার যেন কর্পূরের মত উবে গেল।" বধূরা রাত্রে জল খাইবে সেজন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখেন, গুড়ের নাগরি ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখেন, একটু দুধও ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া রাখেন; কিন্তু খাওয়ার সময় তাহাদের সীমানায়ও আসেন না। তাঁহাকে কখনও বড় দুই বধূকে মিষ্ট কথা বলিতে কেহ শোনে নাই, অথচ তাহারা কাছে না থাকিলে তাঁহার এক দণ্ডও চলে না।

তাঁহার বড় ছেলে প্রমথনাথ ও মেজ ছেলে জগদীশনাথ দুইজনেই কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই দুই ভাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল এবং দুই ভাই-ই বি. এ. পাস করিবার অল্পদিন পরে মারা যান। সেই জন্য কর্ত্রী নরেন্দ্রনাথকে পড়াশুনা করিতে দেন নাই। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময়ই তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি বিবাহ দেন যে, তাঁহার ভাগ্যে ছেলের বাঁচার আশা নাই, বৌয়ের ভাগ্যে যদি ছেলে বাঁচে। ইহাতেই বুঝা যায়—"আমার ভাগ্যে তো যায় নি বিয়ে দিয়েই আমার লোহার ভীম গ'লে গেল" বলিয়া যদিও তিনি বধূদের ভাগ্যেরই দোষ দিতেন, কিন্তু মনে মনে নিজের ভাগ্যেও তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। আগের দুইটি বউ সুন্দরী ও লেখাপড়া-জানা মেয়ে। এবার তিনি বলিয়াছিলেন, "সুন্দরে আর আমার রুচি নেই, কপাল সুন্দর হ'লেই হ'ল।" বোধ হয় সেই কারণেই ছোট বউ সুন্দর নয়, লেখাপড়া সে মোটেই জানে না, তবে কপাল সুন্দর বটে, কেন না নরেন্দ্রনাথ বাঁচিয়া আছেন।

ছোট বৌয়ের যখন বিবাহ হয় তখন তাহার দশ বৎসর বয়স; এখন তাহার বয়স আঠারো। এই আট বৎসরের বিবাহিত জীবনে সে বাপের বাড়ী দুই-একবারের বেশী যায় নাই। বাপের অবস্থা ভাল নয়, আর কর্ত্রী বৌ বাপের বাড়ী পাঠানো পছন্দ করেন না। কনকের তিনটি সন্তান হইয়াছিল—একটি আঁতুড়ঘরেই মারা গিয়াছে—এখন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—দুইটাই রুগ্ন। বড় ছেলে শম্ভু

চার বছরের; মেয়েটি দুই বছরের এবং আবার একটি শিশুর আসিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। শম্ভুর সর্বাঙ্গে ঘা, সে ঘা কোনও ঔষধেই সারিতে চায় না। আবার তাহার চোখে কি দোষ হইয়াছে! কিছুদিন হইতে চোখের যন্ত্রণায় ছেলে অস্থির হইতেছে। গ্রামে ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্য রোগের চিকিৎসা তেমন সুবিধামত হয় না। ডাক্তার বলে, "ছেলের রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে, ভাল চোখের ডাক্তারের কাছে যন্ত্র দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে হবে—আন্দাজী চিকিৎসায় এসব রোগ সারে না।" কর্ত্রী এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না, বলেন, "ঐ সব ব'লে কাটান্ দিচ্ছে।" আবার একটু একটু বিশ্বাসও করেন, বলেন, "তা বলেছে মিথ্যে নয়, শহরে গিয়ে না দেখালে ছেলে ভাল হবে না। ও পাস-করা ডাক্তার হ'লে কি হবে? পেটে বিদ্যে থাকলে কি আর সত্তর টাকা মাইনেয় গ্রামে এসে প'ড়ে থাকে? ওকে দিয়ে হবে না, ছেলেকে কলকাতায় পাঠাতেই হবে।" কিন্তু এ পর্যন্ত কলিকাতায় পাঠানো হইয়া উঠে নাই। মেয়েটি মেয়ে-সন্তান—তার অসুখের জন্য তত কিছু আলোচনা হয় না। টোটকা ঔষধ যে যা বলে তাই দেওয়া হয়। দুইদিন ভাল থাকে, আবার অসুখে পড়ে—এইভাবে দিন কাটিয়া যায়। ছোট বৌয়ের মেজাজ খারাপের ইহাও একটি কারণ।

একাদশী দ্বাদশী কাটিল। নরেন্দ্রনাথের শুভসংবাদের জন্য ঠাকুর-বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন হইতেছিল। সেই স্বস্ত্যয়নের গুণেই হউক অথবা ছোট বৌয়ের ভাগ্যের গুণেই হোক—ত্রয়োদশীর দিন শুভসংবাদই পাওয়া গেল। জানা গেল, নরেন্দ্রনাথ দুবরাজপুরের কাছারি-বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছে ও সেইখানেই আছে। বিজয়া-দশমীর দিন হঠাৎ কাহাকেও না বলিয়া বাড়ী ছাড়িয়া দশ ক্রোশ দূরে কাছারি-বাড়ীতে যাওয়ার কারণ কি—এই প্রশ্নের অবশ্য কোন মীমাংসা হইল না, প্রকাশ্যে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাও হইল না, তবে ফুসফাস করিয়া অনেকেই অনেক রকম জল্পনা করিতে লাগিল। পল্লীগ্রামে অনেক দুঃখের মধ্যে লোকের এই একটি সুখ আছে যে, মাঝে মাঝে এইরূপ সরস আন্দোলনের বিষয় জুটিয়া যায়, তখন স্নানাহার ভুলিয়া লোকে তাই লইয়া মাতিয়া থাকে।

নরেন্দ্রনাথের মা বলিলেন, "ছেলে বাড়ী থাকবে কি? দিনরাত খিচখিচ, দিনরাত বাক্যযন্ত্রণা! পুরুষ মানুষ, এত কি সহ্য করতে পারে? বিজয়া-দশমীর সকালেই তুচ্ছ কথা নিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করলে, মনের খেদে তাই কাউকে না ব'লে দুবরাজপুর চ'লে গিয়েছে; না হ'লে অমন দিনে কি বাড়ী থেকে দূরে যায়? আবাগীর বেটী, সোয়ামীর সঙ্গে যে অমন করিস, সে যদি রাগ ক'রে আর একটা বিয়ে ক'রেই বসে, তা হ'লে তোর দশাটা কি হয়? নিজের ভাল যে বোঝে না, তাকে আর বোঝাবে কে?"

কিন্তু এ সমস্ত কথা তিনি চুপি চুপি বলিলেন, পাছে ছোট বৌয়ের কানে যায়।

মেজ তরফের কর্ত্রী ছেলের সংবাদ পাইয়া ঠাকুর-বাড়ী পূজা পাঠাইলেন, এদিকে বড়বাবুর কয়েক দিন খাওয়া ও ঘুম নাই। নরেন্দ্রনাথের খবর পাওয়া গেল; কিন্তু নিবারণ চক্রবর্তীর স্ত্রী সুষমা কোথায়? তাহার তো কোনও খবরই

নাই। বড়বাবু নিজে ঘুরিতেছেন এবং নানা স্থানে লোক পাঠাইতেছেন, কিন্তু খুব সতর্কভাবে,—যাহাতে খবরটা থানায় গিয়া না পৌঁছায়। বড়বাবুর বিশ্বাস, খবরটা দারোগার কানে গেলে নিরুদ্দিষ্টার সন্ধান হোক বা না হোক, উৎপাতের আর সীমা থাকিবে না।

দুবরাজপুরের কাছারি-বাড়ীতে সুষমা আছে কি না তাহার খোঁজ লইবার জন্য বড়বাবু চেষ্টা করিয়াও সঠিক সংবাদ পান নাই। কাছারি-বাড়ীর ভিতর অন্য লোক ঢুকিবার উপায় ছিল না, কেননা রঘু ও হারা নামে দুইজন মালো পাইক কাছারি-বাড়ীর দুয়ারে দিনরাত পাহারা দিত। নরেন্দ্রনাথ যে দিন নিরুদ্দেশ হয়, এই দুইজনও সেই দিন বৈকালে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং এখন বুঝা যাইতেছে ইহারা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়াছিল। সমস্ত মিলিয়া ঘটনাটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সুষমাকে যে দুবরাজপুরের কাছারি-বাড়ীতেই লুকাইয়া রাখা হইয়াছে—বড়বাবুর মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে নিবারণ সংবাদ পাইয়া মহাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বড়বাবুর নিকট নিবারণ আছড়াইয়া পড়িল, "হুজুর, আমার এ কি সর্বনাশ হ'ল! আপনার ভরসায় আমি বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলাম, আপনি উপায় করুন হুজুর, না হ'লে আমি এখানে আত্মহত্যে হয়ে মরব।"

ভগ্নকণ্ঠে বড়বাবু বলিলেন, "উপায় আর কি হবে নিবারণ? উপায়ের আছে কি? এখন তাকে ফিরে পেলেই বা কি হবে?"

নিবারণের চোখ কপালে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে অতি বিস্মিত ভাবে সে বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি কি বলছেন হুজুর! ডাকাত একটা লোককে লুঠ ক'রে নিয়ে গেল, তার কোন উপায় নেই? এ কি মগের মুলুক? নিরীহ অবলা, কত কষ্টই না সে পাচ্ছে, কি ভাবে তার দিনরাত্রি কাটছে—ভগবান জানেন। আর আমি, আমি তার স্বামী, তার জন্য কোন চেষ্টা করব না, এই আপনি বলতে চান? চললাম আমি থানায়, দেখি, কোন উপায় হয় কি না?" বলিয়া নিবারণ ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বড়বাবু তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "নিবারণ, পাগল হয়ে ছুটাছুটি করলেই কি উপায় হবে? ব'স আমার কাছে, সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝে দেখ, তারপর যা করতে চাও কর।"

মনিবের উপর সম্মান নিবারণের মজ্জাগত, তাই নিবারণ বড়বাবুর কথা এড়াইতে না পারিয়া বসিল। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল সে কোন-মতেই স্থির হইতে পারিতেছে না, স্থিরভাবে কোন কথা শোনা বা বুঝা এখন তাহার সম্ভব নয়।

"কেন আমাকে সেই দিনই খবর দিলেন না হুজুর, এত দেরি কেন করলেন? ওঃ! এতদিন কি আর সে বেঁচে আছে? সে যে তার বিধবা মার একমাত্র সন্তান। গরীব বিধবা, মেয়ে ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। তার মা যে আমার হাতে তাকে তুলে দিয়েছিল। ধর্মের নামে আমি তার ভার নিয়েছি হুজুর,

আগুন সাক্ষী ক'রে, নারায়ণ সাক্ষী ক'রে। সে ধর্ম আমি খুব রাখলাম! ওঃ। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এত ভীতু সে, এত ভালমানুষ! তার ওপরেই এই জুলুম! রাতে উঠানে সে একা নামতে পারে না, এ-বাড়ী ও-বাড়ী সে একা কোনদিন যায় নি। পুকুরঘাটে সে কি একা গিয়েছিল?"

বড়বাবু বলিলেন, "আমি খবর নিয়ে জেনেছি—ঘাটে সে একা যায় নি, মালতী তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু বিসর্জনের বাজনা বাজছে শুনে ছেলেমানুষ তাড়াতাড়ি ছুটে দেখতে যায়, অন্যদিন ঘাটে কেউ না কেউ থাকে, সে দিন ঘাটে আর কেউ ছিল না—সবাই প্রতিমা-বরণের পর অন্দরের উঠানে জড় হয়েছিল। মালতী বললে—সে তখনি ফিরে এসেছে, ফিরে এসে দেখলে কলসী গড়াগড়ি যাচ্ছে, কিন্তু তোমার বৌ নেই।"

নিবারণ বলিয়া উঠিল, "কলসী গড়াগড়ি যাচ্ছে, তবেই বুঝুন ব্যাপার কি! ও-পারের বাঁশঝাড়ের কাছে মালোপাড়া আর ডোমপাড়া। সেখানে ছোটবাবু প্রায়ই যান, সেখানে সন্ধান নিয়েছেন কি?"

বড়বাবু ম্লান হাসি হাসিলেন, "সন্ধান কি আর বাকী আছে নিবারণ!"

"সন্ধান পেয়েছেন তবে? কোথায় আছে সে? কোথায় তাকে আটকে রেখেছে?" রুদ্ধ-শ্বাসে নিবারণ জিজ্ঞাসা করিল, যেন সংবাদ জানিলে সে এখনই ছুটিয়া সেখানে যাইবে।

বড়বাবু বলিলেন, "তাকে আটক ক'রে রেখেছে, কি সে নিজের ইচ্ছায় চ'লে গিয়েছে—তুমি তা জানলে কি ক'রে? আর প্রমাণই বা করবে কি ক'রে যে, সে নিজের ইচ্ছায় যায় নি? সে এখন অন্যের হাতের মধ্যে আছে, তারা তাকে যা বলাবে—সে তাই বলতে বাধ্য হবে।"

"না না, সে তা বলবে না, বলবে না।" নিবারণ অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়া বলিল, "তাকে কেটে ফেললেও সে অন্যের ভয়ে এমন কথা স্বীকার করবে না। সে নিজে গিয়েছে, কি তাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে—আমি তা জানলাম কি ক'রে, তাই আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? আমি জানি না তো তাকে কে জানে? এগারো বছরের মেয়ে আমি ঘরে এনেছি আজ পাঁচ বছর হ'ল, এই পাঁচ বছর সে আমার কাছেই আছে, একদিনের জন্য বাপের বাড়ী যায় নি,—যেতে চায়ও নি। তার মা-ই মাঝে মাঝে এসে মেয়েকে দেখে গিয়েছেন। তার স্বভাব কি আমি জানি না? একবার তাকে আমার কাছে এনে দিন—আর আমি কিছু চাই না।"

বড়বাবু বলিলেন, "এনে যদি দিতে পারি তুমি তাকে ঘরে নিতে পারবে?" নিবারণ উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিতে যাইতেছে দেখিয়া, তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, "আমাকে কথা বলতে দাও নিবারণ। পাগল হ'য়ো না, পাগল হয়ে কিছু লাভ নেই। তুমি আমার ভরসাতেই তোমার স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলে, তুমি যেতে চাও নি, আমিই তোমাকে ব'লে ক'য়ে পাঠিয়েছি—এ কথা একেবারে সত্য। আমি জানি, তুমি আমার উপর কতটা বিশ্বাস কর। একা বাড়ীতে স্ত্রীকে রেখে মহালে গিয়েছিলে, কিন্তু সে বিশ্বাস আমি রাখতে পারি নি। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে স্বপ্নেও আমি তা

ভাবি নি। এ বাড়ীতেই এনে তাকে রাখতাম, কিন্তু রাখি নি এই জন্য—পাঁচ শরিকের বাড়ী, পাঁচজনের আনাগোনা আছে, বৌ মানুষ, তার নিজের বাড়ীতে থাকা অভ্যাস, পরের বাড়ী অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু এমন ভাবে এ ঘটনা ঘটল যে, বাড়ীতে থাকলেও তা নিবারণ হয়তো হ'ত না। তবুও আমার মনে কেবলই এই আক্ষেপ হচ্ছে যে, এ বাড়ীতে এনে কেন তাকে রাখি নি! যা হয়েছে, যা হয়ে গিয়েছে—তার আর কোন উপায় নেই। তাকে ফিরিয়ে আনলেও আর তুমি তাকে ঘরে নিতে পারবে না, তুমি নিতে চাইলেও সমাজ তোমাকে তা করতে দেবে না। তবে যে তাকে নিয়ে গিয়েছে, মামলা ক'রে তাকে শাস্তি দিতে পার হয়তো। কিন্তু প্রমাণ করবে কি ক'রে? নরেন যদি এ কাজ ক'রে থাকে, তার সঙ্গে তুমি যুঝতে পারবে না। মেজ খুড়িকে তো জান, সর্বস্ব দিয়েও তিনি ছেলেকে বাঁচাবেন। বাপের বাড়ীর সম্পত্তি পেয়েছেন,—তাঁর নিজের হাতেও কম টাকা নেই। থানা বল, পুলিস বল, টাকার বশ সবাই। থানায় এজাহার দিতে যাবে, মিথ্যে এজাহারের দায়ে হয়তো তোমাকেই জেলে যেতে হবে। এইসব অনেক ভেবে, আমি থানা-পুলিস ঘাঁটাই নি। না হ'লে আমি চুপ ক'রে থাকতাম না।"

নিবারণ এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বড়বাবুর কথা শুনিতেছিল। এখন বলিল, "আপনি বললেন তার সন্ধান পেয়েছেন—কোথায় আছে সে? সেই খবরটি দয়া ক'রে আমাকে বলুন, আপনার কাছে আর কিছু আমি চাই না। আপনি বলছেন—আমি গরীব, লড়তে আমার ক্ষমতা হবে না। কিন্তু হুজুর, আমি গরীব বটে, আমার মনিব তো গরীব নন, যাঁর ভরসায় আমি পরিবারকে রেখে গিয়েছিলাম, তাঁর যে ক্ষমতা নেই—এ কথা আমি মানি কি ক'রে? আমি কাউকে শাস্তি দিতে চাই না হুজুর। আমি কেবল তাকে ফিরিয়ে আনতে চাই। ডাকাতের হাতে প'ড়ে তার কি শাস্তি হচ্ছে—ভাবলে আমার জ্ঞান থাকছে না। আপনি বলছেন 'সমাজ নিতে দেবে না'—যে-সমাজ দোষীর শাস্তি দিতে পারে না, কেবল নির্দোষের উপর জুলুম করতে পারে, তেমন সমাজের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সমাজ নিতে দেবে কি-না, সে কথা পরের কথা, এখন কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে সেই সন্ধান আমাকে ব'লে দিন।"

শেষ পর্যন্ত পুলিসেরই সাহায্য লইতে হইল। জোর করিয়া পরের কাছারি-বাড়ীতে ঢুকিয়া তল্লাশ করা—এখনকার দিনে আইনে বরদাস্ত করিবে না, সে লাঠিবাজির যুগ এখন আর নাই। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বড়বাবুকে পুলিসে খবর দিতে হইল।

পুলিস আসিল, তদন্ত করিল ও জবানবন্দী প্রভৃতি লইল, কিন্তু বড়বাবু যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহাই হইল। দুবরাজপুর কাছারি-বাড়ীতে সুষমাকে পাওয়া গেল না। আরও দুই-এক গ্রামে অনুসন্ধান করা হইল—কোথায়ও সুষমাকে পাওয়া গেল না। লাভের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মানহানির মোকদ্দমা আনিবে বলিয়া শাসাইতে লাগিল এবং মধ্যম তরফের কর্ত্রী বড়-

বাবুকে শাপ-শাপান্ত করিতে লাগিল ও এবাড়ী-ওবাড়ী যাইবার দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ দুবরাজপুরের কাছারি-বাড়ী ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়া রহিল। বাড়ী আসিয়া রহিল বটে, কিন্তু ভিতর-বাড়ীতে পদার্পণ করিল না। বাহিরেই থাকিত। নরেন্দ্রনাথের জননী এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাড়ীর ভিতরে বধূও বিদ্রোহী হইয়া রহিয়াছে। এমন অবস্থায় দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে আবার নূতন হাঙ্গামা বাধিতে পারে, তাহার ফলে—ছেলে হয়তো আবার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বধূকে জোর করিয়া বলিতে বা উপদেশ দিতে তাঁহার সাহস নাই, তাই তিনি মালা হাতে বারান্দায় বসিয়া নানারূপ আক্ষেপ ও পরিতাপ এবং সেকালে পত্নীরা কিরূপ পতিব্রতা ছিলেন সেই সকল কাহিনী বর্ণনা করিতেন। তাঁহার একটু একটু আশা হইত, এই সমস্ত শুনিয়া ছোট বৌয়ের সুবুদ্ধির উদয় হইতেও পারে।

নিয়ম-সেবা আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিদিন প্রত্যূষে রাধারমণের মঙ্গলারতি হইতেছে। মঙ্গল-আরতির সময় জমিদার-বাড়ীর মেয়েরা সকলেই প্রায় আরতি দেখিতে যাইতেন, বিশেষতঃ যে সকল বিধবা নিয়মসেবা করিতেছেন তাঁহারা তো যাইবেনই। নরেন্দ্রনাথের জননী অন্য অন্য বারে যতই কেন শরীর অসুস্থ থাকুক না নিয়মসেবার সময় মঙ্গল-আরতি সন্ধ্যা-আরতি দর্শন করিতে প্রতিদিনই মন্দিরে যাইতেন, কিন্তু এবার সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। পাছে কেহ সেখানে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, পাছে ছেলের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা শুনিতে পান—এই ভয়ে তিনি মন্দিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। অন্যবারে নিয়মসেবার সময় কর্ত্রী প্রতিদিন লক্ষ নামজপ করিতেন ও রাধারমণ ও রাধারাণীর ফুলের মালা গাঁথিয়া মন্দিরে পাঠাইতেন, এবার তাঁহার নামজপও সম্পূর্ণ হয় না, মালা-গাঁথাও হয় না, অন্যমনে মালা হাতে করিয়া বসিয়া থাকেন। কখনও বিলাপ করেন, কখনও বা অপর দুই বধূকে সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে তিরস্কার করেন। যেদিন কর্ত্রী শুনিলেন—নিবারণ চক্রবর্তীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, খায় না, ঘুমায় না, 'ধন্দ' হইয়া কেবল ঘরের ভিতর বসিয়া থাকে, সেদিন হইতে কর্ত্রীরও মাথা-খারাপ হইবার উপক্রম হইল। ইহার ভিতর আবার নরেন্দ্রনাথের ছেলেটির অসুখ খুব বাড়িয়া গেল, কিছুদিন হইতে সে চোখে একেবারেই দেখিতে পাইতেছে না, চোখ ফুলিয়া গিয়াছে ও চোখে অতিশয় যন্ত্রণা। ডাক্তার তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য বার বার তাগিদ দিতেছেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তাহাতে কোন গ্রাহ্যই নাই। কর্ত্রী রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনিদ্র হইয়া এপাশ ওপাশ করেন, পীড়িত নাতির কাতরানি শুনিতে পান, আর মনে মনে ভাবেন, 'নিবারণের শাপেই কি শম্ভুর এমন হ'ল?'

এই ঘটনার পর প্রায় নয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। সুষমার ইহার মধ্যে কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায় নাই। নিবারণ চক্রবর্তী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, বাঁচিবার আশা ছিল না, এখন সে একটু ভাল, তবে বেশী উঠা-হাঁটা করিতে পারে না। বড়বাবু চক্রবর্তীর অসুখের সংবাদ দিয়া গঙ্গানন্দপুর হইতে তাহার শাশুড়ীকে

আনাইয়াছেন, নিজেও সব সময় তাহার দেখা-শুনা করিয়াছেন, তাহার চিকিৎসার যত কিছু খরচ বড়বাবুই করিয়াছেন।

আষাঢ় মাসের প্রথম। প্রথম আষাঢ়ে এবার প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। ধানের ক্ষেত্র কোথায়ও বা অঙ্কুরিত, কোথায়ও বা বীজ বুনা হইতেছে। কোথায়ও বা উচ্চ-জমিতে চাষীরা এখনও লাঙ্গল দিতেছে। এবার ফসল ভাল হইবে এই আশায় সকলেই আনন্দিত। কিন্তু জমিদার-বাড়ীতে যেন একটা নিরানন্দ ভাব। বড় তরফে ও মেজ তরফে বিবাদ এখনও সমান ভাবেই আছে, তবে বড়বাবু খুড়িমার অসুখের কথা শুনিয়া বিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। কর্ত্রীর কিছুদিন হইতে ক্রমশ আহার কমিয়া গিয়াছিল, উদরাময় ও অল্প অল্প জ্বর চলিতেছিল, সম্প্রতি পা ও মুখ ফুলিয়াছে, তাঁহার আর বিছানা হইতে উঠিবার ক্ষমতা নাই। বড়বাবু শুনিতে পাইলেন, জননীর এত অসুখেও নরেন্দ্রনাথ তাঁহার খোঁজখবর লন না, জননী ডাকিয়া পাঠাইলেও তাঁহাকে দেখিতে যান না—কি বাড়ীর ভিতর পদার্পণ করেন না। লোকমুখে এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়া একজন কবিরাজ সঙ্গে লইয়া বড়বাবু খুড়িমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

গিয়া দেখিলেন, রোগিণীর অবস্থা সংকটাপন্ন, এ যাত্রা যে তিনি বাঁচিবেন তাহা মনে হয় না। কর্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া বালিশে মুখ লুকাইলেন, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া শীর্ণ-হস্তে ভাসুর-পুত্রের হাত দুই-খানি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেখতে এসেছ বাবা! অবনী, খুড়ি ব'লে মায়া আছে আজও তোমার? অনেক শাপ-গাল দিয়েছি বাবা, কিছু মনে ক'রো না, গুরুজনের শাপ আশীর্বাদ হয়।"

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মা আবার ছেলেকে কবে না গাল দেয়? কাহিল শরীর, ও নিয়ে মন-খারাপ করবেন না। এবার আপনাকে কবিরাজ মশায়ের ব্যবস্থা-মত কিন্তু চলতে হবে, অত্যাচার ক'রে ক'রে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছেন দেখছি। এমন হ'লে ভগবানের নাম করবেন কি ক'রে?"

কর্ত্রী হাসিলেন—অতি দুঃখের হাসি। বলিলেন, "আর আমার ভগবানের নাম! ছেলে ছেলে ক'রে সব খোয়ালাম, সেই ছেলে আজ মায়ের মরণকালে একবার ঘরে আসে না। তবু মন মানে না, ডেকে পাঠাই—তাও আসে না। বাবা, তোমার হাতে ধ'রে বলছি, সে তোমারই ছোট ভাই, বড় হতভাগা, তাকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম, তুমি একটু দেখো তাকে, একটু চেষ্টা ক'রো যদি তার স্বভাব শোধরায়। কতদিন মনে করেছি একবার তোমাকে ডেকে পাঠাবো, কিন্তু পারি নি। কোন্ মুখে আমি আর তোমাকে ডাকব! ভগবানকে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছি, অবনী যেন আমার শেষ সময়ে একবার আসে।"

বড়বাবু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কেন ওসব কথা ভাবছেন খুড়িমা, আপনি ভাল হয়ে উঠবেন। অসুখের সময় ওসব ভেবে মন উতলা করবেন না।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আর আমার ভাল হওয়ার সাধ নেই বাবা। দুধের ছেলে শম্ভু, সে পায় না চোখে দেখতে, এও আমাকে দেখতে হ'ল। বেঁচে থাকলে আরও কত দেখতে হবে। ছোট বৌয়ের কোলের দু মাসের ছেলেটারও সর্বাঙ্গে ঘা, আবার

তারও নাকি চোখ লাল হচ্ছে শুনছি। কি হবে বাবা, এর চোখ দুটি রক্ষে হবে কি ক'রে তাই আমাকে বল। নরু আমাকে নাই দেখুক, ছেলেটার যাতে চিকিৎসা করায় তাই কর বাবা।"

বড়বাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরমশত্রু বলিয়া মনে করে—সে কখনই তাঁহার কথা শুনিবে না, ইহা তিনি জানিতেন। অথচ অসহায় শিশু, বিনা চিকিৎসায় অন্ধ হইবে! কিন্তু তিনি নিরুপায়।

বাহিরে ছোট বৌয়ের গলার উচ্চ চীৎকার শোনা গেল। বড়বাবু চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বড়কর্ত্রী বলিলেন, "কি, হ'ল কি? চেঁচায় কেন? ভাসুর ঘরে আছে তাও মানে না! কি ডাকাতে বৌই ঘরে এনেছিলাম!"

ছোট বৌ আর কাহাকেও মানুক বা নাই মানুক, ভাসুরকে মান্য করিয়া চলিত, মনে মনে শ্রদ্ধাও করিত। আজ সে যে ভাসুর ঘরে আছেন গ্রাহ্য না করিয়া এমনভাবে চীৎকার করিতেছে, ব্যাপার কি?

ব্যাপার জানিতে বড় বেশী দেরী হইল না। সুষমা নাকি গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, নাপিত-বৌয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া কনক হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া ভাসুর ঘরে থাকা সত্ত্বেও চীৎকার করিয়াছে। সে চীৎকারের শব্দ বাহির-বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে,—"শয়তানী গাঁয়ে আসছে? গাঁয়ে ঢুকতে চায়, এত বড় তার বুকের পাটা? হারু বাগদী কোথায়, ডাক্ তাকে, লাঠিয়ে মাগীকে দূর ক'রে দিক গাঁয়ের সীমানা থেকে।"

এই যে আট-নয় মাস তাহার স্বামী তাহার নিকটে একবারও আসে নাই, এই যে তাহার ছেলের বিনা চিকিৎসায় চোখ নষ্ট হইয়া গেল, এই যে আর একটি ছেলে বিনা চিকিৎসায় যাইতে বসিয়াছে—ইহার জন্য কনকের সমস্ত রাগ গিয়া পড়িয়াছে সুষমার উপর। অথবা তাহার স্বামীর উপর যে রাগ তাহাই এই ভাবে সুষমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় বাহির হইতেছে।

মহামায়া আসিয়া কনকের মুখ চাপিয়া ধরিল, "চুপ কর্, চুপ কর্, কনক করিস্ কি, ও-ঘরে যে বঠ্ঠাকুর আছেন। আর সে বেচারাকে কেন গাল দিচ্ছিস? আহা, বিধবা মার বাছা, একরত্তি মেয়ে, তার কি দোষ! নিজে মেয়ে হয়েও তুই মেয়ের দুঃখ বুঝিস না?"

ভাসুর ঘরে আছেন শুনিয়া কনক প্রথমে একটু থামিয়াছিল, কিন্তু শেষের কথায় একেবারে জ্বলিয়া গেল।—"না, তার কোন দোষ নেই, একরত্তি মেয়ে, তুলোয় ক'রে দুধ খান! কালামুখ দেখাতে আবার গাঁয়ে আসছে, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারে নি!"

সুষমা আসিয়াছে শুনিয়াই অবনীনাথ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথে এক চাষীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, নিবারণের বৌ ফিরে এসেছে?"

সে বলিল, "আজ্ঞে, আমিও শুনেছি। গাঁয়ে আসে নি, দীঘির পাড়ে গাছতলায় নাকি প'ড়ে আছে, ভোরবেলায় ক্যাবলা রাখাল গরু খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল।

বৌটা নাকি তাকেই কেঁদে-কেটে নিবারণ ঠাকুরকে খবর দিতে বলেছিল, সেই খবর পেয়ে নিবারণ ঠাকুর ছুটে গিয়েছে, তানার শাশুড়ীও সঙ্গে গিয়েছে।"

বড়বাবু বলিলেন, "নিবারণ দীঘির পাড়ে হেঁটে গিয়েছে? সে যে এখান থেকে দু ক্রোশ হবে।" এই বলিয়া আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, হারু বাগ্দী লাঠি ঘাড়ে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, বড়বাবু তাহাকে ডাকিলেন। কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাঠি ঘাড়ে ছুটেছিস কোথায়, ডাকাত তাড়াতে যাচ্ছিস নাকি?"

অপ্রস্তুত হইয়া হারু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে, বৌ-ঠাকুরুণ হুকুম দিয়েছেন—"

"হুকুমের কথা এখন থাক্। আয় আমার সঙ্গে। কোন্ দিকে পথ দেখিয়ে দিবি চল্।"

পথ খুব কম নয়, মাইল চারেক হইবে। গ্রাম ছাড়াইয়া পথ ধানের আলের মধ্য দিয়া গিয়াছে, হারুর অনুসরণ করিয়া বড়বাবু সেই পথে চলিলেন। গরুর গাড়ী চলিবার অন্য রাস্তা আছে, কিন্তু সে পথে দূর হয়, তাই ধানের ক্ষেতের রাস্তা দিয়াই লোকে যাতায়াত করে।

দীঘির পাড়ের ধারেই একটা বড় বটগাছ। সেখানে অনেক লোক জমিয়াছে, দূর হইতেই দেখা গেল।

অবনীনাথ দ্রুতপদে নিকটবর্তী হইলেন। জনতার কাছে পোঁছিলে তাঁহাকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। জনতার ভিতর পোঁছিয়া দেখিলেন, নিবারণ গাছতলায় মাটিতে বসিয়া আছে—তাঁহার কোলে সুষমার মাথা রহিয়াছে। নিকটে একটি শিশু পড়িয়া আছে, শিশুটি এই মাত্র জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে। শিশুটি জীবিত, কিন্তু সুষমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, সে আর বাঁচিয়া নাই। সুষমার মা মাটিতে মাথা খুঁড়িতেছে ও বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। নিবারণ স্থিরভাবে বসিয়া আছে, তাহার চোখে এক ফোঁটা জল নাই।

বড়বাবুকে দেখিয়া নিবারণ বলিল, "হুজুর, এসেছেন? এই দেখুন, সতী-লক্ষ্মী আমার চ'লে গিয়েছে। এই এখনি একটু আগেও কথা বলছিল। দশ দিন জ্বরে শয্যাগত ছিল, তাই পাহারা ছিল না, সেই ফাঁকে পালিয়ে এসেছে, এখান অবধি এসে আর হাঁটতে পারে নি, গাছতলায় প'ড়ে ছিল। ক্যাবলা গিয়ে আমাকে খবর দিলে, খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। এসে দেখলাম, অজ্ঞান, কেবল একবার একবার 'জল' 'জল' করছে। মুখে জল দিতে জ্ঞান হ'ল। আমায় দেখে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললে—'নিয়ে চল, আমায় বাড়ী নিয়ে চল।' হুজুর, বাড়ী আর তাকে নিয়ে যেতে পারলাম না।"

—'দেশ', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৪২

ভূমিকম্প ও পৌষ পার্বণ

গল্প নয়—বাস্তব সংসার

"দিদি, আপনি এসেছেন শুনেছি, কিন্তু কাজের ভিড়ে গিয়ে দেখা করতে পারি নি। শুনে অবধি মনটা ছটফট করছিল, কতদিন দেখা হয় নি। সংসারের ঝঞ্ঝাটের কথা আর কি বলব, কর্তার অসুখ চলছেই, বাণীর কাছে বোধ হয় শুনেইছেন। আজ তিন দিন আবার হঠাৎ পেটের ব্যথা আর বমি। দু দিন তো জলস্পর্শও করেন নি, আজ জলবার্লি নেবু দিয়ে তাই একবার একটু মুখে দিয়েছেন। বৌমারা কে কে আছে? সে কথা আর কি বলব; বড় বৌমার তো আজ তিন বছর হ'ল অসুখ। এমন লক্ষ্মী বৌ কি আর হয়! কি সেবাই ওর করত! আমারও সেবা করবার জন্য অস্থির! কিন্তু আমি আবার কারও সেবা নিতে পারি নে, বলতাম—থাক্ মা, তোমার শ্বশুরের সেবা কর, তা হ'লেই আমার সেবা হবে। এখন তো আমার সেবার দরকার নেই, পরে যখন অথর্ব হব, খুব প্রাণভরে সেবা ক'রো। আহা, মা আমার যেন হাতে হাতে মুখে মুখে থাকত; কুটনো কুটতে বসব—আগে থাকতে দালান ঝাঁট দিয়ে বঁটি, কুটনোর ডালা, ছোট পিঁড়ি সব গুছিয়ে রেখেছে। যা করতে যাব তাতেই যোগাড় দিচ্ছে। আর সরস্বতী তো তার ছোট বোনের মত। এত গুণের বৌ, আমার কপালে সে বাঁচবে কেন? ওই রতন হয়ে অবধিই কি যে ঘুষ-ঘুষে জ্বর হ'ল, সে জ্বর আবার মানতে চাইত না। তারপর বাড়াবাড়ি হতে পণ্ডু ছুটি নিয়ে আবু-পাহাড়ে নিয়ে গেল। রতন আমার কাছেই রইল। পাহাড়ে গিয়ে একটু শরীর সেরেছিল, আবার বাড়াবাড়ি হ'ল, আর সেও আর বিদেশে থাকতে চাইলে না। তাই আবার তাকে সঙ্গে ক'রে উত্তরপাড়ায় নিয়ে গিয়েছে, আহা মা-বাপের ঐ এক মেয়ে।

"রতন? হ্যাঁ, রতন আমার কাছেই আছে। উনি পাঠাতে চাইলেন না, সেখানে বৌমার মাও তো ছেলেপিলে নিয়ে নেন্‌জারী, আবার বৌমা গেলে, তাকেও দেখা-শোনা করতে হবে,—কোন্ দিক সে দেখবে বল? যাবার সময় এখানে নেমে দুদিন থেকে গিয়েছিল। আহা, যেতে কি চায়! বলে,—আরও কিছুদিন থাকব। তা, সেখানে গিয়ে কলকাতার ডাক্তার দিয়ে দেখাবে ব'লে পণ্ডু আর এখানে রাখতে চাইলে না। আর পণ্ডুরও ছুটি ফুরুল, কলকাতায় গিয়ে কাজে 'জয়েন' করতে হবে, ওখানে মেসে থাকবে, আর উত্তরপাড়ায় যাতায়াত করবে।

"মেজ বৌমাও বাপের বাড়ী,—এই প্রথম খোকা হয়েছে। মাঘ মাসে মুখে দুটি ভাত দিতে হবে। বড় বৌমার অসুখের জন্য তো মনটা ভাল নেই, যেমন তেমন ক'রে দুটি ভাত মুখে দেব, ঘটাঘটি আর কিছু হবে না।

"মেয়ের আবার পরীক্ষা। তাই ও বই হাতে দিন-রাত ওর ঘরেই ব'সে আছে, এক হাতে বই আর এক হাতে পাখা। আমার তো আবার এদিক না দেখলে চলে

না। গেরোর কথা আর বলব কি, কি যে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হয়েছে, সুবোর জ্বর, মানির ছেলে এখানে রয়েছে—তার জ্বর, চাকরের জ্বর, দাইয়ের জ্বর, আবার বাবাজীরও জ্বর হয়েছে। আর বাবাজীর কথা বলব কি,—উনি সাগু খান না, বার্লি খান না, আবার গায়েও কাপড় দেবেন না। ঐ দেখুন খালি গায়ে বেরিয়ে এল। বাবাজি, ও কি হচ্ছে? যাও, শির্গাগর ঘরে যাও, গায়ে কম্বল চড়াও। আবার তেড়ে জ্বর এলে আমাকেই সেই তো ভুগে মরতে হবে—তোমার আর কি! বাণী, হাসছ কি, বাড়ীর লোকের জ্বর হ'লে তবু রেহাই আছে, চাকর-বাকরের জ্বর হ'লে আথান্তরের একশেষ। তোমার বাড়ীর সব ভাল তো? ছেলে-মেয়েরা ভাল আছে? দাই-চাকর জ্বর ক'রে বসে নি তো? নূতন বাবাজীটি কেমন কাজকর্ম করছে? বাঙালীর বাড়ী ছিল? ও! তবে অনেকটা রান্না জানে বোধ হয়? দিদি এসে খুব ফুর্তিতে আছেন, না? তা, দিদিকে শিগগির ছেড়ো না। দিদি কাশী চ'লে যাবেন? এই তো এলেন, এর মধ্যেই যাবেন কেন?

"ছোট বৌমা, চা হয়েছে? বাণীকে চা দিয়ে যাও, আর জাল্‌তির মধ্যে খাবার আছে, একটা ডিশে ক'রে নিয়ে এস। আমার জ্বালার কথা আর বল কেন, যেমন বাবাজী, তেমন চাকরটি! চাকর এতক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়োছলেন, যেই চা হয়েছে অমনি গুটিগুটি উঠে পেয়ালা হাতে হাজির! অপরাধই বা কি! জ্বরের তাড়নে সেই সকাল থেকে অঘোরে প'ড়ে আছে। আমি মাথার কাছে এক ঘটি জল রেখে এসেছিলাম, তেষ্টা পায় তো খাবে। তা সে জল মুখে রোচে নি, এখন চা হয়েছে দেখে তবে উঠেছে। বল কেন আর ভাই, আমার হয়েছে হাড়ীর হাল, একা হাতে আর কত দিকে করব!

"হ্যাঁ, তা যা বলেছেন দিদি, কর্তাও ওই কথাই বলেন। কাজ দেখে কখনো ভয় পাই না। কাজ করতেই তো জন্ম নেওয়া, কাজই যদি না করলাম তবে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন? তা এইরকম ক'রেই যেন দিন কাটিয়ে যেতে পারি সেই আশীর্বাদ করুন।

"ছোট বৌমা, চা এনেছ? দিদিকে প্রণাম কর, বাণীকেও প্রণাম কর। হ্যাঁ, এইটি আমার ছোট বৌমা, আপনি একে দেখেন নি। বাণী, দরিখানার উপর উঠে ব'স ভাই, পশ্চিমের ধুলো, দুদিনেই কাপড় ময়লা হয়ে যায়। আমি তাই এই খুরসি পিঁড়িখানা সব সময় হাতের কাছে রাখি। কুটনো কুটতে বসি তাও বঁটির উপর পিঁড়িটা পেতে বসি। হ্যাঁ, কপি এবার খুব সস্তা হয়েছে। মটরশুঁটির সের কত ক'রে কিনেছ? চার আনা? আমি তো চোদ্দ পয়সাতেই পেয়েছি—হাটে নয়, বাড়ীতেই কিনেছি; আমার সেই তরকারি-ওয়ালীই তরকারি দিয়ে যায়। তোমার বাড়ীতেও তো সেই দেয়, তবে বেশী দাম নেয় কেন? হ্যাঁ, এই নূতন মটরশুঁটি উঠেছে কিনা তাই এত মাগগি, এর পর এক পয়সা দু পয়সা সের হবে।

"এই যে সরস্বতী এসেছ! কেমন পরীক্ষা দিলি? আয় এদিকে, তোর কাকিমা এসেছেন, মাসিমা এসেছেন, প্রণাম কর্। আমি দিদি মুখ্যু মানুষ, ওর পরীক্ষার কিছু বুঝি না; শুনছি তো দিচ্ছে একরকম, তবে কাল নাকি খুব শক্ত হয়েছিল। ডিভিশন-মিভিসন যাই হোক, কাগজের এক কোণে একটু নাম বেরুলেই হ'ল।

এইটুকু হোক যেন পাসটা হয়, আর-বছর ফেল হয়ে মেয়ের যা কান্না ! যা, ভোর কাকিমার জন্য দুটো পান সেজে নিয়ে আয়, একটু জর্দাও আনিস। কাপড় ছেড়ে পানের ডাবরে হাত দিস, গায়ের গরম জামাটা খুলিস নে যেন, গরম কাপড়ে দোষ হয় না। কি শীতই পড়েছে, এই তো মোটে বিকাল, এর মধ্যে শীতে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু এদিকে গায়ে গায়ে কোঠা, একটু বাতাস কম আছে। বাণীর বাড়ী একেবারে ফরদা, হু-হু ক'রে হাওয়া বইছে, রোদ শুদ্ধু যেন গায়ে লাগে না। দিদির খুব শীতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, পশ্চিমে শীত সহ্য করা তো অভ্যাস নেই। ভোরে যেন গঙ্গাস্নানে যাবেন না, একটু বেলা হ'লে রোদ উঠলে তারপর যাবেন। কি শীতই পড়েছিল ও-বছর ভূমিকম্পের সময়! ভূমিকম্পে আবার বাড়ী ভাঙে নি? কি বলছেন দিদি? এ তল্লাটে কারুর কি বাড়ী আস্ত ছিল নাকি? আমাদের বার-বাড়ী খুব ভেঙেছিল, ভিতর-বাড়ী তত নয়, তবু সমস্ত বাড়ীই নূতন ক'রে সারাতে হয়েছে। সে বিপদের কথা আর কি বলব! বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন রক্ষা করেছেন যে, কোন প্রাণহানি হয় নি।

"বাবা! ভূমিকম্পের দিনের কথা মনে হ'লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। সেদিন পয়লা মাঘ, প্রায় বাড়ী-বাড়ীই পোষ-পার্বণের পিঠে গড়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ভাল কথা বাণী, খেজুরে গুড় কিনতে ব'লে দিয়েছিলে, সেই ছেলেটি যে গুড় বেচতে আসে, তাকে তোমার বাড়ীর ঠিকানা ব'লে দিয়েছিলাম, গিয়েছিল তো? খেজুর গুড়টা বেশ ভালই, "নলেন নলেন" গন্ধ আছে। ছ আনা সের, তা দাম আর এমন কি বেশী? নারকোলও বাজারে খুব বিক্রী হচ্ছে। পিঠে গড়ছ তো? দিদি এসেছেন, এবার তো আর একা নও, দুজনে হাতে হাতে গ'ড়ে নেবে, সুবিধেই হবে। হ্যাঁ, ভূমিকম্পের দিনের কথা বলছিলাম। সেদিন পয়লা মাঘ, আগের দিন অল্পস্বল্প পিঠে গড়েছিলাম। আমার তো দিদি অল্পে হয় না, বাড়ীর ছেলেপিলে, লোকজন; বছরকার একটা আনন্দের দিন, সবাইকে তো পরিতোষ করতে হবে। বড় বড় জামবাটির দু জামবাটি পাটিসাপটার গোলা গুলে রেখেছি। বড় গামলার দু গামলা রস করা আছে। ক্ষীর, নারকোল-ছাঁই, সমস্ত রাত্রে ক'রে রেখেছি, খাওয়া-দাওয়া চুকলেই পিঠে গড়তে বসব। বাবাজীকে দিয়ে পাঁচ সের লাল আলু আর গোল আলু সিদ্ধ করিয়ে রেখেছি। মানি আর সুধা তখন এখানে ছিল, আর মেজ বৌমাও আছে, ওরা পুলি গ'ড়ে দেবে, আমি আর বাবাজী দুই উনুনে দুটো খোলা চড়িয়ে দেব, হাতে হাতে হয়ে যাবে। খেয়ে এসে, ভাই, পানটি মুখে দিয়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকেছি, তখনও খোলা চড়াই নি, হঠাৎ ঘরখানা যেন একটু ন'ড়ে উঠল। তারপর কি যে গুড়্ গুড়্ শব্দ, আর কি ঝাঁকুনি! 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' চারিধারে চীৎকার শব্দ! শাঁখ-ঘণ্টাও প্রথমে বেজেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেল। তখন বলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, তা শাঁখ-ঘণ্টা বাজাবে কে!

"সে যে কি কাণ্ড দিদি, ব'লে বুঝানো যায় না! গলির ওপারে হেমন্তবাবুদের তেতলা বাড়ী এমন দুলছে যেন হুমড়ি খেয়ে এ বাড়ীর উপর এসে পড়ল ব'লে। মানি, সুধা, মেজ বৌমা সবাই ছেলেদের নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে দোতলার দিকে ছুটেছে। আমি চেঁচাচ্ছি একবার 'সরস্বতী, সরস্বতী' ক'রে,

একবার ছেলেদের নাম ধ'রে। এমন সময় কর্তার কথা মনে হ'ল, তাঁর যে কোমরে বাত, লাঠি না হ'লে এক পা চলতে পারেন না, আবার রতন তাঁর কাছে আছে। 'হে মধুসূদন রক্ষা কর, মধুসূদন! মধুসূদন!' এই ব'লে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছি। কোথা দিয়ে যে বাইরের উঠানে গিয়ে পড়েছি তাও জ্ঞান নেই। ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছি, চারধারে ইট সুরকি, হুড়হুড় ক'রে কার্নিস খ'সে পড়ছে, বাইরের দিকে দোতলার চকমিলানো বারান্দার খানিক খানিক ভেঙে পড়েছে, চারিদিক ধুলোয় অন্ধকার।

"আমার মনে হচ্ছে, কেউ আর বেঁচে নেই, হাউ মাউ ক'রে চেঁচিয়ে কাঁদছি। ভূমিকম্প তখন থেমে গিয়েছে। ভুলু কোথা থেকে ছুটে এসে আমার হাত ধ'রে বাইরের দিকে বড়রাস্তায় নিয়ে গেল, সেখানে হাজারো লোক জড় হয়েছে। দেখি, কর্তা দাঁড়িয়ে আছেন নাতির হাত ধ'রে। ধুলোবালিতে সর্বাঙ্গ মাখানো, চুলের উপর সুরকি-বালি জমেছে। শুনলাম কর্তা নীচেই কাছারি-ঘরের দালানে ছিলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পেরে রতনকে আনবার জন্য উপরে যাচ্ছিলেন। যেমন সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, আর বারান্দার ছাত হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল। আর একটু হ'লেই চাপা পড়তেন, সিঁড়ির উপর উঠেছিলেন ব'লে বেঁচে গিয়েছেন।

"ওরা সব উপরেই ছিল। কেউ নামতে পারে নি, ভূমিকম্প থেমে গেলে সবাই নামল। আমি দেখলাম বাইরে সবাই এসে জড় হয়েছে। কর্তার সেই ধুলোবালি-মাখা চেহারা দেখে আমার তখন কি যে হ'ল দিদি, খালি কর্তার গায়ে হাত বুলোচ্ছি আর কাঁদছি, ছেলেরা যে কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে খেয়ালও নেই। খালি মনে হচ্ছে, যদি চাপা পড়তেন যদি একখানা ইট মাথায় এসে পড়ত? বাণী, ভাই, সে দিনের কথা তোমার তো খুব মনে আছে। সে কি দিন গিয়েছে বল দেখি! মনে হ'ল, কারু তো কোনদিন অনিষ্ট করি নি, অনিষ্ট করা থাক্‌—কারু যাতে অনিষ্ট হয় তেমন কথা কোনদিন মনেও ঠাঁই দিই নি। তবে আমার এমন অনিষ্ট কেন হবে যে, এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের বাড়ীতে উনি অপঘাতে মারা যাবেন? তাই এ জোর মনে ছিল যে, মধুসূদন রক্ষা করবেনই।

"ছেলেরা সব এ-বাড়ী ও-বাড়ী খবর নিতে ছুটল, ভুলু গেল হাসপাতালে, রোগীরা কি ভাবে আছে তার খবর নিতে। রাস্তায় কি ভিড়, কান্নাকাটনি, সে বলা যায় না। আমরা তখন বাড়ীর ভিতরে এলাম। এসে আগেই আমি রান্না-ঘরের দিকে গেলাম। আহা, এত আয়োজন, খাটুনিও কম হয় নি, খরচও কম হয় নি, কারুর ভোগে লাগল না! রান্নাঘরের দরজাটা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখি, ওমা কি আশ্চর্য, যেমন সব চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিটি আছে, মোটেই কিছু নষ্ট হয় নি। করগেটের টিনের ছাদ, তাই চুন-সুরকিও ভেঙে পড়ে নি।

"মানি আর বৌমা গেল ওপরের ঘরে, রাত্রে শোবার কি ব্যবস্থা হবে তাই ঠিক করতে। সুধা গেল হেমন্তবাবুদের বাড়ী। হেমন্তবাবুদের বাড়ী একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে, তবে একেবারে প'ড়ে যায় নি। আমাদের বাড়ীর বার-মহলের ঘর ভেঙেছে, ভিতর-মহলের ঘর বেশ ভালই ছিল। আর যে শীত, কোথায় আর

শুতে যাবে, নারায়ণের নাম ক'রে ঘরেই রাত কাটাও, বরং একজন ক'রে জেগে পাহারা দেওয়া যাবে। ওদের এই কথা ব'লে, ভাই, তসর কাপড় প'রে রান্নাঘরে নামলাম। বাবাজীকে ডাকলাম, এস তো বাবাজী, হাতে হাতে ততক্ষণে কতকটা ক'রে নিই।

"পিঠে শেষ করতে রাত বারোটা বাজল। একরকম ভালই হ'ল, জেগে পাহারা দেওয়াও হ'ল। ছেলেদের সন্ধ্যাবেলায় দুটি দুটি ঝোল ভাত খাইয়েছিলাম, এখন আবার জাগিয়ে তুলে দু-একখানা ক'রে পিঠে খাওয়ানো হ'ল; মুখের জিনিস না খাইয়ে রাখতে নেই। মানি, সুধা, সরস্বতী, মেজ বৌমা সবাই পিঠে খেলে, কিন্তু কি জেদী ছেলে ভাই বঙ্কু, রাগ ক'রে কিছুতেই পিঠে খেলে না। বললে—'ভূমিকম্পে দেশ উচ্ছন্ন হয়ে গেল, কত লোকের কত সর্বনাশ হয়ে গেল, আর আজ তোমার পিঠে গড়ার শখ হ'ল?' আমি কত বুঝালাম, বললাম—'শখ ক'রে করি নি রে, অত জিনিস, নষ্ট হবে তাই করলাম, তবু তো সবাই খেলে!'

"তা, সে ছেলের গোঁ কিছুতেই গেল না, কিছুতেই পিঠে মুখে তুললে না। তখন আমার রাগ হ'ল, বললাম—'কেন পিঠে করব না, কিসের দুঃখে শুনি? অত বড় ভূমিকম্প হয়ে গেল, ভগবানের দয়ায় কারুর কেশটি ছেঁড়ে নি। বাড়ী ভেঙেছে, আবার সারানো হবে, তার জন্য এত ঘ্যানঘ্যানানি কেন বাপু? বাড়ী ভেঙেছে, প্রাণ তো কারু হানি হয় নি' পিঠের দিনে পিঠে করব না তা ব'লে!'

"দিদি, বলব কি আপনাকে! আমার এই পিঠে গড়ার কথা একেবারে শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল। যার বাড়ী বেড়াতে যাই সেই বলে—'তুমি তো কম পাত্র নও' ভূমিকম্পের পর রাত বারোটা পর্যন্ত পিঠে গড়?' কর্তা বললেন—'আজকালকার দিনে এতটা হেকমত কারও আছে কি যে, এতবড় একটা ভূমিকম্পের পর রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার মত পিঠে গড়তে পারে?'"

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয় ১৩৪৩

হেমাঙ্গিনী

হেমাঙ্গিনী আবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর বাপের বাড়ী গোবরডাঙার কাছে একটি পল্লীগ্রামে। শ্বশুর-বাড়ী কলিকাতার শহরের বুকে, এক ঘনবসতি পল্লীর উপগলির ভিতর। ‘উপগলি’ বলিতে এমন একটি গলি বুঝায়, যে গলিতে গলির ভিতর যে পথ দিয়া প্রবেশ করিতে হয় সেই পথ দিয়াই বাহির হইতে হয়—গলির অপর মুখ রুদ্ধ, সেখানে প্রকাণ্ড এক আস্তাবল।

নানা গলির গোলোকধাঁধার ভিতর দিয়া এই গলিতে ঢুকিতে হয়। পরিচিতের পক্ষে পথ সহজ বটে, কিন্তু অপরিচিতের অথবা স্বল্পপরিচিতের পক্ষে সহজ নয়। কাজেই হেমাঙ্গিনীর বাবা যখন রিক্‌শায় বাক্স ও বালিকা কন্যা লইয়া বাড়ী খুঁজিয়া হয়রান হইতেছিলেন এবং রিক্‌শাওয়ালা ভাড়া বাড়াইবার নোটিশ দিতেছিল, তখন মনে মনে তিনি কলিকাতাকে অভিসম্পাত করিতেছিলেন।

অভিসম্পাতের অন্য কারণও ছিল। পল্লীগ্রামবাসী ভদ্রলোক, কলিকাতার হালচাল বিশেষ জানেন না, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া গত অগ্রহায়ণে মেয়েটির বিবাহ দিয়াছেন;—জামাই দেখিতে সুশ্রী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, বি. এ. পাস ছেলে, কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী আছে, অবশ্য একতলা, তা কলিকাতার একতলা বাড়ীও একটা সম্পত্তিবিশেষ;—পিতা মাতা বর্তমান, বাপ এখনও চাকুরি করিতেছেন, তিনি এক শো আশী টাকা মাহিনা পান, এমন ছেলেকে জামাতা পাওয়া হেমাঙ্গিনীর পিতার পক্ষে কম সৌভাগ্য নয়। কিন্তু সেই সৌভাগ্য আজ দুর্ভাগ্যে পরিণত হইয়াছে। লোকমুখে সংবাদ পাইয়াছেন যে, বৈবাহিক নাকি আবার পুত্রের বিবাহ দিতেছেন। খবর পাইয়া প্রাণের দায়ে মেয়েকে লইয়া পিতা শ্বশুরালয়ে পেঁছাইতে চলিয়াছেন, আশা এই যে, সময়মত পেঁছিলে বিবাহ বন্ধ যদি হয়।

কেন হেমার শ্বশুর ছেলের আবার বিবাহ দিতেছেন, ইহার কারণ কি?—ভবতারণবাবু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কুল-মর্যাদায় তিনি শ্রেষ্ঠ কুলীন, হরিনাথ মিত্র প্রথম পুত্রকে তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া কুল করিয়াছেন। সেকালে তাঁহাদের বংশের মেয়ে অনেক টাকা পণ দিয়া কুলীনগণ নিজ নিজ কুল উজ্জ্বল করিবার জন্য গৃহে লইয়া যাইত। এখন অবশ্য দিন-কালের পরিবর্তন হইয়াছে। হেমার বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার এক হাজার টাকা ধার করিতে হইয়াছে, পণ পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু হেমার শ্বশুর যেন সব সময় অসন্তুষ্ট, অথচ কিসের জন্য অসন্তোষ তাহাও কিছু খুলিয়া বলেন নাই।

বিবাহের পর মাঘ মাসে কন্যা প্রথম শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছিল। শাশুড়ী নাকি সে সময় বধূর উপর ততটা সন্তুষ্ট হন নাই। শাশুড়ীর কিছু শুচিবাই আছে,—বৌ আচার-বিচার জানে না বলিয়া তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দিতেন না, নিজেই রন্ধন করিতেন, অথচ “বিয়ে হয়ে এসে অবধি হাতা-বেড়ি হাতে উঠেছে, সে আর

হাতে থেকে নামল না” বলিয়াও নাকি মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিতেন। এ সকল কথা হেমার মুখে শোনা—সে বিশেষ কিছু খুলিয়া বলিতে পারে না, লাজুক স্বভাব, আর বড় শান্ত মেয়ে। বৌ রান্না করিতে পারে না বলিয়াই কি আবার ছেলের বিবাহ দিতে চাহিতেছেন? কি জানি, ব্যাপার তো কিছুই বুঝা যায় না। হেমার বয়স চৌদ্দ উতরাইয়া পনেরোয় পড়িয়াছে মাত্র, উহাকে আচার-বিচার শিখাইয়া লইতেও তো পারিতেন, মেয়ে তো কথার অবাধ্য নয়। তবে এমনটা কেন হইল? অগ্রহায়ণে বিবাহ হইয়াছে, আর এই শ্রাবণ মাস, এক বছরও যায় নাই, ইহার মধ্যেই কি অপরাধে ইঁহারা বালিকার এই শাস্তি বিধান করিতেছেন?

হেমা রাঁধিত না—এ কথা হেমার মুখেই শোনা, অথচ উহার সর্বাঙ্গে পোড়ার দাগও দেখিয়াছি। বাঁ হাতের উপর কালশিটে দাগ। বলিল যে, কলতলায় পড়িয়া গিয়াছিল; কি জানি, শাশুড়ী মারধোর করিত কিনা! তাই বা কে জানে! মেয়ের কপাল! শ্বশুরবাড়ী না পাঠাইয়াও তো উপায় নাই!—এই সমস্ত নানা চিন্তা তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিতেছিল।

আকাশও তখন মেঘে ভারাক্রান্ত। অবশেষে বৃষ্টি নামিল, ভাগ্যক্রমে সেই গলিও খুঁজিয়া পাওয়া গেল। হেমাঙ্গিনীর দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ী আসার ইহাই ইতিহাস।

ইহার তিন মাস পরের কথা। কার্তিক মাসের শেষ, সামান্য একটু শীত পড়িয়াছে, একতলার ছাদের উপর বসিয়া হেমাঙ্গিনী বড়ির ডাল ফেনাইতেছে। পাশের বাড়ীর দোতালার জানালা ঠিক ছাদের লাগালাগি। সেই জানালায় একটি মেয়ে মুখ বাড়াইয়া হেমাঙ্গিনীকে দেখিতে পাইল। বলিল, “আজ যে এত দেরি, ভাই? আমি সেই কখন থেকে জানলার কাছে ঘুর ঘুর করছি, আর ভাবছি, কখন তুমি ছাদে আসবে!”

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, “দেরি কি আর ইচ্ছে ক'রে হ'ল। বাসন মাজতে, কলতলা ধুতে দেরি হয়ে গেল, ভাই। একবার বাসন মাজা ধোওয়া হয়ে গিয়েছিল, কড়ার আংটার পাশে কালি ছিল, দেখতে পাই নি, তাই আবার সব বাসনই ফিরে-ফিরতে মাজতে ধুতে হ'ল। তারপর কাপড় কেচে ডাল বাটলাম, তবে তো ছাদে এলাম। দেখ না এক-ছাদ রোদ হয়ে গিয়েছে, বড়ি যদি আবার এক রোদে না শুকোয় তা হ'লে বকুনি খেতে হবে।”

মেয়েটি হেমাঙ্গিনীরই সমবয়সী, নাম অরুণা। হেমার যত কিছু সুখ-দুঃখের কথা, বাপের বাড়ীর গল্প অরুণার সহিতই হয়। অরুণা বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ীরও আদরের বৌ, দুঃখের সহিত তাহার পরিচয় নাই, তবু হেমাঙ্গিনীর দুঃখে সমব্যথায় ব্যথিতা হয়। বুঝি এই সমবেদনটুকু পাইয়াই হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া আছে, নতুবা শ্বশুরবাড়ীতে যে সুখে দিন কাটিতেছে তাহা বলিবার নয়।

“অরু, ভাই, কাল মার চিঠি পেয়েছি, খোকাও আবার তাতে হিজিবিজি লিখে

দিয়েছে। কিছুই তার বোঝা যায় না, খালি 'দিদি'টা বুঝা গেল, মা সেটা হাতে ধ'রে লিখিয়ে দিয়েছে। ভাই, খোকার কথা মনে হ'লে কি যে মন কেমন করে, মনে হয় পাখী হয়ে উড়ে চ'লে যাই। আসবার দিন আঁচল চেপে ধরেছিল, কিছুতে ছাড়বে না, আর কি তার কান্না!"—বলিতে বলিতে হেমার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অরু বলিল, "মা তোমাকে নিয়ে যাবার কথা কিছু লিখেছেন নাকি?"

"লিখেছেন মাঘ মাসের প্রথমে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ভাই, আমি এখন যেতে চাই না, গেলে আর এরা নিয়ে আসবে না।"

হেমা বাপের বাড়ী গেলে আর যে ইহারা আনিবে না অরু তাহা জানিত, পাড়ায় সকলেই সে কথা জানিত। তাই অরু সে কথায় কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেমার চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতে লাগিল, কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর চোখ মুছিয়া জানালার পাশে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "শাশুড়ী যখন-তখন বলেন, এবার আর বাপের বাড়ী গেলে এ-মুখে আসতে হবে না। ওর জন্য আমার ঘরের লক্ষ্মী বৌমাকে ঘরে আনতে পারছি না, ও অলক্ষ্মী বিদায় না হ'লে তারা তাকে পাঠাবে না। ভাই, কেনই বা আমার সঙ্গে বিয়ে দিলেন, তার সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো পারতেন! দিদিমা একদিন সে কথা বলেছিলেন, তাতে রেগে গিয়ে জবাব দিলেন, 'আর নাতবৌয়ের জন্য অত রস দেখাতে হবে না। কেন বিয়ে দিলাম তুমি তা জান না নাকি? বিয়ে না দিলে 'কুল' হ'ত কি ক'রে? নতুন বৌমার বাপেরা যে মৌলিক, তাদের সঙ্গে প্রথম বিয়ে চলত না যে, নইলে কি ওই পাড়াগেঁয়ে ভূতকে ঘরে আনি?'

অরু বলিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার সতীনের বাপ-মা জেনে-শুনে সতীনের উপর মেয়ে দিলেন—এ তো আশ্চর্য কথা! কি জানি কি রকম লোক তাঁরা!"

হেমা বলিল, "দিদিমার কাছে শুনেছি, এ একরকম বিয়ে, আদ্যিরস না কি যেন বলে। আগে চলিত ছিল, এখন ছেলেরা দুই বিয়ে করতে চায় না। বলে—আর চলিত নেই, কেবল আমার অদৃষ্টেই চলিত হ'ল। আগে একবার কুলীনের মেয়ে বিয়ে ক'রে কুল ক'রে, তারপর মৌলিকের মেয়ে বিয়ে করে, তারই নাম নাকি আদ্যিরস। এত সব কথা ভাই আমার বাবা তো জানতেন না, ঘটক গিয়ে কত কথা বললে, বাবারও জামাই দেখে খুব পছন্দ হ'ল, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বিয়ে ঠিক হয়ে—বিয়ে হয়ে গেল।"

অরু বলিল, "আচ্ছা ভাই, সুরেনবাবু কিছু বলেন না কেন? তিনি তো মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে করেছেন, বাপ-মার কথায় তিনি আবার বিয়ে করলেন কি ব'লে?"

হেমা বলিল, "ওঁদের সেখানে বিয়ে যে আগেই ঠিক হয়েছিল। পশ্চিমে ওঁরা হাওয়া বদল করতে গিয়েছিলেন, সেখানেই তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়, তারপর বিয়ের কথাবার্তাও ঠিক হয়। তাদেরও খুব বর পছন্দ হয়েছিল, বরেদেরও খুব কনে পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু শাশুড়ী মৌলিকে বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে কুল ভেঙে যাবে ব'লে কিছুতেই যখন রাজী হলেন না, তখন নাকি এই পরামর্শ ঠিক হ'ল।"

এই সময় নীচের তলা হইতে চিৎকার-ধ্বনি শোনা গেল, "ওগো নবাবের কন্যা, বড়ি দিতে গিয়ে যে বড়িতেই র'য়ে গেলে? নীচে কি আজ আর নামা হবে না নাকি?"

অরু তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল, হেমাঙ্গিনীও বড়ি দিবার ডালের পাত্র হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালে হেমা যখন ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে আসিল তখন অরুর জানালার দিকে সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া দেখিল—জানালা বন্ধ রহিয়াছে। কাল অরু মার কাছে বকুনি খাইয়া আজ আর সকালে জানালা খুলে নাই।

হেমাঙ্গিনীর আজ একটা কথা অরুর নিকট বলিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছিল। জানালা বন্ধ দেখিয়া, সে নিরাশ হইল। মনে মনে গ্রামের ঠাকুর জয়দুর্গাকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল—"হে মা জয়দুর্গা, অরু একবারটি জানালাটা খুলুক।"

ভক্তের প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না। অরু নিঃশব্দে আস্তে আস্তে জানালা একটু ফাঁক করিতেছে দেখা গেল, হেমাকে দেখিতে পাইয়া জানালা খুলিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"কেমন জব্দ হেমা, হাঁ ক'রে তীর্থের কাকের মত জানালার দিকে চেয়ে থাকতে হয়েছে! তোমার শাশুড়ীর পায়ে বাত, তাই রক্ষে, নইলে ছাদে উঠে এখনি দেখতে আসত যে বউ কি করছে। বাবা বাবা, এমন শাশুড়ী আবার মানুষের হয়?"

"চুপ চুপ, অরু চুপ কর ভাই,—কে শুনতে পাবে আর সর্বনাশ হবে। কাল কি হয়েছে ভাই শোন, আমি সন্ধ্যাবেলায় কয়লা ভাঙছি আর পিছনে কে যেন আমার খোঁপা ধ'রে টান দিল। পিছন ফিরে দেখি কি ভাই—" বলিয়া হেমা হাসিয়া মুখে কাপড় দিল।

অরুর দৃষ্টি অন্যদিকে ছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ও কি, তোর কপাল অতটা কেটে গেল কিসে? কপালটা যে ফুলে ঢোল হয়েছে!"

হেমা বলিল, 'তাই তো বলছি, পিছন ফিরে দেখি যে—দাঁড়িয়ে আছে। আমার চুল তা বাঁধা হয় না, চুল জড়ানো ছিল, টানে খুলে গেল। তখন হাসতে হাসতে বলছে 'এ কি, এ যে চুলের রাশি! এত সুন্দর চুল তোমার!' আমি আর লজ্জায় মাথা তুলতে পারি না। শাশুড়ী বুঝি রান্নাঘরের দুয়ারে ছিলেন, ছেলের কীর্তি দেখে তাঁর এত রাগ হয়েছে যে, হাতে কাঁসি ছিল, সেইখানাই ছুঁড়েছেন, আর ঠিক আমার কপালের ওপর এসে লেগেছে।"

অরু শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "বলিস কি ভাই, ঘায় অঘায় লেগে মারা যাবি একদিন দেখছি।"

হেমাঙ্গিনী সখীকে আনন্দের বার্তা শুনাইতে আসিয়াছিল, কাল তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা বলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের প্লাবনে সে আনন্দ ভাসিয়া গেল।

হেমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মরণ হ'লে তো বাঁচতাম ভাই।—আমিও বাঁচতাম ওরাও বাঁচত।"

"অরু, অরু কোথায় গেলি?" ডাক শুনিয়া অরু বলিল, "আজ যাই ভাই, মা ডাকছে। জানলা খুললে মা বকে, বলে যে, 'মিত্তিরগিন্নি জানতে পারলে কি রক্ষে রাখবে! বৌটারও খোয়ার করবে, আর আমাদেরও শাপ-শাপান্ত ক'রে গাল দেবে!' তাই ভাই, আজ সকালে জানলা খুলি নি।"

"না ভাই, তুই একটু একটু জানলা খুলিস লক্ষ্মী অরু, নইলে আমি বাঁচব না।" বলিতে বলিতে অরু জানালা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মিত্র-বাড়ীর ব্যাপার লইয়া পাড়ায় রীতিমত আন্দোলন হইত, কিন্তু পরের ব্যাপারে মাথা দিতে অনেকেই রাজী ছিল না। যে দিন হেমাঙ্গিনীর পিতা হেমাঙ্গিনীকে রাখিতে আসিয়াছিলেন, সে দিন হেমাঙ্গিনীর শ্বশুর দুয়ার হইতেই রিক্‌শা সহিত বধূ-বিদায় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পাড়ার লোকের উৎপাতেই তাহা পারেন না। দুয়ারে মেয়েকে নামাইয়া দিয়া পিতা সেই রিক্‌শাতেই ফিরিয়া গিয়াছেন। বিদায়ের সময়ের পিতার সেই ব্যাকুল দৃষ্টি যখন-তখন হেমার মনে পড়ে। কোন্ মুখে আবার সে বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? তাহার জন্যই তো তাহার পিতার এত লাঞ্ছনা, এত অপমান! যে পিতা কুকুর-শিয়ালের মত দুয়ার হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন—সেই পিতা আবার তাহাকে লইতে এই বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইবেন! পিতার সেই অপমান হেমা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? উহারা অবশ্য হেমাকে বিদায় করিতেই ইচ্ছুক, কিন্তু এখন কাজকর্ম বেশী, ছেলে-পিলে লইয়া ননদ আসিয়াছেন, দিদিশাশুড়ীর অসুখ, তাঁহার কাছে রাত্রে থাকিবার লোক নাই, কাজেই এ সময় উহারা হেমাকে হয়তো পাঠাইবে না। আর যদি পাঠায়, সেই পাঠানোর সহিত এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক একেবারেই উঠিয়া যাইবে।

সম্পর্ক যদি উঠিয়া যায়, ক্ষতি কি? কি সম্পর্কই বা তাহার ইহাদের সহিত আছে! কিন্তু বাপের বাড়ীর গ্রামে হেমারও দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তো কেহ জানে না, তাহারা জানে—হেমা শ্বশুর-বাড়ীতে আছে। হেমা যদি বাপের বাড়ী যায়, ইহারা আর তো তাহাকে আনিবে না। তখন পাড়ার সকলে আসিয়া তাহার মাকে যখন প্রশ্ন করিবে, 'হ্যাঁগা, মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী কবে পাঠাবে? এতদিন রয়েছে, শ্বশুর-বাড়ী থেকে তো কোন খোঁজ খবর নেয় না? তাদের সঙ্গে কিছু গোলমাল হয়েছে না কি?' এই সব প্রশ্নে মায়ের মলিন মুখ—হেমা যেন এখনই চোখের উপর দেখিতে পায়।

সে যখন মনের দুঃখে মনে মনে বলে, "আমার মরণ হ'লেই ভাল," তখনই তাহার বুকের ভিতর ধক করিয়া উঠে। সত্যই কি সে মরিয়া যাইবে? সে তাহার পিতামাতার প্রথম সন্তান; তাহার পর তিনটি বোন, একটি ভাই মারা গিয়াছে, অবশেষে জন্মিয়াছে খোকা। খোকার বয়স এখন তিন বছর পূর্ণ হইয়াছে,

আর সে পনেরো বছরের; কিন্তু খোকার সঙ্গে সে সমবয়সীর মতই খেলা করিত। পটলী, নারাণী, কুসুম, খাঁদু তাহার গ্রামের খেলার সাথীরা—তাহারা কেহই জানে না, হেমার অদৃষ্টে যে কত দুঃখ! বিয়ের রাত্রে তাহারা চুপি চুপি হেমাকে বলিয়াছিল, "হেমা, তোর কি সুন্দর বর হয়েছে ভাই!" সেই কথা হেমার আজিও কানে যেন লাগিয়া আছে। সুন্দর বর! হ্যাঁ, সুন্দরই তো। সুন্দর বর বটে, কিন্তু সে হেমার বর নয়, হেমার সতীনের বর।

বাবার কাছে সে আদর ছাড়া কখনও তিরস্কার পায় নাই। মা যদি একবার বকিতেন—আবার পরে কত আদরই করিতেন। বাবা আদর করিয়া বলিতেন, "আমার হেমাঙ্গিনী, হেমবরণী।" 'আইলেন মা হেমবরণী হেরম্বে লইয়া কক্ষে' এই গান গাহিয়া কত আমোদ করিতেন। সে সব দিন আজ স্বপ্ন। এখন সে বাপের বাড়ী যদি যায়, বাবার কি সে আনন্দ আর আসিবে? ভগবতী গণেশকে কোলে লইয়া বাপের বাড়ী আসিতেন, যদি তার একটি সুন্দর খোকা হইত, তাহা হইলেও বাবা-মা অনেক দুঃখ ভুলিতেন। আর কিছু নয়, যদি তার শুধু একটি খোকা হইত!

কেহ মরিয়া গিয়াছে শুনিলে তাহার দুঃখ হইত, সেই সঙ্গে ভীষণ ভয়ও হইত। বাড়ীর কাছাকাছি কেহ মারা গেলে, সে কয়েক দিন মায়ের আঁচলে আঁচলে ঘুরিত,—রাত্রে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইত। ভাই-বোনগুলি অতি শিশু অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের কথা তাহার বিশেষ মনে পড়ে না। কিন্তু মা এখনও তাহাদের কথা উঠিলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন,—তাঁহার চোখে জল আসে। হেমা যদি মরিয়া যায়—মার কত কষ্টই না হইবে!

মৃত্যুর সম্বন্ধে আজকাল তাহার নানা কথা কেবলই মনে হয়, চেষ্টা করিয়াও মন হইতে এ চিন্তা সে দূর করিতে পারে না। দিদিশাশুড়ীর এক-একদিন রাত্রে খুব অসুখ বাড়ে, ক্রমাগত হাঁপাইতে থাকেন, যেমন মনে হয়—দম আটকাইয়া এখনি মারা যাইবেন। সে তাড়াতাড়ি লণ্ঠনের মাথায় পুরানো ঘিয়ের বাটী রাখিয়া তাঁহার বুকে ও গলায় মালিশ করে। ক্রমশ রোগিণীর একটু আরাম বোধ হইলে তিনি যখন শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, "আঃ বাঁচালি দিদি। জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে সুখে থাক," তখন তাহার চোখে আপনা হইতে জল আসিয়া পড়ে।

দিদিশাশুড়ীর অসুখের জন্য আজকাল সে সকালে আর ছাদে উঠিবার সময় পায় না। ভোরে কলে জল আসিলেই তাড়াতাড়ি কাপড়-কাচা বাসন-মাজা প্রভৃতি বাসীপাট সারিয়া লয়। সকালে দিদিশাশুড়ীর কাছেই তাহাকে থাকিতে হয়। সন্ধ্যার সময় অবসর করিয়া একবার তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে, কিন্তু তখন অরুর দেখা পায় না। শীতের দিন সন্ধ্যার আগেই অরুদের শোবার ঘরের জানালা বন্ধ হয়। যদি বা আগে অরু এক-একবার—ছাদে হেমা আসিয়াছে কি-না দেখিবার জন্য—

জানালা খুলিত, আজকাল আর জানালা খোলে না। হেমা ভাবে, হয়তো অরু শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছে. কি হয়তো তাহার অসুখ করিয়াছে। অরু জানালা না খুলিলে হেমার তো আর তাহাদের খবর জানিবার কোন উপায় নাই।

এই তো মাঘ মাস আসিয়া পড়িল। মাঘ মাসে তাহার মা লইয়া যাইবেন লিখিয়াছিলেন। সে চিঠির পর আর কোনও চিঠি সে পায় নাই। অরুর হাতে—চিঠির উত্তর সে ডাকে দিতে দিয়াছিল, এ বাড়ীতে কাহাকে দিয়াই বা সে চিঠি ডাকে দিবে? আগে ঠিকা-ঝি বাসন মাজিতে আসিত, হেমা আসিবার মাস খানেক পরেই তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওরেরা হেমার সহিত কথা বলে না; এ বিষয়ে তাহাদের মায়ের কঠিন শাসন। তবে ননদ আসিবার পর তাহার আট বছরের বড় ছেলেটি অনেক সময় মামীমার পিছনে পিছনে ঘুরিত। সন্ধ্যাবেলায় গল্প শুনিবার জন্য আবদার করিত. তাহার দিদিমার শাসন সে মানিত না। ননদের মেজ ছেলেটির নাম সুশান্ত, কিন্তু তাহার স্বভাবটি নামের ঠিক বিপরীত। সুশান্তকে দেখিলেই হেমার ছোট ভাইটির কথা মনে পড়িত, সুশান্তকে কোলে লইয়া আদর করিতে মাঝে মাঝে তাহার বড়ই ইচ্ছা হইত, কিন্তু সাহসও হইত না, সময়ও হইত না।

হেমার ননদের নাম আমোদিনী। বাপের বাড়ী আসিয়া অবধি বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখিয়া ও পাড়ায় বন্ধুদিগের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াই তাহার সময় কাটে। রান্নাঘরে মায়ের কাজেও মাঝে মাঝে সাহায্য করে বটে, কিন্তু সেদিকে তাহার তত মন নাই। হেমাকে মাঝে মাঝে বলে, "বৌ, একটু মা'র মন যুগিয়ে তাঁর হাতের কাজগুলো ক'রে দিও, একা মানুষ কতদিক করবেন তিনি! একে কোমরে বাত, খাটুনিও তো কম নয়. সাধে কি আর তাঁর রাগ হয়?" আবার কখনও বা বলে, "যা একটু পরিষ্কার কাজ আচার-বিচার পছন্দ করেন সেটা তো শিখে এলেই পার! গেঁয়ো ভূত হয়ে আর কতদিন থাকবে?" হেমা কিছুতেই জবাব দেয় না, উত্তর দিবার কিই-বা আছে?

সেদিন আমোদিনী পাড়া হইতে বেড়াইয়া আসিয়া একটু উত্তেজিতভাবে মায়ের কাছে গেল। হেমা শুনিল, দুই মায়ে-ঝিয়ে কি বিতর্ক হইতেছে! হঠাৎ শাশুড়ী "পোড়ারমুখী যে বিদায়ও হয় না, বাপ ফেলে দিয়ে গেল, আর নেবার নামও যে করে না, এখন এ আপদ নিয়ে করি কি?" বলিয়া এমন চেঁচাইয়া উঠিলেন যে, হেমা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। দিদিমা এদিকে "জল জল" করিতেছেন, কিন্তু সে ক্ষীণস্বর তাহার কানেই গেল না। সে স্তম্ভিতের মত দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় ননদ ঘরে আসিয়া বলিল, "দিদিমা যে 'জল' 'জল' করছে, কানে যাচ্ছে না? কানে যাবে কি, দুয়ারে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কথা শোনা হচ্ছে, এ গুণও আছে দেখছি। লোকে তা হ'লে মিথ্যা কথা তো বলেন না! এদিকে ভালমানুষ, ওদিকে পেটে পেটে শয়তানি। তোমার জন্যে পাড়ায় নিন্দেয় ঢি ঢি প'ড়ে গেল। বিয়ে দিয়ে বৌ এনে মার খোয়ারও তো কম হ'ল না?"

হেমা সকালেই আজ ছাদে উঠিয়াছে। আর সে অরুকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "অরু অরু, আছিস ভাই! একবার জানলা খোল্ না?" কেহই উত্তর দিল না। সাহস করিয়া আবার ডাকিল, "অরু ভাই, একবার জানলাটা খোল্ না!"

এবার জানালা খুলিল,—অরুর মা আসিয়া জানালা খুলিলেন। একটু বিরক্ত ভাবেই জানালা খুলিয়াছিলেন, কিন্তু হেমার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বিরক্তির পরিবর্তে মন করুণায় বিগলিত হইল। বলিলেন, "অরু তো এখানে নেই মা, সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছে। তোমাদের বাড়ী গিয়ে দেখা ক'রে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পাছে তোমার শাশুড়ী রাগ করেন ব'লে আমি বারণ করলাম। এই শনিবারে জামাইকে ও তাকে আনব—সেদিন সন্ধ্যার সময় তুমি ছাদে এসো, তা হ'লেই তার সঙ্গে দেখা হবে।"

হেমা নিশ্বাস ফেলিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার মন যেন আজ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোন কাজেই আর সে মন দিতে পারিতেছে না।

দিদি-শাশুড়ীর অসুখ আরও বাড়িয়াছে, তাহার অবস্থা দেখিয়া কবিরাজ বলিয়াছেন, মাঘ মাস কাটে কিনা সন্দেহ। এদিকে ননদের মেজ খোকা সুশান্তের খুব জ্বর, গায়ে ছোট ছোট ঘামাচির মত বাহির হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন ও তাহাকে আলাদা ঘরে রাখিবার জন্য বিশেষ করিয়া আদেশ দিয়াছেন। ছোট খোকারও জ্বর হইয়াছে—তত বেশী নয়, কিন্তু সুশান্ত জ্বরে একেবারে অজ্ঞান। সুরেন্দ্রনাথের আজ পশ্চিমে রওনা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে নাকি তাঁহার একটা কাজ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু বাড়ীর এই সকল অসুখের জন্য আজিকার মত তাঁহার যাওয়া বন্ধ হইয়াছে।

প্রশান্তকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বাড়ীর সকলের মুখ যেন অন্ধকার, দেখিয়া হেমার মনে হইল গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে।

হেমা দিদিমার ঘরে ছিল, ননদ আসিয়া সহসা হেমার দুইটি হাত ধরিয়া বলিল, "বৌ, একটা কথা শোন ভাই।"

হেমাঙ্গিনী অবাক! ননদের এই পরিবর্তনের কারণ কি? এত আত্মীয়তার সহিত কোন দিন তো এ বাড়ীতে কেহ তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই! চাহিয়া দেখিল, আমোদিনীর চোখে জল। আমোদিনী বলিল, "ডাক্তারবাবু খোকাকে আলাদা ঘরে রাখতে ব'লে গেলেন। কিন্তু দিদিমার ঘর ছাড়া আর খালি ঘর তো নেই। এই ঘরটা বড়ও আছে। এই ঘরেই খোকাকে রাখতে চাই। ছোট খোকারও জ্বর হয়েছে, আমি তো ওর কাছে থাকতে পারব না। তুই তো সুশান্তকে ভালবাসিস, ওর কাছে থাকবি, আমি মাঝে মাঝে দেখে যাব। তোর কাছে খোকা যত্নেই থাকবে।"

হেমা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। দিদিমার দারুণ উদরাময়, হাত পা ফুলিয়া গিয়াছে। সারা রাত্রি তাঁহার কাছে একজন লোকের প্রয়োজন, আবার সুশান্ত জ্বরে অজ্ঞান, দুইটি রোগীকে সে একা সারারাত্রি কি করিয়া শুশ্রূষা করিবে?

শনিবারে অরু শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া মায়ের নিকট হেমার কথা শুনিতে পাইল। অরু বার বার জানালার কাছে গিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু হেমা ছাদে আসে নাই। অরু ভাবিল, মা সন্ধ্যার সময় ছাদে আসিতে বলিয়াছেন, তাই হেমা দেরী করিতেছে। সন্ধ্যা আসিল, সন্ধ্যা চলিয়া গেল, রাত্রি আসিল, কিন্তু হেমা ছাদে আসিল না।

অরুর মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "শুনেছি আমোদিনীর ছেলের 'মায়ের অনুগ্রহ' হয়েছে, ডাক্তার রোজই আসছে, বাড়ীতে সোরগোল, আবার মিত্তির-গিন্নির মারও নাকি খুব অসুখ, এখন-তখন হয়ে আছে। সেই গোলমালে বোধ হয় ছাদে আসতে পারে নি।"

কিন্তু অরুর মন মানিল না, বাড়ীর ঝিকে ডাকিয়ে চুপি চুপি বলিল, "শান্তর মা, ও-বাড়ী গিয়ে একবার দেখে এস না, সবাই কেমন আছে! আর ওদের বৌকে একবার চুপি চুপি বলবে যে—আমি এসেছি, একবার যেন ছাদে আসে।"

শান্তর মা অরুর বড় বাধ্য, কিন্তু আট নম্বরের বাড়ীতে যাইতে তাহার সাহস হয় না। গিন্নি যে রাগী, কি জানি বৌয়ের সঙ্গে কথা বলিতে যদি দেখে তবে কি আর রক্ষা রাখিবে?

অরু তাহাকে অনেক সাহস দিল, সেই সঙ্গে তাহার ছেলে শান্তকে খাবার কিনিয়া দিবার জন্য একটি আটআনিও তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল।

শান্তর মা মিত্র-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, যে খোকার 'মায়ের অনুগ্রহ' হইয়াছিল সে অনেক ভাল আছে, কিন্তু বৌটির জ্বর। বলিল, "বৌ জ্বরে একেবারে বেহুঁশ, আমি তাকে তোমার কথা বলব কি, তার কি আর জ্ঞান আছে, খালি বিড় বিড় ক'রে ভুল বকছে। শাশুড়ী আমাকে দেখে 'ওখানে কি করছিস?' ব'লে যেন তেড়ে এল। আমি 'দিদিমাকে দেখতে মা পাঠিয়েছেন' ব'লেই তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।"

অরুর মা আসিয়া ঝিকে ও-বাড়ী যাওয়ার জন্য একটু তিরস্কার করিলেন, কিন্তু অরু কাঁদিতেছে দেখিয়া আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। আদরের মেয়ের কান্নায় অবশেষে তাঁহাকে স্বামীর কাছে অনুরোধ করিতে হইল যে, হেমাঙ্গিনীর পিতার ঠিকানায় হেমার অসুখের সংবাদ দেওয়া হউক। ঠিকানা তাঁহাদের জানা ছিল।

হেমার পিতা সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছেন, হেমাঙ্গিনীকে তখন বাড়ীর দুয়ারের সম্মুখে গলির ভিতর বাহির করা হইয়াছে। চারিধারে জনতা। শোকার্ত্ত পিতাকে দেখিয়া সকলে সরিয়া পথ দিল। "ও মা আমার হেমাঙ্গিনী, হেমবরণী, মা গো!" বলিয়া আর্ত্ত চিৎকার করিয়া পিতা ভূলুণ্ঠিত হইলেন।

জনতা স্তব্ধ। শুধু একজন মুখরা স্ত্রীলোক বলিল, "এখন আর কেঁদে কি হবে? খুনের ঘরে মেয়েকে দিয়েছিলে, দগ্ধে দগ্ধে খুন করেছে। এত অসুখে একটি ডাক্তার পর্য্যন্ত দেখায় নি।"

আর একজন—হেমাঙ্গিনীর চুলের রাশি খাটিয়া ছাড়াইয়া মাটিতে লুটাইতে-ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া বলিল, "দেখেছ দিদি, কি সুন্দর চুলের রাশি! আমি পরশুদিন বুড়ো গিন্নিকে দেখতে গিয়ে দেখলাম, বাছা ঘরের মেঝেয় প'ড়ে আতারি-কাতারি খাচ্ছে, আর বিজ-বিজ ক'রে কি যেন বকছে, আবার বলছে—'কি সুন্দর চুল তোমার, কি সুন্দর চুল!' বিকার হয়েছে কিনা, তাই ভুল বকছিল। আমি তো দেখে শুনে অবাক। গিন্নিকে বললাম, 'হ্যাঁগা, বৌয়ের এত অসুখ, আমরা তো কোন খবরই জানি না। মাটিতে এমন ক'রে ফেলে রেখেছ, মারা যাবে যে? তা শুনে শাশুড়ী বললে কি জান, ওর 'মায়ের অনুগ্রহ' হয়েছে, বিছানায় তুলে কি বিছানা-পাতি নষ্ট করব! কবিরাজ ঠাণ্ডা মাটিতেই ফেলে রাখতে বলেছে।"

—'আনন্দবাজার পত্রিকা,' বার্ষিক (দোল) ১৩৪৩

বরিয়াত

সেদিন পুরানো কাগজপত্র গুছাইতে গিয়া মেজদাদার হাতের লেখা একখানি খাতা দেখিতে পাইলাম। খাতাখানি কবিতার খাতা, তাহার প্রথম কবিতাটির নাম 'বরিয়াত'। কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ :—

"২৬শে ফাল্গুন ১২৯৭ সাল,
ঘটালে বড় জঞ্জাল!
পাটনায় ছেলে দানাপুরে মেয়ে,
ভারী জাঁকজমের বিয়ে।
বিয়ে হয়েছে অনেক দিন,
বরিয়াত হয় নি এতদিন,
বরিয়াত হবার কথা আজ ছিল;
চারিদিকে 'নেওতা' দিয়েছে,
তিনশো মণ মিঠাই পাকানো হয়েছে,
বড় সাধে বিধি বাগড়া দিল।"

ইহার পর কি ভাবে যে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষে কলহ বাধিয়া সেই বড় সাধের 'বরিয়াতে' বাগড়া পড়িয়াছিল, হাস্যরসিক মেজদাদার লেখনীতে তাহার বর্ণনা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খাতাখানির খানিকটা উইপোকায় কাটিয়াছে, বেশীদূর আর পড়া গেল না।

১২৯৭ সাল ২৬শে ফাল্গুন, প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগের কথা। তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর। সেবার মাঘ মাসে পূর্ণকুম্ভযোগ ছিল। যোগটা প্রয়াগে কি হরিদ্বারে, তাহা আমার মনে নাই; কিন্তু মনে আছে যে, দিদিমা যোগে কুম্ভস্নানের জন্য যখন পশ্চিমে যান, আমাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গে লইয়াছিলেন এইজন্য যে, আমি মাতৃহীন হইয়া মামার বাড়ী দিদিমার কাছেই মানুষ হই। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর সেই যে দেশ ছাড়িয়া গেলেন, আর দেশে ফেরেন নাই। দানাপুরে জ্যাঠামহাশয়ের কর্মস্থান। দিদিমা কুম্ভস্নানে যাইবার সময় সেইখানে আমাকে রাখিয়া তীর্থের পথে চলিয়া গেলেন; সেদিনের কথা এই বৃদ্ধবয়সে আজও মনে আছে।

দানাপুরে গঙ্গাতীরে জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ী। বাড়ীতে আছেন জ্যাঠামহাশয়, জ্যাঠাইমা, মেজ বৌদিদি, বড় বৌদিদি, মেজদাদা, ছোড়দি, রঞ্জু ও টুকুনি। রঞ্জু আমার দাদাই বটে—কেননা, সে আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়, কিন্তু টুকুনিও তাহাকে দাদা বলিত না, কখনও 'ভাইয়া,' কখনও বা 'রঞ্জু' বলিত, কাজেই আমিও তাই বলিতাম। রঞ্জুর তাহাতে আপত্তি ছিল না।

এখানে বাড়ীখানির বর্ণনা কিছু না দিয়া পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত

দানাপুরে অমন বাড়ী একখানিও আর ছিল না। দোতলায় জ্যাঠামহাশয়ের ঘরের সম্মুখের ছোট ছাদটি ঠিক গঙ্গার উপরে; ছাদের নীচে চাঁদনী, সেখান হইতে গঙ্গার গর্ভ পর্যন্ত সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। এই গঙ্গাকে 'ছোটগঙ্গা' বলে। মেজদাদার এক কবিতায় এই গঙ্গার বর্ণনা এইরূপভাবে আছে :—

"আছিল গঙ্গা এক বিরাট বিশাল,
কিন্তু মধ্যে হ'ল প্রকাণ্ড এক চড়া,
তাই চড়ার ওপারে হ'ল বড়গঙ্গা
তার ওপারে ছাপড়া।"

বর্ণনাটি খুব ঠিকই হইয়াছে। লম্বা দ্বীপের মত প্রকাণ্ড চড়া গঙ্গার যেন বুকের উপরে ভাসিয়া রহিয়াছে। বর্ষাকালে যখন গঙ্গার জল বাড়ে, যখন সিঁড়িগুলি ডুবিয়া গিয়া বাড়ীর নীচের তলায় চাতালে আসিয়া জল ঠেকে, তখনও গঙ্গার বুকে চড়া জাগিয়া থাকে। এই চড়ায় গম, অড়হর, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয়। কয়েক ঘর বসতিও সেখানে আছে। শীতকালে আবার যখন ছোট গঙ্গার জল খুব কমিয়া যায়, তখন চাষীর মেয়েরা চড়া হইতে বড় বড় ঝুড়ি মাথায় লইয়া হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসে। মাঝামাঝি গঙ্গায় তাহাদের কখন কখন এক-বুক জল হয়, তবু পারানির পয়সাটি বাঁচাইবার জন্য শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারা কাপড় ভিজাইয়া গঙ্গা পার হয়, আর এপারে আসিয়া সিঁড়ির উপর ঝুড়ি নামাইয়া রৌদ্রে কাপড়ের এক এক প্রান্ত মেলিয়া কাপড় শুকায়। আমি, রঞ্জু ও টুকুনি ছাদের উপর দাঁড়াইয়া প্রত্যহ তাহাদের গঙ্গাপার হওয়া ও কাপড় শুকানো দেখিতাম,—আজও তাহা ভুলি নাই।

ছাদ হইতে দেখিবার আরও অনেক কিছু ছিল। বাড়ীর সম্মুখে গঙ্গা, আর বাড়ীর এক পাশে ছিল এক প্রকাণ্ড মাঠ, সেই মাঠে বৃহস্পতিবারে ও সোমবারে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিত। হাটকে দাই ও রামটহল 'পেটিয়া' বলিত। সেই হাটে লোকের আনাগোনা, রাশি রাশি তরিতরকারির স্তূপ, লোকের কেনা-বেচা,—সে দৃশ্যও কম মনোহারী নয়। সেজন্য যেদিন হাটবার, সেদিন আমরা ছাদ হইতে নড়িতে চাহিতাম না।

বাড়ীর ঠিক পাশেই ছিল এক কুমার-বুড়ীর ঘর। কুমার-বুড়ী তার ঘরের সম্মুখের ছোট আঙিনায় বসিয়া সারাদিন চাক ঘুরাইত, আর তাহার ছেলে মাটি ছানিয়া তাল পাকাইয়া দিত। সারাদিন তাহাদের কাজের বিরাম ছিল না। অনবরত চাক ঘুরিতেছে, ছোট মাটির তালটি চাকের উপর ঘুরিতেছে, আর কুমার-বুড়ীর অঙ্গুলি-সঞ্চালনে ক্রমশঃ একটি করিয়া গেলাস গড়িয়া উঠিতেছে—এই একটি গড়া হইল, সেটি কাটিয়া নামাইয়া রাখিল। আবার একটি, আবার একটি, সারি সারি গেলাসে উঠানটি ভরিয়া গেল। সেই গেলাস রোদে শুকাইয়া শুকাইয়া আমাদের বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘরে বুড়ী জমা করিয়া রাখিত, অনেক গেলাস জমিলে পোন সাজাইয়া পোনে আগুন দিত। সেই পোনে আগুন, পোন ভাঙিয়া গেলাস বাহির করা—সেও কি কম সুন্দর দৃশ্য! এই রকম কত দৃশ্যই না সেই ছাদ

হইতে দেখা যাইত! কাজেই যদি বলি, তেমন বাড়ী আর দানাপুরে একটিও ছিল না, তবে সে কথা বড় মিথ্যা বলা হইবে না।

হাটের কাছাকাছি একটা লম্বা ব্যারাকের মত সারি সারি ঘর ছিল, তাহাকে 'চাক্‌লা মহল' বলিত। সেই সমস্ত ঘরে কাহারা যে থাকিত, তাহা জানিতে পারি নাই; কিন্তু সন্ধ্যার পর এক-এক দিন ক্যাণ্টনমেণ্টের অনেক গোরাকে সেদিকে যাইতে দেখিতাম। গোরা দেখিলেই আমার বড় ভয় হইত। বিশেষত হয়তো এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে চাকলা-মহলের দিক হইতে ভীষণ চিৎকার ও কান্নাকাটির শব্দ শুনিতে পাইতাম; তখনই মনে হইত, গোরারা হয়তো কাহাকে খুন করিয়া ফেলিতেছে।

গোরারা অনেক সময় দিনের বেলাতেও আসিয়া উৎপাত করিত। হয়তো কোন হিন্দুস্থানী মেয়ে গঙ্গা হইতে কলসী ভরিয়া মাথায় করিয়া চলিয়াছে, হঠাৎ একজন গোরা আসিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিল। বেচারীর জলের কলসীটি পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। সে যতই গালাগালি দিতে লাগিল, ততই গোরাদের হাসির ও আমোদের সীমা থাকিত না। কুমার-বুড়ীরও গেলাস গোরারা মাঝে মাঝে নষ্ট করিত। কুমার-বুড়ীকে চাক হইতে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া তাহারা চাক ঘুরাইতে বসিত এবং গড়িতে না পারিয়া যতই গেলাস ভাঙিত, ততই তাহাদের আমোদ বাড়িত। বুড়ী নালিশ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে হয়তো একটা দুয়ানি কি সিকি ফেলিয়া দিয়া যাইত।

বাড়ীর বর্ণনা লইয়া অনেকখানি জায়গা ভরিয়া গেল; এইবার কাহিনীতে অবতরণ করিবার পালা।

দানাপুরে যে দিন প্রথম আসি, রাত্রে খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সকালে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া এত কান্না আসিতে লাগিল যে, ঘরের বাহির হওয়া মুশকিল হইল। এমন সময় বাহিরের বারান্দায় জ্যাঠাইমার সাড়া পাইলাম, "রঞ্জু, রতন কোথায় রে? সে কি এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি?"

পর-মুহূর্তেই রঞ্জু দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ করিয়া ঘরে ঢুকিল এবং "আয় রে রতন, গঙ্গায় ইলিসমাছ ধরছে, দেখবি আয়" বলিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। জ্যাঠাইমা ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, রতন যে মুখ ধোয় নি, খায় নি, ওকে টেনে নিয়ে যাস কোথা?" সে কথায় রঞ্জু কর্ণপাতও করিল না।

সকালটা তো রঞ্জুর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াই কাটিয়া গেল। দুপুরে খাওয়ার পর জ্যাঠাইমার ঘরে তাসের আড্ডা বসে। জ্যাঠাইমার খাওয়ার পরে দু-এক দান তাস খেলা চাই-ই, তা খেলুড়ে যেই হোক না কেন। বড় বৌদিদির জ্বর হইয়াছিল, কাজেই মেজবৌদিদি, জ্যাঠাইমা, রঞ্জু ও টুক্‌নি খেলিতে বসিল। তখন গ্রাবু খেলাটারই বেশী চল ছিল; ডাক তুরুপ, দেখা বিন্তি ও বিবি-ধরা গ্যাম প্রভৃতি আরও কতকগুলি খেলা ছিল, কিন্তু আমি কোন খেলাই জানিতাম না। রঞ্জু আর টুক্‌নি একদিকে। জ্যাঠাইমা আর মেজবৌদিদি আর একদিকে। আমি

আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম, রঞ্জুরাই জিতিতেছে, আর জ্যাঠাইমারা হারিতেছেন। মাঝে মাঝে মেজবৌদিদি বলিতেছেন, "রঞ্জু, ইশারা ক'রো না ভাই। রঞ্জু হাতে রঙ থাকতে পাসিয়ে গিয়েছ?" আমি সে সব কথার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না দেখিয়া রঞ্জু হাসিতে লাগিল। বলিল, "তোকে এমন তাসখেলা শিখিয়ে দেব যে, দুদিনের মধ্যে তাসের ওস্তাদ হয়ে যাবি। আমার সঙ্গে মেজদাদা শুদ্ধ পারে না।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "পারবে কি ক'রে? তুমি যে দুষ্টু, খেলতে ব'সে খালি জুয়াচুরি কর।"

রঞ্জু মাথা নাড়িয়া বলিল, "জুয়াচুরি নয় মা, জুয়াচুরি নয়। তাসের হিসাব রাখা চাই। তুমি কি অঙ্ক জান যে, হিসাব রাখবে? তাই তুমি অত হার।" তাসখেলা প্রায় বিকাল পর্যন্ত চলিল, তাহার পর জ্যাঠাইমা ও মেজবৌদিদি উঠিয়া গেলেন, রঞ্জু আমাকে কিছুক্ষণ খেলা শিখাইল, তাহার পর বলিল, "চল্, মাঠে গিয়ে ডাণ্ডাগুলি খেলি।"

রঞ্জুর সঙ্গ আমাকে যেন দিনরাত মাতাইয়া রাখিত। স্কুলে লেখাপড়ায় নাকি সেই ক্লাসের ফার্স্ট বয়, আবার দুষ্টামিতেও তাহার জুড়ি মিলিত না। দুই-চার দিনের মধ্যে তাহার যত বন্ধু ছিল, সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হইয়া গেল। সেই বন্ধুদের মধ্যে একজন বন্ধুর নাম মহাদেবপ্রসাদ। মহাদেবপ্রসাদের বয়স পনেরো-ষোল, আর রঞ্জু মোটে দশ বছরের—কিন্তু তাহাতে বন্ধুত্বের কোন ক্ষতি হয় নাই। খগোল স্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যাণ্টনমেণ্টে মণিবাবুর দোকান, সমস্ত স্থানেই রঞ্জুর অবারিত গতি। যেখানে যখন যাইত, রঞ্জু আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইত। জ্যাঠাইমা দেখিয়া হাসিতেন ও বলিতেন, "এতদিনে মাণিকজোড় মিলেছে ভাল।"

জ্যাঠামহাশয় অফিস হইতে আসিয়া যখন ঘরের সম্মুখের দালানে 'দরি' অর্থাৎ শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন, তখন আমাদের কাছে ডাকিয়া লইয়া গল্প করিতেন। রঞ্জুর ক্লাসে সেদিন কি পড়া হইল তাহাও জানিয়া লইতেন, আবার আমরা কোথায় কোথায় গিয়াছি ও কি করিয়াছি, সব খবরই বাহির করিয়া লইতেন। হাসিয়া হাসিয়া আমাদের তাঁহার ছেলেবেলার কত গল্প শুনাইতেন, সেইজন্য জ্যাঠামহাশয়কে আমার মোটেই ভয় করিত না, বরং খুবই ভাল লাগিত।

জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামহাশয় দুই জনেই সন্ধ্যাবেলা ও সকালবেলায় ঠাকুর-ঘরে গিয়া পাশাপাশি আসন পাতিয়া বসিয়া পূজা করিতেন। ঠাকুর-ঘরে অনেকগুলি ছবি ছিল, তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের একখানি বড় ছবি সিংহাসনের উপর ছিল, সেই ছবিরই ফুলতুলসী দিয়া পূজা করা হইত। রঞ্জুও স্কুলে যাইবার সময় ঠাকুর-ঘরের দুয়ারে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ী হইতে বাহির হইত।

সেদিন সকালবেলায় আমরা নূতন গুড়ের পায়স দিয়া বাসি লুচি খাইতেছি, দাইয়ের মেয়ে সোমারিয়াও একটি বাটি লইয়া আমাদের সঙ্গেই একটু তফাতে খাইতে বসিয়াছে। খাইতে খাইতে সে তাহার মাকে ফরমাইশ করিল, "দাই গে, ছিলম ভর দে" অর্থাৎ আমার জন্য তামাক সাজ। আমি তো তাহার কথা শুনিয়া

অবাক। একে তো ঐটুকু মেয়ের তামাক খাওয়া খুবই বিশ্রী লাগে, তারপর মাকে 'মা' না বলিয়া বলিতেছে 'দাই', আবার তাহাকে তামাক সাজিতে হুকুম করিতেছে।

আমি রঞ্জুকে চুপি চুপি বলিলাম, "ভাই, সোমারিয়াটা কি অসভ্য, ঐটুকু মেয়ে তামাক খায়, আবার মাকে বলছে তামাক সেজে দিতে?"

রঞ্জু সংক্ষেপে বলিল, "হিন্দুস্থানীরা ঐ রকমই।"

কিন্তু টুকুনি শাসন করিবার এমন অবসর ছাড়িতে পারিল না, সোমারিয়াকে ধমক দিয়া বলিল, "এই সোমারিয়া, দুষ্ট মেয়ে, মাকে 'দাই' বলছিস কেন? ও তো আমাদের দাই, তোর তো মা হয়।"

জ্যাঠাইমা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হয়েছে হয়েছে, থাক্ আর সোমারিয়াকে শাসন করতে হবে না, ওকে কে শাসন করে তার ঠিক নেই! ও আমাদের দাই, সোমারিয়ারও দাই; দাই মানে যে, মাও হয়।"

এমন সময় জ্যাঠামহাশয় একখানি টেলিগ্রামের কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া জ্যাঠাইমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো শুনছ, তোমার ডেপুটী ঠাকুরজামাই যে তীর্থ ক'রে ফিরছেন, সঙ্গে তোমার ঠাকুরঝিও আসছেন। আজই এসে পেঁাছবেন, রান্নাবান্না ঠিক ক'রে রেখো।"

জ্যাঠাইমা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "আমার ঠাকুরঝি আর আমার ঠাকুর-জামাই যখন আসছেন, তখন যা ব্যবস্থা করতে হয় আমিই তা করব। তুমি এখন স্নান করতে যাও। আপিস যাওয়ার সময় রামটহলকে ব'লে দিও, যেন একটা গাড়ী নিয়ে স্টেশনে যায়; আর রঞ্জু আর রতন যদি ওঁদের আনতে যেতে চায় তবে রামটহলের সঙ্গে গাড়ী ক'রে যাবে এখন।"

নূতন লোক আসিতেছেন, ইহাতে রঞ্জুর খুবই আনন্দ, কিন্তু আমার ততটা আনন্দ হয় নাই। পিসিমা তীর্থ করিয়া ফিরিতেছেন, দিদিমা যে কবে ফিরিবেন কে জানে!

যা হউক, পিসিমা ও পিসেমশায় আসিয়া পেঁাছিলেন। জীবনে আমি তাঁহাদের কখনও দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম।

পিসিমা দেখিতে সুন্দর ও মোটাসোটা, কিন্তু পিসেমশায় রোগা ও কালো। দুইজনেরই গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আবার হাতেও রুদ্রাক্ষের মালা তাগার মত করিয়া পরা। পিসিমা তাঁর সুন্দর কপালে ভস্মের তিনটি দাগ আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। আরও দেখিলাম, পিসিমা কথা বলিতেছেন, গল্প করিতেছেন, আর এক একবার বলিতেছেন, "গুরুদেব! গুরুদেব!"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "তাই তো ঠাকুরঝি, কুম্ভে স্নান ক'রে যে একেবারে নূতন মানুষ হয়ে এসেছ দেখছি, তা এতটা ধর্ম হঠাৎ ঠাকুরজামাইয়ের ধাতে সহ্য হবে তো? তাঁর তো রামপাখীর ঝোল না হ'লে এক বেলাও চলত না।"

পিসিমা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "বৌদি, সকলই গুরুর কৃপা। কখন যে কি ভাবে কৃপা করেন তিনি, কে তা বলতে পারে? বৈদ্যনাথে তাঁর প্রথম দর্শন পাই। তিনি মানুষ তো নন, সাক্ষাৎ মহাদেব। কুম্ভে গিয়ে তাঁরই কাছে দীক্ষা পেয়েছি।"—এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া মাথায় ছোঁয়াইলেন।

পিসিমা খুব গল্প করিতে পারেন। সে গল্পের বেশীর ভাগ নিজের, স্বামীর ও ছেলেমেয়েদের সুখ্যাতি। গুরুদেবের অলৌকিক শক্তির কাহিনীও তিনি অনেক শুনাইলেন।

পিসিমা যেদিন আসিলেন, ঠিক তার পরদিনই একটি আকস্মিক বিপদ ঘটিয়াছিল। পিসিমা, জ্যাঠাইমা ও আমি বেড়াইবার জন্য গাড়ী করিয়া একজনদের বাড়ী গিয়াছিলাম। বাড়ীর কর্তার নাম শিববাবু, তিনি দানাপুরের অনেক দিনের বাসিন্দা। যখন আমরা তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিলাম, তাঁর বাড়ীতে কমিসেরিয়েটের ঘোড়াদের জন্য ছোলা বাছাই হইতেছিল। কমিসেরিয়েটের ঘোড়া অর্থাৎ গোরাদের যুদ্ধের জন্য যে সব ঘোড়া আছে, সে সব ঘোড়া বাছা পরিষ্কার ছোলা ছাড়া যা-তা ছোলা খায় না। সেই জন্য বস্তা বস্তা ছোলা রোজ বাছা হয়। যাহারা ছোলা বাছে তাহারা সারাদিন ছোলা বাছিয়া, ছয়টি করিয়া পয়সা পায়। কিন্তু তাহারা বাছিতে বাছিতে যে ছোলা খায়, তাহাতেই তাহাদের পেট ভরিয়া যায়, সেইজন্য তাহাদের খাওয়ার খরচটা বাঁচিয়া যায়। ছোলা চিবাইয়া খাইয়া কি করিয়া লোকের খাওয়ার কাজ হইয়া যায়, এটি আমার খুব আশ্চর্য মনে হইয়াছিল। রঞ্জুকে পরে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রঞ্জু সে কথায় সেই একই উত্তর দিয়াছিল, "হিন্দুস্থানীরা ঐ রকমই।"

আমাদের গাড়ী যখন শিববাবুর বাড়ীর প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকিল, সে সময় কতকগুলি গোরা ছোলা লইয়া যাইবার জন্য 'খচ্চর' বলিয়া একরকম ছোট ঘোড়া সঙ্গে আনিয়া গেটের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। আমাদের গাড়ী ভিতরে গিয়া যেমন মোড় ফিরিবে মুহূর্তে মড় মড় শব্দ হইয়া কি যে ঘটিল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম, গাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রামটহল ও কোচম্যান গাড়ীর উপর হইতে ছিটকাইয়া দূরে ছোলার বস্তার উপর গিয়া পড়িয়াছে। পিসিমা "গুরুদেব! গুরুদেব! রক্ষা কর।" বলিয়া চিৎকার করিতেছেন, আর জ্যাঠাইমা এক হাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, আর বলিতেছেন,—"গৌর! গৌর!" ঘোড়া দুটি জোয়াল ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া আমাদের ঘাড়ের উপরেই পড়িত, যদি না গোরারা তাড়াতাড়ি তাহাদের ধরিয়া ফেলিত এবং আমাদের ভাঙ্গা গাড়ীর মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিত।

এত বড় একট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, কিন্তু কাহারও বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই। বাড়ী আসিয়া জ্যাঠাইমা ঠাকুর-ঘরে গিয়া মহাপ্রভুর চিত্রপটকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গৌরচন্দ্র আজ রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে আমরা মরি দুঃখ নাই, রতনটা একেবারে পিষিয়া যাইত।" জ্যাঠাইমার কথা শেষ না হইতেই পিসিমা বলিয়া উঠিলেন, "সাক্ষাৎ মহাদেব। 'গুরুদেব, রক্ষা কর' শুনে শত ক্রোশ দূরে থেকেও তিনি কি থাকতে পারেন! দেখলে ভাই, কি ভাবে আমাদের প্রাণ বাঁচালেন?" জ্যাঠাইমা এ কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া মনে হইল না, আস্তে আস্তে বলিলেন, "ঠাকুরঝি, ভাল এক গুরুদেব পেয়েছে!" অবশ্য তাঁহার সে কথা পিসিমা শুনিতে পাইলেন না।

দানাপুরে বছর বছরই প্রায় একবার করিয়া কলেরা রোগ মহামারী আকারে

দেখা দেয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসই কলেরার সময়, কিন্তু এবার ফাল্গুন মাসেই দানাপুরে কলেরার ধুম লাগিয়া গেল।

এত শীঘ্র কলেরা আরম্ভ হইবার প্রথম কারণ, সেবার গঙ্গায় অতিরিক্ত ইলিশমাছ হইয়াছিল। ফাল্গুন মাস হইতেই জেলেরা বড় গঙ্গায় রাশি রাশি ইলিশমাছ ধরিয়া গঙ্গার ধারে স্তূপ করিতেছিল।

পয়সায় দুটো করিয়া ইলিশমাছ, লোকে সে লোভ সম্বরণ করিবে কেমন করিয়া?

দ্বিতীয় কারণ, কুম্ভমেলার ফেরত যাত্রীর দল গয়াতীর্থ করিবার জন্য দলে দলে পাটনায়, বাঁকিপুরে ও দানাপুরে নামিতেছিল। ফাল্গুন মাসে প্রায় শীত থাকে, এবার ফাল্গুন মাসেই গরম পড়িয়া গিয়াছিল।

তখনকার দিনে কলেরায় স্যালাইন ইন্‌জেকশনের কথা কেহ কানেও শোনে নাই। মেজদাদার আহার-নিদ্রা নাই, হোমিওপ্যাথী বাক্স বগলে করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেছেন। বাঙ্গালী ও বেহারী সকলের বাড়ীতেই তাঁহার ডাক পড়িতেছে। দরকার হলেই রোগীর বাড়ী রাত্রিও জাগিতেছেন।

রঞ্জুর বন্ধু মহাদেবপ্রসাদেরও কলেরা হইয়াছিল, কিন্তু খুব শীঘ্রই সারিয়া গেল। বাঙ্গালীদের বাড়ী তত বেশী অসুখ হয় নাই। তবে শহরে যেখানে ঘন-বসতি, সেখানে কোন কোন বাঙ্গালীর বাড়ীতে কলেরা দেখা দিয়াছিল। একদিন মেজদাদা আসিয়া জ্যাঠাইমাকে সংবাদ দিলেন যে, পূর্ণচন্দ্র মুখুজ্যে মশায়ের ছেলের কলেরা হয়েছে, বাঁচার আশা খুব কম।

জ্যাঠাইমা শুনিয়া যেন বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "বলিস কি রে, সাত মেয়ের পর কত ঠাকুরের দোর ধ'রে ঐ গুঁড়োটুকু হয়েছে। ও যদি না বাঁচে, ওর বাপ-মা পাগল হয়ে যাবে।"

মেজদাদা সেখানে সারারাত্রি কাটাইলেন, আরও কয়েকজন ছেলে তাঁহার সঙ্গে সেবা করিবার জন্য থাকিত, তাহারাও সারারাত্রি মুখুজ্যে-বাড়ী ছিল। সকালে আসিয়া তাহাদের একজন খবর দিয়া গেল যে, ছেলেটি রাত্রেই মারা গিয়াছে, জ্যাঠাইমার একবার সেখানে যাওয়া দরকার।

আমি জ্যাঠাইমাকে ধরিয়া বসিলাম যে, আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব। জ্যাঠাইমা অনেক আপত্তি করিলেন, বকুনিও দিলেন, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। শেষে বলিলেন, "চল্ তবে। যেখানে যাব সেখানেই ন্যাজে ন্যাজে যাবে। বাবা! এমন ছেলে আর দেখি নি!"

জ্যাঠামহাশয় বলিলেন, "সে বাড়ীতে যাও যদি, খালি পেটে যেও না, কিছু খেয়ে নিয়ে যাও। আর রত্নাকে সকালে কাঁটানটের শিকড় বাটা খাইয়েছ তো? ছেলে-মেয়েদের সবাইকে খাওয়াবে, তুমিও খাবে। ঐ ওষুধ নিয়মিত সাত দিন খেলে আর কলেরা হবার ভয় থাকবে না।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই খাওয়া হয়েছে। বিনুর হোমিওপ্যাথিও খেয়েছি, ছেলেদেরও খাইয়েছি, তোমার কোবরেজিও খাওয়া হয়েছে। এখন তুমি নিজে খাও, ঐ তোমার পাথর-বাটীতে শেকড়-বাটা ঢাকা রয়েছে।"

মুখুজ্যে-বাড়ী যাইবার জন্য আমার এত আগ্রহ কেন হইয়াছিল জানি না;

হয়তো সেই যে জ্যাঠাইমা বলিয়াছিলেন, "ছেলে না বাঁচলে ওর মা বাপ পাগল হয়ে যাবে"—সেই কথা মনে পড়িয়া কি একটা অব্যক্ত সহানুভূতির ভাব মনে আসিয়াছিল, নিজেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। এখানে আসিবার আগে আমার বাড়ীতে মামীমার ছোট খুকীটি মারা গিয়াছিল, মামীমা "ওরে, আমার ধন রে, রাতের বেলা তুই একলা কোথা গেলি রে!" বলিয়া সেই যে বুকফাটা কান্না কাঁদিয়াছিলেন, সেই কথা মুখুজ্যে-বাড়ী যাইবার সময় গাড়ীতে বসিয়া কেবলই মনে হইতেছিল।

কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। দুইখানি একতলা ঘর। একখানিতে চুনকাম করা হইতেছে ও মেজদাদাই দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিস্ত্রী দিয়া চুনকাম করাইতেছেন। মেজদাদাকে দেখিয়া আমি আসিয়াছি বলিয়া বকিবেন ভাবিয়া আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল, তাই মেজদাদা আমাকে না দেখিতে পান, সেই জন্য তাড়াতাড়ি আর একখানি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম।

সে ঘরে এক পাশে একটা ছোট তক্তপোশ, তাহার উপরে হাঁড়ি-কলসী, বাক্স-পেঁটরা অনেক কিছু রহিয়াছে। মেঝেয় যিনি কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন, তিনিই বোধ হয় মুখুজ্যে-গিন্নি। আর তাঁর চারপাশে মলিনবসনা সাতটি মেয়ে; বড়টির পরনে থান কাপড় দেখিয়া মনে হইল, সে ছোড়দিদির চেয়েও বয়সে ছোট। ছোটটি টুকুনির চেয়ে ছোট, তার বয়স হয়তো পাঁচ বছর হইবে। সব মেয়েগুলিরই মুখ শুক্‌না, পরনের কাপড় ছেঁড়া, মাথার চুলও রুক্ষ। দেখিয়া মনে হয়, মেয়েগুলি যেন কতদিন স্নান করে নাই ও উপবাস করিয়া আছে।

জ্যাঠাইমার সাড়া পাইয়াই মুখুজ্যে-গিন্নি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও দিদি, দিদি গো, কি দেখতে আর এলে দিদি? আমার সাগর-ছেঁচা মাণিক, মাণিককে যে চোরে চুরি ক'রে নিয়ে গেল দিদি গো, কিছুতে রাখতে পারলাম না!" তাহার পর কত কি বলিয়া যে কাঁদিতে লাগিলেন। আমার সে কান্না শুনিয়া প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল। যখন বলিলেন, "ঘরে ঘরে তো কত ছেলে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দিদি, আমারটি নইলে কি আর রাক্ষুসীর মুখে রুচল না?" তখন জ্যাঠাইমা রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ইশারায় বাহিরে যাইতে বলিলেন। কিন্তু বাহিরে যে মেজদাদা আছেন, না হইলে এখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া রোয়াকে গিয়া দাঁড়াইতাম। ছোট মেয়েটির দিকে নজর পড়িয়া আমার কি যে কষ্ট হইল! ঐটুকু মেয়ে কাঠের মত বসিয়া আছে, মুখে একটি কথা নাই, ছল-ছল চোখে আমার দিকে একবার চাহিল, দেখিলাম, তাহার ঠোঁট দুইখানি কাঁপিতেছে। তাহার মায়ের দৃষ্টিও সেই সময় সেই দিকে পড়িল, তিনি বলিলেন, "ঐ হতভাগা মেয়েরই তো প্রথম ভেদবমি হয়। ওই তো বাড়ীতে রোগ ডেকে আনলে। ও দু-একবার বাহ্যে-বমি ক'রে সামলে উঠল, আর আমার মাণিক যেন কর্পূরের মত উবে গেল। ওই একজন পোড়াকপালী দাঁড়িয়ে রয়েছে (বলিয়া সেই সাদা-থান-পরা মেয়েটিকে দেখাইলেন); কত খরচপত্র ক'রে বিয়ে দিলাম, বিয়ের পর দু মাস ঘুরল না, এমনি মেয়ের কপাল! ও ম'লেও তো পারত। ওরও

হাড় জুড়ত, আমাদেরও হাড় জুড়ত। তা, কই গেল? দিদি গো, আমার সাতটা মেয়ে কেন একদিনে মোল না, আমার মাণিক কেন গেল? সারের সারটুকুই কি এমন ক'রে তুলে নিতে হয়? এই কি ভগবানের বিচার?"

আমি তো এই সব কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, মাণিক কলেরা হইয়া মারা গিয়াছে, এ বেচারারা তাহার কি করিবে?

"ঐ মাণিক আবার তোমার কোলে আসবে বোন।" বলিয়া জ্যাঠাইমা অনেক প্রবোধ দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই-একটি ঠাকুরের স্থানের নামও করিলেন, যেখানে 'দোর ধরিলে' সদ্য ফল পাওয়া যায়। জ্যাঠাইমার অনেক অনুরোধে তিনি এক গেলাস শরবত খাইলেন; তারপর জ্যাঠাইমা মেয়েগুলিকেও কিছু খাওয়াইলেন। খাবার তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এই কলেরা উপলক্ষে দানাপুরে যে কত কাহিনী প্রচার হইল এবং কত হিন্দুস্থানী মেয়ের উপর কালীমায়ের ও ভূতের আবেশ হইল, তাহার সংখ্যা নাই। রাস্তায় দিনরাত 'রামনাম সত হ্যায়' শুনা যাইতেছে ও মাঝে মাঝে 'বল হরি হরিবোল'ও শুনা যায়। কত লোকে যে কত অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়াছে, সবিস্তারে তাহারই বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। রঞ্জুই সেই সকল কাহিনী সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং বৌদিদিদের ও আমাদের এবং দাই ও রামটহলকে শুনাইত। আবার মছরীবালী ও তরকারিবালীরা ও জমাদারনীও নিত্য নূতন ঘটনার সংবাদ লইয়া আসিত। এক উলঙ্গিনী কৃষ্ণবর্ণা নারীমূর্তি মশাল হাতে করিয়া সমস্ত শহরময় গভীর রাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একদিন এই সংবাদ শুনিলাম; সেই সময় আর একজন বলিল, "না না, মশাল নয়, তার হাতে খাঁড়া ছিল।" আবার একজন নাকি অমাবস্যার দিন শেষরাত্রে এক বিকট গর্জন শুনিয়াছে যে—"শহরে একটি প্রাণীও রাখব না।"

পাড়ায় পাড়ায় পূজা দিবার ধূম পড়িয়া গেল। বাঙ্গালীরা একত্র হইয়া রক্ষাকালীর পূজা করিতে লাগিলেন, হিন্দুস্থানীরাও তাঁহাদের সহিত যোগ দিল। ইতিমধ্যে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টির জন্যই হোক বা পূজা দিবার ফলেই হোক, কলেরা যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়াছিল, তেমনি খুব শীঘ্র কমিয়া গেল। মেজদাদার দলের চেষ্টায় প্রত্যেক বাড়ীতেই হাণ্ডা হাণ্ডা গরম জল ফুটিতে লাগিল। ফুটন্ত জল, টাটকা খাবার আর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—এই তিনটি প্রকরণ লইয়া মেজদাদার চিকিৎসা খুব সাফল্যের সঙ্গেই সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং সকলে মেজদাদাকে বলিল, "যা হোক বাহাদুর ছেলে বটে!"

কলেরার 'হিড়িক' কমিতে না কমিতেই দানাপুরে বরিয়াতের ধূম লাগিয়া গেল; কেননা, ফাল্গুন মাসের আর বেশীদিন নাই, সম্মুখে চৈত্র মাস। শুনিলাম, মহাদেবপ্রসাদেরও শীঘ্র 'তিলক' হইবে। মহাদেবপ্রসাদ সেদিন অসুখ হইতে উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, লগ্নপত্র অনুসারে এই ফাল্গুন মাসেই 'তিলক' না হইলে আবার অনেক দিন পিছাইয়া যাইবে, কাজেই উপায় কি?

মহাদেবপ্রসাদের তিলকে আমাদের বাড়ীশুদ্ধ তিন দিন ধরিয়া নিমন্ত্রণ হইল—অবশ্য প্রতিদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণ নয়, খাওয়ার নিমন্ত্রণ কেবল এক দিন আর প্রত্যহই নাচগান শুনিবার ও উৎসব দেখিবার নিমন্ত্রণ।

জ্যাঠাইমা অনেক দিন দানাপুরে আছেন, মহাদেবপ্রসাদের বাড়ীর সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। ছত্রী-বাড়ীর তিন বধু অর্থাৎ মহাদেবপ্রসাদের তিন ভোজাই—চন্দ্রাবতী, পুষ্পবতী ও তারাবতী তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করে, আর তাহাদের শাশুড়ী বাড়ীর কর্ত্রী 'মাইজী'ও জ্যাঠাইমাকে খুব খাতির করেন। যখন-তখন জ্যাঠাইমাকে লইয়া যাইবার জন্য ডুলী পাঠাইয়া দেন। মহাদেবের অসুখের সময় দুই-তিন দিন জ্যাঠাইমা অনেক সময়ই উহাদের বাড়ী থাকিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

বধূদের নাম সকলেরই 'বতী' দিয়া, কিন্তু মহাদেবপ্রসাদের ছোট বোনের নাম কেন চামেলিয়া হইল, ইহা ভাবিবার বিষয়। রঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রথমে বলিতে গিয়াছিল, "হিন্দুস্থানীদের ঐ রকমই হয়।" তাহার পর একটু ভাবিয়া বলিল, "ওর কিনা বিয়ে হয় নি, তাই ওকে চামেলী বৌয়া বলে, বিয়ে হ'লেই চামেলীবতী হয়ে যাবে।"

আমরা নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গিয়া প্রথমে একটা বড় বারান্দায় শতরঞ্চি বিছানো ছিল, সেখানে গিয়া বসিলাম। সামনে চিক খাটানো হইয়াছে; চিকের ওপারে প্রকাণ্ড উঠান, সেখানে পুরুষেরা জড় হইয়াছে, আর চিকের এপাশে বধূরা রঙ্গীন কাপড় পরিয়া, জরিদার ওড়নার ঘোমটা টানিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে সমস্বরে গলা মিলাইয়া গান গাহিতেছে। গানের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না। রঞ্জুকে গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "দূর বোকা, ও বুঝি গান? ও তো 'গারি' দিচ্ছে।" 'গারি' অর্থাৎ গালাগালি। কাহাকে গালাগালি দিতেছে, কেন দিতেছে এবং তাল-মান-লয়েই বা গালাগালি দিবার প্রয়োজন কি, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে এক কথায় রঞ্জু উত্তর দিল, "ওদের ঐ রকম 'গারি' দিতে হয়।"

মহাদেবের খুশির সীমা নাই—কেননা, তাহার তিলকের 'বরিয়াত' অর্থাৎ বরের জন্য তত্ত্ব আসিয়াছে। বরিয়াত দেখিবার জন্য অনেকেই ভিড় করিয়াছে, একটি প্রকাণ্ড দালান বরিয়াতের তত্ত্বে ভরিয়া গিয়াছে। পঁচিশটি বড় বড় থালা ভরিয়া মিষ্টান্ন, লাড্ডু প্রভৃতি, পঁচিশ ঝুড়ি নানাপ্রকার ফল, মহাদেবের জন্য পঁচিশখানা কাপড় ও পঁচিশখানা গায়ের রেশমী চাদর, পঁচিশটি মাথার টুপি ও পঁচিশ থান মোহর, আরও কত কি জিনিস তাহা আমার মনে নাই।

মহাদেবের মা 'মাইজী' আমাদের সকলকে সেই সব জিনিস দেখাইতে দেখাইতে জ্যাঠাইমাকে বলিলেন, "কন্যাপক্ষের অবস্থা তেমন ভাল নয়, তাই পঁচিশ দফা করিয়া জিনিস দিয়াছে। চামেলী বৌয়ারও তো সাদির কথা হইতেছে, এখন জনমপত্রি মিলিলেই হয়। উহার বেলায় কি আমাদের পঞ্চাশ দফার কম দেওয়া চলিবে? আবার দেখ, গণেশপ্রসাদের এক মেয়ে হইল। ভবানীপ্রসাদের দুই লেড়কীর একটি মরিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও একটি আছে। তখনকার দিনে এত বড় মেয়ে কি রাখিত? এখন আইন বড় কড়া। ছত্রীদের ঘরে এই সব

লেড়কীর সাদি দিতেই তো বরিয়াতে বাপ-মা সর্বস্বান্ত হয়। তারপর বরের কাছে মেয়ের বাপকে মাথা হেঁট করিতেই হয়, লেড়কী হইলে অপমান কি কম?"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "আপনাদের বরিয়াতের এত বেশী খরচ কমানো উচিত। সকলে একযোগে পরামর্শ করিয়া তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না? দেখুন তো, এই অযথা বরিয়াতের খরচ করিয়া কত ছত্রীপরিবার সর্বস্বান্ত হইতেছে!"

জ্যাঠাইমার অজ্ঞতা দেখিয়া মাইজী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তাও কি হয় বহিন! জানের চেয়ে মান অনেক বড়।"

এমন সময় একজন দাই গণেশপ্রসাদের লেড়কীকে কোলে করিয়া আনিল। কি সুন্দর খুকীটি! বয়স আট-নয় মাস হইবে। ছোট ছোট দুটি ঝিকঝিকে দাঁত বাহির করিয়া কেবলই হাসিতেছে। আর হাত-মুখ নাড়িয়া কি যে বকিতেছে নিজেই জানে। দেখিবামাত্র রঞ্জু ছুটিয়া গিয়া দাইয়ের কোল হইতে খুকীটিকে যেন কাড়িয়া লইল এবং তাহাকে নাচাইয়া দোলাইয়া, মাথার উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া যেন বল-লোফালুফি করিতে লাগিল; খুকীরও ভয় নাই, কেবল খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। কি সুন্দর সেই হাসি!

মাইজী রঞ্জুর কান্ড দেখিয়া একটু যেন বিরক্ত হইলেন; বোধ হয় মেয়ের অত আদর তাঁহার ভাল লাগিল না। শ্লেষের সঙ্গে যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ, "হাঁ, পেয়ার কর, বহুৎ পেয়ার কর। ভারি আমার আদরের লেড়কী! গণেশকে ফতুর করিবার জন্যই না উহার জন্ম! গণেশ তো মেয়ে লইয়া আহ্লাদে বাঁচে না, যেন তাহার ইষ্টদেবী আসিয়াছেন।"

সেইদিন রাত্রে ছত্রীদের বাড়ীতে অনেক লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। দানাপুরের প্রায় সকলের বাড়ীই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় গণেশপ্রসাদ ছুটিতে ছুটিতে আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "মেজদাদা ও জ্যাঠাইমাকে এখনই যাইতে হইবে, তাহার লেড়কীর বড় অসুখ, বাঁচে কিনা সন্দেহ।"

এই খুকীকে দুপুরবেলায় দেখিয়া আসিয়াছি, ইহার মধ্যে তাহার কি হইল? গিয়া দেখিলাম, খুকী যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, খুকীর মা মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। জ্যাঠাইমাকে দেখিয়া "আগে মৈয়াগে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, শাশুড়ীর "চুপো, চুপো" শাসন শুনিয়াও চুপ করিতে পারিল না।

মেজদাদা গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার জন্য আফিং খাওয়ায়, না?" গণেশ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল।

মেজদাদা বলিলেন, "বুঝতে পেরেছি, আজ কাজের বাড়ীতে মেয়ে পাছে জেগে উঠে বিরক্ত করে ব'লে বেশী ক'রে আফিং দেওয়া হয়েছিল। কেমন, তাই না?"

গণেশপ্রসাদ মায়ের দিকে একবার চাহিল, কিন্তু একথার কিছু উত্তর কেহ দিল না।

মেজদাদা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আফিং খাইয়েছিল কে?"

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব পাওয়া গেল না।

মেজদাদা তখন বলিলেন, "কতটা আফিং বেশী দেওয়া হয়েছিল?"

মাইজী এবার মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "থোড়েই ঘাস্তি।"

জ্যাঠাইমার হঠাৎ কি যেন মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয় গৌর! জয় গৌর! ভয় নেই, মেয়ে বেঁচে যাবে। আমার কাছে সেই শেকড় আছে, খেলেই বমি হয়ে পেটে যা কিছু আছে উঠে যাবে। সেবার মিত্তির-বাড়ীর খোকা তার ঠাকুরদাদার কৌটা থেকে আফিমের গুলি খেয়ে ফেলেছিল, ঐ ওষুধেই বেঁচে গেল। রঞ্জু, দৌড়ে যা, ঠাকুর-ঘরে মাঝের তাকে পিতলের কৌটায় আছে, ছুটে গিয়ে নিয়ে আয়।"

সে যাত্রা অনেক কষ্টে খুকী বাঁচিয়া গেল। কেহ কেহ নাকি বলিয়াছিল, না বাঁচিলেই ভাল হইত, বেচারারা মেয়ের বিয়ের বরিয়াতের দায় হইতে বাঁচিয়া যাইত। মাইজী কি ভাবিয়াছিলেন জানি না, তবে তাঁহাকে তেমন খুশী দেখিলাম না। বলিলেন, "ও-মেয়ের অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে।"

—'আনন্দবাজার পত্রিকা,' শারদীয় ১৩৪৪

ক্ষেমার মা

এক মাসের উপর হইল ক্ষেমার মা হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছে। ইতিমধ্যে হাসপাতালই যেন তাহার নিজের বাড়ী হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ যে, ক্ষেমার মা হয়তো সংসার পাতিতে চিরদিনই ভালবাসিত; আর দ্বিতীয় কারণ, সেই সংসার পাতানোর সাধ হয়তো কোনদিনই তাহার মিটে নাই।

ক্ষেমার মা গোয়ালার মেয়ে, তাহার নাম বিধু ঘোষাণী। একসময় সে বাড়ী-বাড়ী দুধের জোগান দিত, তখন তাহার বিধু ঘোষাণী নামই প্রচলিত ছিল। এখন তাহার সে দুধের ব্যবসা তাহার ভাসুরপোরা দখল করিয়া লইয়াছে, তাই তাহার ঘোষাণী নামও আর লোকের মনে নাই। ক্ষেমা তাহার একমাত্র সন্তান ছিল, দশ বৎসর বয়সে সে মারা গিয়াছে, তবু শেষে ক্ষেমার মা নামটিই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

হাসপাতালের খাতায় ক্ষেমার মার বয়স লিখানো ছিল দু'কুড়ি বারো বছর অর্থাৎ বায়ান্ন বৎসর; গ্রামের যে লোকটি দয়া করিয়া তাহাকে হাসপাতালে পোঁছাইয়া দিয়া যায়—সেই তাহার এই বয়স বলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেমার মাকে দেখিলে ৬৫।৬৬ বৎসরের কম বয়সের বলিয়া মনে হয় না। যেদিন প্রথম হাসপাতালে আসে তখন সে জ্বর ও আমাশয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। দুই-তিন দিন পরে যখন তাহার প্রথম জ্ঞান হইল, তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গিয়া আবার মাথা ঘুরিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। মৃদুস্বরে বলিল, "আঃ মরণ! মাথাটা এমন করে কেন? ঘুরুণী রোগে ধরল নাকি?"

ইহার পর কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। আপনার মনে বিড়বিড় করিয়া "বাছুরটা গেল কোথা, আবার পড়ে দিল নাকি? সন্ধ্যে হোল এখনও ফিরল না" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়াছিল, পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান হইল এবং বুঝিতে পারিল—এ তাহার ঘর নয়, এটা হাসপাতাল। ভাসুরপোরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে উঠানে বাহির করিয়াছিল ও সে যে ক্ষীণস্বরে প্রাণপণে—'আমায় শেয়ালে কামড়ে খাবে, বাইরে ফেলিস নে—তোদের ব্যাগ্‌গোতা করি' বলিয়া আপত্তি জানাইয়াছিল, সে-কথাও ধীরে ধীরে তাহার স্মরণ হইল। কিন্তু তাহার পর কি হইল, কে তাহাকে দয়া করিয়া পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরের হাসপাতালে পোঁছাইয়া দিয়া গেল—তাহা তাহার কিছুই মনে পড়ে না।

মফঃস্বলের হাসপাতাল—খুব বড় নয়, নিতান্ত ছোটও নয়। দুইজন চাকর আছে। একজন জল তোলে, কাঠ কাটে, রান্নাঘর ধোয় ও বাসন মাজে; তাহার নাম দাশরথি। আর একজন রোগীদের জল, পথ্য প্রভৃতি দেয় ও দেখাশুনা করে, তাহার নাম রামটহল। দুইজন নার্স আছে, একজন ঝি আছে, ইহা ছাড়া মেথর

ও মেথরাণী আছে। কম্পাউণ্ডার দুইজন, একজন হস্‌পিট্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ও একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন আছেন। হাসপাতালের পুরোপুরি ভার এই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন বা ডাক্তারবাবুর উপর। ইহা ছাড়া প্রতিদিন সকালে সিভিল সার্জন একবার আসিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া যান।

এখন যে ডাক্তারবাবু আছেন তাঁহার নাম প্রমথবাবু, ইহার আগে ছিলেন সুদর্শনবাবু। শোনা যায়—তিনি ছিলেন বড় কড়া ডাক্তার, রোগীরা ভয়ে তাঁহার কাছে আগাইতে চাহিত না। তিনি "সব তফাত—সব তফাত" হুঙ্কার করিয়া যতদূর সাধ্য রোগীর সংস্পর্শ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে চাহিতেন। তাঁহার সময়ে হাসপাতালে বেডগুলির অনেকগুলিই খালি থাকিত, আউটডোরেও বেশী রোগী হইত না। দাতব্য হাসপাতাল, স্থানীয় লোকের চাঁদার উপরেই অনেকটা নির্ভর, কাজেই খরচ কম হইলে হাসপাতাল কমিটির পক্ষে তাহা তত অসন্তোষের কারণ হয় না; সুতরাং রোগী কম লইয়া বিশেষ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। কেবল গরীব কম্পাউণ্ডারদিগের উপরি-আয় কিছু কমিয়া যাওয়াতে তাহাদের পক্ষে অসুবিধা হইয়াছিল।

প্রমথবাবু আসার পর রোগী অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। আজকাল হাসপাতালে বেড একটিও খালি থাকে না, আউটডোরের রোগীও অনেক বাড়িয়াছে। এমন কি নূতন ডাক্তারের খ্যাতি এত বেশী যে. চার পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও ঔষধ লইতে রোগী আসিতেছে। ক্রোড়ে শিশু. হাতে শিশি ও বোতল লইয়া রোগী ও রোগিণীরা সারি সারি হাসপাতালের পথ দিয়া চলিয়াছে—এ দৃশ্য প্রতিদিনই দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগী বাড়িয়াছে সুতরাং খরচও বাড়িয়াছে। হাসপাতালের লোকজনের খাটুনিও বাড়িয়াছে, এজন্য তাহারা নূতন ডাক্তারের উপর বিষম অসন্তুষ্ট। তবে তাহাদের উপরি-আয়টাও বাড়িয়াছে—এইটিই যা হউক কিছু ভাল।

ক্ষেমার মা ক্রমশঃ আরাম হইতে লাগিল. ক্রমে উঠিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সকলে বলিল—"বুড়ি এ যাত্রা খুব বাঁচিয়া গেল।"

ক্রমে বুড়ি যেন হাসপাতালের সকলের অভিভাবিকা হইয়া দাঁড়াইল। 'বাপু বাছা' বলিয়া খোসামোদ করিতে ও আত্মীয়তা করিতে এবং ঝগড়া করিতে—উভয় দিকেই সে সমান তৎপর। নূতন রোগী আসিলেই তাহার সহিত সে একটা না একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া, তাহার ঘরকন্নার সমস্ত খুঁটিনাটির খবর লইয়া, নানা বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দিয়া ও শাসন করিয়া তাহার পরম পরিতৃপ্তি হইত। দিনে সে অন্ততঃ একবার করিয়া বে-আক্কেল ভাসুরপো ও তাহাদের বধূদের গালাগালি দিত এবং ডাক্তারবাবুর গুণকীর্তন করিয়া 'আমার মাথার যত চুল বাবার তত পেরমাই হোক্—দিনে দিনে বাড়বাড়ন্ত হোক্' বলিয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিত। এ কাজটি তাহার প্রতিদিনের নিয়মিত কাজ ছিল।

ডাক্তারবাবুরও বোধ হয় এই অনাথা বৃদ্ধার উপর একটু মমতা হইয়াছিল।

সে যখন শয্যাগত ছিল তখন তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া প্রতিদিন দুই-একটি মিষ্ট কথা বলিতেন, কি খাইতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা—তাহারও খোঁজ লইতেন। এত আদর ক্ষেমার মা জীবনে কখনও পায় নাই; 'বাবা তুমি রাজা হও' বলিতে গিয়া সে এক এক দিন আবেগে কাঁদিয়া ফেলিত।

ডাক্তারবাবুর উপর তাহার আত্মীয়তার অধিকার দিন দিন যেন বাড়িতে লাগিল। কোন দিন দূরে রোগী দেখিতে গিয়া ডাক্তারবাবু হয়তো হাসপাতালে সময়মত আসিতে পারেন নাই, সেদিন তিনি ফিরিলে ক্ষেমার মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, গিয়েছিলে কোথায়? আমি খালি পথ দেখছি, বলি—বাবা কখন্ আসবে।" আবার যেদিন বেশী রোগী আসিত, সেজন্য ডাক্তারবাবুর বাড়ী ফিরিতে দেরি হইত, সেদিন সে হয়তো রোগীর ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া হাজির হইত; বলিত—"হ্যাদে, বাড়ী যাবা কখন, রুগী দেখা কি তোমার সাঁঝতক চলবে? মুখখান যে শুকিয়ে আমসী হয়েছে।"

কম্পাউন্ডার শচীপতিবাবু বুড়িকে লইয়া মাঝে মাঝে আমোদ করিতেন, বলিতেন—"ক্ষেমার মা, হাসপাতালে এসে তুই যে ডাক্তারবাবুর মা হয়ে গেলি দেখছি! তোর কপাল ভাল।"

কিন্তু রামটহল চাকর বড়ই চটিয়া যাইত। সে বলিত, "বাবু, আপনি আর মাগীর আস্পদ্দা বাড়াবেন না, এমনিই তো যেন রাণী কি মহারাণী; দিনরাত ওর খিচখিচানিতে প্রাণ গেল!"

বাস্তবিক বুড়ির উৎপাতও কম ছিল না।—"হ্যাদে রামটহল তুমি গিয়েলে কোথা? এ রোগীটা যে জল আবানে মারা যায়! 'জল জল' করছে, ওর উঠবার তাগদ নেই, চেঁচিয়ে ডাকবারও তাগদ নেই। আমি যাই এক ঘটি জল এনে দেলাম—তবে সে খেয়ে বাঁচে।"

"হ্যাদে, এ ছেলেটা যে খাট থেকে প'ড়ে যাবে, ওডারে ভাল ক'রে শুইয়ে দিয়ে যাও না। দাই যেই তোমায় ওকে দেখতে ব'লে বাইরে গেল—তুমি সেই তক্কেই পিঠ দিলে?"

"আ মরণ! এ মাগী লুকিয়ে মুড়ি বেগুনী গিলছে দেখ। দূর্ মাগী, কাল তো বমি ক'রে ক'রে মত্তে পড়েছিলি,—আক্কেল নেই, মুড়ি পেলে কোয়ানে? রামটহল বুঝি এনে দিয়েছে?"

এইরূপ উৎপাতে রামটহল যদি ক্ষেমার মার উপর চটিয়া যায় তাহাতে তাহাকে বিশেষ দোষও দেওয়া যায় না।

হাসপাতালে প্রতিদিন বৈকালে অনেক ফেরীওয়ালা রোগীদের নিকট জিনিস বেচিতে আসে। আলুকাবেলী, চানাচুর ভাজা, অবাক জলপান, পাউরুটী-বিস্কুট, এমন কি তেলেভাজা জিলিপি প্রভৃতিও বাদ যায় না। এই সব জিনিস হাসপাতালে বিক্রয় করা নিয়মবিরুদ্ধ, কিন্তু হাসপাতালের চাকর এমন কি কম্পাউণ্ডারবাবুরাও

যেন তাহাদের দেখিয়াও দেখেন না; তাহারা নিঃশব্দে হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করে ও জিনিস বেচিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যায়। বুড়ি দেখিতে পাইলেই গজ্‌গজ্‌ করে।

দাশরথি বিশেষ সাতে-পাঁচে নাই, কিন্তু বুড়ির গজ্‌গজানিতে রামটহল বড়ই চটিয়া যায়, বলে—"ভাল আপদ, এ মাগী বিদায় হবে কবে?"

ডাক্তারবাবু বিকালের দিকে প্রায়ই হাসপাতালে আসিতেন না। যেদিন তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা থাকিত সেদিন ফেরীওয়ালারা কেমন করিয়া যেন আগেই খবর পাইত, সেদিন আর তাহারা এদিকে আসিত না। একদিন একটি জরুরী কেসে বিকালে ডাক্তারবাবু হাসপাতালে আসিয়া একজন রুটি-বিস্কুটওয়ালাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রচণ্ড ধমকে সে তখনই পলাইয়া গেল। রাস্তায় যে আরও কয়েকজন ফেরীওয়ালা দাঁড়াইয়াছিল—তাহাও ডাক্তারবাবুর নজর এড়ায় নাই।

তখনই রামটহলের ডাক পড়িল। রামটহল ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "হুজুর, টাটকা পাউরুটী খারাপ জিনিস নয়। ও রোজ আসে না, আজ এসেছে, আমি ওধারে ছিলাম, দেখতে পাই নি।"

ক্ষেমার মা নিকটেই ছিল, কিছুই বলিবে না ভাবিয়াছিল; কিন্তু তথাপি কেমন করিয়া যেন বলিয়া ফেলিল, "শুধু পাউরুটিওয়ালা? আলুকাবেলী, অবাক জলপান—এসব রোজই তো রুগীদের বেচতে আসে।"

"রোজই আসে? বল কি? কি কি বিক্রি করতে আসে? তুমি নিজে দেখেছ?"

ক্ষেমার মার তখন সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, রামটহলের দৃষ্টির শাসন না মানিয়া সে বলিল, "আমি নিজে চোখে দেখেছি বাবা, রোজই বেচতে আসে। ওই পেট-রোগা ছেলেটা পর্যন্ত কিনে খায়। আমি কিছু বললে রামটহল আমাকে দাবড়ি দিয়ে বলে কি—'তুই রুগী, রুগীর মত থাক্‌, তোর অত কথায় কাজ কি'?"

ডাক্তারবাবু রামটহলের দিকে চাহিয়া—রামটহল যে দৃষ্টির দ্বারা বুড়িকে শাসাইতেছে তাহা দেখিতে পাইলেন। তখনই নার্স, মেথর, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি সকলের ডাক পড়িল। ডাক্তারবাবুর কূট প্রশ্নে ক্রমশঃ অনেক বিষয় প্রকাশ পাইল। সেদিন রামটহলের চাকরী যাইতে যাইতে—বুড়ীর কাঁদা-কাটাতেই রহিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর যদি এরূপ ঘটে তাহা হইলে কিছুতেই তাহার চাকরী থাকিবে না ও অন্য সকলেরও শাস্তি হইতে পারে—ইহা ডাক্তারবাবু দৃঢ়ভাবে বুঝাইয়া দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

ইহার পর ক্ষেমার মার হাসপাতালে থাকা কঠিন হইয়া উঠিল।

উঠিতে বসিতে রামটহল ধমক দেয়, আর বলে, "যাও না বাবুর কাছে—লাগাও গিয়ে, লাগানী বুড়ি!"

কম্পাউণ্ডার তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আলোচনা চলে।

"বুড়ি তো সেরে গিয়েছে, এখনও ওকে রাখা হয়েছে কেন? ডাক্তারবাবু কি ওরই উপর হাসপাতালের কর্তাগিরি করবার ভার দিলেন নাকি?"

"পরের পয়সা কিনা, তাই ডাক্তারবাবুর গায়ে বাধে না। যত পারছেন হাসপাতালে রোগী ভরছেন। সিট ভর্তি হয়ে গেলেও বলছেন,—মেঝেয় বিছানা ক'রে দাও।—রোগ সারলেও হাসপাতাল থেকে রুগী ছাড়ানোর নাম নেই। এতকাল হাসপাতালে আছি, এ ডাক্তারের আমলে যেমন দেখছি, এমনটি আর কখনও দেখি নি বাবা।"

এইরূপ জল্পনা অনবরত চলিল। কিন্তু বুড়িকে তাড়াইবার উপায় বাহির হইল না। সিভিল সার্জন বাঙ্গালী, তিনি ডাক্তারবাবুকে স্নেহ করেন ইহাও সকলে লক্ষ্য করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার কাছে সহসা ডাক্তারবাবুর নামে কিছু বলিতেও কেহ সাহস পায় না। কাজেই ক্ষেমার মা হাসপাতালেই রহিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু জানিতেন যে, ক্ষেমার মাকে হাসপাতালে আর বেশীদিন রাখা চলিবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বোধ হয় তাঁহার মনেও কিছু দুর্বলতা ছিল। ক্ষেমার মার আর জ্বর হয় না, তবে পেটের অসুখ এখনও সারে নাই। যদিও বুড়া মানুষমাত্রেরই পেটের অসুখ থাকেই, হাসপাতালে রাখিবার পক্ষে সেটা বিশেষ কোন কারণ নয়; তবুও ডাক্তারবাবু ভাবিতেন, "বুড়ামানুষ একপাশে পড়িয়া আছে, থাকুক আর দিন কতক। উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায় বটে কিন্তু এখনও খুব দুর্বল, বাড়ী গেলেই আবার বেশী অসুখে পড়িবে।"

ইতিমধ্যে একদিন সিভিল সার্জন হাসপাতালে আসিয়া মেঝেয় পাতা বিছানা লক্ষ্য করিলেন। ছোট ডাক্তারকে বলিলেন, "মেঝেয় বিছানা কেন? খাট কি হয়েছে?"

ছোট ডাক্তার বিপদে পড়িলেন। কি উত্তর দিলে কি হইবে—কে জানে! বলিলেন, "সিট সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে কিনা, তাই মেঝেয় বিছানা পাতা হয়েছে।"

"সিট ভর্তি হয়ে গেলেও রোগী এলে তাকে রাখা হয়? কেন, সিট খালি নেই ব'লে ফিরিয়ে দিলেই তো হয়?"

ছোট ডাক্তারবাবু উত্তর দিবার পূর্বেই কম্পাউণ্ডার তিনকড়িবাবু বলিয়া উঠিলেন, "স্যার, ডাক্তারবাবু সিট ভর্তি হয়ে গেলেও রোগী ফিরাতে চান না। বলেন, 'আহা, অতদূর থেকে এসেছে, হাসপাতাল থাকতে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে?' কাজেই মেঝেয় সিট ক'রে দিতে হয়। সময় সময় এত রোগী হয় যে, ঘরে পা বাড়াতে গেলে চলবার পথ পাওয়া যায় না। অবশ্য এত 'ওভার ক্রাউড' হয়—রোগীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটাও ঠিক নয়।"

সিভিল সার্জন ডাক্তারবাবুকে কর্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি যে খামখেয়ালীভাবে যাহা ইচ্ছা করিবেন—ইহা তাঁহার মনে হইল না। ডাক্তারবাবু ঘরে আসিলে তিনি বলিলেন, "আপনার রোগী খুব বেশী হয়ে গিয়েছে দেখছি, মেঝেতেও বিছানা পাততে হয়েছে দেখছি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সিট একেবারেই খালি নেই। অন্ততঃ আর চারখানা খাট পাতা দরকার।"

সিভিল সার্জন চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "খাট পাতবেন কোথায়? জায়গা কই? সিট না খালি থাকলে রোগী ফিরিয়ে দেন না কেন?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "যে সব রোগীকে ফিরালে তাদের প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে তাদের রাখতেই হয়।" এই বলিয়া সম্প্রতি যে তিনটি রোগীকে সিট ভর্তি হইবার পরও রাখা হইয়াছে, তাহাদের তালিকা দিলেন। একটি আসন্নপ্রসবা প্রথম অন্তঃসত্ত্বা, প্রসব হইতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে পল্লীগ্রাম হইতে আনিয়াছিল। দ্বিতীয়টি একটি ছেলে, গাছ হইতে পড়িয়া হাত ভাঙিয়াছিল, সময়মত আসিলে হাত হয়তো কাটিতে হইত না; কিন্তু এমন অবস্থা করিয়া তাহাকে আনা হইয়াছিল যে, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার হাতটি কাটিয়া ফেলিতেই হইবে। আর একটি রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল, অবস্থা সংকটাপন্ন, তখনই তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন। এসব রোগীকে তিনি কি করিয়া ফিরাইবেন?

সিভিল সার্জন নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আত্মগতভাবে বলিলেন, "তাই তো, রোগী যেমন বেড়ে যাচ্ছে, হাসপাতালের ঘর বাড়ানো বিশেষ দরকার দেখছি।" তাহার পর সহসা ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, দেখি চেষ্টা ক'রে, কি করা যায়! যাদের অসুখ প্রায় সেরে গিয়েছে অন্ততঃ তাদের ডিসমিস করতে পারেন। সেরকম রোগী এখন কয়টি আছে?"

ডাক্তারবাবু দেখিলেন এইবার বুড়ির কথা উঠিবে, সংক্ষেপে বলিলেন, "কাল আপনাকে জানাব।"

পরদিন ক্ষেমার মাকে ডাকাইয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ক্ষেমার মা, এইবার তোমার শরীরটা বেশ সেরেছে, কেমন?"

ক্ষেমার মা একগাল হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বাবা। তুমি যে ধন্বন্তরি, তাই আমাকে বাঁচিয়েছ—নইলে, ম'রে তো গিয়েছিলাম।"

ডাক্তারবাবুর মনে হইল, "মরিলেই তোমার ভাল হইত।" মুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এবার বাড়ী যাও, কেমন? অসুখ সেরেছে, আর হাসপাতালে থাকবে কেন?"

ক্ষেমার মার মুখের হাসি নিমেষে অন্তর্হিত হইল। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। তাহার পর ভগ্নস্বরে বলিল, "বাড়ী যাব? আমার বাড়ী কোথায় বাবা?"

"কেন, তোমার নিজের বাড়ী,—যেখানে তুমি থাকতে।"

"আঃ আমার পোড়াকপাল! আমার আবার নিজের বাড়ী, গোয়ালের পাশে একখানা ঘরে প'ড়ে থাকি, তাও আবার ভাসুরপোরা সাতবার খেদিয়ে দিতে চায়। এই তো এতদিন এসেছি, তারা কি একবার খোঁজ নিয়েছে যে, 'বুড়ি মোলো, কি বাঁচলো!' মরলে তাদের ওযুজ হবে তাও তো জানে, তবু একবার কি খোঁজ নিয়েছে বাবা!"

ডাক্তারবাবু বুড়ির কাহিনী শুনিতে শুনিতে অন্যমনে পেন্সিল মুখে দিয়া

ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় কি? হাসপাতালে আর এমন করিয়া বুড়িকে কতদিন রাখা চলিবে?

বুড়ি বুঝিল, তাহাকে হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। তবুও শেষ চেষ্টা স্বরূপ বলিল, "বাবা, আমার শরীলে কিছু নেই। জ্বর ছেড়েছে তোমার ওষুধের গুণে, কিন্তু শরীল বড় কাহিল। এখানে ঘুরে বেড়াই কাজ কিছু নেই তো, বাড়ী গেলেই—গোয়াল ঝাড় আর ঘুঁটে পাত, তবে দুটি ভাত। এ শরীলে তা বরদাস্ত হবে না বাবা, আবার বিছানায় পড়ব। আর দিন কতক থাকলে তবু একটু বল পেতাম। এত তাড়াতাড়ি আমায় বিদায় দিও না বাবা, তোমায় ব্যাগ্‌গাতা করি।"

কিন্তু বিদায় দিতেই হইল। পরদিন আর একটি রোগিণী হাসপাতালে আসিল, সিভিল সার্জন তখন হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানিতেন সিট খালি নাই, তাই ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, হঠাৎ বুড়ির দিকে নজর পড়িল।

তিনি ডাক্তারবাবুকে বলিলেন, "বুড়ি তো অনেকদিন হ'ল এসেছে, ওর অসুখ কি এখনও সারে নি? আর বেশী ও সারবে না, বুড়ো হয়েছে তো! ওকে এইবার ডিস্‌মিস ক'রে দিন।"

কিন্তু বুড়ি হাঁটিতে পারিবে না, পাঁচ ক্রোশ দূরে তাহার গ্রাম। তাই ডাক্তার সাহেব একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া হাসপাতালের একজন লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইতে হুকুম দিয়া গেলেন।

ক্ষেমার মা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গরুর গাড়ীতে উঠিল, যেন সে কতকালের বাড়ী ছাড়িয়া চিরদিনের মত বিদায় লইতেছে। জনে জনের হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "দোষ ঘাট কত করেছি বাবা, কিছু মনে করিস না। বুড়িকে মনে রাখিস।" রোগী ও রোগিণী প্রত্যেকের বিছানার কাছে গিয়া বিদায় লইয়া আসিল, কিন্তু ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা হইল না, তিনি এত ভোরে হাসপাতালে আসেন না। তাই বুড়ি শচীপতিবাবুর কাছে তার শেষ আশীর্বাদ জানাইবার ভার দিয়া গেল—"বাবা আমার নর-শরীলে মহাদেব। ব'লো বাবা তাকে—বুড়ি ম'লেও তাঁর গুণ ভুলবে না। হেই বাবা, বলিস আমার কথা, ভুলিস নে যেন।"

ক্ষেমার মা চলিয়া গেল। তাহার জন্য কেহ কেহ একটু দুঃখ করিল, সেই রোগা ছেলেটা কেবল কিছুক্ষণ কোলে বসিয়া কাঁদিল।

কিন্তু পরদিনই দেখা গেল, সেই গরুর গাড়ীতেই ক্ষেমার মা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। হাসপাতালে এতদিন থাকিয়া তাহার জাত গিয়াছে, গয়লাপাড়ায় আর তাহার স্থান হইবে না; ভাসুরপোরা সে কথা ভাল করিয়াই তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। সঙ্গের লোকটি অনেক চেষ্টা করিয়াও বুড়ির ভাসুরপোদের বুড়িকে বাড়ী লইতে রাজী করাইতে পারে নাই।

ক্ষেমার মা গরুর গাড়ী হইতে নামিল, কিছু ভীত ভাব আবার খুশী-খুশী ভাবও। সঙ্গে এক নাগরী এখো গুড়, এক কাঁদি কলা ও গোটাকতক নারিকেল।

বুড়ির ঘরের দুয়ারের কাছের গাছে কাঁদিটি পড়িয়াছিল ও গুড়, নারিকেল তাহার ঘরে ছিল। ঘরে তোরঙ্গে একখানা তসর কাপড়, একছড়া সোনার মটরমালা ছিল, তাহা আর পাওয়া যায় নাই, তবে লেপ-কাঁথা যাহা ঘরে ছিল—বুড়ি তাহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

রামটহল বুড়িকে নামিতে দেখিয়া রাগে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, দাশরথি গিয়া ডাক্তারবাবুকে খবর জানাইল, "বুড়ি ফিরে এসেছে। এবার লেপ-কাঁথা-বালিশ—সব সঙ্গে এনেছে।"

ক্ষেমার মা ডাক্তারবাবুকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "বাবা, তারা আমায় ঘরে ঠাঁই দিলে না। যাবার সময় তোমার মুখখানা না দেখে গিয়ে সারা পথ দুঃখে বুক ফাটছিল, তারই লেগে ভগবান আবার ফিরিয়ে এনেছে।" তাহার পর গুড়ের নাগরী ও কলার কাঁদি সম্মুখে আগাইয়া দিয়া বলিল, "খুব ভাল গুড়, খেয়ে দেখো। আর এ কলা আমার নিজের হাতে-আর্‌জানো গাছের কলা। ভাবলাম, ফিরে যখন যাচ্ছি, বাবার জন্যে নিয়ে যাই। ঘরে ভাল গাওয়া ঘি ছিল, হাবাতেরা তা কি আর রেখেছে, সব বেচে দিয়েছে।"

ডাক্তারবাবু বুড়ির এত কথাতে কোনও উত্তর দিলেন না, কেবল বলিলেন, "আচ্ছা, ঘরে যাও।"

বুড়ি যে জায়গায় থাকিত সেখানে নূতন রোগিণীর সিট পড়িয়াছে, সে থাকিবে কোথায় ?

জ্বালানী কাঠ রাখিবার ঘরের বারাণ্ডাটি দরমা দিয়া ঘেরাইয়া সেইখানে বুড়ির জন্য একটা খাটিয়া পাতিয়া দেওয়া হইল। বারাণ্ডা ঘেরাইবার ও খাটিয়া কিনিবার খরচ ডাক্তারবাবুই দিলেন।

আরও এক মাস গেল। ইহার মধ্যে বুড়ির হাসপাতালে কায়েমীভাবেই থাকা লইয়া যে-সকল কথা হইয়াছে, ডাক্তারবাবুর কানে তাহা যদিও যায় নাই তবুও ভাবে-গতিকে ডাক্তারবাবু বুঝিয়াছেন, বুড়ির এভাবে থাকা কেহ পছন্দ করিতেছে না। মাঝে মাঝে বুড়ির নামে নালিশও আসিয়াছে। ডাক্তারবাবু ক্ষেমার মাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার স্বভাব যাইবে কোথায় ? সে হাত মুখ নাড়িয়া হাসপাতালের লোকেরা যে কিরূপ চোর ও দুষ্ট তাহার কাহিনী তাঁহাকে শুনাইয়াছে। "হেই বাবা, আমি দিব্যি গেলে বলছি, একটি কথাও আমার মিথ্যে নয়। আমি তোমায় বলি ব'লে ওরা আমায় বলে 'লাগানী বুড়ি'। সাধে বলি, ওরা রুগীদের দুধ নিজেরা বাটি বাটি চুমুক দিয়ে খায় আর তাদের দেয় জলের মত বার্লি। ওই রোগা ছেলেটা কতদিন জ্বরে ভুগছে—শুধু বার্লি খেতে চায় না, একটু দুধের জন্যে কত কান্না কাঁদিলে, আর রান্নাঘরে গিয়ে দেখি—রামটহল বাটি-ভর্তি দুধ নিয়ে খেতে বসেছে। এ আমার নিজের চোখে দেখা বাবা, যদি মিথ্যে বলি তো চোখের মাথা খাই।"

এই কথা শুনিবার পর ডক্তার প্রায়ই হঠাৎ অসময়ে হাসপাতালে আসিতে লাগিলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, বুড়ি মিথ্যা কথা বলে নাই। একদিন রোগীদের খাওয়ার সময় আসিয়া দেখিলেন—রোগীরা শুধু ডাল দিয়া ভাত খাইতেছে।

মাছ নাই কেন ?—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, আজ মাছ পাওয়া যায় নাই। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া রাঁধুনীকে হাঁড়ি নামাইয়া সমস্ত দেখাইতে বলিলেন, তাহাতে দেখা গেল এক কড়া ভাজা মাছ হে'সেলে রহিয়াছে।

আর একদিন গয়লার হিসাব লইয়া কম্পাউন্ডারের সহিত গয়লার কি কথা-কাটাকাটি হইতেছে শুনিয়া, ব্যাপার কি জানিবার জন্য ঘরে না গিয়া বারান্ডায় দাঁড়াইয়া শুনিলেন,—গয়লা উত্তেজিতভাবে বলিতেছে, "আধাআধি দস্তুরী কাটলে হাসপাতালে দুধ দেওয়া আমার পোষাবে না।" উত্তরে কম্পাউন্ডার বলিতেছে, "আর তুই যে খাঁটি দুধের দাম নিস আর আধাআধি জল দিস—তার কি ?" পরদিন গয়লার উপর হুকুম হইল যে, তাঁহার সম্মুখে গরু আনিয়া দুধ দোহাইয়া দিবে। এই সমস্ত ব্যাপারে হাসপাতাল শুদ্ধ সবাই ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলে একবাক্যে বলিল, "এ সমস্তই কান-ভাঙানী ক্ষেমার মার কীর্তি।"

কিসে কি হইল বলা যায় না, এতদিন ডাক্তার সাহেব ক্ষেমার মার কোনও খোঁজই লন নাই: কিন্তু গরুর দুধ দোহাইবার ব্যবস্থা হইবার তিন-চারদিন পরে একদিন তিনি ডাক্তারবাবুকে নিজের কামরায় ডাকাইয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "বুড়ি বুঝি আবার ফিরে এসেছে ? দেখুন প্রমথবাবু, এটা যে অনাথাশ্রম নয়, হাসপাতাল, এ কথা আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত। আমি বলি, ওকে যেন কালই বিদায় ক'রে দেওয়া হয়।"

দারুণ অপমানে ডাক্তারবাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি কেবল "আচ্ছা" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হাসপাতালে মেয়েদের ওয়ার্ডের বারান্ডার সম্মুখে তখন রামটহলের সহিত ক্ষেমার মার ঝগড়া চলিতেছে। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া বুড়ি—"দেখ বাবা, রামটহলের কীর্তি" বলিয়া কি যেন বলিবার জন্য আগাইয়া গেল, কিন্তু ডাক্তারবাবু সহসা "সাট আপ্" বলিয়া সগর্জনে ভূমিতলে এমনভাবে পদাঘাত করিলেন যে, বুড়ির কথা অর্ধপথেই থামিয়া গেল। ডাক্তারবাবুর এই রুদ্রমূর্তি সে আর কখনও দেখে নাই। "অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, বাবা বাবা" কাঁপিতে কাঁপিতে জড়িত স্বরে এই কয়টি কথা মাত্র উচ্চারণ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার বুটজুতাপরা উত্তোলিত পায়ের দিকে চাহিয়া তাঁহার ভূমিতে পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহও মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। নিজকৃত আচরণের জন্য দারুণ অনুতপ্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বুড়িকে তুলিবার জন্য আগাইয়া গেলেন। কিন্তু ক্ষেমার মা তখন কোথায় ? তাঁহার প্রাণ জীর্ণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া তখন উড়িয়া গিয়াছে।

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', বার্ষিক (দোল) ১৩৪৪

লালী

নীলিমা বানর-ছানাটির নাম রাখিয়াছিল 'লালী'। নীলিমার বাবা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চাকরীসূত্রে গিয়া সেখানকার বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিলেন, সেইজন্য সে দেশের আদরের 'দুলালী' বা 'লালী' নামটিই নীলিমা তাহার প্রিয় বানর-ছানার জন্য মনোনীত করিয়াছিল।

এই বানর-ছানার একটি ইতিহাস আছে। নীলিমার শ্বশুর-বাড়ী নদীয়া জেলার কোন শহরে। বিবাহের পর নীলিমা যখন প্রথম শ্বশুর-বাড়ী যায়, তখন তাহার বয়স পনেরো বৎসর। কিন্তু ছেলেবেলা হইতে পশ্চিমে থাকিয়া তখনও সে বাংলাদেশের মেয়েদের মত শিশুসুলভ ভাব হারায় নাই। শ্বশুর-বাড়ী গিয়া সে অসঙ্কোচে শ্বশুরের সঙ্গে গল্প করিয়াছে, শ্বশুরও তাহাতে খুশী বই বিরক্ত হন নাই, কিন্তু শাশুড়ী পাঁচজনে দেখিয়া কি বলিবে ভাবিয়া একটু ভয় পাইয়াছেন; বধূকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "নীলিরাণী, যখন বাড়ীতে পাড়ার কেউ বেড়াতে আসবে তখন তুমি ওঁর সঙ্গে কথা ব'লো না, ঘোমটা দিয়ে থেকো, কেমন?" নীলিমার, শাশুড়ীর এ সাবধান-বাণী সব সময় মনে থাকিত না, ছোট ননদ সুষমার সঙ্গে সেও সমান তালে উপর নীচে ছুটাছুটি করিত; বাপের বাড়ীতে যেমন কোন কিছু হইলেই "বাবা, দেখে যাও বাবা" বলিয়া পিতাকে ডাকিত, এখানেও শ্বশুরকে ঠিক সেইভাবেই "বাবা, বাবা" বলিয়া ডাকিত। শ্বশুর হাসিতেন, বলিতেন, "আমার পাগলী মা!"

আমের সময় দলে দলে বানর আসিয়া আমগাছ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, নীলিমার সেই বানরবাহিনী দেখিয়া আনন্দের সীমা রহিল না। বানরের উৎপাতে ছাদে আমসত্ত্ব শুকাইবার বা বড়ি দিবার সময় একজন না একজনকে অনবরত লাঠি হাতে পাহারা দিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না, দুই-একটা বানরের দলপতি একেবারে দলবল লইয়া আসিয়া পড়িত, যষ্টিধারিণী প্রহরিণী বানরের দন্তবিকাশ দেখিয়া প্রাণের দায়ে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইত, বড়ি ও আমসত্ত্ব বানরদল লুণ্ঠন করিয়া লইত। নিকারীপাড়া হইতে অনবরত বানর তাড়াইবার টিনপেটানোর শব্দ শোনা যাইতেছে, কিন্তু বানরের উৎপাত তাহাতে বিশেষ কিছু কমিত না। নীলিমার কিন্তু বানরের এই উৎপাতে আমোদই হইত, একদিন তাহার একখানি শখের দামী শাড়ী বানর ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, তাহাতেও তাহার বানরের উপর বিরাগ হয় নাই।

অবশেষে গ্রামে বন্দুকধারীর আবির্ভাব হইল এবং বানর হত্যা আরম্ভ হইল। দিন নাই, রাত নাই, বন্দুকের দুম্ দুম্ শব্দ। বেচারা বানরের দল! তাহারা প্রথমে তাহাদের বিপদের পরিণাম বুঝিতেই পারে নাই, যখন বুঝিল, তখন দিগ্‌বিদিগে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু

পলাইবে কোথায়? নির্দয় মানুষের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার কোন উপায়ই তাহারা পাইল না।

বানর-হত্যার কাহিনী শুনিয়া নীলিমার মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। শাশুড়ীর কাছে গিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "মা, আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "ছি মা, ও-কথা বলতে নেই। যাও, তোমার শ্বশুরের জন্যে পান সেজে নিয়ে এস।"

এমন সময় বাড়ীর কাছেই পথে ছেলেদের হৈ-হৈ কলরব শোনা গেল। "বানর-মারা এসেছে, ঐ রে বানর-মারা এসেছে!"

একটি ভীতা বানরমাতা শিশুকে বুকে আঁকড়াইয়া প্রাণভয়ে এক ছাদ হইতে আর এক ছাদে লাফাইয়া লাফাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ঐ যে নীলিমাদের ছাদের আলিসায় লাফাইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের দুম্ করিয়া শব্দ, বানরী ছাদ হইতে সম্মুখের পথে লুটাইয়া পড়িল।

"মা গো, কি হ'ল গো!"—বলিয়া নীলিমা কাঁদিতে কাঁদিতে নীচের তলায় ছুটিল। ননদ সুষমা আসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া থামাইল, "বৌদি, নীচেয় যেও না, ওখানে যে অনেক লোক জ'মে গিয়েছে, ওখানে গেলে মা বকবেন।"

বানর-মাতার দুই হাত যুক্ত, চক্ষু বিস্ফারিত। পিঠে গুলি বিঁধিয়াছে, বুকে-আঁকড়ানো ছানাটি কিন্তু অক্ষত আছে। বাচ্চাটি এখনও প্রাণপণে মৃতা মার বুকের আশ্রয় আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

চারিধারে ছেলের দলের ভিড়, তাহাদের নানা বিতর্ক চলিতেছে।

একজন বলিতেছে, "দেখছিস ভাই, ম'রে গিয়েছে, কিন্তু তবুও হাতজোড় ক'রেই রয়েছে।"

আর একজন বলিল, "শুনিস নি? যত বাঁদর যেখানে মরেছে সব হাতজোড় ক'রে মরেছে! মরার সময় ওরা জোড়হাত ক'রে শ্রীরামকে ডেকেছিল, ওরা সব শ্রীরামের দাস কিনা! মা বললেন, মরবার সময় ওরা শ্রীরামকে ডেকেছে, ওদের আর বানর-জন্ম হবে না।"

আর একটি ছেলে সংশোধন করিয়া বলিল, "দূর, তা কেন? ওরা হাতজোড় করে কেন জানিস? মানুষদের বলতে চায় 'আমাকে মেরো না, মেরো না।' কথা বলতে পারে না তো, তাই হাতজোড় ক'রে মিনতি করে। কিন্তু মানুষ কি নিষ্ঠুর ভাই, তবু গুলি ক'রে মেরে ফেলে।"

দুই-একটি মেয়েও সেখানে জুটিয়াছে, তাহারাও নানা মন্তব্য করিতেছে। কেহ বলিতেছে, "বাঁদরের উৎপাতে প্রাণটা ঝালাপালা হয়েছিল, এইবার পাড়া ঠাণ্ডা হবে।" আবার কেহ বলিতেছে, "ওরা অবোলা প্রাণী, ওদের কি দোষ, পেটের জ্বালায় চুরি ক'রে খায়। তাই ব'লে এমন ক'রে কি জীবহত্যে করতে হয়?"

বানর-ছানাটি যেন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, নড়িতেও পারিতেছে না। তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া একটি চার বছরের ছেলে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা

করিল, "হ্যাঁ মা, তুমি যখন খুকীকে কোলে ক'রে দুধ খাওয়াও তখন যদি তোমাকে কেউ গুলি করে, তা হ'লে খুকী কি করে? চুপ ক'রে থাকে, না চেঁচায়?"

তাহার পিসিমা তাহার পিঠে গুম্‌ করিয়া এক কিল বসাইয়া বলিল, "দূর হতভাগা ছেলে, যত সব অনাছিষ্টি কথা! চল্‌, বাড়ী চল্‌।"

সকলেই তো নিজের নিজের বাড়ীতে চলিল, কিন্তু ছানাটির কি হইবে? নীলিমার বিষম ভাবনা হইল। নীলিমা বলিল, "ভাই ঠাকুরঝি, ছানাটাকে চুপে চুপে নিয়ে এস না ভাই, একটু দুধ খাইয়ে দিই।"

কিন্তু সুষমার সে সাহস হইল না। অবশেষে নীলিমা শ্বশুরের কাছে গিয়া আবেদন করিল। তখন ছানাটিকে আনা হইল বটে, কিন্তু শাশুড়ী ইহাতে একটু বিরক্ত হইলেন। নীলিমা সেদিন সমস্ত বৈকালবেলা শাশুড়ীর মাথার বেতো চুল তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিল।

সেই অবধি ছানাটি নীলিমার কাছেই রহিয়া গেল। তাহাকে পলিতা করিয়া দুধ খাওয়ানো, তাহার গায়ের লোমগুলি ব্রাশ দিয়া পরিষ্কার করা, তাহাকে সাবান দিয়া ঈষৎ গরম জলে স্নান করানো, পাউডার মাখানো, এ সমস্ত কাজে নীলিমার বিন্দুমাত্র আলস্য নাই। পাড়ার ঠানদিদি ঠাট্টা করিয়া নীলিমাকে বলিতেন, "কি ভাই, দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছিস নাকি? বানর-ছানার এত যত্ন, নিজের ছানা হ'লে না জানি কি করবি!"

এই ঘটনার পর তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে। নীলিমার স্বামী প্রাণতোষ কিছুদিন হইল ডিপুটী হইয়া তাঁহার কর্মস্থানে আসিয়াছেন। নীলিমাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। নীলিমার খোকাটি দেড় বছরের, তাহার দিদিমা তাহার নাম দিয়াছেন রতন। রতনের দুইটি খেলিবার সঙ্গী আছে, একটি লুসী কুকুর আর একটি লালী।

খোকা হইয়াছে বলিয়া লালীর যত্ন কিছুই কমে নাই। তাহার গলায় পলার মালা, মালার মাঝে মাঝে একটি একটি ঘুঙুর গাঁথা। তাহার জল খাইবার বাটী, ভাত খাইবার থালা, এমন কি ভাত খাইতে বসিবার ছোট একখানি পিঁড়ি পর্যন্ত আছে। সকলের যখন আহারের জায়গা করা হয়, লালীরও পিঁড়ি পাতিয়া জায়গা করা হয়। লালী তাহার নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া এমন সাবধানে ভাত খায় যে, এ-পাশে ও-পাশে একটি ভাতও ছিটকাইয়া যায় না। সেই থালা বা সেই বাটী ছাড়া অন্য পাত্রে ভাত দিলে লালী তাহা স্পর্শও করিত না।

লুসী অবশ্য এ দলে স্থান পাইত না, বাহিরের দালানে তাহার ভাত দেওয়া হইত। লুসী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না বা লালীকে হিংসা করিত না; সে জানিত, খাবার ঘরে তাহার প্রবেশের অধিকার নাই।

বিকালে লালীর জন্য ছোলাভাজা, কলা ও পেয়ারা প্রভৃতি ফল বরাদ্দ ছিল, রাত্রে রুটি আর দুধ। লালীর আলাদা ছোট খাট ও তাহাতে বিছানাও ছিল, রাত্রে

লালী নিজেই গিয়া সেই বিছানায় শুইত, অন্য কাহারও বিছানায় গিয়া উৎপাত করিত না।

তবে খোকা যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন লালীর কিছুদিন বড় কষ্টে দিন কাটিয়াছিল। খোকা হইবার পর নীলিমাকে দেখিতে না পাইয়া কয়েকদিন সে একেবারে অনাহারে ছিল, জল পর্যন্ত খায় নাই। বাধ্য হইয়া নীলিমাকে আঁতুড়-ঘরের বাহিরে আসিয়া লালীকে দেখা দিতে হইয়াছিল।

লালী প্রথম প্রথম খোকাকে হিংসা করিত, সেজন্য সে সময় তাহাকে সব সময়ই শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত, আর শোনিয়ার মা দাই খোকার পাহারায় থাকিত। অল্পদিনেই লালীর সে হিংসা সারিয়া গেল, তখন খোকা হইল পরম কৌতূহলের বস্তু। খোকাকে কেমন করিয়া কাজল পরানো হয়, ঝিনুক বাটী লইয়া দুধ খাওয়ানো হয়, মাথা চাপড়াইয়া ঘুম পাড়ানো হয়, সমস্ত লালী একান্ত-মনে লক্ষ্য করিত। একদিন সুবিধা পাইয়া তাড়াতাড়ি কাজললতা লইয়া খোকাকে কাজল পরাইতে গিয়াছিল, কিন্তু শোনিয়ার মা আসিয়া পড়াতে তাহার আর কাজল পরানো হইল না, নিজের হাতে কেবল কালি মাখাই সার হইল। তখন নীলিমার কাছে সাবান হাতে করিয়া হাজির হইল, কি না,—সাবান দিয়া আমার হাত পরিষ্কার করিয়া দাও।

লুসী বড় ভাল কুকুর। লালীর উপর তাহার হিংসা তো ছিলই না, বরং বাৎসল্যভাব ছিল। তাহার বাচ্চা হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, সেই অবধি লালীকে সে যেন পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। যখন-তখন তাহার গা চাটিয়া আদর করিত, তাহার অনেক উৎপাত নিঃশব্দে সহ্য করিত। কিন্তু বংশানুক্রমিকতার একটা প্রবল শক্তি আছে, সময় পাইলেই সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠে। লালীকে নীলিমা আদর করিত আবার শাসনও ছিল রীতিমত। নীলিমার উপস্থিতির সময় লালী যত ভদ্র, অনুপস্থিতির সময় তাহার ততটা ভদ্রতা থাকিত না। পরের বাড়ী গিয়া লালীর জাতির স্বভাব প্রকাশ পাইত। তাহার উৎপাতে আশেপাশে লোকের ঘরের চালে চালকুমড়া ও বাগানে কলাগাছে পাকা কলা নির্বিঘ্নে থাকিতে পাইত না। হাকিমের বাড়ীর বানর এবং অতি আদরের বানর,—লোকে প্রথম প্রথম সহিয়াছিল, ইদানীং প্রায়ই লালীর নামে অভিযোগ আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। নীলিমার কাছে অভিযোগ আসিলে সে ক্ষতিপূরণ দিয়া ও মিষ্টকথা বলিয়া মিটাইয়া ফেলিত, কিন্তু প্রাণতোষের কাছে অভিযোগ আসিলে তিনি রাগিয়া গিয়া নীলিমাকে বকিতেন, নীলিমা উপবাস করিত এবং লালীর বন্ধনদশা ঘটিত। কিন্তু তাহার করুণ ক্রন্দনে নীলিমা তাহাকে বেশীক্ষণ বাঁধিয়া রাখিতেও পারিত না, খুলিয়া দিয়া চোখে চোখে রাখিত, দুই-একদিন হয়তো লালী বাড়ীর বাহির হইত না, তাহার পর আবার যে-কে সেই।

একবার লালী বাহিরে গিয়া লাঠির বাড়িতে মাথায় জখম লইয়া বাড়ী ফিরিল। লালীর অবস্থা দেখিয়া নীলিমার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। অনেক সেবা-শুশ্রূষায় লালীর মাথার ঘা ভাল হইল। তখন নীলিমা তাহাকে অনেক উপদেশ দিল, বলিল, "হতভাগা বাঁদরী, বাড়ীতে এত খাও তবু চুরি ক'রে না খেলে

তোমার পেট ভরে না? এবার তোমার শিক্ষা হয়েছে কি? না, আবার যাবে পরের বাড়ী উৎপাত করতে? এবার বাড়ী থেকে বেরুলে আমিই লাঠি মেরে তোমার পা ভেঙে দেব।"

নীলিমার শাসনেই হউক অথবা লাঠির বাড়ি খাইবার ভয়েই হউক, লালী আর বাড়ীর বাহির হইত না। নীলিমার খুশীর সীমা নাই, প্রাণতোষকে ডাকিয়া বলিল, "বড় যে তুমি বল—বানরের বুদ্ধি আর কত হবে? দেখ দেখি, লালী কত লক্ষ্মী হয়েছে, আর মোটেই ফটকের বা'র হয় না।"

প্রাণতোষ হাসিয়া বলিল, "বরাবরই কি আর বানর থাকবে, তোমার কাছে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ ও মানুষই হয়ে যাবে দেখছি। আমাকেও তো মানুষ ক'রে তুলেছ তুমি!"

নীলিমা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "যাও, তোমার কেবল ঠাট্টা! আমি কি তাই বলেছি নাকি?"

ইতিমধ্যে একদিন তার আসিল, প্রাণতোষের বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, সংবাদ পাওয়া মাত্র যেন প্রাণতোষ রওনা হয়।

সন্ধ্যার সময় কেবল একটিমাত্র ট্রেন আছে, সেই ট্রেনে রওনা না হইলে সেদিন আর যাওয়া হইবে না। প্রাণতোষ তখনই ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী ছুটিল, নীলিমাকে বলিয়া গেল, "তুমি আমার জিনিসপত্র ঠিক ক'রে রেখো, আমি এসেই রওনা হব। তুমি এ কয়দিন শোনিয়ার মাকে তোমার কাছে রেখো। মহাদেও আছে, তেওয়ারী আছে, আর জমাদারও না হয় বাড়ীতেই থাকবে। যত শীঘ্র পারি আমি ফিরে আসব।"

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নীলিমা নিজেও প্রাণতোষের সঙ্গে যাইবার জন্য জিনিসপত্র গুছাইয়া ও কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। প্রাণতোষ দুই-একবার আপত্তি করিল, কিন্তু নীলিমার রোদনরক্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া বেশী আপত্তি করিতে পারিল না।

একটা কিছু বিপদ ঘটিয়াছে, লুসী তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু লালী বুঝিতে পারে নাই। খোকাকে লইয়া নীলিমা মাঝে মাঝে কাহারও কাহারও বাড়ী বেড়াইতে যায়, লালী সেইজন্য নীলিমাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিশেষ কিছু গোলমাল করিল না।

নীলিমা লুসীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিল, বলিল, "লুসী, লক্ষ্মী হয়ে থেকো, লালীকে দেখো, যেন বাইরে বেরিয়ে না যায়।" তাহার পর মহাদেও, তেওয়ারী, শোনিয়ার মা সকলকেই লালীর দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া "দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা" বলিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়া যে দিকে গোপীনাথের মন্দির সেই দিকে হাতজোড় করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "হে গোপীনাথ, গিয়ে যেন বাবাকে ভাল দেখতে পাই।" সেই সময় লালীর করুণ ক্রন্দন নীলিমার কানে আসিল।

লালী এতক্ষণে যেন বুঝিয়াছে যে, তাহার মা তাহাকে ফেলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ঠিকই যে বুঝিয়াছে তাহা নয়। একটু কাঁদিয়া চুপ করিল, ছোলাভাজা ও পেয়ারা কিছু খাইল, কিছু ছড়াইয়া ফেলিল, তাহার পর উন্মনাভাবে ঘন ঘন পথের দিকে চাহিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল, নীলিমা ফিরিল না। রাত্রি হইল—না, তখনও নীলিমা ফিরিল না। লালী তাহার বিছানায় গেল না, নীলিমা চলিয়া যাইবার সময় যেখানে ছিল সেই-খানেই বসিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। মহাদেও চাপরাসী তাহাকে খুব ভাল করিয়া জানালার সহিত শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিল, লালী তাহাতে একটুও আপত্তি করিল না।

রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা যাইতেছে লালীর অবিশ্রাম কান্না। শোনিয়ার মা এক-একবার ঘুমের ঘোরে মশা মারিবার জন্য নিজের গায়ে চপেটাঘাত করিতেছে, সেই সঙ্গে অর্ধ সচেতন হইয়া বলিতেছে, "ইয়া ক্যায়সিন মুশকিল! হরবখৎ ক্যাঁ, ক্যাঁ, ক্যাঁ!"

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, চার দিন অতীত হইল, লালীর কান্না দিনরাত সমান তালে চলিতেছে, রাত্রেও সে কান্নার বিরাম নাই। লালী খাদ্য স্পর্শও করিতেছে না, লুসীর সান্ত্বনায় দৃক্‌পাতও করিতেছে না, অবিরত পথের দিকে চাহিয়া আছে। মাঝে মাঝে স্টেশনগামী গাড়ীর চাকার শব্দ শুনিলেই চমকিয়া উঠিতেছে, ঐ বুঝি নীলিমা ফিরিল।

শোনিয়ার মা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মহাদেওকে বলিল, "জিঞ্জির খোল দেও ভাইয়া, ঘুমনে ফিরনে বেচারী ঠান্ডা হো জায়েগা।" কিন্তু শিকল খুলিতে মহাদেওয়ের ভরসা হয় না, যদি লালী কোথায়ও পলাইয়া যায়!

অবশেষে শোনিয়ার মা নিজেই লালীর শিকল খুলিয়া দিল। ছাড়া পাইয়া লালী বাড়ীর বাহিরে গেল না, ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেখিয়া শোনিয়ার মা ভাবিল, এবার লালীর মন ভাল হইয়াছে। শোনিয়ার মা তাহার জন্য কিছু খাবার আনিতে যেমন ঘরের বাহির হইয়াছে তখনই লুসীর চীৎকার শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, লালী রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

লালী ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের রাস্তা ধরিয়া ছুটিয়াছে। শোনিয়ার মা চেঁচাইতেছে, "মহাদেও! মহাদেও!" বাগদীপাড়ার ছেলের দল 'ধর্ ধর্' করিয়া ছুটিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একপাল কুকুরও ছুটিতেছে। দুই-একটি দুষ্ট ছেলে লালীর দিকে কুকুর লেলাইয়া দিল। নিরুপায় লালী কুকুরের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য নদীর দিকে দৌড়িল।

কিন্তু লালী চার-পাঁচ দিন খায় নাই, তাহার আর দৌড়িবারও শক্তি নাই। নদীর ধারে নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে, তাহার মাস্তুলের উপর লাফাইয়া উঠিতে গিয়া সে 'ঝুপ' করিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল।

কে যেন ডাঙ্গা হইতে চেঁচাইয়া উঠিল, "ঐ সেই বাঁদরটা, ডেপুটীবাবুর বাঁদর! আমাদের পাকা কলার কাঁদি সাবাড় করেছিল।" সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে "ঢিল ছোঁড়্, ঢিল ছোঁড়্" শব্দ। জলের ঢেউয়ে লালী হাবুডুবু খাইতেছে, সঙ্গে

সঙ্গে চারিধার হইতে ঢিল আসিয়া পড়িতেছে। ঐ গেল, গেল লালী ডুবিয়া। সেই সময় মহাদেও ও তেওয়ারী আসিয়া নদীর ধারে পৌঁছিল। কিন্তু কোথায় লালী? আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

পরদিন সকালে নীলিমা ও প্রাণতোষ ফিরিল। প্রাণতোষের বাবা ভাল আছেন, সুতরাং প্রাণতোষের মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। কম্পাউণ্ডে পা দিয়াই মহাদেওকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাদেও, সব্ আচ্ছা হ্যায়?"

"হাঁ হুজুর।" বলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহাদেও উত্তর করিল, "লেকেন বান্দর ঠো ভাগ্ গিয়া।"

"ভাগ্ গিয়া? কাঁহা ভাগ্ গিয়া?"

"ক্যায়সে ভাগ্ গিয়া?"

অল্প কথায় মহাদেও ঘটনাটি বিবৃত করিল।

নীলিমা খোকাকে কোলে লইয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে, কম্পাউন্ড পার হইয়া যে বারান্ডায় গিয়া উঠিবে সে সামর্থ্যও যেন তাহার নাই। শোনিয়ার মা আসিয়া তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে নিল এবং নীলিমার হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া চলিল।

এদিকে লুসী ছুটাছুটি করিতেছে। একবার সে আসিয়া নীলিমার কাপড় ধরিয়া টানে আবার প্রাণতোষের পায়ে গিয়া আঁচড়ায়, ব্যাপার কি?

প্রাণতোষ লুসীর ভাব বুঝিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, সঙ্গে রঘু, জমাদার, তেওয়ারী ও মহাদেও সকলেই চলিল, পথে আরও অনেকে সঙ্গে জুটিল।

লুসী নদীর ধারে ধারে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুদূরে একটা প্রকান্ড অশ্বত্থ-গাছ দেখা যাইতেছে, সেই গাছের তলায় পাড়ার যত কুকুর জড়ো হইয়াছে, দূর হইতেই তাহাদের চীৎকার শোনা যাইতেছে।

গাছটির এক ধারের শিকড়ের মাটি বর্ষার জলে ক্ষয়িয়া গাছটি নদীর দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার একটা ডালেব অগ্রভাগ একেবারে নদীর জলে গিয়া পড়িয়াছে। কুকুরগুলি গাছের চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে ও ঊর্ধ্বমুখ হইয়া চীৎকার ও গর্জন করিতেছে।

এখন ব্যাপারটি অনেকটা স্পষ্ট হইল। লালী জলে ভাসিয়া গাছের ডাল ধরিয়া কোনমতে গাছে উঠিয়াছে, কুকুরগুলিও গন্ধে গন্ধে গাছের তলায় আসিয়া জড় হইয়াছে এবং লুসীও লালীর সন্ধানে ঘ্রাণের সাহায্যে এখানে আসিয়া লালী যে গাছের উপর আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সম্ভবতঃ বার বার এখানে আনাগোনা করিয়াছে, কিন্তু অতগুলি কুকুরের সহিত একা লড়াই করিতে ভরসা পায় নাই। হয়তো মহাদেওয়ের পা আঁচড়াইয়া তাহাকেও ডাকিয়াছে, কিন্তু সে তাহার ভাষা বুঝে নাই।

প্রাণতোষের আদেশে কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল ও একজন গাছে উঠিয়া ঘন পত্রের অন্তরালে লুক্কায়িত মৃতপ্রায় লালীকে গাছ হইতে নামাইয়া আনিল। লালী দুই হাতে ও দুই পায়ে প্রাণপণে ডাল আঁকড়াইয়াছিল, যেমন-ভাবে সে বন্দুকের গুলিতে হত মায়ের বুক আঁকড়াইয়াছিল।

কিন্তু প্রায় পতনোন্মুখ অবস্থায়,—কেননা তাহার হাতে ও পায়ে আর জোর ছিল না, সম্ভবতঃ আর অল্পক্ষণ পরেই সে গাছের তলায় পড়িয়া যাইত।

শেষ মুহূর্তে সে যে রক্ষা পাইল, সে কেবল লুসীর গুণে। প্রাণতোষ তাহাকে কোলে করিয়া বাড়ী আসিলেন। বাড়ী ফিরিয়া নীলিমার কোলে দিয়া বলিলেন, “এই নাও, তোমার লালীকে। জ্যান্ত তো বাড়ী ফিরিয়ে এনেছি—এখন বাঁচুক আর মরুক।”

—‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, শারদীয় ১৩৪৫

সিকি চুরি

ব্যাপারটা অতি সামান্য, একটা সিকি চুরি।

কিন্তু সকলের পক্ষে সেটা খুব সামান্যও নয়। অন্তত চুরি ব্যাপারটার সঙ্গে যাহার যোগ আছে বলিয়া অনুমান করা হয়, তাহার পক্ষে তো নয়ই।

১২৮০ সালের কলিকাতা। খোলা নর্দমা ও পানা পুকুর যত্রতত্র। মোটর বা ইলেক্ট্রিক ট্রামের কল্পনাও কেহ করিতে পারে না। রাস্তায় গ্যাসের আলো, গৃহস্থের বাড়ী রেড়ীর তেলের প্রদীপ ও বড়মানুষের বাড়ী সেজের আলো অন্ধকার দূর করে। যে বাড়ীর কথা আমরা বলিতেছি, সেটি সেকেলে বড়মানুষের বাড়ী। সম্মুখে বৈঠকখানা-বাড়ী, ভিতরে প্রকাণ্ড উঠান ও চণ্ডীমণ্ডপ। আরও ভিতরের দিকে অন্দরমহল এবং অন্দরমহলের পিছনে খিড়কীর পুকুর ও বাগান। বাগান এক নম্বর ঘন রাংচিতার বেড়া এবং দুই নম্বর ইঁটের প্রাচীরে বেষ্টিত।

বাড়ীটি বড়লোকের বাড়ী, কিন্তু এখন যাঁহারা এ বাড়ীতে বাস করেন, তাঁহারা বড়লোক নহেন, সম্পন্ন গৃহস্থ। দেশে তাঁহাদের বাড়ীঘর ও জমিদারিও কিছু আছে। কলিকাতায় তাঁহারা ভাড়া বাড়ীতে আছেন। পরিবারবর্গ কতক দেশের বাড়ীতে কতক বা কলিকাতার বাড়ীতে থাকেন।

কলিকাতার বাড়ীতে এখন আছেন বাড়ীর গৃহিণী স্বর্ণময়ী দেবী, তাঁহার ছয় ছেলে, একটি ভাসুর-পুত্র, দুটি দেবর-পুত্র, ছয়টি বধূ—পাঁচটি তাঁহার নিজের পুত্রবধূ ও একটি ভাসুরের পুত্রবধূ, তিনটি বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যা, নাতি-নাতনী এবং জন-দুই আশ্রিতা। তাঁহার এক বিধবা বৈবাহিকা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন এ বাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

এতবড় পরিবারে রাঁধুনী বামুন নাই, বাড়ীর মেয়েদের উপরেই রান্নার ভার আছে। তখনকার দিনে উড়িষ্যাদেশ হইতে দলে দলে রাঁধুনী বামুন বাঙ্গলা দেশে আসে নাই। বড়লোকের বাড়ী রাঁধুনী ব্রাহ্মণ অথবা রন্ধনকারিণী থাকিত বটে, কিন্তু গৃহস্থের বাড়ীতে প্রায় বাড়ীর মেয়েরাই রন্ধন করিতেন।

এ বাড়ীতে কর্ত্রী নিজেই এক বেলা রন্ধন করেন, বধূরা সাহায্য ও পরিবেশন করে, অন্য বেলা একজন আশ্রিতা আত্মীয়া ও বধূ এবং কন্যারা মিলিয়া মিশিয়া রন্ধনকার্য নির্বাহ করেন। এ বাড়ীর ইহাই রীতি।

মাঘ মাসের শেষ, এখনও খুবই শীত আছে। খিড়কীর বাগানের আমগাছগুলি আমের মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে। পুকুরের বাঁধা-ঘাটে বাড়ীর মেয়েরা কেহ স্নান করিতে আসিয়াছে, কেহ বা স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। পুকুরের আর এক ঘাটে প্রসন্ন ঝি একরাশি বাসন লইয়া মাজিতে বসিয়াছে। পুকুরপাড়ের কুলগাছ হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটি পাকা কুল ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রসন্ন মাঝে মাঝে ছাই-মাখা হাত ধুইয়া সেইগুলি কুড়াইয়া কোঁচড়ে রাখিতেছে এবং আপনমনে বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে,—"ছেলেগুলোর জ্বালায় একটা পাকা কুল পাওয়ার জো নেই।"

বেলা প্রায় দশটা। চাকর বাজার আনিয়া বাজারের তরকারির ধামা ও বাজার-ফেরত পয়সা রোয়াকের উপর রাখিয়া গেল। সেই পয়সার ভিতর ছিল চক্‌চকে নূতন একটা সিকি।

কর্ত্রী বাজার বুঝিয়া লইয়া হাঁকিয়া বলিলেন, "ন বৌমা, বাজারের ধামাটা এসে ঘরে তোল তো, আর পয়সাগুলোও তাকের উপর তুলে রাখ, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।"

ন বৌ মাছ কুটিতে বসিয়া ছিল, সেখান হইতে সাড়া দিল, "এই মাছের চুবড়িটা রান্নাঘরে রেখে যাচ্ছি মা।"

ন বৌয়ের আসিতে দেরি হইবে বুঝিয়া কর্ত্রী নিজেই আবার বাজার তুলিতে গেলেন, গিয়া দেখিলেন, বাজার-ফেরত পয়সাগুলি আছে, কিন্তু সিকিটি নাই।

"তাজ্জব কথা! সিকিটা কি উড়ে গেল নাকি? আমোদিনী, আমোদিনী, দেখ তো ছেলেরা কেউ সিকিটা নিয়ে গেল নাকি?"

আমোদিনী কর্ত্রীর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা, বয়স দশ বৎসর। দৌত্যকার্যে, ঝগড়া করিতে এবং ভাব করিতে, সকলের ফরমাইশ খাটিতে সুনিপুণা। মায়ের ডাক শুনিয়া "কি মা, ডাকছ কেন?" বলিয়া দোতলার বারান্দা হইতে উত্তর দিল।

স্বর্ণময়ী বলিলেন, "এই রোয়াকের উপর রাসলাল বাজার-ফেরত পয়সা রেখে গিয়েছিল, তার মধ্যে একটা সিকি ছিল, দেখতে পাচ্ছি না। দেখ তো, টেঁপি, নালু, ভুলু, মদন, খোদন, মণ্টি—কে কোথায় রয়েছে! ওরাই কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে বোধ হয়!"

আমোদিনী টেঁপির ছোটমাসী, টেঁপির বয়স সাত ও আমোদিনীর বয়স দশ। পিঠাপিঠির বোনের মত দুইজনের মধ্যে বিবাদ লাগিয়াই আছে।

টেঁপি দোতলার দরদালানের এক কোণে তখন পুতুলের সংসার লইয়া তন্ময় হইয়া আছে। পুতুলের ভিতর ছেলে-পুতুল অর্থাৎ কোঁচা-কাছা-দিয়া-কাপড়-পরা পুতুলগুলি এক দিকে বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে, আর অন্য দিকে অন্দরমহলে বৌ-পুতুলগুলি ঘোমটা দিয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছে। সবই এক পয়সা দামের বেনে-পুতুল।

পুতুলের বালিশ বিছানা তৈরী করা ও কাপড় পরানো প্রভৃতি বিষয়ে টেঁপির রাঙ্গামাসী টেঁপিকে বিশেষ সাহায্য করে, সেজন্য টেঁপি রাঙ্গামাসীর বড়ই অনুগত। রাঙ্গামাসীর এক বৎসর মাত্র বিবাহ হইয়াছে, তখন তাহার বয়স ছিল এগারো। এখন সে বারো বছরের মেয়ে। বারো বছরের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ীর বৌ, ছয় মাস হইল ঘর করিতে আসিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার পুতুলখেলার নেশা কাটে নাই। এজন্যই বোধ হয় টেঁপির সঙ্গে তাহার এত বন্ধুত্ব।

আমোদিনী গিয়া দেখিল, টেঁপি একটি ছোট বেনে-পুতুলকে লেপ চাপা দিয়া শোয়াইতেছে, আর আপনমনে বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে, "ভাবনায় ভাবনায় প্রাণটা গেল! আজ আবার ছোট মেয়েটার গা গরম হয়েছে।"

আমোদিনী পিছন হইতে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ও ছোড়্‌দাদা, ও মেজদি, শুনে যাও, শুনে যাও। কি মজার কথা! টেঁপির 'ভাবনায় ভাবনায়

প্রাণটা গেল!' শোন শোন, শুনে যাও না। আজ নাকি ওর ছোট মেয়ের গ গরম হয়েছে!"

টেঁপি ভয়ানক চটিয়া গেল। ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "ছোটমাসী ভারি দুষ্টু, যাও বলছি, যাও এখান থেকে। ভাল হবে না বলছি।"

টেঁপি যে সিকির খবর জানে না তাহা বুঝাই গেল।

মদন ছিল উঠানে, তখন তাহার ডাক পড়িল। "মদন, মদন, রোয়াকের উপর সিকিটা ছিল, তুই নিয়েছিস, না?"

মদনের সে কথায় ভ্রূক্ষেপই নাই। সে তখন একটা লাঠি ঘাড়ে করিয়া উঠানের একবার এ দিকে ছুটিতেছে, আবার অন্য দিকে ছুটিতেছে। লাঠির মাথায় একটা ছেঁড়া কাপড়ের বোঁচকা বাঁধা এবং মদনের হাতে একটা ভাঙ্গা লোহার শিকল। সেই শিকল বাজাইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাঁকিতেছে, "ডাক যাচ্ছে, ডাক যাচ্ছে! কোম্পানী বাহাদুরের ডাক যাচ্ছে! তফাত! তফাত!"

লালু লাট্টু ঘুরাইতেছিল এবং ভুলু কুলতলা ও আমতলায় কসি আম ও পাকা কুলের সন্ধানে ঘুরিতেছিল। সকলকেই একে একে তল্লাশি ও জেরা করা হইল। কিন্তু কোনখানেই সিকির খোঁজ পাওয়া গেল না।

বড়বাবু হরেন্দ্রনাথ খাইতে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, "মা, আমোদিনীর খুব কাজ জুটিয়ে দিয়েছ তো! আমার মনে হচ্ছে দারোগাই হয়তো চোর। আমোদিনী, তুই সিকিটা নিস্ নি তো?"

আমোদিনী নাকী সুরে বলিল, "দেখ না মা, বড়দাদা কি বলছে?"

ইতিমধ্যে প্রসন্ন ঝি আসিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—"হেঁই মা, গুরুর দিব্বি। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, সিকি কেমন চক্ষেও দেখি নি। যে আবাগী সিকি নিয়েছে, সে চোখের মাথা খাক।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আ মোলো যা! ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে ছাই-মাখা হাতে ছুটে এল দেখ। তোকে কে ঘাটে গিয়ে সিকির খবর দিয়ে এল, আমোদিনী বুঝি?"

"আমি নয় মা, ছোড়্দাদা। আবার ছোড়্দাদা শুদ্ধু আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। বলছে, তুই নিশ্চয় সিকি নিয়েছিস। এই তো আমার আঁচলে চাবি আছে, দেখ না গিয়ে টিনের বাক্স খুলে সিকি আছে কিনা?"

গৃহিণী বলিলেন, "রণু, তুই আবার লাগলি কেন? আজ কি খাওয়াদাওয়া হবে না? ভারি এক সিকির হাঙ্গামা হয়েছে দেখছি! চুলোয় যাক সিকি। আয়, সবাই ভাত খাবি আয়।"

"বড় বৌমা, মেজ বৌমা, সেজ বৌমা, ন বৌমা, নূতন বৌমা, রাঙা বৌমা, চারু, তরু, সব খেতে আয়।"

রণেন গৃহিণীর দেবর-পুত্র, বয়স সতরো-আঠারো। অত্যন্ত আমুদে-স্বভাবের ছেলে। এত বড় সুযোগ সে ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল, "আচ্ছা, তোমাদের সকলের খাওয়া হোক না। তারপর আমি প্রত্যেককেই 'সার্চ' করব। জ্যাঠাইমাকেও বাদ দিচ্ছি না। অবশ্য, জ্যাঠাইমার স্নান আহ্নিক খাওয়াদাওয়া হতে এখন অনেক দেরি আছে, তোমাদের তার আগেই 'সার্চ' করব।"

রাঙ্গা বৌ ফস্‌ফস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মেজ ঠাকুরঝি, ছোট ঠাকুরপো কি করবে আমাদের?"

রণেন শুনিতে পাইয়া বলিল, "রাঙা বৌদি, 'সার্চ' মানে জান না, তবে আর কাঙাল হরিনাথের স্কুলে প'ড়ে শিখেছ কি? সন্ধান, সন্ধান! তোমাদের হাতবাক্স খুলে সন্ধান করব। এবার বুঝতে পেরেছ তো?"

এবার মেজদিদি কুমুদিনী কথা বলিলেন, 'হ্যাঁ, তা আর বুঝতে পারি নি! ঐ ব'লে চিঠিপত্র সব টানাটানি করবে আর কি! আমার বাক্সে আমি হাত দিতে দেব না।"

রণেন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "চিঠিপত্র? ও! তুমি যে এ কথা বলবে তা আগেই জানি। ডাকহরকরা এলেই 'শ্রীমতী কুমুদিনী' শিরোনামার চৌকো লেফাফা থাকবেই থাকবে। তিন মাসে কতগুলো চিঠি জমেছে মেজদি! আহা, থাক্‌ থাক্‌, তোমার সে সম্পত্তি নিয়ে আমি মোটেই টানাটানি করব না। বিশ্বাস না হয়, বাক্স খোলবার সময় সবাই দাঁড়িয়ে পাহারা দিও।"

খাওয়া হইলে সকলে একসঙ্গে পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল, রণেন ইতিমধ্যে সমস্ত বাক্স আনিয়া দরদালানে জড় করিয়াছে। এবার বাক্স খুলিবার পালা।

মেজ বৌ বলিল, "দেখি রণু ঠাকুরপো, তোমার হাত দেখি, হাতে ক'রে সিঁকি লুকিয়ে আন নি তো! কি জানি, তুমি যে দুষ্টু ছেলে, হয়তো কার বাক্সে একটা সিঁকি গুঁজে রাখবে।"

"আরে, যা-তা সিঁকি দিলে চলবে না। সে যে একেবারে নূতন সিঁকি, জ্যাঠাইমা বললেন শুনলে না! আচ্ছা, এই দেখ, হাত দেখ। বরং গায়ের জামাটা আমি খুলেই রাখছি।"

বাক্স খোলা আরম্ভ হইল। ভীষণ মুহূর্ত! অতি সাহসীরও এ সময় বুক ঢিপ ঢিপ করে। ইহারা তো ভীরু বঙ্গবালা। রণেন একটি একটি বাক্স খুলিতেছে ও যাহার বাক্স তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, ভাবখানা এই যে, 'কেমন জব্দ!'

প্রথমে বড় বৌদিদির, তাহার পর মেজদিদির, ক্রমশ পর পর বড় হইতে ছোটদের বাক্স খোলা হইতেছে। রাঙ্গা বৌ ভয়ে কাঠ হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে, নূতন বৌ কাঁপিতেছে, শীতে কি ভয়ে বলা যায় না।

"এইবার নতুন বৌদিদির বাক্স।"—বলিয়া রণেন হাসিয়া নূতন বৌয়ের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সিঁকিটা একেবারে পাশেই একটা খোপে রহিয়াছে, বাক্স খুলিবামাত্রই সকলের নজরে পড়িয়া গেল। রণেন একটা কিছু দিয়া যে চাপা দিবে, সে সময়ও সে পাইল না। বাস্তবিক, সে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, আমোদ করিতে গিয়া এমন অঘটন ঘটিবে, সে আগে তাহা জানিত না।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা।

নূতন বৌ একা একা কুঠুরী-ঘরে অন্ধকারে বসিয়া আছে।

কুঠুরী-ঘর বাজে জিনিসপত্র ও বাক্স-তোরঙ্গে বোঝাই, সে ঘরে বড় কেহ যায় না। ঘরে মশা ভন্‌ভন্‌ করিতেছে।

নূতন বৌয়ের বড়ই ভূতের ভয়, অন্ধকার ঘরে একটুও সে থাকিতে পারে না। একা হইলে তো কথাই নাই। কিন্তু আজ অন্ধকার সম্বন্ধে যেন তাহার কোন চেতনাও নাই।

আজ সকালে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল? এত বড় দুর্ঘটনা বোধ হয় কাহারও জীবনে কখনও ঘটে নাই। এমন দুর্ঘটনা যে তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে, কাল তাহা কি সে স্বপ্নেও জানিত?

কাল সন্ধ্যাবেলা ঠিক এমনি সময় ঘরে ঘরে প্রদীপ দিয়া তাহারা দুই জা, সুশীলা ও সে মাঝের ঘরে চুলের দাঁড় বিনাইতেছিল; দুইজনের মধ্যে পাল্লা দেওয়া হইতেছিল, আর রণু ছিল বিচারক। রণুর হাতে ছিল একটা ঘড়ি, আধ ঘণ্টায় কে কতটা দাঁড় বিনাইয়াছে—ইহাই ছিল বিচারের বিষয়। দর্শকেরও অভাব ছিল না—মেজদিদি, সেজদিদি, ন'দিদি ও ঠাকুরঝিরা সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই দৃষ্টি দাঁড়-বিনানোর দিকে। শেষে যখন রণু ঘোষণা করিল, "নতুন বৌদিদির জিত!" আঃ, তখন কি আহ্লাদ! বেচারী রাঙ্গা বৌ, মুখ চুন করিয়া বসিয়া রহিল।

আর কাল দুপুরবেলায় সেই বেহুলার ভাসানের যাত্রাগান। দরদালানের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রা করিয়াছিল, কেহই তাহাদের সে যাত্রার খবর জানিতে পারিত না, যদি না রাঙ্গা বৌ কনুইয়ের এক গুঁতা দিয়া ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া একটা বড় শার্শী ভাঙ্গিয়া ফেলিত! রাঙ্গা বৌ সাজিয়াছিল রামসিং দারোয়ান। মাথায় পাগড়ী, প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে তাহাকে মানাইয়াছিল বেশ। "রাম সিং দারোয়ান হাজির হ্যায়" বলিয়া লাফ দিয়া দিয়া তালে তালে কেমন লাঠি ঘুরাইতেছিল, ভারি চমৎকার হইয়াছিল। আর সে নিজে সাজিয়াছিল বেহুলা, তাহার গলা ভারি মিষ্টি বলিয়া শ্বশুরবাড়ীতে তাহার খুব খ্যাতি আছে। বড়দিদি চাঁদসদাগর, আর মেজ ঠাকুরঝি সনকা বেণেনী সাজিয়াছিলেন। হায় রে, তাহাকে বেহুলার মত বুঝি ভেলাতেই ভাসিতে হয়, আর সে লোকের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া!

উঃ! রাঙ্গা বৌ কি লাফ দিতেই পারে! দৌড়াইতে আর লাফাইতে তাহার খুশির সীমা থাকে না। সেদিন অন্ধকার সিঁড়িতে সে কি কাণ্ডই করিয়াছিল! অন্য কোথায় তো লাফাইতে পারে না, তাই অন্ধকার সিঁড়িতে যখন নামে, তখন তিনটা করিয়া সিঁড়ি লাফ দিয়া দিয়া নামে। এদিকে ঘোমটা দিয়া আস্তে আস্তে হাঁটে, আর সিঁড়িতে গিয়া যেই পৌঁছানো সেই সুশীলার আর এক মূর্তি। রোজই ঐ রকম লাফায়, একদিন আমার ঘাড়ে পড়িয়াছিল আর কি! তাতেও শিক্ষা হয় না। সেদিন মেজ বঠ্‌ঠাকুর সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল, আর ও নামিতেছিল লাফ দিয়া, গিয়া পড়িল একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপর। তাঁহার পিছনে আসিতেছিল

কেষ্ট চাকর জল লইয়া, তিনি আবার টাল খাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছেন। সে কি কান্ড! কলসী পড়িয়া জলে স্থলে একাকার। মা তবুও ওকে কিছু বকিলেন না, কেবল বলিলেন, "ছিঃ মা, অন্ধকার সিঁড়িতে অমন ক'রে লাফায় কি ?"

আর মেজ বঠ্‌ঠাকুর, তিনি তো কিছু বকিলেনই না, বরং বলিলেন, "দেখ মা, রাঙা বৌমার কোথায়ও লেগেছে কি না! সিঁড়িতে একটা আলো না রাখলে আর চলছে না।" আবার কহিলেন, "ছেলেমানুষ ঘোমটা দিয়ে অন্ধকারে চলতে পারবে কেন ?"

ভাবিতে ভাবিতে নূতন বৌয়ের রাঙা বৌয়ের উপর হিংসা হইল, রাগও হইল। সে ভাবিল, "আহ্লাদী আমার! উনি ছেলেমানুষ! আর আমি কি বুড়োমানুষ নাকি? সিকিটা তো আমি নেব ব'লেও নিই নি। কেবল চক্‌চকে কি একটা রয়েছে দেখে তুলে নিয়েছিলাম। মা যদি এসে না পড়তেন তবে আবার তো রেখেই দিতাম। না, মা তো তখন আসেন নি, তবে কে যেন আসছিল ব'লে মনে হ'ল। কি যে হয়েছিল তখন আমার ঠিক মনে নেই। কখন যে সিকিটা নিয়েছিলাম, কখন যে বাক্সে রেখেছিলাম, তাও আমার মনে পড়ছে না। কেন যে মরতে সে সময় ভাঁড়ার-ঘরে গিয়েছিলাম, না হ'লে সিকিটা রোয়াকেই প'ড়ে থাকত, আমার চোখেও পড়ত না।"

"রাঙ্গা বৌ এসেছিল বিকালে এক বাটী কুল জরিয়ে নিয়ে। তখন আমি ছাদে ব'সে ছিলাম। দেখি, মুখটি ওর শুকিয়ে গিয়েছে। আমার জন্য মনে মনে দুঃখু হয়েছে ওর। আমায় চুপি চুপি বললে, 'নতুন দিদি, খুব ভাল কুল, একটু খেয়ে দেখ না কেমন হয়েছে।'—মর্ মুখপুড়ি, আমি কুল খাব? আমার কুল খাওয়ার সময়ই বটে, বিষ পেলে বরং খাই, ক্ষিধেও খুব পেয়েছিল, দুপুরে মোটেই ভাত খেতে পারি নি। আর সুশীলা কুল জরায় খুব চমৎকার! খেলাম একটু। খুবই খুশী হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে এলাম। কেউ যদি এসে দেখে আমি কুল খাচ্ছি, কি মনে করবে? ভাববে, 'সিকি চুরি করেছেন, লজ্জা নেই, আবার কুলের আচার খাচ্ছেন!' "

খোলা জানলা দিয়া বাহির-মহলের সম্মুখের বারান্দা দেখা যাইতেছিল, নূতন বৌয়ের সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। অন্ধকারে বারান্দায় কে ও পায়চারী করিতেছে? ঐ তো নূতন বাবু!—উনি সেই যে আমোদিনীর মুখে নূতন বৌয়ের সিকি চুরির খবর পাইয়া কখন বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, বিকালেও তো বাড়ী ফিরেন নাই। শাশুড়ী জলখাবার দিবার জন্য কত উঁহার খোঁজ করিয়াছিলেন, তখন তো উনি বাড়ী ছিলেন না! কখন ফিরিলেন কে জানে! ঐ যে ঘন ঘন পায়চারী করিতেছেন, যখন উঁহার মন খারাপ হয় তখনই উনি ঐ রকম পায়চারী করেন। কে জানে, এখন উনি কি ভাবিতেছেন! আমোদিনীটা কি দুষ্টু, তাড়াতাড়ি নাচিতে নাচিতে গিয়া খবর দিয়া আসিল, "নতুন দাদা, নতুন দাদা, নতুন বৌদিদি সিকি চুরি করেছে!" কি শুভ সংবাদই দিলেন!

আঃ, আজিকার দিনটা যদি স্বপ্ন হইত? এমন তো স্বপ্নে লোক কত কি

দেখে, স্বপ্ন দেখে কত ভয় ভাবনা হয় আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখে কিছুই সত্য নয়, সবই স্বপ্ন, তেমন যদি হইত।

কেমন করিয়া সে আর মুখ দেখাইবে? চোর, সে সিকি-চোর! পুকুরঘাটে গা ধোয়া, এ-বাড়ী ও-বাড়ী সকলে মিলিয়া সাঁতার শেখা, সাঁতার দেওয়া, জল ছিটাছিটি করা সে কি স্ফূর্তি! রাঙ্গা বৌ সাঁতার দেয়, যেন জলের মাছ। সে কলিকাতার মেয়ে, সাঁতার জানে না, রাঙ্গা বৌ-ই তাহাকে ঘড়া ধরিয়া সাঁতার দিতে শিখাইতেছিল। নতুনবাবুর তাহাতে কত ভয়! বলিতেন, "লক্ষ্মী আমার, একা একা বেশী জলে যেও না যেন। সাঁতার জান না, ডুবে গেলে আর তুমি উঠতে পারবে না।" সে কথা মনে করিয়া নূতন বৌয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মনে হইল সে যদি ডুবিয়া মরিত, তাহা হইলে ভালই হইত। নূতন বাবু নিশ্চয়ই তাহা হইলে তাহার শোকে কাঁদিতেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। কখন যে নূতন বৌ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল, ঘরে আলো। শাশুড়ী তাহার পাশে বসিয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছেন, "নতুন বৌমা, ওঠ মা, অনেক রাত হয়েছে, ভাত খেতে চল। পাগলি! অন্ধকারে ভূতের ভয় করে নি?"

দরজায় দাঁড়াইয়া নূতনবাবু। তিনি বলিলেন, "অন্ধকারে গুদাম-ঘরে শুয়ে আছে, কিছুতে কামড়ায় নি তো? সাড়া দিয়েছে তো তোমার কথায়?"

কি তাঁহার স্বরে উৎকণ্ঠা! নূতন বৌ যেন দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। সিকি চুরি বোধ হয় তাহা হইলে স্বপ্নই!

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', বার্ষিক (দোল) ১৩৪৫

অভাবনীয়

দুই বাড়ী ছিল রাস্তার এপারে ও ওপারে।

দুই বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে এবং পুরুষদের মধ্যে কেবল যাতায়াত নয়, বিশেষ আত্মীয়তাও ছিল, যদিও এক বাড়ী গোঁড়া হিন্দুর ও অপর বাড়ী ক্রিশ্চিয়ানের।

আলাপের প্রথম সূচনা এইরূপেঃ

ইঞ্জিনিয়ার তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন সকালবেলায় অসময়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং "মা, মা" করিয়া ডাকিয়া উচ্চকণ্ঠে নিজের আগমন ঘোষণা করিলেন। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ ভাসুরের সাড়া পাইয়া হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন এবং মা পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কি বাবা, ডাকছ কেন?" তারাদাস বলিলেন, "আমাদের সম্মুখের বাড়ীতে নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মুন্সেফবাবু আসছেন। আজ এগারোটার গাড়ীতে তাঁরা এসে পোঁছবেন। আমি তাঁদের এ বেলা এখানে এসে উঠবেন ব'লে তার ক'রে দিয়েছি। তোমরা খাবার ও জলখাবারের যোগাড় রাখবে। আসছেন তিনি আর তাঁর স্ত্রী, দুটি তিনটি ছেলেমেয়ে আছে, গুটি চারেকও হতে পারে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, নারায়ণ-বাবু খৃষ্টান। হিন্দুর বাড়ী অতিথি আসছেন, অতিথি নারায়ণ, এ তো তুমি জানই।"

মা হাসিলেন, বলিলেন, "আমাকে আর অত শেখাতে হবে না। আমার পেটেই তুমি হয়েছ, তোমার পেটে আমি হই নি।"

মুন্সেফ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, ফুলের মুখুটি, বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান। খৃষ্টান ধর্মে তাঁহার কিভাবে অনুরাগ হইল এবং কেনই বা খৃষ্টান হইলেন তাহার অবশ্য একটা ইতিহাস আছে। তবে তিনি একজন বিশেষ উৎসাহী খৃষ্টান ইহার ভুল নাই। কিন্তু আবার নিজের পূর্বের বংশ-পরিচয় দিয়া গৌরব করিবার দুর্বলতাটিও তাঁহার বিলক্ষণই আছে। তিনি যখন খৃষ্টান হন, তখন তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন, লোকে বলে,—খৃষ্টান হওয়ার ফলেই তিনি মুন্সেফী চাকরিটি লাভ করিয়াছেন।

মুন্সেফ-গৃহিণীর নাম শ্যামরঙ্গিণী, খৃষ্টান হইবার পর তাঁহার স্বামী শ্যাম বাদ দিয়া কেবল 'রঙ্গিণী' নামটিই রাখিয়াছেন। সাদাসিধা গৃহস্থ মহিলা, প্রথমে হিন্দুর বাড়ী আসিয়া কিছু সঙ্কুচিতা ছিলেন বটে, কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাঁহার সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তখন মাকে 'মা' বলিয়া ও মুন্সেফবাবুর দিদিকে 'দিদি' বলিয়া এমন সহজভাবে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন যেন তিনি এই বাড়ীরই বধূ। বধূদের সহিতও তাঁহার অল্পক্ষণের ভিতরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

আহারের সময় নারায়ণবাবু ও তারাদাসবাবু একত্রেই আহার করিতে বসিলেন। টেবিল-চেয়ার নয়, মাটিতেই আসন পাতিয়া খাবারের জায়গা করা হইয়াছিল, একটু দূরে দূরে। মা নিজে সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিবেশন করাইলেন এবং তারাদাসবাবু "ইনি মা" বলিয়া পরিচয় দিলে নারায়ণবাবু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

প্রথম পরিচয়ের ইহাই ইতিহাস।

এই পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণতি লাভ করিতে বিলম্ব হইল না। মা প্রতিদিনই তাঁহার নিরামিষ যাহা কিছু ব্যঞ্জন রাঁধা হইত, তাহা প্লেটে করিয়া সাজাইয়া মুন্সেফবাবুর বাড়ী পাঠাইতেন, কেননা নারায়ণবাবু নিরামিষ ব্যঞ্জন খাইতে ভালবাসেন। মুন্সেফ-গৃহিণী এ বাড়ীতে ততটা আসিতে সময় পাইতেন না। তাঁহার তিনটি মেয়ে, দুটি ছেলে। ছোট মেয়েটি মাত্র এক বৎসরের, অন্য ছেলে-মেয়েগুলিও বড় দুরন্ত। তাহা ছাড়া বাড়ী-ঘর সাজাইতে গোছাইতে তাঁহার অনেক সময় লাগিত। এজন্য তিনি আসিতে না পারিলেও এ-বাড়ীর বধূরা সুবিধা পাইলেই তাঁহার বাড়ী যাইতেন।

মা ও কাকিমাদের এই খৃষ্টান-বাড়ী যাওয়া-আসায় আপত্তি ছিল ইঞ্জিনিয়ার-বাবুর বড় ছেলে বিভূতির। বিভূতির বয়স বছর আট-নয়। এই বয়সেই সে মহা-ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে। ত্রি-সন্ধ্যা স্নান আহ্নিক গীতাপাঠ এগুলি তো আছেই. ইহার পর পৈতা লইবার পর হইতে সে মাছ মাংস একেবারে বর্জন করিয়াছে। ঠাকুরমার ঘরে ঠাকুরমা ও পিসিমার সঙ্গেই তাহার আহারের ব্যবস্থা। পারতপক্ষে বিধর্মীর ছায়া মাড়ানো উচিত নয়—নূতন মা ও কাকিমাদের এরূপ উপদেশ সে প্রায়ই দেয়. কিন্তু মুন্সেফবাবুর বড় ছেলে রিপনের সঙ্গে দেখা হইলে নিজের উপদেশের মর্যাদা নিজেই রাখিতে পারে না। বিশেষ ছোট্ট খুকী রমলা। সেই সুন্দর টুক্‌টুকে মেয়েটি। আয়ার কোল হইতে সে যখন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হাত বাড়াইয়া কোলে আসিতে চায়. তখন তাহাকে কোলে না লইয়া পারা যায় কি?

বিভূতি নিজের মনে মনে তর্ক তুলিত. ছোট ছেলেমেয়ের আবার জাত কি? ওরা তো কেবল স্বর্গ থেকে এসেছে। মাছ মাংস অখাদ্য কিছুই খেতে শেখে নি। তবে আয়ার কোলে থাকে বটে. তা অত ভাবলে আর চলে না। এই যে তাকে চামড়ার জুতা পায়ে দিতে হয়, তার তো কোন উপায় নাই। খড়ম পরিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে. কেমন বাধ-বাধ ঠেকে, চলিতে গিয়া হোঁচট খায়। আর স্কুলে ছেলেরা ঠাট্টা করে. কাজেই দায়ে পড়িয়া জুতাই তাহাকে পায়ে দিতে হয়। বেবিরও সেই রকম; ছোট্ট মেয়ে—নিজে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে না, কাজেই আয়ার কোলে উঠিয়া তাহাকে বেড়াইতে হয়।

বিভূতির একটু কবিত্বও ছিল। সে নিজের পড়িবার বইয়ে একটি কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছিল.—

"এই পুস্তক যিনি করিবেন চুরি,
স্ববংশে নিধন হবেন যাবেন যমপুরী।
এই পুস্তক যিনি করিবেন হেলা,
তাঁহারে ধরিবে যমে দ্বিপ্রহরের বেলা।"

ইত্যাদি।

অবশ্য কবিতাটি তাহার নিজের রচনা নয়, একটি সঙ্গী ছাত্রের খাতা হইতে টুকিয়া লওয়া। কিন্তু রমলার নামে সে নিজেই একটি কবিতা রচনা করিয়াছিল,—

"রমলা রমলা, সুন্দর মেয়ে,
আরো সুন্দর তুমি পরীদের চেয়ে।"

ছোটকাকিমা ও সেজকাকিমা চলিয়া গিয়াছেন। এখন আছেন কেবল নূতন মা আর ফুলকাকিমা। তাঁহারা কখন যে খৃষ্টান-বাড়ী যান আর কখন ফিরিয়া আসেন বিভূতি অনেক সময় তাহা জানিতে পারে না, কাজেই বাড়ী আসিয়া কাপড় ছাড়িলেন কি না সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ থাকিয়া যায়। তাঁহারা অবশ্য অনেক করিয়া বিভূতিকে প্রবোধ দেন যে, মুন্সেফবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহারা এমন আল্‌গোছে থাকেন যে, ছোট খুকিটা কাঁদিয়া 'খুন' হইলেও তাহাকে কোলে নেন না।

কিন্তু এত শুদ্ধাচারের বড়াই সত্ত্বেও একদিন বিভূতির কাছে তাঁহারা হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গেলেন। বিভূতি গেটের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, মা ও কাকিমা মুন্সেফবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিতেছেন, বিভূতি তাড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তোমরা পান খাচ্ছ যে! খৃষ্টান-বাড়ী গিয়ে পান খেলে?"

নূতন মার মুখ চুন হইয়া গিয়াছে, কেবল পান নয়, রঙ্গিণী দেবীর নিজের হাতের তৈরী গজা কেমন হইয়াছে তাহাও তাঁহারা চাখিয়া আসিয়াছেন যে! বিভু জানিতে পারিলে তাঁহাদের তো বাড়ীতে ঢুকিতেই দিবে না।

কাকিমার উপস্থিতবুদ্ধি অতি প্রবল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার সর্বক্ষণের সাথী পানের ডিবাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "খিষ্টান-বাড়ী পান খাব, তেমনি আমাদের পেয়েছিস নাকি? এই দেখ্‌ ডিবেয় ক'রে পান সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা সাহেব মানুষ, পান কোথায় পাবে?"

কিন্তু কোন কৈফিয়তই গ্রাহ্য হইল না। বিভূতি হাঁকিল, "বাবাজি, ইধার আও। এক লোটা পানি আউর থোড়া গোবর লাও।"

সর্বনাশ! গোবর-জল খাইতে হইবে! নূতন মার চক্ষুস্থির! তিনি কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন, "বিভু, বাবা, গোবর-জল খেলে বমি ক'রে ক'রে ম'রে যাব, হয়তো শেষে কলেরাই হবে। বরং মার ঘর থেকে এক ঘটি গঙ্গাজল এনে দে।"

কাকিমা সর্বদা সপ্রতিভ। তিনি বাবাজীর হাত হইতে গোবর-জলের ঘটি হাতে লইয়া বলিলেন, "ধরেছে যখন, যে নাছোড়বান্দা ছেলে, ও কি আর শুনবে, নূতন দিদি, চল ভাই ইঁদারার পাড়ে যাই, সেইখানে গিয়ে গোবর-জল গিলি, এখনি তো বমি হবেই।" বলিয়া ঘটি হস্তে ইঁদারার পাড়ে চলিয়া গেলেন।

কলেরা হইবার সম্ভাবনা শুনিয়া বিভুর ভয় হইয়াছিল, ইঁদারার পাড় হইতে 'হোয়াক, হোয়াক,' শব্দ শুনিয়াই বিভু তাড়াতাড়ি পাখা আনিতে ছুটিল।

পরদিন বিভূতি মা ও কাকিমার কলেরা হয় নাই দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল ও বাতাসা আনাইয়া হরির লুট দিল।

ষোল বৎসর পরের কথা। বিভূতি এখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, আশা আছে, বছর খানেকের মধ্যে ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে।

তাহার হিন্দুয়ানি এখন অনেকটা সংযত, কেননা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রের পক্ষে ত্রি-সন্ধ্যা স্নান প্রভৃতি সম্ভব নয়। তবে যতটা সম্ভব হয় সে বিষয়ে তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। ইঞ্জিনিয়ারবাবুর ইচ্ছা, বিভূতি ডাক্তারী পাস করিয়া বাহির হইলে তাহার পর তাহার বিবাহ দিবেন, কিন্তু বিভূতির নূতন মা এখন হইতেই কনে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তবে পশ্চিমে থাকেন বলিয়া কনে দেখিবার ততটা সুবিধা হইতেছে না। তাই স্বামীকে কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া দেশে ফিরিতে অনুনয় করিতেছেন।

এবার নূতন কর্মস্থলে আসিয়া ইঞ্জিনিয়ারবাবুর স্ত্রী কুমুদিনী দেবীর বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে, শাশুড়ী ননদও সঙ্গে আসেন নাই, জায়েরাও কেহ কাছে নাই। নূতন স্থানে আসিয়া এ পর্যন্ত বিশেষ কাহারও সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয় নাই। ছেলেমেয়েদেরও বড়দিনের ছুটির পরই স্কুলে পাঠাইতে হইবে। তখন দিন যে কি করিয়া কাটিবে কে জানে! তবে বিভূতি শীঘ্র আসিবে লিখিয়াছে এইটুকুই যা ভরসা।

ইঞ্জিনিয়ারবাবু আপিস হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, একটা সুখবর আছে। নারায়ণবাবু যে এখানেই আছেন।"

কুমুদিনী বলিলেন, "কোন্ নারায়ণবাবুর কথা বলছ? আমাদের মুন্সেফবাবু নাকি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁরই কথা বলছি, তিনি এখন এখানে সাব-জজের কাজে আছেন। এখানে আর তিনি নারায়ণবাবু নেই, এখন তিনি মোখারজি সাহেব। যাবে কাল তাঁদের বাড়ী তোমার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে?"

"কাল?" এত দেরি কুমুদিনীর যেন সহ্য হইতেছিল না। বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে একটা খবর পাঠিয়ে দাও যে, কাল আমি দেখা করতে যাব।"

কতদিন পরে আবার দুই বন্ধুর দেখা।

"নূতন দিদি, ভাই!"

"রুক্মিণী দিদি!"

"তোমাকে যে আর চিনতেই পারছি নে। কতদিন পরে দেখা বল দেখি! প্রভু যীশুর অপার দয়া, এ যেন অভাবনীয়!"

কুমুদিনীর মনে হইল রুক্মিণী যেন আর ঠিক সে রুক্মিণী নাই, এখন তিনি যেন কতকটা মেমসাহেব হইয়াছেন।

পশ্চিমের শহরের দারুণ ধুলো সত্ত্বেও বাড়ীখানি যেন আয়নার মত ঝকঝক করিতেছে, জিনিসপত্র সাজানো গোছানো অতি পরিপাটি। রুক্মিণী নিজে অবশ্য শাড়ী পরিয়াই আছেন, কিন্তু তবুও যেন একটু বদল বলিয়া মনে হইল।

"চপলা, অবলা, কুন্তলা—সব কেমন আছে? রিপন, বীরেন ভাল আছে তো?

রমলা—সেই তোমার কোলের খুকি এখন কত বড়টি হয়েছে? আর কটি ছেলেমেয়ে হয়েছে?"

"আর? হ্যাঁ, আরও চারটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এতগুলিকে মানুষ করা সহজ কথা কি? তোমার তো সেই যে মার মুখে শুনেছিলাম 'না বিয়িয়ে কানাইয়ের মা', স্বামীর বাড়ীতে এসেই সুষমা আর বিভুকে পেলে। তারপর, এখন আর কটি খোকাখুকি? সুষমার বিয়ে কোথায় হয়েছে? রাঙাদিদি, নদিদি, ফুলদিদি সব কেমন আছেন? তাঁদের কি ছেলেপিলে? এখানে কে কে আছে?"

কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, "এত কথার জবাব একসঙ্গে কি দেওয়া যায় ভাই! এখানে এখন বিশেষ কেউ নেই, তবে এর পর কেউ কেউ আসতে পারেন। দিদিরা, মা, ঠাকুরঝি সবাই এক রকম ভাল আছেন, তোমার কথা মাঝে মাঝে বলেন। তুমি তো এতদিনে একটা চিঠিও দাও নি।"

"সে দোষটা একা আমাকে দিলে হবে কেন ভাই! চপলা-অবলার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র উনি কি পাঠান নি? আমার মনে হচ্ছে উনি যেন বললেন, ইঞ্জিনিয়ার-বাবুকেও নিমন্ত্রণ পাঠাতে হবে। আর আত্মীয়ের মধ্যে কাকেই বা নিমন্ত্রণ পাঠাব বল, কে আমার মেয়ের বিয়েতে আসবে? যা কিছু নিমন্ত্রণ করা হ'ল বন্ধু-বান্ধবকে।"

"তা হ'লে চপলা-অবলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে? কতদিন বিয়ে হয়েছে? জামাই দুটি কেমন হ'ল?"

"যীশুর দয়ায় জামাই দুটি ভালই হয়েছে। উনি যেমন খুঁজেছিলেন, দুটিই ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, স্বাস্থ্যবান, বয়স বেশী নয়, ভাল চাকরি পেয়েছে, পয়সা-কড়িও আছে।"

কুমুদিনী বলিলেন, "বামুনের ছেলে মানে কি? ব্রাহ্মণের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে? তোমরা বামুন কায়েত মান নাকি?"

রঙ্গিণী হাসিয়া বলিলেন, "তা মানি বইকি ভাই। উনি বলেন, ধর্মের খাতিরে খৃষ্টান হয়েছি, তা ব'লে নীচু ঘরে যে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেব সে আমার বংশে হবে না। বরং বিয়ে না হয়, মেয়েরা কুমারী থাকবে। এ তো আর হিঁদুর ঘর নয় যে, মেয়ের বিয়ে না দিতে পারলে জাত যাবে! অনেক খুঁজে খুঁজে উনি ছেলে দুটিকে পেয়েছেন, একটি চাটুয্যে আর একটি বাঁড়ুয্যে। একটি ছেলের বাপ খৃষ্টান হয়েছিল, আর একটির ঠাকুরদাদা। এখনও তাদের অন্য পরিবার সব হিন্দু। ওরা খৃষ্টান বটে, কিন্তু যাওয়া-আসা আছে। আমার মত কপাল নয় যে, আত্মীয়স্বজন একেবারে জন্মের মত বিসর্জন দিয়েছে।" বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভারী হইয়া আসিল।

"তোমার বাবা মা বেঁচে আছেন ভাই?"

"হ্যাঁ ভাই, বাবা মা ভাই বোনেরা, যীশুর দয়ায় বৃহৎ পরিবার। শ্বশুরবাড়ীতেও শাশুড়ী, দেওর, ভাসুর সবই আছেন। কালনার মুখুয্যে-বাড়ী ডাকসাইটে ঘর। উনি বলেন, ওঁরা নাকি খুব বড় কুলীন, ফুলের মুখুটি না কি যে বলেন তাই ওঁরা। তুমি তো জানই ভাই, উনি খৃষ্টান হবার পর কি ভাবে আমি ওঁর কাছে আসি!

সে কথা তো তোমাকে এর আগেই বলেছি। কলেজে পড়তেন কলকাতায়, ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, বাবা-মার কত আনন্দ! হঠাৎ খবর এল—খৃষ্টান হবার খবর। ওঃ! কি দিনই সে গিয়েছে! সদাপ্রভু আমাকে মার্জনা করুন। সে দিনের দুঃখের কথা আজও ভুলতে পারি না।" বলিয়া রুক্মিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, "সে তো তোমার মুখে অনেকবার শুনেছি যে, তোমার বাবা আর ভাইয়েরা তোমাকে পাঠাতে চান নি, তোমার মা-ই চুপি চুপি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ ভাই, মা-ই আমাকে পাঠালেন। দু মাস ওঁর কোন চিঠি পাই নি। হয়তো চিঠি আসত, আমাকে কেউ দিত না। একদিন কালনা থেকে একটা ছেলে এল আমাদের বাড়ীতে, সেই চুপি চুপি আমাকে এক টুকরা কাগজ দিল, তাতে লেখা ছিল, 'রুক্মিণী, তুমি কি আমার কাছে আসবে?' আমি ওঁর কাছে একটু একটু পড়তে শিখেছিলাম, চিঠিপত্র লিখতে পারব ব'লে বিয়ের পর থেকে উনিই যত্ন ক'রে শিখিয়েছিলেন। চিঠিটা পেয়ে আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পরালাম না। অসুখ করেছে ব'লে ঘরের ভিতর গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলাম। একটু পরে মা এসে আমার মাথার কাছে দাঁড়ালেন, চুপি চুপি মুখ নীচু ক'রে বললেন, 'পটুলি, জামাই কি কোন খবর পাঠিয়েছেন? ও-ছেলেটা তোর ঘরে এসে তোকে কি বললে?'

"আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম, চিঠির কথা মাকে বললাম। মা বললেন, 'যেতেই হবে মা, হিঁদুর মেয়ের স্বামী ছাড়া আর গতি নেই'।"

বলিয়া রুক্মিণী আবার একটু চুপ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এত কথা আজ মনে হ'ল কেন জান ভাই? তোমাকে দেখে। তুমি আমার বোনের মত। তুমি আমাকে বড় ভালবাস। এ সব কথা কাউকে যদি না বলি তবে মন আমার যেন পাথর-চাপা হয়ে থাকে, অথচ কাকে বলব? বলবার লোক কে আছে? উনি রাগ করবেন, বলবেন, প্রভু যীশুর আশ্রয় পেয়েছ, একটু দুঃখ কষ্ট সেজন্য সহ্য করবে না? যীশু যে ক্রুশের যন্ত্রণা সয়েছিলেন! আর আমাদের জন্যই তিনি তত দুঃখ ইচ্ছা ক'রে স্বীকার করেছিলেন। এ সবই তো জানি ভাই, তবুও মানুষের মন বোঝে না। যাক্ ওসব কথা, এখন চল আমার ঘর-সংসার দেখবে।"

দুই বন্ধুতে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ঘর দেখা ও দেখানো হইল। দেয়ালের ফোটো-গুলি দেখাইয়া কোন্‌টি কাহার ফোটো—রুক্মিণী কুমুদিনীকে তাহার পরিচয় দিলেন: "এঁইটি চপলার আট বছর বয়সের, এইটি পনেরো বছরের, এটি বিয়ের সময়ের ফোটো, বর-কনে দুজনেরই ফোটো। এই অবলার বিয়ের ফোটো, এই যে রিপনের ফোটো, ব্যাট হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রিপন আর বিভূতি দুজনে এক বয়সী, দুজনের ভারি বন্ধুত্ব ছিল, এখন হয়তো দুজন দুজনকে চিনতেই পারবে না, আমিই তো তোমাকে চিনতে পারছিলাম না।

"বিভু এখন কত বড়টি হয়েছে, কি করছে, এখনও তার সেই হিঁদুয়ানির বাতিক আছে নাকি? বিভু ভারি সরল ছেলে। ছেলেবেলায় রমলাকে ও ভারি

ভালবাসত। এই দেখ রমলার ফোটো। রমলা আর কুন্তলা কলকাতায় আছে, আর দু-একদিনের মধ্যে এখানে আসবে। তখন তাকে নিয়ে তোমার ওখানে যাব।"

প্রথম দিনের দেখার আলাপ সহজে ফুরায় না। কুমুদিনী তিন ঘণ্টার আগে বাড়ী ফিরিতে পারিলেন না। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, ইঞ্জিনিয়ারবাবু বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া সট্‌কায় তামাক টানিতেছেন, এখনও তাঁহার কাপড় ছাড়া, মুখ ধোওয়া কিছুই হয় নাই। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কি গো, নূতন বন্ধু পেয়ে যে পুরনো বন্ধুদের কথা ভুলেই গেলে!"

কুমুদিনী একটু অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, "আমি বাড়ী ছিলাম না ব'লে কি কাপড় ছাড়া, মুখ ধোওয়াও হ'ল না নাকি? বাবাজীকে ছেলেমেয়েদের খাবার দিতে ব'লে গিয়েছি, তোমাকে সেও তো খাবারটা ধ'রে দিতে পারত।"

বলিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিলেন যখন, তখন ইঞ্জিনিয়ারবাবুর মুখ-হাত ধোওয়া হইয়া গিয়াছে, কুমুদিনীকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার আজ বাড়ী ফিরতে দেরি হয়েছে, তোমাকে রাগানোর জন্য ও-কথা বলেছিলাম। বিভু আজ রাত্রের গাড়ীতে আসছে। আর এই নাও একখানা ফোটো এসেছে, বিভুর বিয়ের জন্য মেয়ের ফোটো পাঠিয়েছে, দেখ তো পছন্দ হয় কিনা।"—বলিয়া একখানি খাম তাঁহার হাতে দিলেন।

কুমুদিনী বলিলেন, "রমলার কথা মনে আছে তোমার, মুন্সেফবাবুর সেই ছোট খুকিটি। আজ তার ফোটো দেখে এলাম। কি সুন্দরই হয়েছে! ফোটোতেই এমন দেখাচ্ছে, দেখতে না জানি কত সুন্দর! আহা, খৃষ্টান যদি না হ'ত!"

বিভু রাত্রে আসিয়া পৌঁছিল। সে ছুটিতে আসিয়াছে, কিন্তু এখানে আসিয়াও তাহার এক মুহূর্ত ছুটি নাই। অ্যানি বেশান্ত আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনা, সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার উদ্‌যোগের কাজে সে এমন মাতিয়া গেল যে, বাড়ীতে তাহার 'টিকি'টি পর্যন্ত দেখিবার উপায় নাই।

কুমুদিনী বলিলেন, "বিভু, তোমার বেথিয়ার কাকিমা এখানে আছেন যে। রিপনের মা রে! রিপনকে ভূলে গিয়েছিস!"

বিভু বলিল, "না মা, ভুলি নি। তুমি তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে যেতে বলছ বুঝি? তা এখন আমার সময় কোথায়?"

"ওরই মধ্যেই একবার সময় ক'রে নিয়ে যেতে হবে, নইলে তাঁরা ভাববেন কি! তোর আবার হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আছে জানেন তো, ভাববেন সেই জন্যই বুঝি বিভু দেখা করতে এল না।"

কিন্তু সত্যই সময় নাই। আজই প্রসেশান বাহির করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দুস্থানী ছেলেরা হাঁদাকান্ত, আর বাঙ্গালী ছেলেরা অতি 'আলসে', একটা কাজ গড়িয়া তোলা তাহাদের কুষ্ঠিতে নাই। বিভু বলিল, "মা, তুমি ওখানে যদি যাও তো আমার কথা তাঁদের ব'লো যে, আমি শিগগির তাঁদের বাড়ীতে যাব।"

কুমুদিনী সেই দিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মোখার্জি সাহেবের বাড়ীতে গেলেন। দেখিলেন, কাম্পাউণ্ডে এক প্রকাণ্ড ঘোড়া, সহিস দলাই-মালাই করিতেছে।

বড়দিন আসিয়া পড়িয়াছে, রুক্মিণী তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত। বান্ধবীকে দেখিয়া "এসো নূতন দিদি" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন বটে, কিন্তু কুমুদিনী দেখিলেন তাঁহার মুখ যেন বড় বিষণ্ণ।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছে তো ভাই?"

"হ্যাঁ, ভালই আছে। রিপন, রমলা, কুন্তলা—এরা তিন ভাই বোন এসেছে। মনটা আজ ভাল নেই ভাই। দাদা কাল এসেছিলেন, তাই বাপের বাড়ীর কথা মনে প'ড়ে মনটা খারাপ হয়ে আছে। দাদা আর আমি দুই ভাই বোন পিঠাপিঠি, এক দণ্ড আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ত না। মা বলতেন, 'ওদের ঝগড়াও যেমন ভাবও তেমনি।' একদিন আমি দাদার হাতে কামড় দিয়ে রক্ত বার ক'রে দিয়েছিলাম, মা তাই দেখে 'মেয়ে নয় তো, রাক্ষুসী' ব'লে যেমন আমাকে ধরতে এসেছেন, আর দাদা ছুটে গিয়ে 'বোনটিকে মেরো না মা' ব'লে মাকে জড়িয়ে ধরলেন, সে কথা আমার আজও মনে আছে। সেই আমার দাদা! তীর্থ ক'রে ফেরবার পথে কি জানি কেমন ক'রে আমার ঠিকানা পেয়েছিলেন, এ বাড়ীতে দেখা করতে এসেছিলেন। সেই পনেরো বছর বয়সে চ'লে এসেছি, আর তো দেখা হয় নি। এত বৎসর পরে দাদা আমার বাড়ী এলেন, আমার এমন সাহস হ'ল না যে, দাদাকে বলি, 'দাদা আমার বাড়ী একটু জল খাও'!"

কুমুদিনী বলিলেন, "তুমি জল খেতে বললে না কেন?"

রুক্মিণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আমি বলি নি, উনি অনেক ক'রে বলেছিলেন, কিন্তু খেলেন না তো। হেসে বললেন, 'আহ্নিক-পুজো হয় নি, এখন কি জলখাবার সময়?' হিঁদুরা বড় নিষ্ঠুর হয় ভাই। না হ'লে এক গ্লাস শরবত যদি খেতেন, না হয় আমার ব্রাহ্মণ চাপরাসীই এনে দিত, তা হ'লে দোষ হ'ত কিছু?"

কুমুদিনী নির্বাক্ হইয়া রহিলেন। রুক্মিণী আবার বলিলেন, "আর একটা কারণে মনটা ভাল নেই। কুন্তলার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছিল, এনগেজমেণ্ট পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি বামুনের ঘরের ছেলে, দেখতে ভাল, পয়সাকড়ি আছে। উনি অনেক খুঁজে এই ছেলে ঠিক করেছিলেন। রিপনের কাছে শুনলাম, ছেলে নাকি কোন্ ক্লাবে গিয়ে নেশা ক'রে দারুণ মাতলামি করেছিল। জানি না, কি হবে ভাই! এনগেজমেণ্ট হয়তো ভেঙেই দিতে হবে।"

এমন সময় ঘরে একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল, "ম্যামি ম্যামি, ঘোড়ায় চড়ছি, দেখবে এসো।"

রুক্মিণী বলিলেন, "এই রমলা। রমলা, ইনি তোমার বড় মা হন, এঁকে নমস্কার কর।"

রমলা ইতস্তত করিয়া অগ্রসর হইল, বলিল, "চুমো খাব মা?" রুক্মিণী ও কুমুদিনী দুইজনেই হাসিলেন। রুক্মিণী বলিলেন, "ও এক পাগল মেয়ে। ওর ড্যাডির আদরেই এত ধিঙ্গী হয়েছে। যা আবদার ধরবে উনি তাই দেবেন। আবদার ধরলে—সংস্কৃত শিখব, এক পণ্ডিত এনে দিলেন। আবার আবদার ধরল—ঘোড়ায়

চড়া শিখব, তাই মঞ্জুর হ'ল। আমি বলি, মেয়ে যদি প'ড়ে হাত-পা ভাঙে, তবে বিয়ে হবে না। উনি বললেন, 'হাত-পা তো এমনিও প'ড়ে গিয়ে ভাঙতে পারে।' প্রথমে ছোট ঘোড়া এনে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'ভাল ক'রে চড়তে শিখলে বড় ঘোড়া প্রাইজ দেব।' তাই এক প্রকাণ্ড ঘোড়া কেনা হয়েছে. এখন হাতেই ভাঙুক আর পা-ই ভাঙুক।"

যতক্ষণ রঙ্গিণী কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ কুমুদিনী অবাক হইয়া রমলার দিকে চাহিয়াছিলেন। রমলা যে এত সুন্দরী তাহা তিনি ছবি দেখিয়া ধারণাও করিতে পারেন নাই। কি সুন্দর চোখের সরল চাহনি. আর কি মধুর তাহার সরল হাসি! "এস আমার মা" বলিয়া হাত বাড়াইতেই রমলা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার দুই গালে চুম্বন করিল। বিভূতি এ দৃশ্য দেখিলে কি করিত কে জানে!

সাহেব-মহলে বড়দিনের উৎসব লাগিয়াছে। এদিকে দেশী মহলে অ্যানি বেশান্তের আগমনে অভ্যর্থনা, সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। অ্যানি বেশান্তের এই আগমন তাঁহার ভক্তবৃন্দের নিকট স্বর্গ হইতে দেবীর আবির্ভাব বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহার একবার মাত্র দর্শন লাভ করিবার জন্য, তাঁহার বাংলোর কাছে, ময়দানে ও পথে ভিড়ের অন্ত নাই। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী এই উৎসবে এক হইয়া যোগ দিয়াছে। অ্যানি বেশান্তের নূতন নামকরণ হইয়াছে "আন্না বাসন্তী"।

বক্তৃতা-মণ্ডপে অসম্ভব ভিড়। উচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মানা অ্যানি বেশান্তের কণ্ঠধ্বনি চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে. "ভাই সব. আমি হিন্দু। আমি সকল ধর্মশাস্ত্র পড়িয়াছি ও বুঝিয়াছি, হিন্দু ধর্মের তুল্য মহান্ ধর্ম পৃথিবীতে আর নাই। যে জন্মের সঙ্গে এই ধর্মের অধিকারী হইয়াছে. সে মহা সৌভাগ্যবান।"

ফিরিবার সময় বক্তৃতার শ্রোতাগণের ভিড়ের মধ্যে মোখারজী সাহেবের সঙ্গে তাঁহার এক ডিপুটি বন্ধুর ধাক্কা লাগিয়া গেল। ডিপুটিবাবু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "মিস্টার মোখার্জি!"

মোখার্জি সাহেবের মাথায় টুপি ছিল, সুতরাং মাথা চুলকাইবার সুবিধা ছিল না. তিনি "হ্যাঁ. তা" বলিয়া কি বলিতে উদ্যত হইতেই ডিপুটিবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "বক্তৃতা কেমন শুনলেন?"

"শুনব আর কি? যত সব পাগলামি আর হাম্বাগ। আমি এর একটা কড়া জবাব দেব।"

"হ্যাঁ. তা দেবেন বইকি!" বলিয়া মৃদু হাসিয়া ডিপুটিবাবু গেটের বাহিরে আসিলেন।

এ দিকে পথে শোভাযাত্রার বিষম ভিড়। তাহার ভিতর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। মারহাট্টী ধরনে কাপড়-পরা একটি সুন্দরী বালিকা প্রকাণ্ড এক ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া চলিয়াছে। বাতাসে তাহার চুল ও আঁচলের কাপড় উড়িতেছে। ঘোড়া ভিড় দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে. আরোহিণী বহু চেষ্টাতেও

তাহাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। ঘোড়া চাপা পড়িবার ভয়ে জনতা ছুটা-ছুটি করিতেছে, তাহাতে ঘোড়া আরও ভয় পাইতেছে। চারিদিকে "গেল গেল" শব্দ। একজন সিপাহী চেঁচাইয়া উঠিল, "সাবাস মায়ি, তু তো রাণী লছমীবাঈ!" এবং সে ঘোড়া ধরিতে ছুটিল। মোখারজি সাহেব "ঘোড়া ধর, ঘোড়া ধর" বলিয়া পাগলের মত ছুটিয়াছেন, এমন সময় একজন বলিষ্ঠ বাঙ্গালীর ছেলে বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া ঘোড়ার সম্মুখে উপস্থিত। "গেল গেল" শব্দের মধ্যেই দেখা গেল, ছেলেটি ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া ফেলিয়াছে, সিপাহিও ততক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ঘোড়া থামিতেই রমলা লাফ দিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। ঘোড়ার পিঠ আস্তে আস্তে চাপড়াইল, যদিও সে নিজে হাঁফাইতেছিল, কিন্তু কিছুই যেন হয় নাই, এইভাবে বিভূতিকে বলিল, "ঘোড়াটা বড় হাঁফিয়ে গিয়েছে, একটু ভিড় সরিয়ে দিন না।" কথাটি অনুরোধও বটে, আদেশও বটে।

ততক্ষণে মোখারজি সাহেব ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। "ব্রেভ বয়" বলিয়া তিনি বিভূতির করমর্দন করিলেন।

ঘটনার বিবরণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত শহরে নানা আকারে রাষ্ট্র হইয়া গেল। কুমুদিনী শুনিলেন, বিভু পাগলা ঘোড়ার সম্মুখে পড়িয়া জখম হইয়াছে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে। তিনি পাগলের মত বাড়ীর দুয়ারের দিকে ছুটিলেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার স্বামী বিভূতির হাত ধরিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন। ছুটিয়া গিয়া "বিভু, বাবা আমার" বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার আর জ্ঞান রহিল না।

সেইদিন রাত্রে কুমুদিনী বিছানায় শুইয়া আছেন, বিভূতি তাঁহার মাথায় বাতাস করিতেছে। কুমুদিনী শুনিলেন, বিভূতি গুন গুন করিয়া আবৃত্তি করিতেছে,

"রমলা রমলা সুন্দর মেয়ে!
আরো সুন্দর তুমি পরীদের চেয়ে।"

কুমুদিনী চোখ মেলিলেন। বিভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিভু, রমলাকে বিয়ে করবি?"

বিভূতি বলিল, "তোমার পছন্দ হয়েছে বুঝি?"

"পছন্দ তো হয়েছে, কিন্তু খৃষ্টান যদি না হ'ত—"

"কেন, হিন্দু ক'রে নাও না কেন?"

"কি ক'রে হিন্দু করব? তা যে হয় না।"

"কেন, হিন্দু খৃষ্টান হতে পারে, আর খৃষ্টান হিন্দু হতে পারে না?"

"না।"

"তবে বেশান্ত কি ক'রে হিন্দু হলেন?"

"সে মেমেদের কথা আলাদা। মেমকে তো কেউ বিয়ে করছে না! বিয়ে যে সামাজিক ব্যাপার।"

বিভূতি বলিল, "থাক্ মা ও-কথা। বিয়ে না করলেও মানুষের চ'লে যায়।"

সেই দিন রাত্রে যখন কুমুদিনীর সঙ্গে বিভূতির কথা হইতেছিল, মোখার্জি সাহেব রঙ্গিণীর সহিত বিভূতির কথাই বলিতেছিলেন।

"ছেলে বটে বিভূতি! এমন একটা ছেলে আর আমার নজরে পড়ল না।"

রঙ্গিণী বলিলেন, "কেমন একটু গোঁড়ামি আছে, এই যা দোষ।" মোখার্জি সাহেব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "গোঁড়ামি তুমি কাকে বল? নিজের ধর্মে শ্রদ্ধা থাকা কি মন্দ? এই যে আমার ছেলেমেয়েরা, এদের কি কোন ধর্মেই শ্রদ্ধা আছে? ডাক তো রমলাকে, শুনি সে কি বলে! রমি—রমি!"

রমলা ছুটিয়া আসিল, "ড্যাডি, কি বলছ?"

"বিভুকে বিয়ে করবি? সেই ছেলেকে? যে তোর ঘোড়ার মুখের লাগাম ধ'রে ঘোড়া থামিয়েছিল।"

রমলা একটু ভাবিত হইল। একটু সলজ্জভাবও তাহার মুখে দেখা গেল। পরে বলিল, "সে খুব ভাল ছেলে ড্যাডি। আমি নিশ্চয় তাকে বিয়ে করতে পারি, কিন্তু সে,—সে হয়তো করবে না। তুমি যে বলেছিলে সে হিঁদুর ছেলে।"

কুমুদিনী স্বামীকে বলিলেন, "তোমার এত বুদ্ধি আছে, এত কলকারখানা বুদ্ধি ক'রে ঠিক কর, আর এইটে ঠিক করতে পারছ না। রমলাকে আমি বৌ করবই করব।"

ইঞ্জিনিয়ারবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সেটা যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার হবে।"

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', বার্ষিক (দোল) ১৩৪৬

সন্ন্যাসীর স্ত্রী

রেবতী সন্ন্যাসীর স্ত্রী।

সন্ন্যাসীর অবশ্য স্ত্রী থাকা সম্ভব নয়, কেননা, সংসারের সঙ্গে তাঁহার যদিও আগে সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু সন্ন্যাস লইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্বন্ধ তো একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু রেবতী সন্ন্যাসিনী নয়, সে হয়তো এখনও মনে করে সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দ স্বামী তাহারই স্বামী।

'হয়তো মনে করে' এইজন্য বলিলাম যে, ঠিক ঠিক মনে করে কি না, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে।

রেবতীকে আমি প্রথম দেখি গঙ্গার ঘাটে। ঘাটের সিঁড়ির উপর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া বসিয়া আছে, দেখিয়া মনে হইল, মেয়েটি কাঁদিতেছে। তাহার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে আমি চিনিতাম, সে সেবাশ্রমের সেবিকা গিরিবালা।

আমি কাছে গিয়া গিরিবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হয়েছে কি? মেয়েটি কে, অমন ক'রে ব'সে আছে কেন?"

গিরিবালা বিরক্তমুখে উত্তর করিল, "দেখুন না, কি মুস্কিল। সেবাশ্রমের সেবিকা হতে এসেছে, যদি এমন ক'রে দিনরাত কাঁদাকাটা করে, তবে সেবার কাজ করবে কি ক'রে? উল্টে ওরই সেবা করতে হবে দেখছি।"

গিরিবালার নিকট তাহার পরিচয় পাইলাম, মেয়েটি অচ্যুতানন্দ স্বামীর স্ত্রী।

অচ্যুতানন্দ স্বামীকে আশ্রমে কে না জানে? তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য এবং তাঁহার সাধনার কঠোরতার কথা ইহার আগেই বহু-বার শুনিয়াছি। আশ্রমবাসিগণেব তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি যেন সাধন-সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, দিনরাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, সে জ্ঞান তাঁহার ছিল না। ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ, শীত ও গ্রীষ্মের অনুভূতি পর্যন্ত যেন তাঁহার লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার দীক্ষাদাতা গুরু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "অচ্যুত যেভাবে সাধনায় ডুবে যাচ্ছে, ওর দেহ থাকলে হয়।"

দুই বৎসর একই ভাবে গিয়াছিল, তাহার পর গুরুর আদেশে তিনি সেবাশ্রমের কার্যভার এবং ব্রহ্মচারী ও তরুণ সন্ন্যাসীদিগের বেদান্ত অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন ইহা জানিতাম, কিন্তু তাঁহার যে পূর্বাশ্রমের স্ত্রী আছে—তাহা জানিতাম না।

মেয়েটি সেবাশ্রমের সেবিকা হইল কি করিয়া? আর যদি বা সেবিকা হইল, এত কান্নাকাটিই বা করে কেন?

গিরিবালা যাহা জানিত, তাহা আমাকে বলিল। বিবরণটি এইরূপ : অচ্যুতানন্দ সন্ন্যাস লইয়া যখন আসেন, তখন তাঁহার স্ত্রী ও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। অচ্যুতানন্দ কিছু বিষয়-সম্পত্তি ও নগদ টাকা স্ত্রীর ও ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু যাহার নিকট ভার দিয়া আসিয়াছিলেন সে-ই

সমস্ত গ্রাস করিয়া বসিল। মেয়েটির বাপের বাড়ী কেহ ছিল না, সেজন্য ছেলে-মেয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইল।

অচ্যুতানন্দ স্বামী দেশ হইতে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন, সেই পত্রে এই ঘটনা তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল। তাঁহার ছেলেটির খুব অসুখ, সে পত্রে এ সংবাদও ছিল।

অচ্যুতানন্দ পত্রখানি লইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "মহারাজ, আমার এখন কি কর্তব্য আমাকে আদেশ করুন।"

মহারাজ বলিলেন, "বৎস, বিরজা হোমে আহুতি দিয়ে যেদিন তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছ, সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক সেই দিন থেকে তোমার ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ভগবানের বৃহৎ সংসার, তিনিই তাঁর ভার বহন করছেন, তুমি আমি কি করতে পারি? যা হোক, শিশুটির চিকিৎসার যদি কোন উপায় করা যায়, সে চেষ্টা আমি করছি।"

ইহার পর আর একখানি পত্র আসিয়াছিল ছেলেটির মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া। তাহার পর আর একখানি পত্রে আসিল কন্যার মৃত্যুসংবাদ।

ইহার পর আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে অচ্যুতানন্দের নামে আরও দুইখানি পত্র আসিয়াছে। গ্রামের এক সহৃদয় বৃদ্ধ সম্পর্কে অচ্যুতানন্দের ঠাকুরদাদা হইতেন, তিনিই এই পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন। প্রথম পত্রে রেবতী যে কি দুর্দশায় দিন কাটাইতেছে, তাহাই জানানো হইয়াছে। শেষ পত্রে জানা গেল, রেবতীকে আশু রক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিলে তাহার বিপদের সম্ভাবনা আছে; কেননা, গ্রামের জমিদার-পুত্রের তাহার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে।

পত্রখানি হাতে লইয়া অচ্যুতানন্দ আবার গুরু মহারাজের নিকট চলিলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে পত্রখানি স্থাপন করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে আর্তধ্বনির ন্যায় এই কথাটি বাহির হইল, "মহারাজ, আর তো পারা যায় না।"

ইহার পর রেবতী সেবাশ্রমে আশ্রয় পাইল। সেবিকার কাজ সে কিছুই জানে না। তাহাকে মন দিয়া শিখিয়া লইতে হইবে, কিন্তু শিখিবার দিকে তাহার কোনই উৎসাহ দেখা যায় না।

কোন কাজেই তাহার মন নাই। এজন্য সর্বদাই তাহার ত্রুটি ঘটে, সেজন্য তিরস্কারও তাহাকে কম সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু রেবতী উদাসীন, শত তিরস্কারেও তাহার সংশোধন হইতেছে না।

তাহার পর আরও একটি বিশেষ দোষ এই যে, অবসর পাইলেই নির্জনে গিয়া সে কাঁদে।

সেবাশ্রমের নানা বিভাগ আছে, সেবিকাও অনেকগুলি। কতকগুলি সাধারণ সেবিকা এবং কতকগুলি পরিচালিকা বা উচ্চশ্রেণীর সেবিকা এবং সর্বোপরি আছেন সেবাশ্রমের নারী-বিভাগের প্রধানা পরিচালিকা।

রেবতীর উপর প্রধানা পরিচালিকা প্রসন্ন নহেন; তিনি কাজের মানুষ, হৃদয়-চর্চা করিবার তাঁহার অবসর নাই। রেবতীর কান্নাকাটিতে তিনি বড়ই বিরক্ত

হইয়াছেন, কিন্তু উপায় কি? রেবতীকে তো তাড়াইয়া দেওয়া যায় না, কোন একটা কাজের ভার দিয়া তাহাকে আশ্রমে আশ্রয় দিতে হইবে।

গিরিবালার মুখে আমি এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলাম। রেবতীর কাছে গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলাম, বলিলাম, "রেবতী, আমি তোমার দিদি হই, আমাকে দিদি ব'লে ডেকো, কেমন?"

রেবতী একটু আশ্চর্য হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, চাহিয়া রহিল অনেকক্ষণ। তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা।"

আশ্রমে কতকগুলি সেবিকার রেবতীর উপর সহানুভূতি ছিল; মালতী তাহাদের মধ্যে একজন। মালতী রেবতীরই প্রায় সমবয়সী, সেজন্য দুইজনের ভিতর কতকটা সখীত্বের ভাবও হইয়াছিল।

আমি আজকাল রেবতীর জন্য প্রায়ই সেবাশ্রমে যাই। কি জানি কেন মেয়েটির উপর আমার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। অনেক দুঃখ পাইয়াছে সে, ভগবান কি তাহাকে শান্তি দিবেন না?

রেবতীকে বুঝাইয়া বলি যে, "লক্ষ্মী দিদিটি, কাজে মন দাও তা হ'লে মন ভাল থাকবে। আর দিনরাত চোখের জল ফেল না, ওতে স্বামীর অকল্যাণ হয়।"

রেবতী রাগিয়া গেল, বলিল, "আমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক যে আমার চোখের জলে অকল্যাণ হবে?"

অচ্যুতানন্দ স্বামী কয়েকমাস পূর্বে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। মালতী আসিয়া রেবতীকে সংবাদ দিল যে, "স্বামীজী কাল সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছবেন।"

রেবতী গম্ভীর হইয়া গেল, কিছুক্ষণ কথা বলিল না, তাহার পর বলিল, "আসবেন তো আমার কি? এলে কি আমি চতুর্ভুজ হব?"

মালতী বলিল, "দিনরাত বকুনি খাস সে সময় মুখে কথাটি নেই, আর আমি কিছু বললেই ঝাঁজিয়ে উঠিস কেন বল্ দেখি?"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় আরতির পর দেখি যে, উত্তরের বারান্দায় অন্ধকার কোণে রেবতী ও মালতী দুইজনে দাঁড়াইয়া আছে, দুইজনেরই চোখে জল। রেবতী মালতীর হাত ধরিয়া আছে আর বলিতেছে, "আমাকে মাফ কর্ ভাই, আমাকে মাফ কর্। আমার মাথার ঠিক নেই। দুনিয়ায় আমার কেউ নেই মালতী, তুই কেবল আমাকে বোনের মত ভালবাসিস, আর দিদিমণি ভালবাসেন।"

সেদিন আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়া রেবতীর হাতের শাঁখা দু'টি ভাঙিয়া গিয়াছে, রেবতী কয়দিন খালি হাতেই আছে।

মহামায়া দেবী নামে একজন রোগিণী সেবাশ্রমে ছিলেন। তিনি ধনবতী মহিলা, সেবাশ্রমে অনেক সাহায্য করেন। তীর্থ করিতে আসিয়া হঠাৎ পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহাকে সেবাশ্রমে আনা হইয়াছে।

তাঁহার ঘরে নিয়ত দুইজন সেবিকা থাকে, রাত্রে একজন ও দিনে একজন। রেবতী কয়দিন রাত্রে তাঁহার ঘরে ছিল, আজ বদল হইয়া দিনেই তাঁহার ঘরে আসিয়াছে।

মহামায়া দেবী রেবতীর সেবায় সন্তুষ্ট আছেন। মাঝে মাঝে বলেন, "বাড়ী যাবার সময় তোমাকে আমি নিয়ে যাব, যাবে আমার সঙ্গে?"

রেবতী বিশেষ কোন উত্তর দেয় না; কখনও বা আস্তে আস্তে বলে, "মহারাজেরা যদি মত করেন—"

আজ রেবতী ঘরে ঢুকিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "রেবতী, ও কি? শুধু হাত কেন?"

রেবতী বলিল, "শাঁখা ভেঙে গিয়েছে।"

"ভেঙে গিয়েছে, আর তুমি খালি হাত ক'রে স্বচ্ছন্দে আছ? রাম রাম! এ কি পাপের ভোগ আমার! ব্রাহ্মণের মেয়ে, সধবা, তার কি না শুধু হাত দেখতে হ'ল! লোকে তীর্থি করতে এসে শাঁখা শাড়ী সিঁদুর দিয়ে সধবা পুজো করে, আর আমি আবাগী তীর্থে এসে দেখলাম সধবার শুধু হাত! আরে হাবা মেয়ে, হাতে একগাছা ক'রে সুতোও জড়িয়ে রাখতে পার নি?"

রেবতী অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখনই হাঁকডাক করিয়া শাঁখা, লোহা, সিঁদুর ও একখানি লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী আনানো হইল। মহামায়া দেবী বলিলেন, "আগে তোমাকে শাঁখা সিঁদুর লোহা পরিয়ে তারপর ওষুধ জল যা খেতে হয় খাব।"

রেবতীর চোখ দিয়া অনেকদিন জল পড়ে নাই, আজ দেখি তাহার দুই চোখ ভরা জল, ঝরিয়া পড়ে পড়ে। আমি মহামায়া দেবীকে বলিলাম, "দিদি, অসুখ শরীরে অত উদ্বেগ মনে আনবেন না; শাঁখা ওকে আমি পরিয়ে দিচ্ছি, আপনি মুখ ধুয়ে ওষুধ খান।"

কিন্তু মহামায়া দেবী তাহাকে শাঁখা, লোহা ও সিঁদুর পরাইয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। বাহিরে গিয়া দেখিলাম, রেবতী সিঁদুর মুছিয়া ফেলিয়াছে, শাঁখা দুইটি আছে বটে কিন্তু লোহা হাতে নাই, বোধ হয় খুলিয়া ফেলিয়াছে। আমি চুপি চুপি বলিলাম, "মহামায়া দেবী রাগ করবেন, শাঁখা দুগাছা যেন খুলো না।"

তাহার পরদিন রেবতীর জ্বর হইল। রেবতী আমাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, "জ্বর হয়ে বেঁচে গিয়েছি দিদি। মহামায়া-দিদি সঙ্গে নিয়ে যাবেন ব'লে যে রকম ধরেছিলেন আমি তো 'না' বলতে পারতাম না, মহারাজেরা হয়তো ওঁর মতে মত করতেন, তা হ'লেই আমাকে চ'লে যেতে হত।"

আমি বলিলাম, "সেখানে গেলে তোমার তো কিছু কষ্ট হ'ত না, মহামায়া দেবী লোক খুব ভাল, যত্ন ক'রেই রাখতেন।"

সে-কথায় রেবতী 'হাঁ', 'না' কিছুই বলিল না। বুঝিলাম, তাহার সেবাশ্রম ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু কেন? সেবাশ্রমে রেবতী যতদিন আসিয়াছে, অচ্যুতানন্দ স্বামীর সহিত উহার তো একবারও দেখা হয় নাই। এখানে উহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পর তিরস্কার তো আছেই। তবুও রেবতী সেবাশ্রম ছাড়িয়া যাইতে চায় না কেন?

আমি বলিলাম, "রেবতী, এবার ভাল হয়ে উঠে মন দিয়ে কাজকর্ম ক'রো।

সকলে যাতে সন্তুষ্ট হন তাই করাই তো ভাল। তুমি তো সেবাশ্রমেই থাকতে চাও, আর কোনখানে যেতে চাও না তো!"

রেবতী চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মনে হইল উহার জ্বর বাড়িতেছে এবং জ্বরের ঝোঁকে বকিয়া যাইতেছে। একথা আমার এই জন্য মনে হইল যে, রেবতী স্বভাবতই বেশী কথা বলিত না, আজ সেই রেবতী এত কথা কেন বলিতেছে!

সে বকুনীর ভিতর বেশ একটু শৃঙ্খলা ছিল, একবার বলিল, "তাসের ঘর, তাসের ঘর—দোতলা, তিনতলা, চারতলা ঘর উঠল, আবার ঝুপ ক'রে পড়ে গেল, না দিদি?"

আবার বলিল, "মা-বাপ-মরা মেয়ে মামার বাড়ী মানুষ হয়েছি, জান দিদি, বিয়ের পর হ'ল নিজের ঘর, সেই আমার তাসের ঘর। এখানে সবাই বলে, 'রেবতী কাজ জানে না, গোছ জানে না', সেখানে সবাই কি বলত জানো দিদি? 'রেবতীর মত গোছালো মেয়ে, কম্মা মেয়ে পাড়ায় আর একটাও নেই।' ঝকঝক করত আমার উঠোন, একপাশে ধানের গোলা। রোজ নিজে হাতে উঠোন নিকিয়েছি, সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যেত। সেই উঠোনে আমার খোকা আমার খুকি খেলা করত।"

আমি মনে মনে রেবতীর সেই উঠান ও বাড়ী যেন কল্পনায় দেখিতে পাইলাম। নিকানো চুকানো উঠান, একপাশে ধানের গোলা, গোয়ালে গরু বাছুর, খোকা খুকি উঠানে খেলা করিতেছে, তিন বছরের মেয়ে আর এক বছরের ছেলে। বাবা আসিতেছেন সাড়া পাইয়াই ছেলে ছুটিয়া গিয়া বাবার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

সন্ন্যাসীর কি কোনদিন সে সকল স্বপ্ন মনে উদয় হয়? কে জানে!

তিন দিনের দিন রেবতীর গায়ে বসন্তের গুটি বাহির হইল; সুতরাং রেবতীকে সংক্রামক ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হইল।

আমি মাঝে মাঝে রেবতীকে দেখিতে যাইতাম, দেখিতাম অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে কি যেন বিজ্ বিজ্ করিয়া বকিত।

মালতী বলিল, রেবতী নাকি তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, একবার অচ্যুতানন্দ স্বামী যেন তাহাকে দেখিতে আসেন রেবতীর এই অনুরোধ তাঁহাকে জানাইতে।

আমি মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজীকে রোগিণীর অনুরোধ জানিয়েছিলে কি?"

মালতী বলিল, "মহারাজকে একথা কে ভরসা ক'রে বলবে? আমার তো সাহস হয় না।"

আমি ভাবিলাম, আমি নিজেই গিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিব। কিন্তু তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল না এজন্য একটু ইতস্ততও হইতে লাগিল।

অনুরোধ করিতে হইল না, অচ্যুতানন্দ স্বামী নিজেই আসিলেন; বোধ হয় কেহ তাঁহাকে রেবতীর পীড়ার সংবাদ দিয়াছিল।

আমার দুঃখ হইতে লাগিল যে, রেবতী অজ্ঞান, স্বামী যে আসিয়াছেন তাহা সে জানিতে পারিল না।

অচ্যুতানন্দ রোগিণীর মাথার কাছে আসিয়া বসিয়াছিলেন, সমস্ত রাত্রি এক-ভাবেই বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে তাহার মুখে একটু জল দিতেছেন এবং মাঝে মাঝে তাহার কানের কাছে কি যেন বলিতেছেন, বোধ হয় ভগবানের নাম শুনাইতেছেন।

রাত্রি কাটিয়া গেল, ব্রাহ্মমুহূর্ত। সন্ন্যাসী রোগিণীর কানের কাছে মুখ রাখিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "রেবা, রেবা!"

সেই মুহূর্তে রোগিণীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চমকিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল। সে দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে! এক হাতে স্বামীর হাত জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল নিশ্চিন্ত আরামে।

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয় ১৩৪৭

হিমাচলপ্রসাদ

"হিমু, হিমু, আমার সোনার হিমু, হিমাই ধন, আমার হিমাচলপ্রসাদ!"

খোকার মা খোকার দোলনায় দোল দিতে দিতে খোকাকে আদর করিতেছেন।

হৃষ্টপুষ্ট তিন মাসের ছেলে, ধপধপে গৌরবর্ণ, কালো কোঁকড়া চুল, উজ্জ্বল চোখের চাহনি। "না! দুষ্টু ছেলে কিছুতে ঘুমুবে না, কেবল আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে! আমি যে এখন গা ধুতে যাব খোকন, একটু চোখ বোজো।"

ঘরখানি সাজানো গোছানো, আসবাবগুলিও বেশ দামী দামী। এই ঘর এই সব আসবাবে আগেও সাজানো ছিল, কিন্তু তখন খোকনধন আসে নাই, সেইজন্য বাড়ীর সকলের মনে হইত ঘর যেন খালি খালি, ঘরে যেন কোন শোভা নাই। আজ তিন মাস খোকন আসিয়াছে, একা খোকনে যেন সমস্ত বাড়ীখানি ভরপুর। দণ্ডে দণ্ডে কাকারা আসিয়া ঘরে উঁকি মারিতেছে, সুবিধা পাইলেই খোকাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে, চটিজুতা ফট ফট করিয়া মাঝে মাঝে বৃদ্ধ গৃহকর্তা আসিয়া হাঁক দিতেছেন, "দাদাভাই কি করছে রে?" ঠাকুরমার আর আনন্দ ধরে না, খোকা যেন তাঁর সাত রাজার ধন এক মানিক।

কিন্তু "হিমাচলপ্রসাদ" নামটি মস্ত প্রকাণ্ড, আর কটমটও বটে। ছোট্ট একটি মিষ্টি নাম হইলে তবে তো খোকাকে মানায়। কিন্তু খোকার মা নীলিমার কি জানি কি বিদঘুটে পছন্দ, ছেলের নাম রাখিল হিমাচলপ্রসাদ! এত যে বড় বড় অভিধান আনিয়া নাম বাছাই, তাহার ফল কি হইল এই শেষে! যা হোক, এ নাম খোকার মারই থাক্, আর সকলে যাহার যাহার পছন্দমত নাম নিশ্চয়ই রাখিবে। কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামে এর নজীর যখন রহিয়াছে, আর রবীন্দ্রনাথও তো বলিয়াছেন—

> "নিজের মনের মত সবাই করুক নামকরণ,
> বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার, খুড়ো রামচরণ।"

খোকার মা নীলিমাকে এই হিন্দুস্থানী নাম রাখার জন্য অনেক কথাই শুনিতে হয়, যেমন—

"হ্যাঁ রে, বেছে বেছে আর নাম পেলি নে, নাম রাখলি কিনা হিমাচলপ্রসাদ,—কি মেয়ের পছন্দ রে! এর চেয়ে হনুমানপ্রসাদ নাম রাখলেই হ'ত, সে নামের তবু একটা মানে আছে।"

"ভাই নীলি, খোকনের নাকি একটা কটমটে খোট্টাই নাম রেখেছ? কার পছন্দে এ নাম রাখা হ'ল, তোমার, না, মিস্টার সেনের? ও-নাম আমরা নাকচ ক'রে দেব, দেখি তোমরা কি কর?"

"ও ভাই, মিস্টার সেন যে হিমালয়ের ফরেস্ট অফিসার, তাই খোকার নাম হ'ল

হিমাচলপ্রসাদ। আদিখ্যেতা ঢের হয়েছে,—এবার একটি ভাল দেখে নাম রাখ দেখি।"

বান্ধবীগণের কাছে এরকম অনেক কথাই খোকার মা নীলিমাকে শুনিতে হয়। খোকার দিদিমার মনের বিশ্বাস—হিমালয়ে দুর্জয়লিঙ্গ মহাদেব আছেন, নীলি বোধ হয় সেখানে স্বপ্নে কিছু পেয়েছিল, স্বপ্নের কথা তো বলতে নেই, তাই চুপ ক'রে থাকে। হোক বাপু, যে নামই হোক্‌—অতি দুঃখের ধন, নামে কি এসে যায়!

বাস্তবিক এই নামকরণের একটা ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসটি নীলিমা একদিন তাহার প্রিয় বান্ধবী সুষমাকে গোপনে বলিয়াছিল, সেই গোপন কথাটি আমরা নীলিমার কথাতেই শুনাইতেছি, ব্যাপারটিতে একটু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ আছে।

"তুই তো সবই জানিস সুষি, বিয়ের পর যখন দু বছর গেল তখনই আমার শাশুড়ীর কি হা-হুতাশ! তারপর আরও তিন-চার বছর চ'লে গেল, তখনকার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। সেকাল হ'লে আর ছেলে রাজী হ'লে হয়তো শাশুড়ী আবার ছেলের বিয়ে দিতেন। তুই হাসছিস কি? তোদের মিস্টার সেনেরও ভিতরে ভিতরে ছেলের সাধ বেশ ছিল, সেকাল হ'লে হয়তো আবার বিয়ে করতেও রাজী হতেন, কিন্তু হায় রে একাল, পুরুষ মানুষের কি অসুবিধাই না ঘটিয়েছে! সেকালে গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করলেও দোষ হ'ত না। আর একালে একটা ছেড়ে দুটো বিয়ে করলেই লোকসমাজে ছিঃ ছিঃ!

'শাক দিয়ে ঢাকা' আবার কি? আমারও শখ ছিল বইকি, তা কেন মানবো না! 'মা' হতে কোন্‌ মেয়ের না সাধ হয়? তা, আমার নিজের সাধ না মেটার দুঃখ যেমনই হোক না কেন, আমাকে ঘরে এনে ওঁদের যে সাধ মিটল না, সেইটি সব চেয়ে বেশী দুঃখ। সময় সময় সারা রাত ঘুম হ'ত না, কত কি ভাবনা মনে আসত, এমনও মনে হ'ত—তুই শুনে হাসবি—মনে হ'ত, না হয় আর একটা বিয়েই করুন। জানতাম যে কখনই আর বিয়ে করবেন না, তাই নিশ্চিন্তভাবে অত বড় স্বার্থত্যাগের চিন্তা মনে আনতাম ভরসা ক'রে।

সভ্য সমাজে মানুষ হয়েছি, তুকতাক ঠাকুর-দেবতার দোর ধরা এ সব কোন কালেই মানি নি, কিন্তু এখন দায়ে প'ড়ে সবই মানতে হ'ল। ঠাকুর তো ঠাকুর, একটা উঁচু ঢিপি দেখলেও মনে মনে প্রণাম করেছি, মনে মনে বলেছি, 'হে ঠাকুর, একটি সন্তান দাও, আমার লজ্জা নিবারণ কর।' যে যা মাদুলী এনে দিত শাশুড়ী সবই আমাকে পরাতেন, আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে পরতাম। শিকড়-বাকড় খাওয়ায় ওঁর আপত্তি ছিল, আবার আমার শ্বশুর ডাক্তার, তাঁরও বিশেষ আপত্তি ছিল, তাই শাশুড়ী সাহস ক'রে খাওয়াতে পারেন নি, কি জানি যদি হিতে বিপরীত হয়! কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছে হ'ত শিকড় খেয়ে দেখলেও হয়, তবে সে কথা মুখ ফুটে বলি কি ক'রে? পিসিমার কাছে ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি, শিকড়-বাটা খেয়ে বড়রাণী, আর শিল-ধোওয়া জলটুকু খেয়েই ছোটরাণীর সুন্দর খোকা হ'ল। কোন্‌ এক দেবস্থানে তেঁতুলগাছে মানত ক'রে ঢিল বেঁধে এলে নাকি নিশ্চয়ই ছেলে হয়, শাশুড়ী সেখানে গিয়েও ঢিল বেঁধে এলেন। কিন্তু কেউ কেউ

বললে—শাশুড়ী গেলে ফল হবে না, নিজেই গিয়ে ঢিল বেঁধে মানস করতে হবে। তা সেটি আর হ'ল না, কেন না উনি ফরেস্ট অফিসার হয়ে তরাই অঞ্চলে গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম।

হিমালয়ে বছর দুই কেটে গেল। শীতের সময় নীচে নামতাম, আবার শীত একটু কমলেই পাহাড়ে যাওয়া হ'ত। আমি পাহাড়ে যখন ওঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তাম, তখন কি ভালই লাগত! একেবারে পাকা ঘোড়সওয়ার হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ঘোড়া দুলারি ভারি আদরিণী, দেখতেও তেমনি সুন্দর, পাহাড়ে রাস্তায় তার দুলে দুলে চলবার সে যে কি বাহার, তা যদি ভাই একবার দেখতিস তো মুগ্ধ হয়ে যেতিস। দুলারি আবার আমাকে ছাড়া কাউকে পিঠে নিত না।

একদিন আমি আর উনি পাহাড়ের পথে চলেছি, সঙ্গে চাপরাসী আছে আর জনকতক কুলী, তারা মাঝে মাঝে পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে। দু ধারে বড় বড় চেনার গাছ, মন্দিরের চূড়ার মত তাদের আগাগুলি আকাশের দিকে মুখ ক'রে উঁচু হয়েছে। গায়ে গায়ে গাছ, মাঝে সরু বন্যপথ। কখনও গাছে গাছে লতা জড়িয়ে পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেই সব লতায় কত সুন্দর সুন্দর বন্য ফুল ফুটেছে! কি সুন্দর, কি গম্ভীর যে সেই দৃশ্য, তার বর্ণনার ভাষা পাই না।

হঠাৎ পিছনে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠল, একদল ভুটিয়া কুলী প্রাণপণে দৌড়ে উপর পাহাড় থেকে নীচে নামছে, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে। চিৎকারের অর্থ আমরা যদিও বুঝতে পারলাম না, কিন্তু চাপরাসী তখনই আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে 'হাতীর দল নীচে নামছে, এখনি পালাতে হবে। বড় জোর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই হাতীর দল এসে পড়বে।'

পাহাড়ে শীত পড়লেই উপর থেকে হাতীর দল নীচের জঙ্গলে নেমে আসে, কখনও বা খাদ্য ও জলের অভাব হ'লে হাতীরা দলবদ্ধ হয়ে জঙ্গলের এক দিক থেকে অন্য দিকে যাত্রা করে। এই যাত্রার সময় যে হতভাগ্য প্রাণী তাদের সম্মুখে প'ড়ে যায়, তার আর নিস্তার নেই, পায়ের চাপে তাকে পিষে মরতে হয়, অথবা হাতীরা শুঁড় দিয়ে তাকে ছুঁড়ে যদি দেয় তাতেও তার মৃত্যু নিশ্চিত। পাহাড়ীরা আগে থেকে কি ক'রে জানি না হাতী আসার সংবাদ জানতে পারে, সে সময় তারা নিজেরা পালাবার সময় চিৎকার ক'রে অন্যদেরও সংবাদ দিয়ে যায়।

দু বছর পাহাড়ে আছি, বনে বনে ঘুরে অনেকটা সাহসও বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনও পড়ি নি। উনি বললেন, 'ভয় পেও না নীলি, এখনও হাতী এসে পড়বার দেরি আছে, আমরা আধ ঘণ্টা ঘোড়া ছুটালেই তাঁবু পেয়ে যাব।'

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে আসছে। যদিও এখন দিন আছে, কিন্তু বনের ভিতর দিন থাকতে থাকতেই অন্ধকার হয়। তবে আজকার দিনটা বেশ পরিষ্কার, কুয়াশা কি মেঘ নেই, তাই অনেকটা রক্ষা।

আমাদের দুই ঘোড়া জঙ্গলের পথে পাশাপাশি ছুটছে, পিছনে চাপরাসী ও কুলীরা, তারাও ঘোড়ার সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়া ছুটছে, হঠাৎ পথের মধ্যে এক বিষম বাধা।

একটি মেয়ে পথে ব'সে পড়েছে, মেয়েটির বয়স বেশী নয়, তাকে ভুটিয়ানী ব'লেই মনে হ'ল। বোধ হয় ছুটে চলতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছে বা পায়ের তলায় কোনও বন্যগাছের তীক্ষ্ণ কাঁটা বি'ধে গিয়েছে, তাই আর চলতে না পেরে ব'সে পড়েছে। একজন পুরুষ তার হাত ধ'রে ওঠাবার জন্য টানাটানি করছে, বোধ হয় তার স্বামীই হবে, কিন্তু সে উঠতে পারছে না ব'লে মনে হ'ল. একটা গোঙানি ও অস্পষ্ট আর্তনাদ তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে।

আমাদের তো দেরি করবার উপায় নেই, অথচ পথে এ কি বিষম বাধা! ওরা যদি আর একটু এইভাবে থাকে তবে নিশ্চয় হাতীর পায়ের তলায় পিষে মরবে।

তাদের দুর্বোধ্য পাহাড়ী ভাষা আমরা তো বুঝিই না, কুলীরাও বুঝতে পারল না। চাপরাসী অনেকরকম ভাষা জানে, কেননা সে বহু ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে পাহাড়ের নানাস্থান বেড়িয়েছে। সেই আমাদের ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে, "মেয়েটি পূর্ণগর্ভা, পথ চলতে চলতে তার প্রসববেদনা আরম্ভ হয়েছে, হাতীর ভয়ে এতদূরে কষ্ট ক'রে চ'লে এসেছে বটে, কিন্তু এখন আর এক পাও চলতে পারছে না। তার স্বামীকে সে তাকে ফেলেই প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালাতে বলছে, কিন্তু স্বামী তাতে রাজী হচ্ছে না।"

ব্যাপার গুরুতর। আমরাই বা ওদের ফেলে রেখে যাই কেমন ক'রে? অথচ সময় নেই, যা হয় তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে। আমি আমার ঘোড়াতেই মেয়েটিকে তুলে নিতে চাইলাম, কিন্তু দুলারি একেবারেই রাজী নয়। তখন উপায় না দেখে মেয়েটির আপত্তি সত্ত্বেও ওঁর ঘোড়াতেই তাকে তুলে দিলাম। চাপরাসীকে বললাম, তাকে বুঝিয়ে বলুক যে বাবু তার বাবা, আর সে তাঁর বেটী।

উনি পাছে সে প'ড়ে যায় এজন্য এক হাতে তাকে ধ'রে অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঘোড়া ছুটালেন, অবশ্য শিক্ষিত ঘোড়া পড়বার বিশেষ ভয় ছিল না।

সমস্ত পথ ভগবানকে স্মরণ করতে করতে চললাম এবং নিরাপদে তাঁবুতে এসে পে'ৗছলাম। অবশ্য, ভগবানের কৃপাতেই বিপদের উদ্ধার হ'ল, এ কথা আমার মনে তো হয়েছিল, ওঁরও যে হয় নি এ কথা উনি হলফ ক'রে বললেও আমি বিশ্বাস করি না।

তাঁবুতে পে'ৗছে আমি ভিতরে গিয়ে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে পড়লাম। আমার সর্বশরীর কাঁপছিল ও বুকেও প্যাল্পিটেশন হচ্ছিল। আমার অহঙ্কার আছে যে, আমি ভীতু মেয়ে নই, কিন্তু আমার এই যে দারুণ অবসাদ, এ ভয়ে বা পরিত্রাণের আনন্দে অথবা নানা অবস্থার সংঘাতে, তা নিজেও ঠিক বুঝতে পারি নি।

একটু পরেই উনি ভিতরে এলেন, আমার বিছানার কাছে এসে খবর দিলেন, মেয়েটিকে সইসের তাঁবুতে ভালভাবেই রাখা হয়েছে। সইস চাপরাসী ও অন্য সব কুলীরা সইসের তাঁবুতেই থাকবে, এই রকম ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন। উনি জানতেন যে, ভুটিয়ানীর জন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকব, তাই এসেই এই খবরটি আগেই আমাকে দিলেন।

আমাদের চা খাওয়া হ'ল, ওদের স্বামী ও স্ত্রীকেও দু কাপ চা কিছু রুটি

পাঠিয়ে দিলাম। কুলীরা সারারাত্রি বড় বড় কুঁদো কাঠে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রি কাটালে, কেন না আগুন দেখলে হাতীর দল এদিক দিয়ে আসবে না। যা হোক রাত্রি সুপ্রভাত হ'ল। আকাশে সূর্যোদয় হয়েছে, কুয়াশা মেঘ নেই, কিন্তু দারুণ শীত। ভুটিয়ানী কেমন আছে দেখতে গেলাম। পর্দা তুলে দেখি যে, এক বোঝা খড়ের উপরে এক ছোট্ট খোকা, পিট-পিট ক'রে চাইছে আর আঙুল চুষছে। কি সুন্দর যে তাকে দেখতে, কি তোকে বলব ভাই! মনে হ'ল, তখনি একবার বুকে তুলে নিই, কিন্তু লোকলজ্জায় তা পারলাম না।

ভুটিয়ানী বেহুঁশভাবে প'ড়ে আছে, মনে হ'ল তার খুব জ্বর হয়েছে; চোখ চাইতে, ছেলেকে নেবার জন্যে হাত বাড়াতে চাইছে কিন্তু পারছে না। চাপরাসী গ্রামে খুঁজে পেতে এক বদ্যি নিয়ে এল। গলায় তার তবলকীর মালা, গায়ে কম্বলের আলখাল্লা। সে মন্ত্রতন্ত্র কত কি প'ড়ে ঝাড়িয়ে দিলে, তারপর পাঁচনের মত কি সব শিকড় ও লতাপাতা সিদ্ধ ক'রে খেতে দিলে। সবাই বললে—এ ওষুধের নাম জাড়ি, এ নাকি প্রসূতির অব্যর্থ ওষুধ। ভুটিয়ানী কয়েকদিন জ্বরে ভুগল, তারপর ক্রমশ আরাম হ'ল। আমি দেখতাম, জ্বরের ঘোরে কেবলই সে যেন এপাশে ওপাশে হাত বাড়িয়ে ছেলেকেই খুঁজত।

দিনের মধ্যে অনেকবার আমি তার তাঁবুতে তদারক করতে যেতাম। শুনতাম চাকরেরা বলাবলি করত, 'মাইজীর বড় দয়ার শরীর।' কিন্তু কেবল দয়ার জন্যই কি আমি যেতাম? কে জানে!

শীত ক্রমেই বেশী হচ্ছে, আমার ভয় হ'ল, কচি বাচ্চাটার ঠাণ্ডা না লাগে, আর ওর মাও তো জ্বরের রোগী। দুখানা ভুটিয়া কম্বল আনিয়ে দিলাম। মাঝে মাঝে ছেলেটাকে না দেখে এলে আমার যেন স্বস্তি হ'ত না, রাত্রেও দু-একবার উঠে গিয়ে দেখে আসতাম, উনি আমাকে তাতে কত ঠাট্টা করতেন।

পনেরো দিন হয়ে গেল, এইবার আমাদের এখান থেকে উঠতে হবে। জিনিসপত্র বাঁধা হ'ল, তাঁবু তোলা হ'ল। আমরা স্টেশনে রওনা হলাম। গাড়ীতে উঠেছি, প্লাট্‌ফরমে দেখি ছেলে-কোলে ভুটিয়ানী ও তার পাশে তার স্বামী। দুজনেই কতবার যে আমাদের সেলাম করলে তার সংখ্যা নেই, ভাষায় বোঝাতে পারে না, কি ভাবে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে, তা যেন বুঝে উঠতে পারছে না। ভুটিয়ানী ছেলেকে আমার সম্মুখে উঁচু ক'রে তুলে ধরল, যেন বলতে চায়, 'এ ছেলে তোমাদেরই দান।' কি আমাদের দেবে ভেবে পাচ্ছে না, চাপরাসীর হাতে কতকগুলি ডালভাঙা কচি কচি পাতা দিলে, আর কি সব বলতে বলতে মাঝে মাঝে চোখ মুছছে দেখতে পেলাম।

চাপরাসী আমাদের তার কথার অর্থ বুঝিয়ে বললে যে,—'ভুটিয়ানী বলছে, তার এই ছেলে আপনাদের দয়াতেই বেঁচেছে, পাহাড়ের দেবতা এই পুণ্যকর্মের ফল নিশ্চয়ই আপনাদের দেবেন। ভগবান ঘুম পাহাড়ের উপরে মন্দিরে আছেন, ভুটিয়ানী সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে মানত করবে, তিনি শীঘ্রই আপনার কোলে সুন্দর খোকা দেবেন। আর ওরা বলছে—ওরা বড় গরীব, কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য আপনাদের কিছু দিতে পারলে না, তাই এই লতাপাতাগুলি দিচ্ছে, দয়া ক'রে

এগুলি নিন। তরকারি বা ভাতে এই পাতা দিলে ভারি সুগন্ধ হয়।' এই ব'লে সে পাতাগুলি গাড়ীর ভিতর তুলে দিলে।

ঘণ্টা বাজল, আর সময় নেই। গাড়ী আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করেছে। তখন আমার মনে হ'ল, আমি তো টাকা-পয়সা ওদের কিছু দিয়ে আসি নি, কম্বল দুটোও চাপরাসী হয়তো ওদের দেবে না। এই দারুণ শীতে কচি ছেলে আর তার মা কি ক'রে বাঁচবে? তাড়াতাড়ি আঁচলে যে তিন-চারটে টাকা বাঁধা ছিল তা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। ওঁর পায়ের তলায় যে ভুটিয়া কম্বলটা পাতা ছিল, সেটাও জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। ওরা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

তিন-চার মাস পরেই বুঝলাম, ভুটানী মার আশীর্বাদ সফল হয়েছে, তার খোকার মত আমাদের ঘরেও খোকা আসছে। কি যে তখন মনে হ'ল ভাই, বুঝিয়ে বলতে পারি নে। হায় রে! কেন সেই ভুটানীর ঠিকানা রাখি নি? তা হ'লে তো তাদের জানাতে পারতাম যে, দুঃখিনীর অন্তরের আশীর্বাদ ভগবান সফল করেছেন। তা হ'লে তো আমার হিমাচলপ্রসাদকে একবার হিমালয়ে তার ভুটানী মার কুঁড়েঘরে গিয়ে তার খোকার সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে দিতে পারতাম!"

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', বার্ষিক (দোল) ১৩৪৭

ছায়া-ছবি

নাটিকা

সময়—৭০।৭৫ বৎসর পূর্বে।
স্থান—পল্লীগ্রামের কোন মধ্যবিত্ত জমীদারের বাড়ী।

(বাড়ীটি দ্বিতল, কতকটা চকমিলানো এবং কতকটা একহারা। অন্য শরিকদের বাড়ী এ-বাড়ীর গায়ে লাগাও শ্রেণীবন্ধভাবে অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরের উঠানের পর সদরের কাছারি-বাড়ী, কাছারি-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সারি সারি ধানের গোলা। অন্তঃপুরে উঠানের সম্মুখে প্রশস্ত বাঁধানো রোয়াক, সেখানে ঠাকুরমা ও তাঁহার নাতনী রাধারাণী গল্প করিতেছেন)

রাধা—তারপর ঠাকুমা কি হ'ল?

ঠাকুরমা—সন্ধ্যে হয়ে এল যে, এখন ওঠ্। কাল আবার বলব অখন।

রাধা—না, তুমি বল তারপর কি হ'ল!

ঠাকুরমা—তারপর তোর দাদামশায় আর দিদিমা খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ঘরে গেল, আর তোর ঠাকুরদাদা করলেন কি, অন্ধকার রোয়াকে তাদের ঘরের জানলার কাছে চোরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাধা—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন, বল কি ঠাকুমা? ঠাকুরদাদা কি আড়ি পাতছিলেন নাকি?

ঠাকুরমা—আড়িই তো পাতছিলেন; জানতেন মেয়ের বিয়ের কথা মেয়ের মা-বাবাতে নিশ্চয়ই কিছু হবে: তাই কি কথা হয় শোনবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন তাঁর বুক দুর দুর করছিল।

রাধা—কেন? কেউ দেখে ফেলে সেই ভয়ে?

ঠাকুরমা—সে ভয় তো আছেই, আরো ভয় হচ্ছিল যদি ওরা বলে যে, রাজনারাণ ঘোষের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না!

রাধা—ঠাকুমা, তুমি বলছ কি, ঠাকুরদাদা তাদের বাড়ী অতিথি হয়ে খেয়ে-দেয়ে আবার রাত্তিরে তাদেরই ঘরে আড়ি পাততে গেলেন! কেন, ঘরে গিয়ে ঘুমলেই পারতেন, বিয়ে দেয় না-দেয় সে তো সকালেই জানা যেত। তোমাদের ছেলের কি আর বিয়ে হ'ত না?

ঠাকুরমা—আরে দিদি, দায়ে প'ড়ে সবই করতে হয়। তুই তো আর দেখিস নি তোর ঠাকুরদাদা কি রকম বাঘের মত মানুষ ছিলেন। সেই মানুষ গিয়েছেন মুখ্যি কুলীনের বাড়ী হাতজোড় ক'রে ছেলের কুলকর্মের জন্য মেয়ে ভিক্ষে

করতে। তোর দাদামশায়কে কত বিনয় ক'রে বলেছেন, "কথা দিন, আমার ছেলেকে কন্যাদান করবেন, তা হ'লে আমি আপনার বাড়ী অতিথি হব, না হ'লে জলগ্রহণ না ক'রেই ধ্লো পায়ে ফিরে যাব।" তা তোর দাদামশায়ও কম ত্যাঁদড় নন, বললেন, "সে কি একটা কথা হ'ল? আহার কর্ন, বিশ্রাম কর্ন, মেয়ের গর্ভধারিণীরও তো একটা মতামত আছে, কাল সকালে আপনাকে সঠিক জানাব।"

রাধা—ও বাবা! ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে এত খোসামোদ করতে হয় তা তো জানি নে। আচ্ছা ঠাকুরমা, মার তখন কত বয়স?

ঠাকুরমা—বছর আড়াই হবে, আমিই তো বিয়ে দিয়ে এনে কোলে পিঠে ক'রে মান্ষ করেছি, তবে ভারি শান্ত ছিল, আবদার আখ্‌ট মোটেই ছিল না, কেবল সন্ধ্যাবেলায় ঘ্ম পেলে 'মার কাছে যাব' ব'লে বায়না করত।

রাধা—অত ছোট মেয়ে বিয়ে দিলেনই বা কেন?

ঠাকুরমা—না দিয়ে করবে কি? ম্খ্যি কুলীনের মেয়ে আর কি ঘরে রাখতে পারে? কত লোক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে তখন তোর দাদার দ্য়োরে ধন্না দিচ্ছে, আমাদের কপাল ভাল তাই মেয়েটি পেলাম। তাও বলি, আমার ছেলের মত জামাই তাঁরা পেতেন কোথায়, ছেলে তো নয়, যেন রাজপ্ত্তুর।

রাধা—তা তোমার নিজের ছেলে, রাজপ্ত্তুর তো বলবেই, ঠাকুরদাদা তা হ'লে হলেন রাজা, আর তুমি তো রাণী হ'লে? বেশ! বেশ! খ্ব নিজের গাওনা গেয়ে নিলে যা হোক।

ঠাকুরমা—দেখ্ রাধ্, তুই কি ক'রে ব্ঝবি যে তোর বাবা আমার কত দ্ঃখের ধন। কত ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা খ্ঁড়ে তবে কীর্তিকে কোলে পেয়েছি। বিয়ে যখন হয় তখন দশ উতরে এগারোয় পড়েছে, ছেলের সে কি রঙ আর কি চেহারা, আর সেই সময় আবার ইংরিজী ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে, কত কি যে বছর বছর প্রাইজ পেত, একটা সাহেব এসে আবার ওর পড়া শ্নে এমনি খ্শী হ'ল যে, একটা সোনার পদকই দিলে, সে পদক এখনো আমার বাক্সে তোলা আছে। তোর দাদা দিদি অনেক প্ণ্যি ক'রে এমন জামাই পেয়েছিল।

রাধা—আচ্ছা ঠাকুমা, রাগ না কর তো একটা কথা বলি, তোমার শাশ্ড়ী নাকি বড় বউকাঁটকী ছিলেন, তোমাকে পেটভরে খেতে দিতেন না?

ঠাকুরমা—যাঃ! কি কথা হচ্ছে আর কি কথা নিয়ে এলি? তাঁরা গ্র্জন স্বগ্গে গিয়েছেন, তাঁদের কথা কি আর এখন অমন ক'রে বলতে আছে? ওতে অপরাধ হয়।

রাধা—হ্যাঁ, অপরাধ তো হয়, কিন্তু তোমাকে বলি, তুমিও বাপ্ বৌকাঁটকী হয়েছিলে, না হ'লে অত আদর ক'রে পরের মেয়ে ঘরে নিয়ে এলে, শেষে কিনা আবার একটা বিয়ে দিতে চাইলে ছেলের?

ঠাকুরমা—আমি কি বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, পাড়ার সবাই "ছেলে হ'ল না, ছেলে হ'ল না" ক'রে যে মাথা খেয়ে ফেলতে লাগল। তাও বটে আর 'আদ্যিরস'

করারও একটা ধুয়ো উঠল, শ্বশুরঠাকুর তখনও বেঁচে ছিলেন, তিনি বললেন, ডাগর দেখে একটি মৌলিকের মেয়ে বিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে এস, বংশও রক্ষে হবে, আর আদিরসে কুলও উজ্জ্বল হবে।

রাধা—তা হ'ল না কেন?

ঠাকুরমা—তোর বাবা কি সেই পাত্তর যে আবার বিয়ে করবে। আহা তোর মার তখন সে কি মূর্তি! ভাবনায় ভাবনায় বাছা একেবারে কাঠিটি হয়ে গিয়েছিল। সে কষ্ট আমি তো ভাল ক'রেই জানি, আমার যখন তিনটে মেয়ে পর পর হ'ল তখন আমার শাশুড়ীও তো উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন যে "ছেলে হ'ল না, ছেলের আবার বিয়ে দেব" তখন কত ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত ক'রে তবে তো কীর্তি হ'ল। তাই বৌমাকে বললুম যে. ঠাকুর-দেবতা ভিন্ন গতি নেই। আমিও মানস করি, তুমিও মানস কর, তোমার কোলে যেন বচ্ছরের মধ্যেই সোনার চাঁদ আসে। ছেলে হ'লেই বিয়ে দেবার ডামাডোল আপনি থেমে যাবে। আহা, বৌমা আমার পেটে ভাত নেই, মাথায় তেল নেই, একটা ঢিবি দেখলেও মাথা খুঁড়েছে। ঠাকুর-বাড়ীতে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় গিয়ে কত আরাধনা করেছে, আর কি মা সর্বমঙ্গলা ছেলে না দিয়ে পারেন!

(রাধারাণীর বড় বোন সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা—ঠাকুমা, সন্ধ্যে যে উতরে যায়, জপ-আহ্নিক করবে, না, রাধির সঙ্গে খালি গল্প করবে! বাবা ব'লে পাঠালেন, ছুটিপুর থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁরা রাত্রে এখানে থাকবেন। বড়দা জেলে ডাকতে গিয়েছেন পুকুরে মাছ ধরবার জন্যে। মা বললেন, তোর ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়, রান্নার কি ব্যবস্থা হবে!

ঠাকুরমা—এই উঠছি দিদি, আমার রাধারাণীর পাল্লায় পড়লে কি আর সহজে ছুটি আছে? আয় রাধু, সন্ধ্যেবেলায় ছাঁচতলায় আর থাকিস নে।

(ঘাটের পথ—বৌ-ঝিরা স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অনেকেরই কক্ষে জলপূর্ণ কলসী, কেহ বা কাচা কাপড়ের স্তূপ হাতে কাঁধে লইয়া সঙ্গিনীদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। পথের দুই ধারে মাঠ, মাঠে সারি সারি খেজুর গাছ ও খেজুর গাছের গলায় কলসী বাঁধা)

একজন বধূ—ছেলেগুলো সব সেই ভোর থেকেই বাড়ী ছেড়েছে। বললাম যে, এত ভোরে হিম লাগবে আর একটু পরে উঠিস, কে শোনে সে কথা! ভোর থেকেই সব গিয়ে জড় হয়েছে গুড়ের বানে। ভাই হেমা, কলসীটা একটু ধর্ না, কাপড়টা গুছিয়ে নিই।

হেমা—দাও না, আমাকেই কলসীটা দাও, তুমি কাচা কাপড় আর জলের কলসী দুই একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।

বধূ—না রে, ঠাকরুন আবার রাগ করবেন, বলবেন, জলের কলসীটা ঘাট থেকে আনতে পার না, আবার হেমার ঘাড়ে চাপিয়েছ? 'নবাবের বেটী-টেটী' কত কি বলবেন দেখিস।

হেমা—(হাসিয়া) 'নবাবের বেটী' সে তো ভাল কথাই। তা যাক্‌গে, কাপড় গোছ করা হয়েছে, এইবার কলসী নাও। হ্যাঁ ভাই, যাদুদিদিকে আজ ঘাটে দেখলাম না তো? সে তো খুব ভোরেই নাইতে আসে।

মানদা—জানিস না কিছু সেজোদের বাড়ীর খবর? যাদুদিদি যে কাল সমস্ত মাথার চুল কেটে ফেলেছে! কাল সারাদিন ওদের বাড়ী শুদ্ধু সকলের উপোস গিয়েছে। সেজখুড়ী তো কেঁদে কেটে এমন মাথা খুঁড়েছেন যে তাঁর মাথা একেবারে ফুলে উঠেছে।

হেমা—কেন, কেন মানিদিদি, আমি তো কিছু জানি নে, হয়েছিল কি?

মানদা—হবে আবার কি, তুচ্ছ কথা। বিদ্যেসাগর নাকি বিধবা বিয়ের আইন করেছেন, তাই—

হেমা—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে, শান্তিপুরে তাঁতিরা বেঁচে থাক্, বিদ্যাসাগর-পেড়ে কাপড় বুনেছে। সেজ বৌ, ভাই, তোমার তো শান্তিপুরে বাপের বাড়ী, আমাকে একখানা ঐ কাপড় আনিয়ে দেবে ভাই!

মানদা—আ মর্ ছুঁড়ি, এক কথায় আনে আন্ কথা। যাদুদিদির কথা জিজ্ঞেস করছিলি না! সেজদাদা আমোদ ক'রে যাদুদিদিকে বলেছিল, "যাদু, বিধবা বিয়ের আইন হয়েছে শুনেছিস, বিদ্যেসাগর এই আইন করিয়েছেন। আমি এবার কলকাতায় তোর জন্য একটা সম্বন্ধ ঠিক ক'রে আসছি, এই অঘ্রাণ মাসেই বিয়ের ধুম লেগে যাবে আর কি। যে যেখানে বিধবা আছে সকলেরই বিয়ে হবে, কেউ বাদ যাবে না।" যাদুদিদির মুখ লাল হয়ে গেল, সে কথাটি না ব'লে সেখান থেকে উঠে গেল। এদিকে সেই কথা নিয়ে পাড়ায় ঘোঁট, বগলা ঠাকরুন বাড়ী বাড়ী খবর দিয়ে এল যে, অঘ্রাণ মাসে যাদুর আবার বিয়ে হবে, সত্য কলকাতায় পাত্র ঠিক ক'রে এসেছে। তারপর সেজখুড়িকে মিত্তির-বাড়ীর গিন্নি এসে চুপি চুপি বললেন, "হ্যাঁ সেজবৌ, এ কি কথা শুনছি, রাজনারাণ ঘোষের অত বড় নাম তোরা একেবারে জলে ডুবোবি? বিধবা মেয়ের নাকি আবার বিয়ে দিবি? এমন কাজ কখনো করিস নি, কখনো করিস নি!" এই আর কি, লেগে গেল তুল-কালাম! যাদুদিদি তো গিয়ে ঘরে দুয়োর বন্ধ করলে, ঘরে কাঁচি ছিল, কচ্ কচ্ ক'রে অমন যে সুন্দর চুল সব কেটে ফেলেছে। মনের বিবাগে যে গলায় দড়ি-টড়ি দেয় নি এই রক্ষে।

হেমা—ও মা, এত কাণ্ড হয়েছে আমি তো কিছু জানি নে। মেজবৌ, তুমি তো আমায় কিছুই বললে না! খালি বললে, সেজদের বাড়ী আজ আর তাস খেলতে যেও না।

মেজবৌ—তোমাকে ব'লে আর কি হবে! আর তুমি তো কুমোরখালির মেয়ে, ইস্কুলে কি পড়াই শিখেছ—রাতদিন ঘরের কোণে বই মুখে ক'রেই প'ড়ে আছ। এ সব খবর তুমি আর কি ক'রে জানবে?

হেমা—আচ্ছা, বগলা ঠাকরুন কি রকম মানুষ, কেবল ঘোঁট পাকানো নিয়েই আছেন!

ন বৌ—ওঁর কথা আর ব'লো না, ছিপতি চাটুয্যের মেয়ে তো, কত আর হবে! কুলীনের মেয়ে চল্লিশ বছর বয়স হ'ল, বিয়ে হ'ল না, কি নিয়ে আর থাকবেন বল, তাই দিনরাত কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোথায় কার কি কুচ্ছো পাবেন সেই চেষ্টায়।

হেমা—আহা, যাদুদিদি বেচারী কোন দোষের দোষী নয়। কোন্ ছেলেবেলায় ন বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, তার বিয়ে হ'লেই বা দোষের কি হ'ত?

(মাঠ দিয়া একটি চাষার ছেলে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে—)

"ও ঘাটে যেও না বেউলা—
ওরে বেউলা আমার মা!
চাঁদের বেটা দুর্লভ নখা
তোরে দেখলে ছাড়বে না।"

মানদা—ওরে ও ছোঁড়া, দাঁড়া না। বেশ তো গান করছিস, গলাটা ভারি মিষ্টি। তুই ভাসানের দলে থাকিস নাকি?

চাষার ছেলে—না মা ঠাকরান, শুনে শুনে শিখে নেলাম।

মেজবৌ—ভাই, আমরা একদিন ঘরে দুয়োর বন্ধ ক'রে বেউলার ভাসান করব। সেজবৌকে আগে থাকতে বলা হবে না, তা হ'লে সে সেজ ঠাকুরপোকে ব'লে দেবে, আর আমাদের গাওনা মাটি হয়ে যাবে। কি সুন্দর সে দিন বেউলের ভাসানে সঙ দিয়েছিল। এই লাঠি ঘাড়ে রামসিং জমাদার এল গান গাইতে গাইতে "রামসিং জমাদার হাজির হুয়া", রাঙা বৌকে রামসিং জমাদার সাজালে ঠিক হবে, সে বেশ লম্বা-চওড়া আছে। আর নতুন বৌকে সাজাব বেউলা, ওর গলাটা ভারি মিষ্টি।

মেজবৌ—আচ্ছা থাক্ এখন বেউলার ভাসান, রোদ কোথায় উঠল দেখেছিস। ছেলেরা এখনি "ভাত, ভাত" ক'রে এসে পড়বে, চল্, পা চালিয়ে বাড়ী চল্।

কুমুদ—আমাকেও ভাই লক্ষ্মীপুজোর খই ভাজতে হবে, বাছতে হবে, আবার মোয়া বাঁধতে হবে। ভশ্চাযি্যদের কিরণকে না হয় ডেকে আনি। সে এলে হাতে-হাতে হয়ে যাবে।

মানদা—কিরণকে ডাকবে? ওর সৎমার মুখ নাড়া কে খাবে বল! আহা, মেয়েটাকে দিনরাত যেন দাঁতে পিষছে। কি অদেষ্ট ক'রেই এসেছিল! সেই চার বছর বয়সে কবে যে বিয়ে হ'ল, কবে যে সিঁথের সিঁদুর মুছল কিছুই তার জানলে না।

মেজবৌ—কি আর হবে বল, আর-জন্মে যেমন কম্ম ক'রে এসেছে তার ফল তো ভুগতে হবে। নইলে মাই বা ওর মরবে কেন, আর বাপেরই বা এমন বুদ্ধি হবে কেন যে, এক কেশোরুগীর সংগে চার বছরের বাচ্চাটাকে বিয়ে দিয়ে পরিবর্তে নিজে আবার ধেড়ে এক মাগীকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনবে। বাবা, ভশ্চায্যি-গিন্নি যেন খাণ্ডারণী, অমন মেয়ের খুরে খুরে পেরন্নাম।

(যদু ভট্টাচার্যের বাড়ী, ভট্টাচার্য খড়ম পায় দিয়া সাবধানে কর্দমময় উঠান পার হইলেন, দাওয়ায় রক্ষিত গাড়ু হইতে জল লইয়া পা ধুইয়া গামছায় পা মুছিলেন এবং জলচৌকীর উপর বসিয়া ডাক দিলেন—)

কিরণ, কিরণ, এক কল্কে তামাক নিয়ে আয় তো মা। আঃ, কি টিপ-টিপিনি বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, কালীপুজো গত না হ'লে বৃষ্টি থামবার আর আশা নেই।

(ইতিমধ্যে ভট্টাচার্যের দুই বৎসর বয়স্কা কন্যাটি উঠানে আছাড় খাইল)

গৃহিণী—(উচ্চকণ্ঠে) হ্যাঁ লা কিরণ, ও কিরণ! পোড়ারমুখী মরেছে নাকি, এই তো রান্নাঘরে ছিল, এর মধ্যে গেল কোথা?

ভট্টাচার্যের আর এক কন্যা—দিদি বাড়ী নেই মা, বড়বাড়ীর গিন্নিমা ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তুমি তখন মজুমদার-বাড়ী গিয়েছিলে তাই তোমাকে ব'লে যেতে পারে নি।

গৃহিণী—(ক্রুদ্ধকণ্ঠে) দিদির তো খুব সাফাই গাওয়া হচ্ছে, এদিকে উঠোনে বোনটা গড়াগড়ি যাচ্ছে, একটু নড়াটা ধরতে পার না? দিদি, দিদি, দিদি! সাতকেলে দিদি তোদের! যত সব পেটে জন্মেছে কাঁটার ঝাড়, মা গেল ভেসে, দিদি বলতে একেবারে অজ্ঞান!

ভট্টাচার্য—আঃ, ওরূপ উষ্ণ হও কি জন্য! জমিদার-বাড়ী হইতে গিন্নিমা ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন, না যাইয়া কি করিবে? এখন খুকীকে তোল, আমি তুলিতে গেলে আমাকে আবার পদপ্রক্ষালন করিতে হইবে।

গৃহিণী—পাণ্ডিত্য বচন এখন রাখ, আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। 'না যাইয়া করিবে কি', করিবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। চোদ্দ বছরের ধাড়ি, জ্ঞান নেই যে সে বিধবা। ওই মেয়েকে আবার ঢং ক'রে তেল খরচ ক'রে পড়ানো হয়, বিদ্বানের মেয়ে বিদ্বান হবেন, রোজগার ক'রে বুড়ো বাপকে খাওয়াবেন! আর বড়বাড়ীর গিন্নিকেও বলি, যখন-তখন পরের মেয়েকে ডেকে পাঠাস কি ব'লে, ঘরে কি ওর কাজকম্ম নেই, তাই তোদের বাড়ী যাবে বাঁদীগিরি করতে? রান্নাবান্না হয়েছে তো, না, তাও হয় নি?

কন্যা—(ভয়ে ভয়ে) হ্যাঁ মা, দিদি সব রেঁধে-বেড়ে ঢেকে রেখে গিয়েছে, ও বড়বাড়ীতে ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ খাবে, বড়বাড়ীর গিন্নিমা ব'লে দিয়েছেন।

গৃহিণী—আচ্ছা, হয়েছে, থাম্। বিধবা হয়েছেন, তবু একটু হায়া নেই, এর ওর বাড়ী পাতড়া মেরে বেড়াচ্ছেন,—অমন মেয়েকে ছাই পেড়ে কাটতে হয়।

ভট্টাচার্য—(উত্তেজিতভাবে) বিধবা হইয়াছে, বিধবা হইয়াছে! সে কি নিজের দোষে বিধবা হইয়াছে, না, আমারই দোষে বিধবা হইয়াছে! তাহাকে শিশু-বয়সে এক কাশরোগীর সহিত আমিই বিবাহ দিয়াছি, পরিবর্তে বিবাহ করিবার জন্য। হায় হায়, পাত্র যে কাশরোগী তাহা কি জানিতাম? সন্ধানও লই নাই। দারপরিগ্রহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া কি অপকার্যই করিয়াছি!

(আবেগে ভট্টাচার্যের কণ্ঠরোধ হইল)

গৃহিণী—আহা আহা, একেবারে কেঁদে ফেললে যে! মেয়ে তো কারও বিধবা হয় না, কেবল তোমারই মেয়ে বিধবা হয়েছে। তা দাও না আবার মেয়ের বিয়ে, ঐ যে শুনি বিদ্যেসাগর না কে যেন কি আইন করেছে! হায় হায়, কালে কালে হ'ল কি! বাপের এত সোহাগ না হ'লে মেয়ে এমন ধিঙ্গী হয়! ও মেয়ে কি আর ঘরে থাকবে! তোমার মুখে কোন্‌দিন চুনকালি দেবে, তা দেখে নিও। মেয়েদের স্কুল হ'ল, পাঠশালা হ'ল, আরও কালে কালে কত কি হবে! নিজে পড়িয়ে হয় না, আবার নিরঞ্জনকে বলেন, 'খুকীকে একটু সূত্রটা বুঝাইয়া দাও তো', সূত্র বোঝাবে, না, তোমার মাথা বোঝাবে, কি যে বোঝাবে তা পরে দেখতেই পাবে।

ভট্টাচার্য—গৃহিণী, ক্ষমা দাও। আমার শিরোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি এত অবোধ কেন, তোমারও তিনটি কন্যা হইয়াছে, তাহাদেরও বিবাহ দিতে হইবে। রাসমণিকে তো অতি শীঘ্রই পরিবর্তে দিতে হইবে, না হইলে রামসদয়ের বিবাহ হইবে না। খুড়ামহাশয় আমার প্রথম বিবাহের সময় তাঁহার কন্যাকে পরিবর্তে দিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অদ্যাপি অবিবাহিত, আর আমার অর্থও নাই যে, পণ দিয়া ভ্রাতার বিবাহ দিব, সুতরাং কন্যাকে পরিবর্তে না দিয়া উপায় কি?

গৃহিণী—তা কখনই হবে না। আমার মেয়েকে আমি পরিবর্তে দেব না, দেব না, দেব না। এত ছোট মেয়ের বিয়েও আমি দেব না। কেন, আমার কি সাধ-আহ্লাদ কিছু নেই? হাতে শাঁখা প'রেই জন্ম কাটল, মেয়ের বিয়ে দিয়ে যদি গায়ে দুখানা সোনাদানা ওঠে, তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন? (সহসা উগ্র হইয়া) যত মায়া তোমরা সেই আবাগীর উপর, আমার মেয়েদের উপর তোমার মায়াও নেই, দয়াও নেই। তাকে যদি এই মাসের মধ্যে বাড়ী থেকে বিদেয় করতে না পারি তবে আমার নাম মালতী বাম্‌নী নয়।

(যদু ভট্টাচার্যের বাড়ী। বাহিরের টোলঘরে ভট্টাচার্যের ছাত্র নিরঞ্জন চক্রবর্তী পাঠ অভ্যাস করিতেছে। কিরণ প্রাঙ্গণে গোময় লেপন করিতেছে, গৃহিণী শয়নগৃহে বসিয়া তাম্বূলের বাটা লইয়া পান সাজিতেছেন)

গৃহিণী—(আত্মগত) মেয়েটাকে বিদেয় করতেই হবে। সহ্য হয় না, সহ্য হয় না, বিধবা মেয়ের এত আদর আমার সহ্য হয় না। আর মেয়েগুলোও তেমনি হয়েছে, কেবল "দিদি, দিদি, দিদি"! মা যেন কেউ নয়, দিদিই সর্বস্ব। রাসমণি, হরমণি তো কেঁদেই ফেলে, হতভাগী যেন ওদের গুণ করেছে, একটু কিছু বলবার যো নাই। আর পাড়াপড়সীও তেমনি, সকলের মুখেই খালি শোন যে "কিরণের মত মেয়ে হয় না, এমন গুণের মেয়ে আর হয় না।" এবার দেখি পাড়ার লোক গুণবতীর গুণ কত গাইতে পারে! যা মনে করেছি তা করবই, উনি বাড়ী নেই, এই সময়েই আপদটাকে বিদেয় করতে সুবিধে হবে, আর দেরি করা নয়। আমার কাজকম্মের একটু কষ্ট হবে, তা হয় হোক্, সতীন-কাঁটা চিরদিন এমন ক'রে বরদাস্ত করতে পারব না। কিরণ, কিরণ, এদিকে একবার আয় তো মা!

কিরণ—(রান্নাঘর হইতে) এ কি, নতুন মা আমাকে 'আয় তো মা' ব'লে ডাকছেন, এমন মিষ্টি ক'রে তো কখনও ডাকেন নি, আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! (উচ্চ স্বরে) যাই মা, দুধের কড়াটা নামিয়েই যাচ্ছি।

গৃহিণী—একটু শীগগির আয় মা, আমার হাতজোড়া, পান সাজ্‌ছি।

কিরণ—(প্রফুল্লমুখে গৃহিণীর কাছে গিয়া) মা আমায় ডাকছেন?

গৃহিণী—হ্যাঁ মা, ডাকছি। (কিছুক্ষণ কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে) সত্যি, ভারি হাবা, 'আয় মা' ব'লে ডেকেছি, তাই আহ্লাদে আর বাঁচছে না। যাকগে অত ভাবব না, যা মনে করেছি তা করতেই হবে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ মা, শোন, নিরঞ্জন ঐ টোলঘরে আছে, এক গেলাস জল চেয়েছিল, রামু তো নেই, কোথায় খেলতে গিয়েছে, তুমি এক গেলাস জল আর এই পান দুটো ওকে দিয়ে এস তো। অনেকক্ষণ জল চেয়েছে।

কিরণ—(ভীতভাবে) মা, আমি—আমি—

গৃহিণী—হ্যাঁ, তুমিই যাও, জল আর পানটা দিয়ে এস, ও তো তোমার ভাইয়ের মত, এত কিন্তু হচ্ছ কেন? কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? আমাকে না ওঠালে বুঝি তোমার হবে না! জলটা আর পানটা দিয়ে আসবে তাও পার না?

কিরণ—(একবার উঠানের দিকে চাহিল, যদি রাসমণিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পর শঙ্কিত পদক্ষেপে টোলঘরের সম্মুখে গিয়া জলের গেলাস ভিতরে রাখিয়া বলিল) এই পান নিন।

নিরঞ্জন—(আশ্চর্য হইয়া) পান কেন?

(কিরণ হঠাৎ পিঠের উপর ধাক্কা খাইয়া ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল, সেই মুহূর্তে বাহির হইতে দরজা বন্ধ হইয়া গেল)।

নিরঞ্জন—ও কি দরজা বন্ধ করলে কে? কিরণ, কিরণ, ওঠ, খুব লেগেছে না কি? কি ক'রে হঠাৎ প'ড়ে গেলে?

(খোলা জানলার কাছে গৃহিণীর উচ্চ চিৎকার ও লোক সমাগম)

(যদু ভট্টাচার্য বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথশ্রমে তাঁহাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখাইতেছে। এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে একটি থেলো হুঁকো)

যদু—(আত্মগত) তাই তো, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, পথে যাহার সঙ্গে দেখা হয় কথা কয় না, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, ইহার অর্থ কি! সকল বিষয়েরই একটা তাৎপর্য আছে, বাড়ীতে কি কোন বিপদ ঘটিল, কিছুই তো বুঝিতেছি না।

(অদূরে হরিশ মজুমদারের প্রবেশ)

আরে মজুমদার মহাশয় যে, দয়া করিয়া একবার এদিকে আসুন, আমার বাড়ীতে কি কোন বিপদ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে?

হরিশ—(নতমুখে) ভট্টাচার্য মশাই! কি আর বলব, আপনার কন্যা কিরণ—

ভট্টাচার্য—(সোদ্বেগে) কিরণ—আমার কন্যা কিরণ, কিরণের কি মৃত্যু হইয়াছে?

হরিশ—মৃত্যু হ'লেই ভাল হ'ত, কিরণ কাল সন্ধ্যায় নিরঞ্জনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে।

ভট্টাচার্য—(অধীরভাবে) গৃহত্যাগ! নিরঞ্জন! আপনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন?

হরিশ—(মাথা চুলকাইয়া) বিশ্বাস না ক'রেই বা কি করি মশাই। দেখলাম, দুজনে একঘরে,—নিরঞ্জন আর কিরণ, আপনার গৃহিণী দরজা বন্ধ ক'রে পাড়ার লোক ডাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখালেন।

ভট্টাচার্য—আঃ দুষ্টা! কোথায় কোন্ ঘরে এ ঘটনা ঘটিয়াছিল?

হরিশ—টোলঘরে। কিরণ মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, নিরঞ্জন তাকে হাত ধ'রে তুলছিল—আমি জানলা দিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি। কেবল আমি কেন, পাড়ার সকলেই দেখেছে।

ভট্টাচার্য—হ্যাঁ, যাহাতে পাড়ার সকলে দেখিতে পায় সেজন্য তাহারা পথের দিকের জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিল! ওঃ, কি ষড়যন্ত্র! হায়! হায় হতভাগ্য আমি, নিজের কন্যার নিজেই সর্বনাশ করিয়াছি। আপনাদের কি একটুও সন্দেহ হইল না যে, ঘটনাটির ভিতর একটি ষড়যন্ত্র আছে? তাহাদের কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে, কেন ওভাবে কিরণ টোলঘরে পড়িয়া আছে? আর বাহির হইতেই বা দরজা বন্ধ কে করিল?

হরিশ—তা তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বইকি—নিরঞ্জন কি যেন বলেছিল, আর কিরণ তো কোন কথাই বলতে পারে নি। তা যা হোক, আপনার গৃহিণী তাদের স্টেশনে রওনা ক'রে দিয়ে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছেন, এর পরেও কি তারা আর গ্রামে মুখ দেখাতে পারত! আর তাদের কৈফিয়ত কেই বা বিশ্বাস করত? জানেন তো, মেয়েদের সুনাম কাঁচের আরসীর মত ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

ভট্টাচার্য—হ্যাঁ, সবই জানি। স্টেশনে পাঠানোর খবর পাইয়া বড়ই উপকার হইল, আমিও যাইতেছি স্টেশনে।

(রাস্তা দিয়া একটি গরুর গাড়ী যাইতেছিল)

এই যে রহিমের গাড়ী। বাবা, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি স্টেশনে পেঁছে দে তো, যা ভাড়া চাস তাই পাবি।

হরিশ—মশাই, করেন কি? তাদের কি আবার ফিরিয়ে আনতে চান? এমন পাগলের মত কাজ করবেন না। শেষে আপনাকে পর্যন্ত একঘরে হতে হবে। যাঃ, কে শোনে কার কথা, ভট্টাচার্য চলল স্টেশনে, ব্রাহ্মণের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কলিকাতা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী।

(বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য, এক হাতে কিরণের হাত ও অপর হাতে নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া আছেন)

ভট্টাচার্য—(গদ্‌গদ স্বরে) দয়ার সাগর! আমার সাক্ষাৎ ভগবান! এই আমার অনাথা মেয়ে, চার বছর বয়সে বিধবা হইয়া অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, আর এই নিরঞ্জন আমার পুত্রতুল্য মেধাবী শিষ্য—ইহাদের দুইজনকেই আপনার পদপ্রান্তে অর্পণ করিলাম। আমি হতভাগ্য, আমি পাষণ্ড, আমি আমার কন্যাকে আশ্রয় দিতে অপারগ। দেবতা, যাহাতে কুশল হয় তাহাই করুন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়—(চোখে অশ্রু ও মুখে হাসি) যাতে কুশল হয়, তাই হবে। অনেক সময় বিপদও সম্পদের হেতু হয়। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। এস মা আমার, এস বাবা, তোমরা আমারই আপন জন, কোন চিন্তা নেই তোমাদের, আমার এ বাড়ী তোমাদেরই বাড়ী।

(কিরণ বিদ্যাসাগরের পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং নিরঞ্জন নতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল)

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয় ১৩৪৮

মনস্তত্ত্ব

বাড়ীতে আছেন রাধামাধব ঠাকুর। তিনিই ছিলেন আমাদের বাড়ীর কর্তা।

ছেলেবেলায় দেখিয়াছি রাধামাধবের মন্দিরে আরতির সমারোহ। গ্রামের সকল বাড়ীর মেয়েরাই সকাল সকাল কাজ সারিত এইজন্য, যেন তাহারা আরতির সময় উপস্থিত থাকিতে পারে। রাধামাধবের মন্দিরের বাজনাদারদের চাকরান জমি দেওয়া ছিল, সেই জমি তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং পুরুষানুক্রমে রাধামাধবের মন্দিরে বাজাইয়া আসিতেছে। দেবোত্তরের গোয়ালারা রথে, দোলে, রাসে, ঝুলনে যত ঘি দুধ দই লাগিত সমস্তই সরবরাহ করিত এবং উৎসবে সপরিবারে প্রসাদ পাইত। দ্বিপ্রহরে ভোগের পর ডঙ্কায় ঘা পড়িত, সেই ডঙ্কার ধ্বনি শুনিয়া দলে দলে প্রসাদপ্রার্থী আসিয়া অঙ্গনে জড় হইত। জন্মাষ্টমীর সময় সমস্ত গ্রামে গৃহে গৃহে প্রসাদী তালের বড়া বিতরণ করা হইত; গ্রামের জেলে মালো অথবা নমঃশূদ্র কাহারও বাড়ী বাদ যাইত না। আবার গ্রামের যে কোন বাড়ীর নূতন গাছের ফল, ক্ষেতের শস্য বা তরিতরকারি, গুড়ের বানের প্রথম গুড়, গরুর দুধ সমস্ত রাধামাধবের মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত। গ্রামের শিশুরা ছেলেবেলা হইতেই জানিত, রাধামাধবকে আগে না দিয়া কিছু খাইতে নাই।

ছেলেবেলায় দেশের বাড়ীতে ঠাকুরমার স্নেহের ছায়ায় যে আনন্দে দিন কাটিয়াছে, এখন সে আনন্দের কথা আর মনে পড়ে না। দেশের বাড়ীর কথাও এখন আর বড় একটা মনে পড়ে না। এখন বিদেশের কর্মস্থানই আমাদের বাসস্থান হইয়াছে। রাধামাধব দেশে আছেন। নায়েব, গোমস্তা ও পূজারী ব্রাহ্মণের উপরেই এখন তাঁহার সেবার ভার। সে বর্ধিষ্ণু গ্রামও আর নাই। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গ্রামে ভদ্র গৃহস্থ খুব কমই আছেন। চাষী ও নিম্নশ্রেণী কোনরূপে টিঁকিয়া আছে। মাঝে মাঝে চিঠিতে খবর পাওয়া যায় যে, দেবোত্তরে একেবারে আদায় নাই, ঠাকুর সেবা অচল হইয়া উঠিয়াছে। বট, অশ্বত্থ গাছ গজাইয়া মন্দির জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে সংস্কার না হইলে কোন্ দিন ঠাকুরের মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে ইত্যাদি। সে সব চিঠি লইয়া বাবা যদিও বা মাঝে মাঝে মাথা ঘামাইতেন, কিন্তু দাদা একেবারেই মাথা ঘামান না। বাবাকে দুই-একবার বাড়ীতে যাইতেও দেখিয়াছি, তবে সে রাধামাধবের জন্য অথবা ঠাকুরমাকে দেখিবার জন্য তাহা ঠিক বলা যায় না। ঠাকুরমা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন দেশেই ছিলেন, বাবা অনেক বলিয়াও তাঁহাকে দুইদিনের জন্যও নিজের কাছে আনিতে পারেন নাই। ঠাকুরমা তীর্থ-দর্শনের প্রলোভনও জয় করিয়াছিলেন। ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার। দাদা বলিতেন, ওটা ঠাকুরমার 'মনস্তত্ত্ব'। এখানে বলিয়া রাখি যে দাদা সাইকোলজিতে এম. এ.।

বিদেশকে এখন আর বিদেশ মনে হয় না। তবুও মাঝে মাঝে দেশের কথা মনে পড়ে, সেই সঙ্গে মনে পড়ে ঠাকুরমার কথা। গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি হাস্যময়ী, না হাসিলেও সর্বদাই মনে হইত ঠাকুরমা যেন হাসিতেছেন। কিন্তু সেই ঠাকুরমা যখন

রাগ করিতেন, তখন কাহার সাধ্য হইত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলে। একবার ঠাকুরমার রাগ দেখিয়াছিলাম দাদার বড় ছেলে অরুণের অন্নপ্রাশনের সময়। ঠাকুরমা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন দেশে গিয়াই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করা হইত। অরুণের অন্নপ্রাশন হয় কার্তিকের প্রথমে। কলিকাতা হইতে আলু ও ফুলকপি এবং মসলা ও মেওয়া প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই জিনিসগুলি রাধামাধবের ভাণ্ডারে না তুলিয়া বোধ হয় ভুল করিয়া আমাদের বাড়ীর ভিতরের ভাণ্ডারে তোলা হইয়াছিল। ছোটকাকা ও বাবা দুই ভাই জিনিসপত্র নৌকা হইতে নামাইয়া বাড়ীতে পাঠাইতেছিলেন। সুতরাং দুইজনেই এ ব্যাপারে সমান অপরাধী। ঠাকুরমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ক্রিয়াকর্ম রাধামাধবের, না, তোমাদের দুই ভাইয়ের? যাক্, তোমাদের কাজ তোমরা নির্বাহ কর, এ কয়দিন আমি পুরুত-মশাইয়ের বাড়ী গিয়ে থাকব।" এই বলিয়া দুয়ারে পা বাড়াইলেন, ঠাকুরমার গৌরবর্ণ তখন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মুখ এত গম্ভীর যে ঠাকুরমা যেন আর একজন হইয়া গিয়াছেন। বাবা আসিয়া দুয়ারের সম্মুখে মাটিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া ঠাকুরমার দুই পা জড়াইয়া ধরিলেন। সে দৃশ্য এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

রাধামাধব সম্বন্ধে কত কাহিনী যে আমরা শুনিয়াছি তাহার শেষ নাই। রাধামাধব যে পাথরের ঠাকুর এ কথা কাহারও মনে হইত না। আমি অবাক হইয়া রাধামাধবকে দেখিতাম আর ভাবিতাম, এখন তো লক্ষ্মীছেলের মত চুপটি করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। যেন সত্য সত্যই হাতে-গড়া পুতুলটি। রাধামাধব আদুরে ছেলের মত যখন-তখন নানা আবদার করিতেন, স্বপ্নে নাকি সে সমস্ত আবদার শুনা যাইত। আমার বড় দুঃখ হইত যে, আমি কেন একদিনও স্বপ্নে রাধামাধবকে দেখিতে পাই না! ঠাকুরমা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তিনি রাশি রাশি ক্ষীরের ছাঁচ গড়িয়া থালায় থালায় সাজাইয়া রাধামাধবের মন্দিরে পাঠাইতেছেন। এই স্বপ্ন যে-রাত্রে দেখিলেন তাহার পরদিন ভোরবেলায় গয়লা-বাড়ী দশ সের খাঁটি দুধের ফরমাইশ গেল। সেদিন ঠাকুরমা স্নান করিয়া আসিয়া পূজা সারিয়া উনানে দুধের কড়া চাপাইলেন। দুধের ক্ষীর করিয়া ছাঁচ তুলিতে দিন শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ছাঁচ তুলিতে তুলিতে কতকগুলি ছাঁচ ভাঙিয়া গেল, সেইগুলিই ঠাকুরমা সেদিনের মত রাধামাধবের বৈকালীতে দিলেন এবং হাঁড়ী ভরিয়া ছাঁচ গুছাইয়া রাখিলেন।

পরদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। এখনকার দিনে এ ঘটনা কেহ বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না। ঘটনাটি এইরূপ :

বেলা প্রায় দশটার সময় এক হাঁটু ধূলা লইয়া এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ঠাকুরমার শয়নঘরের সম্মুখে আঙিনায় দাঁড়াইয়া হাঁক দিলেন, "জ্যেঠি আছেন নাকি?"

ঠাকুরমা ডাক শুনিয়া ত্রস্তে বাহির হইলেন, বলিলেন, "রামেশ্বর নাকি? কখন এলে? পায়ে যে ধূলা কাদা, এখনও পা ধোওয়া হয় নি?" এই বলিয়া আমার ছোট পিসিমাকে ডাকিলেন, "আরে শৈলজা, তোর কাকামশাই এসেছেন, পা ধোওয়ার জল আর গামছা নিয়ে আয়।"

রামেশ্বর হাসিলেন, বলিলেন, "জ্যেঠি, পা ধোওয়া হবে এখন। রাধামাধবের

মা তা হ'লে রাগ করবেন। সুন্দর মা এখন সগ্‌গে গিয়েছেন, আবার একদিন রথে ক'রে নেমে আসবেন, আমাদের জন্যে কত খেলনা আনবেন।"

সেদিন রাত্রে ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। পাটনা শহর, দারুণ গ্রীষ্ম। আমরা প্রায়ই উঠানে খাটিয়া পাতিয়া শুই। শেষরাত্রে ঘুমের ঘোরে মনে হইল, যেন ঘাসে ঢাকা সবুজ উঠানে ছোট একটি ছেলে মৃদু পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পায়ে ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া কি বাজিতেছে। ঝণ্টু নাকি? সেই তো মাঝে মাঝে সাধ করিয়া পায়ে ঘুঙুর পরে, টুলুর সঙ্গে এই লইয়া তাহার ঝগড়া হয়। আবার মনে হইল, রাধামাধবই যেন ঝণ্টু হইয়া গিয়াছেন, আমার বিছানার পাশে আসিয়া মাথার চূড়া হইতে ময়ূরপাখা খুলিয়া আমার হাতে দিয়া বলিতেছেন, "কাকা, ময়ূরপাখা নিবি, এই নে।" বাস্তবিক ছেলেবেলায় রাধামাধবের এই চূড়ার ময়ূরপাখার উপর আমার লোভ ছিল, আজ এতদিন পরে সেই ময়ূরপাখা রাধামাধব আমাকে দিতে আসিয়াছেন।

"ঠাকুরপো, ওঠ ওঠ, টুলুর বড় অসুখ। এইমাত্র পায়খানায় গিয়েছিল, ফিরে এসে কেমন হয়ে পড়েছে, তার হাতের আঙুলের ডগা একেবারে যেন নীল হ'য়ে গিয়েছে।" বৌদিদির এই আকস্মিক আহ্বানে চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম।

পাটনা শহরে কলেরা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু গর্দানীবাগে যে কলেরা আসিবে তাহা ভাবি নাই।

শেষরাত্রির কলেরা, খুবই কঠিন, দাদা বাড়ী নাই, টুলুরাণীকে বুঝি হারাই!

আমার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বৌদিদি আমাকে ধরিলেন, বলিলেন, "ঠাকুরপো, একটু ঠাণ্ডা হও, ডাক্তারকে গিয়ে ফোন কর।"

এ কী! আমি কি এখনও ঘুমাইয়া আছি? আমার বিছানায় ময়ূরপাখা আসিল কোথা হইতে? তাড়াতাড়ি পালকটি মাথায় ঠেকাইয়া বৌদিদির হাতে দিলাম, নিঃসংশয়ে বলিলাম, "বৌদিদি, রাধামাধব চূড়া থেকে ময়ূরপালক দিয়ে গেলেন। যাও, টুলু-মার গায়ে মাথায় বুলিয়ে দাও গিয়ে, আমি ফোন করতে যাচ্ছি।"

বৌদিদি কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর জোড়হাতে রাধামাধবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পাখাটি লইয়া গেলেন।

অতি শীঘ্র ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি এতক্ষণ সাহস করিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিতে পারি নাই, এখন ডাক্তারের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিলাম।

বৌদিদির ধৈর্য ও তৎপরতা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। ইতিমধ্যে তিনি অন্য ছেলেদের ঘর হইতে সরাইয়া দিয়াছেন ও ঘরটি রোগী-শুশ্রূষার উপযোগী করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছেন। আমি ঘরে ঢুকিতে টুলুর ক্ষীণ আর্তধ্বনি শুনিলাম, "হাত গেল! হাত গেল মা, পা গেল আমার!"

বৌদিদি ধীরে ধীরে ময়ূরপাখা বুলাইতেছেন—টুলুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "এই যে বাবা, এখনি ভাল হয়ে যাবে। রাধামাধবের ময়ূরপাখা বুলিয়ে দিচ্ছি ধন।"

আমি টুলুরাণীর খাটের কাছে গিয়া দেখিলাম, যেন সে একটু আরাম পাইয়া চোখ বুজিয়াছে, ঠোঁট দুইখানি একটু নড়িতেছে ও অস্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে:

"রাধামাধব! রাধামাধব!"

টুলুকে আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। ডাক্তার বলিলেন, "এ যেন এক অঘটন ঘটনা।" ময়ূরপাখাটি আমার বিছানায় কোথা হইতে আসিল তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার কি মীমাংসা হইতে পারে সে বিষয়ে দাদাকে একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলাম। দেখিলাম, দাদা গম্ভীর হইয়া গেলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "থাক্, আর বিদ্যা জাহির না-ই করলে।"

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয় ১৩৪৯

সেকালের রোমান্স

'রোমান্স' জিনিসটা চিরকালের। তবে দেশ কাল ও পাত্র ভেদে তার ধরনটা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়।

আমার এই কাহিনী এমন এক প্রেমের কাহিনী, যে-কাহিনীর নায়িকার বয়স তেরো বৎসর। মেয়েটির নাম বিজয়িনী, ডাক নাম বিজু।

আট বৎসর বয়সেই বিজুর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল; বাবা ছিলেন সরকারী বড় চাকুরে, তাই তাঁকে দেশে দেশে বেড়াতে হত, বিজুও বাপের সঙ্গে নানা দেশ বেড়িয়েছে। শ্বশুরবাড়ি বাংলা দেশের এক পল্লীগ্রামে। বিয়ের চার বছর পরে সে একবার শ্বশুরবাড়ি এসেছে, আর এসেই সে তার স্বামীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে প্রেমে পড়া, এটা অবশ্য একটা নূতন কথা, কেন না বিয়ের মন্ত্রই হচ্ছে 'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।' সুতরাং হিন্দু বিবাহমন্ত্রই যখন প্রেমের গ্রন্থিবন্ধন, তখন নূতন ক'রে আবার প্রেমে পড়ার কথাই উঠতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, কেন না বিয়ের পর বিজুর সঙ্গে তার স্বামী বিনয়ের খুব কমই দেখা হয়েছে, আবার যদি বা দেখা হয়েছে সে কথা বিজুর বিশেষ মনেই নেই।

পশ্চিমে থেকে থেকে বিজুর স্বভাবটা এমন হয়েছিল যে সে বাঙালীর ঘরের বৌ হয়ে কি করে যে একগলা ঘোমটা টেনে একেবারে ভাল মানুষটি হ'য়ে থাকবে বিজুর মা সে কথা ভাবতেও পারতেন না। তাই যখন বিজুর শ্বশুরবাড়ি যাবার পর তিনি তাঁর বেয়ানের পত্রে জানলেন যে, 'বিজু বড়ই সরল ও লক্ষ্মীমেয়ে' তখন তাঁর মন অনেকটা হাল্‌কা হল। কিন্তু শাশুড়ী একথাও লিখেছেন "পশ্চিমে থেকে বাংলা দেশের আদব কায়দা কিছু শেখে নি সেজন্য ভাববেন না, দু দিনেই সব শিখে নেবে।"

বিজুর শ্বশুরবাড়ি গ্রাম্য জমিদারের বাড়ি। শ্বশুর—জেলার বড় উকিল, কিন্তু ছেলেরা কেউই বিদ্বান নয়। বিজুর স্বামীর বয়স বাইশ বৎসর, কিন্তু সে এনট্রান্স পাস করার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের ছেলেদের মোড়লগিরি করছে। চাষীদের সঙ্গে তার বিষম ভাব, এমন কি মাঠে গিয়ে মাঝে মাঝে লাঙ্গল চষেও দেয়। চাষীরা বলে, "ন বাবুর মত আর মানুষ হয় না, ওঁকে তো দ্যাবতা বললেই হয়।" কিন্তু বাড়িতে তার উৎপাতে বৌ-ঝিরা সব সময় তটস্থ থাকে, কোন সময় তার কি খেয়াল হয় কে জানে! তাই বিজয়িনী শ্বশুরবাড়ি এলে মেজবৌ একদিন বলেছিল, "এবার তো নবৌ আসছে, এবার তুমি জব্দ হবে, তার সঙ্গে এমন করে লাগতে পারবে না।" এখন এক পারিবারিক নাটক অভিনয়ের দৃশ্যের বর্ণনায় আসছি।

১২৫১ সাল। তখনকার দিনের একান্নবর্তী পরিবার। দরদালানে একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন খেতে বসেছে, খুড়্‌তুতো, জেঠ্‌তুতো, পিস্‌তুতো ভাইয়েরা,

ভাগনে এবং শ্যালকও আছে, গুরুজনদের মধ্যে আছেন ছোটকাকা ও পিসেমশাই। বধূরা এবং মেয়েরা পরিবেশন করছে, গৃহিণী আছেন রান্নাঘরে।

পরিবেশনে বিজুর খুবই উৎসাহ। মাছের থালায় দু হাতই জোড়া, তাই মাঝে মাঝে তার ঘোমটা সরে যাচ্ছে। মেজো ননদ এসে মাঝে মাঝে ঘোমটা ঠিক করে দিচ্ছেন। গৃহিণীর আদেশ, নবৌকে কিছু বলা চলবে না তবে সহবত অবশ্য শিখিয়ে দিতে হবে।

বিজুর স্বামী বিনয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "মেজ্‌দা, দেখ, বড় মুড়োটা দেখছি আমারই পাতে পড়েছে। তোমরা কখানা করে মাছ পেয়েছ দেখি, আমার পাতে দেখ বড় বড় পাঁচখানা মাছ।"

মেজদাদা বললেন, "বিনয়, থাম্‌ দেখি। বড় মাছটা তুইই তো ধরেছিলি তবে মুড়োটা তোর পাতে পড়বে না কেন?"

বিনয় বললে, "পরিবেশন করছে কে, ও নবৌ বুঝি? ঘোমটা দিয়ে আছে বলে আগে চিনতে পারি নি, আমি বলি বুঝি মেজবৌদি। তবে তো আমার পাতে থালা শুদ্ধ মাছই পড়বে। মা, মা, ওকে কেন মাছ পরিবেশন করতে দিলে?"

মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে বললেন, "বিনু, আবার কি নষ্টামি জুড়েছিস্‌? কেন ওকে ওরকম করিস্‌? আমিই তো বলেছিলাম তোর পাতে বড় মুড়োটা দিতে। কাল আবার অভয়কে দেব। পুকুরে কি মাছের অভাব হয়েছে?"

বিজয়িনী আড়ষ্ট, থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে। তার চোখের জলে ঘোমটা ভিজে গিয়েছে। শাশুড়ী এসে তার হাত থেকে থালাটি নিয়ে বললেন, "ছিঃ, কাঁদে না, যাও মা, হাত মুখ ধুয়ে এস।"

মুড়োটি বিনয় খায় নি, পাতেই পড়ে আছে। সেজবৌ ফুস্‌ ফুস্‌ করে বললে, "দেখলে তো ভাই, নঠাকুরপো মুড়োটা নবৌয়ের জন্যে পাতে রেখে গেল।"

কথাটা শাশুড়ীর কানে গেল, বললেন, "পাতে রেখেছে তাতে হয়েছে কি? যাও মা, বিনুর পাতে গিয়ে বোসো। স্বামীর পাতের মাছের মুড়ো খেলে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি হয়, সেজপিসিমা বলেন, শোন নি?"

দু ঘণ্টা পরে। বিজয়িনী ডাঁসা পেয়ারার সন্ধানে পেয়ারা গাছের তলায় গিয়েছে। গিয়ে দেখল, বিনয় গাছতলায় দাঁড়িয়ে।

বিনয়কে দেখে বিজুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাছে গিয়ে বললে, "আমাকে গোটা কতক পেয়ারা পেড়ে দেবে?"

বিনয় বললে, "গোটা কতক? ও বাবা, আব্বা তো কম নয় দেখছি। বল না কেন, গাছে যতগুলো পেয়ারা আছে সবই পেড়ে দাও।"

বিজয়িনী : "সব পেড়ে দিতে বলব কেন? সবগুলো তো আর ডাঁসা পেয়ারা নয়?"

বিনয় : "আচ্ছা, পেয়ারা পেড়ে দেব। তার আগে বল্‌ দেখি, ঘাটে তোদের চুপি চুপি কি পরামর্শ হচ্ছিল?"

বিজুর মুখ মলিন হয়ে গেল। সে বললে, "ছাড়, মার ঘরে যাব, মা ডেকেছেন পাকা চুল তুলে দিতে।"

কিন্তু বিনয় জোর করে তার হাত চেপে ধরল, বললে, "সেটি হচ্ছে না। কি পরামর্শ হচ্ছিল না বললে ছেড়ে দেব না। বল, শিগ্‌গির বল পরামর্শটি কি? বনভোজন হবে? ও না, বোধ হয় চাষীদের খেজুর গাছের রস চুরি করা হবে, তাই না?"

বিজু বললে, "রস চুরি করব কেন, তুমি ভারি বাজে কথা বল। রোজ তো এক কলসী করে জিরেন রস চাষীরা দিয়ে যায়।"

"তা হলে কি হবে, কৃষ্ণযাত্রা? হ্যাঁ, এইবার ঠিক ধরেছি।"

বিজু বললে, "তাই বুঝি, বেহুলার ভাসান তো করা হবে। দেখো নি সেদিন। কি সুন্দর বেউলার ভাসান গান করেছিল মুসলমানপাড়ার ছেলেরা?" বলতে বলতে চমকে উঠল, : "ওমা! কি হবে? দিদিরা যে বারণ করেছিল বলতে?"

সন্ধ্যার সময় কোন কাজ থাকে না। রান্নার পাট দিনে দিনেই চুকিয়ে রাখা হয়, কেবল সময়মত গরম ভাতটি নামিয়ে নেওয়া, আর সেও রাত্রি দশটা এগারোটায়। কাজেই সন্ধ্যাতে প্রায়ই কড়ি খেলার আসর বসে, দশ-পঁচিশ, ছক্কা-পাঞ্জা, বাঘবন্দী খেলা। তার মধ্যে দশ-পঁচিশই প্রধান খেলা। দশ-পঁচিশের ঘরে ঘরে যে চারটি করে কড়ি বসানো হয় তার জন্য কত রঙ-বেরঙের কড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে, আবার দানের সাতটি কড়িও বাছাই-করা বড় বড় কড়ি।

কিন্তু আজ আর কড়িখেলা নয়, আজ হবে বেহুলার ভাসানের গান। দর-দালানের উপরের বড় ঘরটা তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করাই থাকে, কেবল একবার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবার জন্য খোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় ছবি আছে সেগুলোও মাঝে মাঝে মুছে পরিষ্কার করা হয়। চাবিটা থাকে ভাঁড়ার-ঘরের তাকের উপর। আজ সেই ঘরেই বেহুলার ভাসান করা হবে।

বেহুলার ভাসানে কান্নার পালা অনেক আছে, আবার তার মধ্যে সং এনে হাসির খোরাকও জোগান দেওয়া হয়। মাথায় পাগড়ী বাঁধা রামসিং জমাদারের সে কি ভঙ্গী, সে কি লাঠি ঘুরোনো, যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করছে। আবার যেই শুনেছে একটা "ম্যাঁও" শব্দ, অমনি "ডাকু আয়া, ডাকু অয়া" বলে তার পালানোর ভঙ্গিমা দেখে দর্শকেরা হেসে কুটি কুটি হয়ে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। তখনকার দিনে লোকের আমোদবোধের বিশেষ প্রবণতা ছিল।

বেহুলার নৌকায় 'গোদা' গিয়ে উঠেছিল, বেহুলা যখন স্বামীর দেহ নিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন কলার ভেলায় করে; নৌকা নয়, কলার ভেলা। সেই 'গোদা'কে নিয়েও সং দেওয়া হ'ত। গোদা পায়ে তুলো আর পাট জড়িয়ে 'গোদ' তৈরী করেছে, আর থপ্ থপ্ ক'রে হাঁটতে হাঁটতে গোদা-পা তুলে তুলে তার তিন বৌকে শাসাচ্ছে, "মারব এই গোদা পায়ের লাথি।" আবার গানও করছে নেচে নেচে,—

"আমায়, 'গোদা, গোদা' করিস নে গোদা বড় ভাগ্যিমান।
গোদার ডোলে গরু, শামুখে ধান।"

একটা ছোট বাছুরকে ধান রাখা ডোলের ভিতর ক'রে নিয়ে এসেছে, আবার একটা শামুখে ধান ভরে এনেছে। সেই শামুখটা সকলের সম্মুখে তুলে ধরে বলছে "দ্যাখ্ তোরা আমার কত ধান; গোলায় আর কত ধানই ধরবে, আমার শামুখের ধানে সম্বৎসর ওড়ন্ ফোড়ন্, অতিথ-পাতিত, এসো জন বসো জন সব কুলান হয়ে যাবে।" আবার বেহুলার নৌকা ধরবার জন্যে মাটিতে উপুড় হয়ে সাঁতারের অভিনয়।

এই অভিনয়গুলিই বিশেষ করে দর্শকদের মন আকর্ষণ করত, তাই মাঠে ঘাটে গান শোনা যেত—

"গোদা গোদা করিস নে গোদা বড় ভাগ্যিমান।"

আজ গোদা সেজেছে সেজো বৌ, পায়ে তুলো জমিয়ে গোদ করা হয়েছে, আবার শামুখে ধান ভরেও আনা হয়েছে কিন্তু ডোলটি খালি ডোল, বাছুর তাতে নেই।

এদিকে রামসিং-জমাদারবেশী মেজবৌ লাঠি ঘাড়ে পাঁয়তারা কষতে কষতে এমন এক লাফ দিয়েছে যে জানলার সার্সি ভেঙে চুরমার এবং ঠিক সেই সময়েই বিনয় ঘরের মধ্যে এসে হাজির।

অভিনয়কারিণীগণ এর পর যেভাবে লাঞ্ছিতা হলেন, তা বর্ণনা করা যায় না। দুজন দুজন করে চুলের বিনুনীতে বিনুনীতে বেঁধে এক এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, "ঠিক এইভাবে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক, তারপর ছুটি হবে।"

বিজু কোথায়? বিজুকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। সেই বিশ্বাস-ঘাতিনীই যে সমস্ত সন্ধান দিয়েছে তা বুঝতে কারও আর বাকি রইল না।

বেচারা বিজয়িনী! এই কাণ্ডর পর সে একেবারে একঘরে হ'ল। তার সঙ্গে আর কেউই কথা বলে না—সে সকলের পিছনে পিছনে বেড়ায়, কিন্তু কেউই তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

শাশুড়ী ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন, বললেন, "হ'ল কি তোদের? বিজু অমন মুখ কালি করে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? রান্নাঘরের দুয়োর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, তোরা ওকে কাজে ডাকিস নি বুঝি?"

সেজ মেয়ে বিমলা বললে, "না, ওকে আমরা আমাদের কোন কাজেই ডাকব না। ও ভারী দুষ্টু, যে কথাটি হবে সেইটি গিয়ে ন-দার কানে তুলে দেবে। এদিকে দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি যেন উলটে খেতে জানে না।"

বিজয়িনী কাঁদছিল, বললে, "মা, আমি তো ওর কাছেই যাই নি, আমি তো তোমার ঘরে আসছিলাম, তোমার পাকা চুল তুলতে, ও যে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।"

সেজ ননদ মুখ নাড়া দিয়ে বললে, "নিয়ে গেল তো নিয়ে গেল, ওকে সব বলে দিতে গেলি কেন?"

বিজয়িনী অবিশ্রান্ত চোখের জল ফেলছিল: "আমি তো বলতে চাই নি, আমি তো বলতে চাই নি—ও যে, ও যে—" বলতে বলতে কান্নায় তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার পরের দিন। মায়ের অনুরোধে বৌয়েরা ও মেয়েরা অপরাধিনীকে ক্ষমা করেছে, সঙ্গে নিয়ে বাগানে গিয়েছে। বিজু একেবারে কৃতার্থ।

বাগানের মাঝখানে একটা ঝোপড়া তেঁতুলগাছ। বিজু মনের আনন্দে অনবরত বকে চলেছে, "জান ভাই, জান ভাই, উনি হাত গুনতে পারেন, তোমাকে সব বলে দেবেন, সব ঠিক মিলে যাবে। এই যে গাছটা দেখছ, এটা কি গাছ বল দেখি?"

ননদ বিমলা বললে, "ওটা তো তেঁতুলগাছ, তুই কখনও বুঝি তেঁতুলগাছ দেখিস নি?"

বিজু বললে, "না ভাই, ওটা তেঁতুলগাছ নয়। উনি বলেছেন, ওটা এক রকমের তালগাছ। দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে।"

এই অদ্ভুত কথায় সকলে হেসে উঠল। কিন্তু বিজুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলতে লাগল, "দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে। উনি বলছিলেন যে, তোমরা গাছটাকে তেঁতুলগাছ মনে কর, কিন্তু আসলে ওটা তালগাছ। কি জন্যে যেন ওর পাতাগুলো তেঁতুলগাছের মত হয়ে গিয়েছে, উনি সে কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি।"

মেজ-জা ধমক দিয়ে উঠল, "থাম্ দেখি নেকি, অত 'উনি, উনি' করিস নে। তোর 'উনি' সগ্‌গ্ থেকে নেমে এসেছেন। আমরা তো মানুষ নই, আমাদের তো চোখ নেই!"

কিন্তু বিজয়িনীর দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ গ্যাছে তাল ধরবেই। সে বললে, "আচ্ছা, দেখো, তালের সময় গাছে তাল ধরে কি না!"

বিজয়িনী যখনই বিনয়কে এড়িয়ে চলে, চতুর বিনয় তখনই বুঝতে পারে নিশ্চয় কিছু পরামর্শ চলছে। আর তখনই সে "বিজু, বিজু", ডাক ছাড়ে। সেই "বিজু বিজু" ডাক শুনলে বিজয়িনী আর দূরে থাকতে পারে না। বিনয়েরও আর বিজয়িনীর গোপন কথা বের করে নিতে কষ্ট হয় না।

তাই আজকাল গোপন-সভায় বিজয়িনীর আর প্রবেশের অধিকার নেই। বিজু যতই কাকুতি-মিনতি করুক কেউই তাকে দলে নেয় না, বলে, "বিজু তো! ন-ঠাকুরপো কাছে এলে ওর কি আর জ্ঞান থাকে? দেখ না, যে দিকে ন-ঠাকুরপো, ওর নজরটি কেবল সেই দিকেই আছে।"

গ্রীষ্মের দুপুর, বিনয় ঘরের মেঝেয় শীতলপাটি পেতে শুয়ে আছে। ছেলেদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এইবার মেয়েরা পাতে পাতে খেতে বসবে। বিজয়িনী কি একটা কাজে ঘরে এসেছিল, বিনয় ডাকল, "বিজু, বিজু, এদিকে আয় দেখি।"

বিজয়িনী এগিয়ে এসে বলল, "মা খেতে ডাকছেন, কি চাই তোমার?"

"খেতে ডাকছেন? বলিস কি? তোর যে চোখ লাল হয়েছে দেখছি, নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। এদিকে আয় তো! ও বাবা! এ যে বিষম জ্বর! শো, শো, শীগ্‌গির খাটের ওপর শুয়ে পড়্। আমি লেপ এনে তোর গায়ে ঢাকা দিচ্ছি।"

সেই দারুণ গ্রীষ্মে বিজয়িনী লেপ গায়ে দিয়ে হাঁসফাঁস করছে। শাশুড়ী শুনলেন, বৌয়ের জ্বর এসেছে। ছেলের মুখে সংবাদ পেয়ে শাশুড়ী ঘরে এসে বধূর অবস্থা দেখলেন, বললেন, "দুখানা লেপ দেখছি গায়ে চাপিয়েছ, খুব কি শীত করছে?"

বিজয়িনী বললে, "না মা, ভয়ানক গরম হচ্ছে।"

শাশুড়ী ব্যাপারটি তখনই বুঝতে পারলেন, বললেন, "ওঠো, ভাত খেতে চল। বাছা রে, একেবারে ঘেমে তিরখুন্তি। বিনু, হতভাগা ছেলে, আয় এদিকে, বৌটাকে খুন না করে বুঝি তোর শান্তি হবে না?"

বিনয় দুয়ারের কাছে মুখ বাড়িয়ে বললে, "ও গিয়ে বিছানায় লেপ মুড়ি দিল কেন, আমার কি দোষ? নিজের জ্বর হয়েছে কি না সেটুকু বুদ্ধি নেই?"

বিজয়িনী তবুও উঠতে রাজী হয় না, বলে, "উনি বলেছেন খুব জ্বর হয়েছে।"

শাশুড়ী রেগে উঠলেন, "বলুন উনি। জ্বর হয়েছে না ওর মাথা হয়েছে। আয় এদিকে, ওকে উঠতে বল্, আমি চলে যাচ্ছি।"

সেদিনের এই ঘটনায় বিজয়িনীকে অনেক ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু উপহাসের কারণটি যে কি বিজয়িনী বুঝতে পারে নি।

ইতিমধ্যে একদিন চিঠি এল দুঃসংবাদ নিয়ে, বিজয়িনীর বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

চিঠি পড়ে গৃহিণী স্তম্ভিত। তিনি তো জানেন বিজয়িনী তার বাবাকে কতখানি ভালবাসে। সময় ও সুযোগ পেলেই সে সকলকেই বাবার গল্প শোনায়। বিশেষ করে শাশুড়ীর যখন পাকাচুল তুলতে বসে তখন অনর্গল বকে যায়, কেননা সে বেশ বুঝতে পারে শাশুড়ী মনোযোগ দিয়েই তার কাহিনী শোনেন এবং শুনতে ভালবাসেন।

গৃহিণীর মনে পড়ছিল, সরলা বালিকার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই হাসিমাখা মুখের ভাব। বাবার কথা বলতে বলতে সে যেন আত্মহারা হয়ে যেত। অবশ্য বাপের বাড়ির সকল খুঁটিনাটি ঘটনাই সে বলত। মার কথা, ভাইবোনদেব কথা, ঝগড়ু সহিসের বৌয়ের কথা, এমন কি মেনি বেড়ালটার কথাও বাদ দিত না। কিন্তু বাবার কথা বলতে গেলেই তার মুখ সবচেয়ে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত, গৃহিণী তা লক্ষ্য করেছেন বৈ কি!

আজ যখন বিজয়িনী শুনবে তার বাবা আর নেই, তখন তার কি অবস্থা হবে সে-কথা যেন মনে করাই যায় না।

গৃহিণী ছেলেকে ডেকে তার দুই হাত ধরে মিনতি করে বললেন, "লক্ষ্মী বাবা, রাত্রেই যেন মেয়েটাকে এই দারুণ খবর শোনাস নে।"

খাওয়াদাওয়ার পর যে যার ঘরে শুতে গেল। গৃহিণী উদ্বিগ্ন হয়ে বিজয়িনীর শোবার ঘরের দিকে কান পেতে থাকলেন।

বিজয়িনী স্বামীর কাছে এলেই খুশী হয়ে উঠত, আর অনর্গল নানা কথা বলত। স্বামী সে কথায় কান দিচ্ছে কি না সে দিকে তার খেয়াল থাকত না।

আজও ঘরে এসে আনন্দময়ী মহা আনন্দের দিনে কি কি ঘটেছে অর্থাৎ মেজদিদি, সেজদিদি ও ঠাকুরঝি যখন পুকুরঘাটে গিয়েছিল, তখন মেজদিদি কিভাবে পা পিছলে পড়ে গেল, সেজদিদি ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতরাবার সময় ঘড়াটা হঠাৎ কি করে ডুবে গেল, আবার সেজদিদি ডুব-সাঁতার দিয়ে কি কৌশলে ঘড়াটি তুলল ইত্যাদি বর্ণনা দিতে দিতে নিজের মনেই মাঝে মাঝে হেসে অস্থির, তখন বিনয় হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ, খুব তো হাসিখুশি হচ্ছে, এদিকে কি চিঠি এসেছে জান? তোমার বাবা মারা গিয়েছেন।"

"কি বললে?" বিজু চমকে উঠল, "বাবা মারা গিয়েছেন বলে চিঠি এসেছে? তোমার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে বল। আমার বাবা নেই? আমার বাবা?"

বিজুর গলা দিয়ে "বাবা গো!" শব্দের আর্তনাদ শুনেই গৃহিণী ছুটে এলেন।

দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন তিনি : "দোর খোল্, শীগগির দোর খোল, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! বউটাকে তুই নিকেশ না করে ছাড়বি নে দেখছি।"

সেই আনন্দ-প্রতিমা কেমন যেন হয়ে গেল। তার মুখের দিকে যেন আর চাওয়াই যায় না। গৃহিণী কোন রকমে তাকে দিয়ে চতুর্থী করালেন, ভাবলেন বধূকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মা-ও তো শোকাতুরা, মা মেয়েকে দেখে হয়তো কিছু শান্তি পাবেন, আর বিজুও মায়ের কোলে গিয়ে একটু জুড়বে।

কিন্তু কাকে পাঠাবেন? বিজু বিষম জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ল, তার আর উঠবার শক্তি নেই।

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞানের মত হয়ে থাকে, কিন্তু বিনয় কাছে আসলেই যেন বুঝতে পারে তখন চোখ খুলবার চেষ্টা করে।

গৃহিণী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছেন, বিজুর বাপের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে।

বিনয় ছটফট করে বেড়ায়, বিজয়িনীর কাছে বেশীক্ষণ বসতে পারে না। বাড়ির সকলেই পালা করে রাত জাগে, সকলেরই মুখ মলিন, বাড়ির আনন্দের উৎস যেন একেবারে শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।

গৃহিণী সব সময়েই বধূর ঘরে আছেন, তাঁর রান্নাবান্নায় আর মন নেই। মাঝে মাঝে বিনয়কে বলেন, "তুই গিয়ে ওর কাছে একটু বোস্, তা হলে হয়তো হুঁশ আসবে।"

হুঁশ এল, কিন্তু একেবারে শেষ অবস্থায়। স্বামীর হাত দু হাতে জড়িয়ে ধরে বিজয়িনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, "তুমি,—তুমি তো আমায় ভালবাসতে না!"

এইটিই তার শেষ কথা।

বিনয় যেন পাগলের মত হয়ে গেল। মার কোলে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে কেবলই বলতে লাগল, "মা, মা, সে কিনা বলে গেল, আমি তাকে ভালবাসতাম না!"

—'দেশ', শারদীয় ১৩৬২

সেকালের এক বাস্তব ঘটনা

অনেক দিন আগের কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা-বিবাহকে আইনত বৈধ বিবাহ করিলেন কাহিনীটি সেই সময়ের।

দেশে তখন হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এক দিকে দেশব্যাপী শত্রুর দল, আবার অন্য দিকে গুণমুগ্ধ ভক্তের দল। বিধবা-বিবাহ লইয়া কত গান বাঁধা হইয়াছিল। শান্তিপুরের তাঁতিরা সেদিন "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" পাড়ের কাপড় বুনিয়াছিল।

বাংলা দেশের বিধবা, এখনকার দিনে আর তখনকার দিনে অনেক তফাত। তখনকার বালবিধবা চার-পাঁচ বছরের থেকে ষোড়শী-সপ্তদশী। তখনকার সংস্কার এতই প্রবল ছিল যে, একাদশীর দিনে বালিকা-বিধবা জল-পিপাসায় মারা গেলেও স্নেহময়ী জননীও তার মুখে জলবিন্দু দিতে সাহস করিতেন না।

আরও বিশেষ করিয়া এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্রভূমে। নাটোরের মহারাণী, প্রাতঃস্মরণীয়া শরৎসুন্দরী দেবী,—তিনি বারো বৎসর বয়সে বিধবা হন। তাঁহার বৈধব্য-পালনের কঠোরতার তুলনা নাই। একাহার, ভূমিশয্যা বা কম্বলাসন, সকল রকম আরামের উপাদান বর্জন--ইহাই ছিল অতুল ঐশ্বর্য-শালিনী বালিকা-রাণীর জীবন-যাপনের আদর্শ, আর সেই আদর্শ মানিয়া লইয়াছিল সমস্ত উত্তরবঙ্গ।

একবার কোনও বিদেশিনী মহিলা বালিকা-রাণীকে বলিয়াছিলেন, "মহারাণী, আপনার ন্যায় বালিকা-বিধবার আবার বিবাহ হওয়াই উচিত।" এই পাপ কথা কানে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাণী শরৎসুন্দরী ত্রিরাত্রি নির্জলা উপবাস করেন।

অন্য কোন সময়ে চারি সপ্তাহ লগ্ন-জ্বরে যখন তিনি পীড়িতা ও মরণাপন্না, তখন একাদশীর দিনে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রাজবাড়ির কর্মচারীগণের অনুরোধে "আতুরে নিয়মো নাস্তি"—অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় একাদশী তিথিতে ডাবের জল বা গঙ্গাজল গ্রহণ করিলে পীড়িতা বিধবার পাপ হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা দেন। রাণী অবশ্য সে ব্যবস্থা গ্রহণীয় মনে করেন নাই এবং সুস্থ হইবার পর সেই সব পণ্ডিতের রাজবাড়িতে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইহার ফলে রাজসাহী ও নাটোরে কত মুমূর্ষু বৃদ্ধা বিধবা একাদশীর দিন মৃত্যুকালেও শুষ্ককণ্ঠে শীতল বারির স্পর্শলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। কত শিশু-বিধবা,—যাহারা বিবাহ কাহাকে বলে তাহাই জানে না, তাহারাও একাদশী তিথিতে জল-পিপাসায় মারা গিয়াছে।

আমার এই কাহিনীটি বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত কুমারখালি নামক স্থানের কাহিনী এবং কাহিনীর পাত্রী পুঁটুরাণী নবম বর্ষেই বিধবা হইয়াছিল।

আড়াই বৎসর বয়সেই পুঁটুরাণীর মা মারা যায়। পুঁটুরাণী ছিল মায়ের

অতি আদরের মেয়ে; কি দিনে, কি রাত্রে সে মা ছাড়া এক মিনিটও থাকিতে পারিত না।

মা যখন রান্নাঘরে রান্না করিত, পুঁটুরাণীকে একটি ছোট পিঁড়িতে বসাইয়া রাখিত। রথের মেলায় পুঁটুরাণীর মা তাহার জন্য মাটির হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি যে সকল খেলনা কিনিয়া আনিয়াছিল, সেইগুলি লইয়া মায়ের অনুকরণে সে 'রান্না-বান্না' খেলা করিত।

যে মা ছাড়া পুঁটুরাণী এক দণ্ডও থাকিতে পারিত না, স্নানের সময় পুকুর-ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া পাহারা দিত—কতক্ষণে মা'র স্নান শেষ হইবে—সেই মা একদিন হঠাৎ কোথায় যে চলিয়া গেল, আর আসিল না।

পুঁটুরাণী মায়েরও কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিত না, সমস্ত দিন কেবল ঘরে ঘরে মাকে খুঁজিয়া বেড়াইত। বিছানার স্তূপ সরাইয়া দেখিত, তাহার ভিতর কেহ লুকাইয়া আছে কি না! রান্নাঘরের এক কোণে সিকায় মুড়কি-মোয়া ও ক্ষীরের নাড়ুর হাঁড়ি ঝুলিত, পুঁটু সেই ঝুলন্ত হাঁড়ির পিছনে বার বার উঁকি দিয়া দেখিত, যদি একখানি হাসিমুখ হঠাৎ তাহার আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাহাকে "পুঁটু রে, পোঁটন ধন রে" বলিয়া ডাকে! মার সঙ্গে তাহার এইভাবে লুকোচুরি খেলাও হইত। ঘাটের সিঁড়িতে সিঁড়িতে শ্যাওলা আর টোপা-পানার স্তূপ জমিয়া আছে, সেগুলিও সরাইয়া নাড়াইয়া পুঁটু কি যেন খুঁজিত, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "ও কি করছিস পুঁটু?" পুঁটু ম্লান মুখে উত্তর দিত, "দেখছি ওগুলোর নীচে কি আছে।"

বাড়িতে ছিলেন পুঁটুর বাবা পশুপতি মৈত্রের এক পিসিমা, তিনি সব সময় পুঁটুকে নজরে নজরে রাখিতেন, কে জানে কখন ঘাটে গিয়া মেয়েটা পা পিছলাইয়া জলে ডুবিয়া যায়!

মা যখন চলিয়া গেল, আর আসিল না, তখন পশুপতি মেয়েকে রাত্রে শুইবার সময়ে তাঁহার বিছানায় লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইতেন। পুঁটু বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইত, আবার ঘুমের ঘোরে চমকিয়া চমকিয়া উঠিত, মাঝে মাঝে বিছানায় হাত বুলাইয়া দেখিত বিছানায় আর কেহ চুপি চুপি আসিয়া শুইয়াছে কি না!

কিন্তু সে বিছানাতেও বেশিদিন তাহার স্থান হইল না। তাহার বাবা একদিন কোথা হইতে এক ঘোমটা দেওয়া বউ লইয়া আসিল, আর পাড়ার সকলে আসিয়া তাহাদের বাড়ি জড় হইল, তাহারা উলু দিল, শাঁখ বাজাইল, আবার পুঁটুকে বলিল, "এই দ্যাখ্ তোর নতুন মা।" কেউ কেউ বলিল, "তোর সেই মাই আবার সগ্গো থেকে ফিরে এসেছে।"

পুঁটুর মা! ওই নাকি পুঁটুর মা? পুঁটু বড় শান্ত মেয়ে, তাই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—অন্য কেহ মেয়ে হইলে কি যে করিত—অর্থাৎ পুঁটুরই মনে হইতেছিল, কি যে করিবে—যাক্ সে কথা, সেইদিন রাত্রে পুঁটু আর তাহার বাবার বিছানায় ঘুমাইতে পাইল না, বুড়ী ঠাকুরমা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল নিজের বিছানায়।

পুঁটুর যে দুঃখ, সে দুঃখ পুঁটু ছাড়া আর কে বুঝিবে! তাহার চোখে জল

আসিলে দুই হাত দিয়া সে চোখ ঢাকিত, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মুখময় কাজল লাগিয়া যাইত, আর তাহার সেই নতুন মা—সে বলিত, "দ্যাখ্ দ্যাখ্ মেয়েটা যেন একটা ভূত!" নতুন মা নাকি কনে-বৌ, তবু তার দাপটে বাড়ির সবাই অস্থির, ঠাকুরমা তাহাকে ভয় করিতেন। পুঁটুরাণীর বাবা,—হ্যাঁ তিনিও ভয় করিতেন, তাই তো আজকাল তিনি আর পুঁটুকে কাছে ডাকেন না, "পুঁটু আমার সোনার মেয়ে, রাজপুত্তুর এনে আমি দেবো পুঁটুর বিয়ে" এই সব শোলোক বলিয়া আদরও করেন না।

পুঁটু শুনিয়াছে, তার বাবাই নাকি নতুন মাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন 'শালঘর মধুয়া' থেকে। সকলে সে গ্রামকে বলে "শাল্খা মোদো।" সেখানে নাকি কেনি সাহেবের মস্ত কুঠিঘর আছে।

নতুন মার নাম মালতী, সে নাকি আগে কুমারখালি মেয়ে-ইস্কুলে পড়িত। এ-বাড়ি ও-বাড়ির মেয়েরা গল্প করে, পুঁটু কিছু কিছু বুঝিতে পারে, সে এখন তো বড় হইয়াছে। বাবা তাহাকে আদর করেন না, কিন্তু নতুন মাকে একদিন আদর করিয়া শোলোক বলিতেছিলেন, "মালতী মালতী মালতী ফুল, মজালে মজালে মজালে কুল।" শোলোকটা বেশ শুনিতে, তাই পুঁটু ভুলিয়া যায় নাই।

বাস্তবিক, নতুন বৌ মালতী খুব চালাক-চতুর মেয়েই ছিল। তখনকার দিনের কনের চেয়ে তার বয়সও ছিল বেশী। কেননা বিধবা মায়ের মেয়ে, মায়ের অবস্থাও ভাল ছিল না, অনেক জোগাড়-যন্ত্র করিয়া তিনি এই বিয়েটি ঠিক করিয়াছিলেন, তাঁর এক পিসতুতো ভাই ছিল পেস্কার, সেই সম্বন্ধটি ঠিক করিয়া দেয়। একটা সতীন-কাঁটা আছে বটে, তা তাহাকে, বিবাহ দিয়া বিদায় করিয়া দিলে মালতীই হইবে বাড়ির সর্বেসর্বা।

ছাদনাতলায় স্ত্রী-আচারের সময় পাড়ার এয়োরো বরকে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়াছিল। কেহ-বা একগাছি সুতা হাতে লইয়া বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কও দিনি বর, এডারে কি কয়?" বর উত্তর দিয়াছিল "সুতা।" অমনি চারিধার হইতে কলরব উঠিল, "সুতা নয়, সুতা নয় হে—কও সুতো।" বশম্বদ বর বলিল, "সুতে," আর চারিধার হইতে নানা বিচিত্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, "মালতী তোমার গলার পোতে।" বর একবার নিজের পৈতাটিতে হাত দিয়া দেখিল, পৈতাটি যথাস্থানেই আছে কি না!

আবার একখানি সুপারি-কাটা জাঁতি লইয়া একজন প্রশ্ন করিলেন, "ওহে বর, কও তো এডা কি বস্তু?" বর বলিল, "ও তো জাঁতি।" অমনি চারিধারে হাস্যধ্বনি উঠিল, "বর তো দেখি কল্কাত্তিয়া মানুষ। জাঁতি আবার কারে কয়, এ তো সর্তা। কও "সর্তা"। বর 'সর্তা' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র চারিধারে ধ্বনি উঠিল, "মালতী তোমার ঘরের কত্তা। মালতী তোমার ঘরের কত্তা।"

বস্তুত বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলা যাইতে না যাইতেই প্রকৃতপক্ষে মালতীই হইল ঘরের কত্তা। যিনি এতদিন কত্তা ছিলেন, তিনিও স্ত্রীকে প্রতিপদে ভয় করিয়া চলেন, আর বৃদ্ধা পিসির তো কথাই নাই, সে বেচারীকে আজকাল হবিষ্য-ঘরের বাহিরে দেখাই যায় না।

পুঁটু তাই একেবারে নিরাশ্রয়। কখনও বা ঠাকুরমা তাহার হাতে চুপি চুপি একটা মোয়া দেন, আর বলেন, "কাঁঠালতলায় গিয়া খাইয়া আয়।"

পুঁটুরাণীর ক্রমশ পর পর একটি বোন একটি ভাই হইয়াছে। তা পুঁটু আর খেলা করিবার সময় পায় না। "ছয়-সাত বছরের বুড়ো মেয়ে, ভাই-বোনদের দেখাশুনা করিবে, না দিনরাত খেলা আর খেলা—" নতুন-মা পুঁটুকে দিনরাত বকুনি দেয়। পুঁটুর সেই রথে কেনা খেলনাগুলির একটিও আর আস্ত নাই, কোনটি বোন দখল করিয়া লইয়াছে, কোনটি বা ভাই ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

ইহাই পুঁটুর বাল্য-জীবনের ইতিহাস। তাহার পর নয় বৎসর বয়সে বিবাহ ও তাহার দুই মাস পরেই ঘটিল বৈধব্য। যদিও পুঁটু বিবাহ কি আর বৈধব্যই বা কি কিছুই জানে না।

ইতিমধ্যে বাড়িতে আর একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে আসিয়াছে, সে নতুন মার নাকি ভাই হয়।

ছেলেটির নাম হরিপদ। তাহার বাপ-মা নাই। তাহার বাবা পুঁটুর নতুন মার সম্পর্কে কাকা হইতেন; বাবা মারা যাইবার পর ছেলেটিকে খাইতে পরিতে দিবার কেহই নাই। স্কুলে পড়িত, কিন্তু এখন পড়া তো দূরের কথা, খাইতে দিবারই লোক নাই।

তাই মালতী এবার বাপের বাড়ি গিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। পশুপতি তো নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া রওনা হইয়া যান কুষ্ঠিয়ায়, বাড়িতে বাজার-হাটই বা কে করে, আর ফাই-ফরমাশই বা খাটে কে?

আজকাল কাঠ-কাটা আর জল-তোলা ঐ ছেলেটাই সব করে। বাসনমাজার কাজও মাঝে মাঝে তাহাকে করিতে হয় বইকি। তা ছাড়া গরুর রাখালটাকেও ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে এসব কাজ তাহার সবই জানা আছে।

ইহার মধ্যেও সে প্রতিদিনই বই লইয়া বসে। পুঁটুর ভাল নাম সুশীলা। সে পুঁটুকে ডাকিয়া অক্ষর চেনায়, বলে, 'সুশীলা, এস একটু পড়া-শুনা কর।'

এ সব ব্যাপার মালতীর দুই চক্ষের বিষ, কিন্তু তবুও সে কেন যে বাধা দেয় নাই, তাহা সে-ই জানে।

পুঁটুর বাবা পুঁটুকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান নাই, শ্বশুরবাড়ি হইতেও অলক্ষণা বৌকে লইয়া যাইবার তাগিদ দেখা যায় নাই। আর নতুন মারও এখন তাহাকে বিদায় করিবার ততটা উৎসাহ দেখা যায় না, কেননা তেরো বছরে পড়িয়াই একবেলা রান্নার ভার পুঁটুর উপরেই তিনি দিয়াছেন। বিধবা মেয়ে রান্নার কাজে থাকিলে মন ভাল থাকিবে। তবে মাছটা আলাদা ঘরে তিনিই রান্না করেন, কেননা ব্রাহ্মণ-পাড়ায় বাড়ি, আর কুমারখালির ব্রাহ্মণপাড়া, ভাদুড়ি, লাহিড়ি, মজুমদার,

আশপাশেই সাত-আট ঘর, বিধবাকে মাছের পাকে পাঠানো শুনিলে আর কি রক্ষা থাকিবে?

কিন্তু এত পাহারার মধ্যেও পুঁটুরাণীর বাবা একাদশীর দিন ছুতা করিয়া আফিস কামাই করিতেন। কোন এক ছুতায় তিনি মেয়েকেও সুযোগ বুঝিয়া নিজের ঘরে ডাকিয়া লইতেন, তখন মালতী হয়তো দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকিত অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি গাবু খেলার আসরে যোগ দিতে যাইত। ছেলেমেয়ের জন্য তো ভাবনা নাই, পুঁটু আছে, বিশেষ করিয়া একাদশীর দিন তাহার খাওয়া-দাওয়ার কোন হাঙ্গামা নাই।

এইভাবেই দিন চলিতেছিল, কিন্তু মালতীর মনে যেন একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করিয়া উঠিত মাঝে মাঝে। যখন পল্লীবাসিনীগণ তাহারই বাড়িতে তাসের আসর বসাইত, সেদিন তামাক-পাতার গুঁড়া ও পান সরবরাহের জন্য পুঁটুরাণীকেও এক-একবার সে ঘরে আসিতে হইত। হয়তো সে সময় কোন দরদী পিসিমা অথবা কাকিমা তাহার দিকে চাহিয়া যদি বলিতেন, "আহা, মেয়ে তো নয়, যেন রূপের ডালি, পোড়া বিধেতা এরই কিনা কপাল পোড়ালেন!" অথবা হয়তো কেহ বলিতেন, "এমন শান্ত আর কাজের মেয়ে, সে কিনা পেলে না ঘর-সংসার!" তখন মালতীর মনটায় যেন কে খোঁচা দিয়াছে এমনি তাহার যন্ত্রণা হইত।

মালতীর নিজের মেয়ে সুন্দরী নয়, আর সতীনের মেয়ে দিনে দিনে যেন আরও বেশী সুন্দর হইতেছে। বিনা আভরণে অপরূপ রূপসী। লোকে বলে, পুঁটু যেন তার মায়ের ছবিখানি। মালতী ভাবে "হায় রে, মরা সতীন ম'রেও মরল না, হাড় জ্বালাবার জন্যে রেখে গেল ঐ রাক্ষুসীকে! ওকে দেখলেই তো ওর বাপের মনে প'ড়ে যাবে ওর মরা মায়ের মুখ।"

মালতীর দুঃখের কি শেষ আছে? ভগবানও যেন তাহার সঙ্গে বাদ লাগাইয়াছেন। ঐ ছোঁড়াটা,—পুঁটুর উপরই ওর যত দরদ। তা না হইলে যাহার খায়, যাহার পরে তাহার মেয়েকে ভাল করিয়া না পড়াইয়া সর্ব্বনাশী পুঁটুকেই কেন অত যত্ন করিয়া পড়ায়! না হইলে অমনিই কি পুঁটু মাসে একখানা করিয়া বই শেষ করিয়া ফেলে, আর তাহার মেয়ের পড়া এগোয় না! আবার সোহাগী মেয়ের জন্য বাপের সোহাগ কত, মাসে মাসে নতুন নতুন বই আসে, খাতা আসে লেখার জন্য। আবার বলেন, 'ঐ নিয়ে যদি ভুলে থাকে তো থাকুক না!' আহা, দরদের বালাই লইয়া মরিতে হয়।

মালতীর মনে হইত সে যেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারিয়াছে। দরকার কি ছিল এই লেখাপড়ার বায়নায়! তাহার মেয়ে তাহার ছেলে না হয় মূর্খ হইয়াই থাকিত, না হয় তাহাদের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিত—সেখানে যা হয় হইত।

এত বড় ছেলে আর ঐ মেয়ে একত্র পড়াশোনা করে, এটাই কি ভাল? যদিও

সব সময়ই তার 'কুকি'ও ঘরে থাকে, তবু সে তো নেহাত পোলাপান, সে আর কি বুঝিবে!

মালতী বুদ্ধিমতী, মনে মনে একটি উপায় স্থির করিল। তাড়াইতে হইবে। একেবারে দুইজনকেই বাড়ি হইতে তাড়াইতে হইবে। না হয় মালতী রাঁধিবার জন্য তাহার জ্ঞাতি-জা হেমের মাকেই রাখিবে, ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি?

রবিবার, সন্ধ্যাবেলা। পশুপতি উপরের ঘরে বসিয়া নথিপত্র খুলিয়া বসিয়াছেন। সোমবারে কোর্টে তাঁহার অনেকগুলি মামলা আছে। পুঁটুরাণী রান্নাঘরের কাজ সারিয়া পড়ার ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া হরিপদকে বলিতেছে, "আমারে এই অঙ্কটা বুঝিয়ে দেবেন? বুঝতে পারছি না।"

হরিপদ এবার পরীক্ষা দিবার জন্য তৈরী হইতেছে, তাই তাহার অন্য কোন দিকে মন নাই। ঘরে খুকি সুধারাণী বসিয়া ছিল, তাহার হাতে দ্বিতীয় ভাগ। মালতী তাহাকে ডাকিল, "সুধা, আয়, মোয়া বানাইছি—খাইয়ে যা।"

সুধা ডাক শুনিয়া দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ কি যে ঘটিল, পুঁটু কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পিঠের উপর আচমকা ধাক্কায় সে ঘরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পড়ার ঘরের দরজায় বাহির হইতে শিকল পড়িল, আর সেই সঙ্গে মালতীর উচ্চ চিৎকার শোনা গেল, "ও দিদি, ও হারুর মা, বলাইয়ের পিসি, আসেন আপনারা, আইস্যা নিজের চইক্ষে দ্যাখেন। দ্যাখেন আইস্যা, বাপ-সোয়াগী মেয়ের কীর্ত্তি!"

আশপাশের বাড়ির লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া দৃশ্যটি দেখিল বইকি! দেখিল, পুঁটুরাণী উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর হরিপদ তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সে রাত্রির ঘটনা যেন এক অঘটন ব্যাপার। পশুপতি বাহির হইতে পারেন না, দেখেন তাঁহার ঘরের দরজা বাহির হইতে শিকল বন্ধ। জানালায় গরাদ না থাকিলে তিনি জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতেন।

লোকজনের ভিড়, হৈ-হৈ শব্দ যখন থামিল, পশুপতি তখন দুয়ার খোলা পাইয়া বাহিরে আসিতে পারিলেন। এতক্ষণ তিনি অনবরত দরজায় লাথি মারিয়া মারিয়া দরজা প্রায় ভাঙিগয়া ফেলিয়াছেন।

ব্যাপার কি, প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, পরে অবশ্য বুঝিলেন টুকরা-টুকরা কথা শুনিয়া। "চুলের মুঠা ধরিয়া পিছা মারিয়া খেদাইয়া দিছে" "খাল কাইট্যা কুমীর আনুছিল" "ধম্মের সংসারে অধম্ম" "এক্কেরে রওনা কইর‍্যা দিছে বৌঠন" প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে যতটা বুঝিলেন তাহাতে বিলম্ব না করিয়া স্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

শীতের রাত্রি, দারুণ অন্ধকার, ছুটিতে ছুটিতে কতবার হোঁচট খাইলেন। স্টেশনে গিয়া দেখিলেন দেরি হইয়া গিয়াছে, ট্রেন এই মাত্র চলিয়া গিয়াছে।

স্টেশন-মাস্টারের কাছে খবর পাইলেন, একটি মেয়ে ও একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেকে টিকিট করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেয়েটি কাঁদিতেছিল, বোধ হয় শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে।

পশুপতি মৈত্র উকীল মানুষ, ব্যাপারটি বুঝিতে তাঁহার দেরি হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ পরের স্টেশনে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন, "একটি ছেলে ও মেয়ে যাইতেছে, থার্ড ক্লাসের টিকিট, তাহাদের নামাইয়া রাখুন।"

পরদিন সকালবেলা। বেলা প্রায় নয়টা। কলিকাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাস-ভবন।

সৌম্যমূর্তি বিদ্যাসাগর মহাশয় বসিয়া আছেন, সম্মুখে ডেস্কের উপর কাগজ-পত্র। পশুপতি আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। পাগলের মত চেহারা, চক্ষু রক্তবর্ণ, এক হাতে পুঁটুরাণী ও আর এক হাতে হরিপদের হাত ধরিয়া আছেন।

"আমার মা-মরা মেয়ে পুঁটুরাণী, বিধবা মেয়ে—"

পশুপতি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, ক্রন্দনবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

আট-দশ দিন পরে পশুপতি কুমারখালিতে ফিরিলেন। এ কয়দিন মালতী কেবল ঘর বাহির করিয়াছে, পাড়াপড়শী নানা রকম কানাঘুষা করিয়াছে, কেহ বা বলিয়াছে 'লোকটা বিবাগী হ'য়ে গেল নাকি?' মক্কেলরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে।

কিন্তু পশুপতি যখন ফিরিলেন তখন তাঁহার ভাবটা বেশ খুশীই মনে হইল। সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি, ইতুপূজা, ঘরে ঘরে শাঁখ বাজিতেছে, উলু পড়িতেছে, কিন্তু পশুপতির বাড়িতে শাঁখ বাজে নাই, মালতী তখনও বিছানা হইতে উঠে নাই। পশুপতি বাড়ি আসিয়া মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "কুকি রে, তোদের বাড়িতে শাঁখ বাজে না ক্যান্ ?"

—'দেশ,' ২৭ কার্তিক ১৩৬৯

ফরিদপুরের মিশন-হাউস

১২৯৬ সাল। কিছুদিন আগে পূর্ববঙ্গে এক দফা বন্যা হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহার জের চলিতেছে। অন্নকষ্ট, নানা রোগের প্রাদুর্ভাব, গো-মড়ক ইত্যাদি।

পূর্ববঙ্গ অবশ্য জলের দেশ, প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় এ-বাড়ি ও-বাড়ি দূরের কথা, এ-ঘর ও-ঘর যাইতে হইলেও কলার ভেলার আশ্রয় লইতে হয়, কেননা, উঠানে এক কোমর জল দাঁড়ায়। আর সেই জলে যত ময়লা ভাসিয়া আসে। আর এ-পাড়া ও-পাড়া যদি যাইতে হয়, তাহা হইলে জলপথই একমাত্র পথ, সেজন্য ঘাটে ঘাটে প্রত্যেক বাড়ির একখানা করিয়া ডিঙ্গি নৌকা বাঁধাই থাকে।

মাদারীপুর, ভোলা প্রভৃতি সব জায়গায় এই একই ব্যবস্থা। আর একটু আগাইলে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ। সেখানে যে কয়মাস বর্ষা থাকে, সে সময় সূর্যের মুখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিশোরগঞ্জে ইঁট দিয়া গাঁথা দালান নজরেই পড়ে না, সব ছেঁচা-বেড়ার দেয়াল আর খড়ে-ছাওয়া চাল। তবে প্রত্যেক বাড়ির পোতা খুব উঁচু, আর ঘরে ঘরে একখানা করিয়া মাচা বাঁধা থাকে, সেইটিই শয়নের স্থান।

আমি পূর্ববঙ্গের ছেলে, কিন্তু শহরে থাকাই আমার অভ্যাস, তাই সাঁতার দিতেও পারি না আর নৌকা বাইতেও জানি না। তবুও মাঝে মাঝে গ্রামে যাইতে হয়। কেননা, বাড়িতে ঠাকুরসেবা আছে, দেবোত্তর সম্পত্তিও আছে। পাট কোষ্টা এ-সবের তদারকও করিতে হয়, আর মামলা-মোকদ্দমায় মাথাও গলাইতে হয়।

সে-বার ফরিদপুরে গিয়া কয়েক মাস কাটাইতে হইয়াছিল। সেই সময় ফরিদপুরের সঙ্গে বেশ ভাল করিয়াই পরিচয় হইয়াছিল।

ফরিদপুর টাউন, সুতরাং এখানে আদালত কাছারি আছে, বিভিন্ন কোর্টে হাকিমেরা বিচার করেন, আর প্রত্যেক কোর্টেই আছে নাজির, সেরেস্তাদার প্রভৃতি। প্রথম মুন্সেফ, দ্বিতীয় মুন্সেফ এবং তৃতীয় মুন্সেফও আছেন। এইসব কোর্টে বিচার হয় দেওয়ানী মামলার। আর ফরিদপুরে এই ধরনের মামলা খুবই বেশী। তবে জমির দখল লইয়া মাথা-ফাটাফাটিও আছে বইকি।

আমার বন্ধুর বাবা ছিলেন দ্বিতীয় মুন্সেফ। তাঁহার বাহিরের গৃহে আমার আস্তানা হইয়াছিল, কেননা, বাসার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এখানে ধানের শোভা একটি দেখিবার মত জিনিস। বিলে বিলে আউস ধান এক গলা জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে মাথাটুকু জাগাইয়া, যখন কোন নৌকা তাহাদের একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে তখন মাথা হেঁট হইয়া যায়, আবার নৌকা চলিয়া গেলেই মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া উঠে।

মাঝিরা গান গাহিতে গাহিতে নৌকা বাহিতেছে, অনবরত ঝপ্ ঝপ্ দাঁড়-ফেলার তালে তালে মিশাইয়া উঠিতেছে ভাটিয়ালী সুরের ঝঙ্কার। চাষীরা

যখন ক্ষেতে কাজ করে, তখন সেখানে বসিয়া যায় বাউল সুরের গানের আসর। দূর হইতে শোনা যায় গানের কলির এক এক চরণ :

"মন আমার টোপাপানা, ডুবতে চায় না
ঐ ভাবনা রাত্রি দিনে।"

অথবা

"ঘুরেছ দিল্লী লাহোর, ঢাকা শহর—
কত, টাকা মোহর নিয়ে এলে
খেতে না পয়সা সিকি, বল দেখি
এখন তা কি সঙ্গে নিলে? (হায় রে)
বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চ'লে।"

আবার,

"ঘবের গিন্নী চললে কোথায় উদাসিনী হয়ে!
এই যে, এত হাঁড়ি কলসী পাকাইলে
তেলে আব ঘিয়ে,—
তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ি
যাও না দুটো সঙ্গে নিয়ে।"

পূর্ববঙ্গের ভাষার কি জানি কি মিষ্টতা আছে, যেন শিশুর আধ আধ বুলি। যত শুনিতাম, কানের ভিতর দিয়া যেন মরমে প্রবেশ করিত, শুনিয়া শুনিয়া যেন সাধ মেটে না।

বিলে যে দিনে ও রাত্রে কত ফুলই ফুটিয়া থাকে, কোনটি রক্তাভ, কোনটি শ্বেত, কোনটি বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। কোনটি দিনের বেলায় পাপড়ি মেলে, কোনটি বা রাত্রে পাপড়ি মেলে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে যদি বিলে নৌকায় যাও, তবে ফুল তুলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না। যতই মৃণালের সঙ্গে সঙ্গে ফুল টানিয়া তুলিবে, ততই তুলিবার ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবে। পুরীর সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইবার যেমন একটি মোহ থাকে, এও সেইরকম।

আবার জল যখন শুকাইতে আরম্ভ করে, তখন মাছ ধরা আরম্ভ হইয়া যায়। বিলে ও খালে বাঁশের বাঁধন পড়ে, সরু সরু কঞ্চি গায়ে গায়ে গাঁথা। তাহার ভিতর মাছ আটকাইয়া গেলে আর বাহির হইতে পারে না। মাঝে মাঝে উপুড়-করা নৌকাও আছে জলের ভিতর ডোবানো। নৌকায় ডালপালা ও শেওলা-দাম দিয়া খোলটা ভরতি করিয়া রাখা হয়, সেই খোলের ভিতর কই, মাগুর আর সিঙ্গি মাছ ঢুকিয়া পড়িলে আর বাহির হইতে পারে না।

ফরিদপুর, রাজবাড়ী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণের ভিতর জেলে আর নমশূদ্র অনেক ঘর আছে। একজন উচ্চবর্ণের ব্যক্তি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশ তো জেলে-চাঁড়ালেরই দেশ।" চাঁড়ালের ঘরের মেয়েরা বিধবা হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না বটে, কিন্তু রক্ষিতা থাকিতে তাহাদের আপত্তি নাই, সমাজে তাহা নিন্দনীয় নয়।

আর আছে বুনোর দল। বুনোরা একরকম অস্পৃশ্য বলিয়াই গণ্য হয়, কিন্তু তাহাদের দিয়া ধান ভানানো বা মাটি কাটানো (অর্থাৎ যে সব কাজ শ্রম-সাধ্য) প্রভৃতি কাজে কাহারও আপত্তি হয় না।

ধান ভানার পর ঝাড়িয়া বাছিয়া চালগুলি ঘরে তুলিয়া দিয়া যখন বুনোর বউ আঁচলে খুদগুলি বাঁধিয়া লইয়া বাড়ি যায় তখন যে বাড়ির সে ধান ভানিয়াছে সেই বাড়ির গৃহিণী হয়তো তাহাকে বলেন, "দেখি লো বুনো বউ, কতগুলো খুদ বার করেছিস?" অথবা কোন সহৃদয়া গৃহিণী হয়তো বলেন, "মাথাটা পাত্ দেখি, একটু তেল ঢেলে দি, নেয়ে এসে এখানেই দুটো পেসাদ পেয়ে যাবি।"

ফরিদপুর-মিশন-হাউসের মিশনারিগণের এই বুনোপাড়ার দিকেই বিশেষ করিয়া দৃষ্টি থাকে, যেমন ভাগাড়ের মরাগরুর উপর থাকে শকুনির তীক্ষ্মদৃষ্টি।

ফরিদপুর-মিশন-হাউস একটি নয়, তিনটি বড় বড় অট্টালিকা। ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্ট—দুই দলেরই মিশন-হাউস আছে। তবে ফ্রি-চার্চ-মিশনই বেশী জমকালো।

আমি দেখিতাম, আমার বন্ধু প্রায় প্রতিদিনই একবার করিয়া মিশন-হাউসের দিকে যাইতেন। বুঝিলাম, সেখানে তাঁহার কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে। কি সে আকর্ষণ? বন্ধু অল্পদিন হইল বিবাহ করিয়াছেন, বৌটির উপর তো তাঁহার খুবই অনুরাগ বলিয়াই মনে হয়। এবার তিনি আই. এ. পরীক্ষা দিয়াছেন, পরীক্ষার পর নতুন বৌকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার বাবা পত্রে জানাইয়া-ছিলেন। তিনি পিতার আদেশ অবশ্য অবহেলা করেন নাই। নববধূ তো এখানেই আছেন, তবে কি তিনি হঠাৎ খ্রীষ্টের অনুরাগী হইয়াই উঠিলেন?

বন্ধু নিজেই একদিন রহস্য ভেদ করিলেন, বলিলেন, "জুলাই মাসের আগে তো আর কলকাতায় যাচ্ছি না, এর মধ্যে বৌটার যাতে পড়াশুনা একটু এগিয়ে যায় সেজন্য মিশনের মিস্ রোজকে বলেছিলাম। মিস্ রোজ তো খুশী হয়েই রাজী হয়েছেন, কিন্তু বাবা যে রকম গোঁড়া, রাজী হবেন কি না বুঝতে পারছি না। বাবা নিজে যা বোঝেন, তা ছাড়া তিনি তো আর কারও কথা শুনবেন না। কিন্তু মিস্ রোজ যে কি রকম ভাল মেয়ে, যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছে সেই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়। আমার সঙ্গে তিনি একেবারে নিজের পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার করেন। একদিন চল্ না মিশন-হাউসে আলাপ করে আসবি।"

শুনিয়া একটু ভাবনা হইল। পরে একদিন মিস্ রোজকে চোখেই দেখিলাম।

মিস্ রোজ আসিয়াছিলেন নাজিরের বাড়ি। নাজিরবাবুর দুই মেয়ে সুরমা ও মনোরমা গার্লস্ স্কুলের ছাত্রী এবং মিস্ রোজের প্রিয়পাত্রী।

প্রিয়পাত্রী যে তাহা বুঝিতে পারিলাম তখনই, যখন দেখিলাম মিস্ রোজ নাজিরবাবুর বাড়ির সম্মুখের বাগানটার ভিতর ঢুকিয়াই সুরমা ও মনোরমাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

সুরমা ও মনোরমা দুই বোন দুই বছরের ছোট-বড়, একটির বয়স আট ও আর একটির বয়স দশ। আমি গার্লস্ স্কুলে উহাদের আবৃত্তি শুনিয়াছি, সেই সময় উহাদের বয়সও জানিয়াছিলাম। বন্যার সময় ছোটলাট যখন পূর্ববঙ্গে

আসেন তখন এই স্কুলের মেয়েরা একটি গান গাহিয়া তাঁহাকে ফুলের মালা দিয়াছিল। গানটি অবশ্য স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের রচনা। গানটার কিছু কিছু মনে আছে :

"বঙ্গরাজ, বঙ্গে আজ কি দেখিতে আসিলে?
পূর্ববঙ্গ ভগ্নপ্রায় জঠরেরি অনলে।
যদি রাজ দয়া ক'রে আসিলে বঙ্গের ঘরে,
নিরন্নেরে অন্ন দিয়ে রাখ প্রাণে সকলে।"

গানে অবশ্য আরও নানাভাবে আবেদন-নিবেদন ছিল, শেষের ছত্রটি ছিল এই রকম :

"দুঃখিনী বঙ্গের মেয়ে,
আজ কি কহিব তোমা পেয়ে,
পল্লীতে পদ বাড়াইয়া দেখ গিয়ে সদলে।"

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বাংলা দেশ, পূর্ববঙ্গ তো শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ এবং মৎস্যাশী বাঙ্গালীর মৎস্যনিকেতন। তবু তো দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ আর অন্নকষ্ট—এ যেন এক চিরন্তন ব্যাপার। লোকের পরনে বস্ত্র নাই, হয়তো মাসের পর মাস পদ্মের নাল সিদ্ধ করিয়া খাইয়াই তাহাদের দিন কাটাইতে হয়, ঢ্যাঁপের খই ভাজিয়া তাহাই খাইয়া কত লোক প্রাণধারণ করিতেছে। সেদিন এই কথাই মনে উঠিয়াছিল। কেন এমন হয়?

সুরমা ও মনোরমা দুই বোনই বেশ 'আপ্ টু ডেট' মেয়ে, স্কুলেও তাহাদের সুখ্যাতি আছে, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় সেদিন তাহারাই প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিল। আজ দেখিলাম তাহাদের আর এক ভিন্ন রূপ, দুই হাতে কাদা মাখা, কাপড়েও কাদা লাগিয়াছে। দুই বোন নিজের নিজের খেলাঘর গোবর-মাটি দিয়া নিকাইতেছে, সেই অবস্থাতেই মিস্ রোজ তাহাদের দুই বোনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "আঃ দুষ্টু মেয়েরা, তোমরা তোমাদের গোলাপীদিদিকে ভুলি গেলে?" সুরমা তখনই উত্তর দিল, "না, সিস্টার, ভুলি নি আমরা, আপনিই আমাদের ভুলে গেছেন।"

মিস্ রোজ সংশোধন করিলেন, "নো, নো, নট সিস্টার, আমি তুমাদের গোলাপীদিদি। আমার মা নাম রাখিয়াছিলেন রোজালি। বাংলায় ইহার অর্থ হয়—গোলাপফুল। আমি তোমাদের গোলাপীদিদি।"

ইহার পর মিস্ রোজ তাহারা তাহাদের খেলাঘরে কি কি রন্ধন করিবে ও কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে তাঁহারও নাম থাকিবে কি না সে খবর জানিতে চাহিলেন। তাহার পর প্রার্থনা-পুস্তকখানি হাতে লইয়া অন্দরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ইঁহারা 'জেনানা মিশন' কার্যে অর্থাৎ অন্তঃপুরের প্রচারকার্যে নিযুক্তা হইয়াছেন। যে সকল মহিলা এই কাজে আছেন তাঁহাদের মধ্যে মিস্ গিলবার্ট বহু

বৎসর পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে প্রচারকার্য করিয়াছেন। এখন ফরিদপুরেই স্থায়ীভাবেই আছেন এবং বয়সও ষাট বৎসরের অধিক হইয়াছে। ইনি সেবাকার্যে বিশেষ করিয়া প্রসূতি-পরিচর্যায় এমন নিপুণা যে, সকল গৃহস্থের বাড়ি হইতেই তাঁহার আহ্বান আসে এবং তিনিও ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের বাড়িতেই ডাকিবামাত্র উপস্থিত হন। ডাল-ভাত তরি-তরকারি যে যাহা দেয় হাতে মাখিয়া তাহাই খান, কাঁটা-চামচ বা চেয়ার-টেবিলের কোন বালাই নাই; হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এক হাতে কলার পাতায় রাখা ভাত মাখিয়া অন্য হাতে সেই মাখা গ্রাস আহার করিতেছেন এই দৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন।

আমার বন্ধুর বাড়িতেও অল্পদিন আগেই একটি নূতন শিশু আসিয়াছে তাঁহার মায়ের ক্রোড়ে। আঁতুড়ঘরে প্রথম হইতেই মিস্ গিলবার্ট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার সহযোগিনীরূপে আরও একজন মিশনারি মহিলা ছিলেন, তিনি মিশনের জন্যই ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে মিস্ এডিথ বলা হয়। অবশ্য হাড়িনী ধাত্রীও সেদিন একজন ছিল।

এইভাবে এই মিশনারি মহিলা প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন এবং চিনি-মাখানো কুইনিনের বড়ির মত প্রচারকার্যও সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া যান। এ বিষয়ে তাঁহাদের তৎপরতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ডাক্তারের আসল উদ্দেশ্য যেমন রোগ আরোগ্য করা, ইঁহাদেরও আসল উদ্দেশ্য থাকে পাপরোগে পীড়িত জনগণকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করা। এই কার্যের জন্য তাঁহারা কি পারিশ্রমিক পান তাহা অবশ্য আমার জানা নাই।

কলিকাতায় দেখিয়াছি, জেনানা মিশনের শিক্ষয়িত্রীরা বাড়ি বাড়ি পড়াইতে যান। তাঁহারা অবশ্য মেম নন, তাঁহারা বাঙ্গালী খ্রীষ্টান। এখানে মেমেরা গৃহস্থের বাড়িতে অনেক সাহায্য করেন, যেমন রোগীর সেবা বা প্রসবকার্যে সাহায্য প্রভৃতি। তবে মেম অবশ্য সব বাড়িতে ঘরে দুয়ারে ঢুকিতে পান না, স্বতন্ত্র একটা ঘরে তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হয়, সেখানে তিনি যখন বাইবেল পড়েন বা গান করেন তখন বাড়ির মেয়েরা অবশ্য উপস্থিত থাকেন, না হইলে অভদ্রতা হয়। কিন্তু পরে আবার তাঁহারা কাপড় কাচেন, মেমের ছোঁওয়া কাপড় তো আর হিন্দুর ঘরে চলে না।

কিন্তু আঁতুড়ঘর অশুচি স্থান, কাজেই মেমের সেখানে যাওয়াতে আপত্তি ওঠে না। নবজাত শিশুর জন্য মিশন হইতে জামা পাউডার সাবান প্রভৃতি অনেক কিছু তাঁহারা সঙ্গে আনেন, সেগুলিও লইতে কোন আপত্তি দেখা যায় না।

মিশনারি মহিলাগণের মধ্যে মিস্ রোজই ছিলেন খুব অল্পবয়স্কা, এত অল্প বয়সে তিনি কেন যে বাড়ি ছাড়িয়া দূরদেশে প্রচারকার্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার মুখে কোন দুঃখের ছায়া দেখিতে পাই নাই। সর্বদাই হাসি-খুশি, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েকে নানাবিধ উপহার দিয়া তিনি অল্প দিনেই এত বশ করিয়া ফেলিতেন যে ছেলেমেয়েদের মায়েরাও তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত। বন্ধুর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল, বোধ হয় সেই

খাতিরেই বন্ধুর নববিবাহিতা পত্নীকে ইংরাজী পড়াইতে নিয়মিতভাবে তিনি মুন্সেফবাবুর বাড়িতে আসিতে লাগিলেন।

বউটি কলিকাতার মেয়ে, অর্থাৎ কলিকাতাতেই ছেলেবেলায় কাটাইয়াছে, পড়াশুনাতেও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কাজেই মিস্ রোজ এমন ছাত্রী পাইয়া বোধ হয় খুশীই হইয়াছিলেন, তাই তিনি বাইবেলের জন্য বেশী সময় না দিয়া পড়ানোর দিকেই সময় বেশী দিতেন। গান গাহিতেও ততটা উৎসুক ছিলেন না।

কিন্তু অন্য কোন মিশনারি মহিলা যেদিন আসিতেন সেদিন বাহিরের ঘর হইতে সুরের ঝঙ্কার শুনা যাইত। শুনিতাম, কাঁপানো গলায় দিশী গানগুলিকে বিদেশী সুরে গাওয়া হইত।

মিস্ গিল্‌বার্ট তাঁহার প্রার্থনা পুস্তক হইতে গান করিতেন :

"যীশুর শোণিতস্রোত বহিছে অবিরত
তারিতে আমার মত পাপীরে।
আমি শুনিলাম যীশুর স্বর—
'হও পাপী অগ্রসর
ডুব ডুব রে ক্রুশ রুধিবে'।"

মিস্ গিল্‌বার্টের সঙ্গে প্রতিদিনই একখানি বই থাকিত, সেই বইয়ের ভিতরের প্রথম দুইটি পৃষ্ঠা গাঢ় কালো রঙের, শেষের দুইটি পৃষ্ঠা ধবধবে সাদা আর মাঝের দুইটি পৃষ্ঠা ঘোর রক্তবর্ণ। এই বই খুলিয়া মিস্ গিলবার্ট প্রতিদিন একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতেন :—"এই দেখ গাঢ় কালো রঙে, মানুষ এই রকম দারুণ পাপী, তাহার হৃদয় কালো, কালো। এই দেখ বরফের মত শুভ্র রঙ, সেই কালো মন কি করিয়া এমন সাদা হইল?" মাঝের পৃষ্ঠা খুলিয়া বলিতেন, "এই দেখ রক্তবর্ণ, যীশুর শোণিত। পাপীর জন্য যীশু ক্রুশে প্রাণ দিলেন। সেই রক্তই মানুষের কালো মন ধুইয়া দিবে, করিয়া দিবে তুষারের মত সাদা। যীশুর যে শরণ লইবে তাহারই পাপ মোচন হইবে, না হইলে শেষ বিচারের পর হইবে অনন্ত নরকে বাস।"

বাউলের গান, বৈষ্ণবগণের গান, ফিকিরচাঁদ ফকিরের গান, দেখিতাম সবই বদলাইয়া লইয়া গাওয়া হইত।

'হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্যগতি নাই'য়ের স্থানে করা হইয়াছে 'যীশুর শরণ বিনা পাপীর অন্য গতি নাই।' কিম্বা

"পার কর গৌরাঙ্গ তরঙ্গ মাঝারে,
নিদানের কাণ্ডারী তুমি জানি পূর্বাপরে।"

বদলাইয়া

"পার কর যীশু হে পাপ-তরঙ্গ-মাঝারে,
তুমি বিনা পাপীগণে কে আর নিস্তারে!"

করা হইয়াছে।

মুন্সেফবাবু মিশনারি মেমেদের বাড়িতে আসা-যাওয়া একেবারেই পছন্দ করিতেন না, কিন্তু গৃহিণীর ভয়ে কিছু বলিতে পারিতেন না। গৃহিণীর সন্তান হওয়ার সময় এই মিশনারি মেমেরা ছিল বলিয়াই তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই। ইহারা কি যত্নই না করিয়াছে! ছেলেকেও নাওয়ানো ধোওয়ানো পর্যন্ত সবই করিয়াছে, একদিন সারারাত্রিই এ বাড়িতে কাটাইয়া দিল, কি না, ছেলে সর্দিতে হাঁসফাঁস করিতেছে। অপরে কে কোথায় এমন করিয়া যত্ন করে!

কিন্তু কর্তা তবুও মাঝে মাঝে বলিতেন, "দেখ, ওরা লোক সুবিধের নয়, ঐ মেম মাগী বৌমার কাছে রোজ রোজ আসে এ আমার মোটেই ভাল লাগে না। বৌমা ছেলেমানুষ, পড়ানোর সময় তুমি বরং একটু ও-ঘরে থেকো, কি জানি কি মতলব ওদের, কিছুই বলা যায় না।"

বধূর এক কাকা ফরিদপুরের কাছেই থাকেন, পল্লী অঞ্চলে বাড়ি, সেখানে জমিদারি আছে। কাকা একদিন ভাইঝিকে লইতে আসিলেন, শ্বশুর-শাশুড়ী আপত্তি করিলেন না। বধূও যেন কিছুদিনের জন্য মুক্তির আস্বাদ পাইবে বলিয়া খুশী মনেই নৌকায় রওনা হইল।

সারারাত্রি চাঁদের আলোয় নৌকা চলিতেছে, আর বিলের শোভা দেখিতে দেখিতে বৌয়ের খুশির সীমা নাই। পনরো দিনের মাত্র ছুটি, এই পনরো দিন পরে কাকা নিজেই আবার ফিরাইয়া দিয়া যাইবেন বলিয়া কথা দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু পনরো দিন আর পার হইল না, শ্বশুরের বদলির খবর আসিয়াছে, ফরিদপুর হইতে তাঁহাকে বিদায় লইতে হইবে, তাই দেওর লইতে আসিল।

বৌটির এত শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে অবশ্য মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায় কি? কাকিমা নূতন গুড়ের পায়েস রাঁধিবেন বলিয়া আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু পায়েস আর তাহার খাওয়া হইল না। দেওর বলিল, "এখন না রওনা হ'লে কাল সকালে পেঁছনো যাবে না।" কাকাও পেঁছাইতে সংগে আসিলেন।

বধূ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাঁধা-ছাঁদা আরম্ভ হইয়াছে। পেয়াদারা আসিয়া জিনিসপত্র সব বাহির করিতেছে, বাড়ির সর্বত্রই যেন বিশৃংখল ভাব।

মাঠের পথ দিয়া মিস্ রোজ দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছেন দেখিয়া বৌ তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে আসিল। মিস্ রোজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিতেছেন, বেশ বোঝা গেল তিনি খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছেন।

আমি সামনের বারান্দায় জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদার তদারক করিতেছিলাম; কেননা বন্ধু কলিকাতায়, এখন আমিই তাঁহার প্রতিনিধি। এবার আমারও আসিয়াছে বিদায়ের পালা।

ঘরের মধ্যের কথাও কানে আসিতেছিল, "ওঃ মাই ডার্লিং, আমার প্রিয়তমা ছোট-বৌ, তুমি যে চলিয়া যাইতেছ আমি তাহা জানিতাম না। আমি ঘুমাইতে-ছিলাম, যীশু আমাকে ডাকিলেন,—যীশু বলিলেন 'ওঠো, জাগো, তোমার ছোট-বৌ চলিয়া যাইতেছে।'"

এ কি ব্যাপার? এ যে স্বপ্নে দেবদর্শন! হিন্দুর দেশে আসিয়া খৃষ্টীয়

প্রচারিকারও মনে হিন্দুর ধর্মভাবের প্রভাব জাগ্রত হইল না কি? না, বাইবেলেও স্বপ্নে প্রত্যাদেশের কথা অনেক স্থানে আছে। ধর্ম জিনিসটাই এক রহস্য।

তেরো বৎসরের একটি মেয়ে বিদেশিনীর এই ভালবাসায় যে মুগ্ধ হইবে তাহার আর আশ্চর্য কি! মিস্ রোজ বৌটির হাতে একখানি বই দিয়া বলিলেন, "তুমি একটি দেববালা, যীশুকে স্মরণ রাখিবে। তোমার গোলাপীদিদিকে ভুলিও না।" এই সব কথার কিছু কিছু কানে আসিল, আমার মনে হইল বৌটি যেন কাঁদিতেছে।

কিন্তু মুন্সেফবাবুর সেদিন রওনা হওয়া স্থগিত রহিল, কেননা সেদিন ফরিদপুরের উকীলগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দিবার আয়োজন হইয়াছে। বারের খ্যাতনামা উকীল প্রসন্ন সান্ন্যাল মহাশয় হইয়াছেন বিদায়-ভোজের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারই বাড়িতে ফরিদপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই সে রাত্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এ রকম ভোজে খাদ্য ও পানীয় দুইয়েরই আয়োজন থাকিত, অর্থাৎ ভোজটি হইত দেশী ও বিলাতী উভয় রকমের। রুচি অনুসারে নিমন্ত্রিতগণ কেহ বা খাদ্য, কেহ বা অধিক পরিমাণে পানীয়ই গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা পানীয় বর্জন করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরে এবং স্বতন্ত্রভাবে আহার্য পরিবেশিত হইত। তখনকার দিনে এইরকম নিয়ম ছিল। অর্থাৎ আমি এখানে ১২৯৬ সালের মফস্বল টাউনের বিদায়ভোজেরই বর্ণনা দিতেছি।

সুতরাং নিমন্ত্রণ-শেষে নিমন্ত্রিতগণ যখন মধ্যরাত্রে বাড়ি ফিরিলেন, তখন একটু সোরগোল হইবে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হইল গোলমালটা যেন থামিতে চাহিতেছে না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আরও মনে হইল, গোলমালটা আসিতেছে নন্দীদের বাড়ির দিক হইতে। সেখানে একদল লোক জমিয়া গিয়াছে।

নন্দীকর্তা,মহাধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, মারা গিয়াছেন। অল্পদিন আগে তাঁহার মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই শ্রাদ্ধে কলিকাতার বিখ্যাত কীর্তনীয়াকে আনা হইয়াছিল, কীর্তনের জন্য।

নন্দীকর্তার পাট ও তামাকের আড়ত ছিল রংপুরে, সেখানে তাঁহার অনেক তালুকও আছে। বাড়িতে পরিবার বেশী নয়, বড় ছেলে ভোলানাথ নন্দী—তিনিই এখন কারবারের মালিক, তাঁহার একটি ছেলে। আর মেয়েদের মধ্যে নন্দী-গৃহিণী, বড়বৌ সুষমা, বিধবা ছোটবৌ ভগবতী আর এক বিধবা ননদ।

ছোটবৌ পরমাসুন্দরী, কিন্তু ভাগ্য তাহার বড়ই অসুন্দর। বিধবা মা মেয়েটিকে লইয়া ভাই-ভাজের গঞ্জনা সহ্য করিয়া দিন কাটাইতেছিল, নন্দীকর্তা মেয়ে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌ করিয়া ঘরে আনিলেন। কিন্তু বৌ ঘরে আনিবার পর দুই মাসও কাটিল না, ছোট ছেলে মারা গেল সর্পাঘাতে। 'বিষকন্যা' আর কাহাকে বলে! সেই বৌ যদি শাশুড়ী পিস্শাশুড়ীর চোখের বালি হয়, যদি উঠিতে বসিতে তাহাকে লাথি ঝাঁটা খাইতে হয়, তবে সে দোষটা কাহার? দোষটা তাহার ভাগ্যের, না, শাশুড়ী পিস্শাশুড়ীর?

"শ্বশুর ভালবাসিতেন, তা বাসিবেন না কেন, তিনিই তো ঐ কালসাপিনীকে ঘরে আনিয়াছিলেন। আর ভাসুর ভোলানাথ—সেও বোধ হয় ভাদ্রবৌকে পছন্দ করিত, কিন্তু বৌটা ভাসুরের সামনে বাহির হইতে নাই বলিয়া তাহার ত্রিসীমানাও মাড়াইতে চাহিত না।"

"আরে বাপু, এখন আর অত সব কে মানে? ভাসুর যদি 'পানটা দাও', 'জলটা দাও' বলে তা ঘরে গিয়ে দিয়ে আসতে দোষ কি? আসলে বৌটা ছিল কুঁড়ের হদ্দ।"

"ইদানীং আবার মিস্ স্টিল বলিয়া মিশন-হাউসের এক মেমের আনাগোনা চলিতেছিল নন্দীবাড়ী, কি জানি কি হইতে কি হইয়া গেল?"

এই সব কথাবার্তা শুনিতে শুনিতে নন্দীবাড়ির দিকে গেলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কি হইয়াছে।

অবশেষে শুনিলাম, সেই বৌটিকে পাওয়া যাইতেছে না। ভাসুর নিমন্ত্রণ-বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই নাকি ভাই-বৌয়ের ঘরের দরজা ঠেলিয়াছিল, ভেজানো ছিল দরজা, ধাক্কায় খুলিয়া গেলে দেখা গেল—ঘরে বৌ নাই।

বৌ ইদানীং ঘর হইতে বড় একটা বাহির হইত না, শাশুড়ী পাড়ার মেয়েদের কাছে বলিয়াছিলেন, "বৌয়ের উদুরি হয়েছে, কবিরাজি চলছে।"

"চৌদ্দ কি পনেরো বছরের একরত্তি মেয়ে, তার হ'ল কি না উদুরি! এ এক তাজ্জব বটে। কলিকাল কিনা!" লোকে এই কথাই অবশ্য বলিত।

"তা, ভোলানাথ এসেই নিজের ঘরে না গিয়ে ভাই-বৌয়ের শোবার ঘরের দরজাতেই বা ধাক্কা দিল কেন?" এ প্রশ্নও উঠিয়াছিল।

"আঃ, তার কি তখন মাথার ঠিক ছিল? পা টলছে, তখন শুয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে। আর ভোলানাথের একটু 'বার দোষ' আছে সে কথা অবশ্য সকলেই জানে, কিন্তু এদিকে একেবারে মাটির মানুষ। দায়ে আদায়ে ধার চাইতে গেলে কখনও কাকেও 'না' বলে না।"

এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর ও নানা কথা শুনিতে শুনিতে বাড়ি ফিরিলাম। কিন্তু বৌটির যে কি হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না।

শেষ-রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি, নন্দীবাড়িতে এক প্রলয় কাণ্ড।

মিশনের বড় সাহেব ফাদার রেভারেণ্ড ম্যাকসুইনি এবং তাঁহার সঙ্গে মিশনের লোকজন, পুলিসের লোকও সঙ্গে আছে দেখিলাম। নন্দীবাড়ি একেবারে লোকে ভরতি। বৌটি কি তবে মারা পড়িয়াছে? আত্মহত্যা করিয়াছে? না, খুন হইয়াছে?

না, সে সব কিছু নয়। বৌটি গতরাত্রে পলাইয়া গিয়া মিশনে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং রাত্রেই সেই শিশুকে ও তাহার মাতাকে ব্যাপ্তাইজ্ করা হইয়াছে।

এখন মিশনের আশ্রিত সেই শিশু ও তাহার মাতার সম্পত্তি বুঝিয়া লইতে স্বয়ং রেভারেণ্ড ম্যাকসুইনি পুলিস লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

"মাতার সম্পত্তি? হিন্দুঘরের বিধবার আবার কি সম্পত্তি থাকিবে?"

"হাঁ, ছিল, বৌটির শ্বশুর যে পাকা উইল করিয়া গিয়াছেন, সেই উইল রেজেস্টারিও হইয়াছে। সে উইল তো আর রদ হইবে না।"

মিশনের লোকেরা বৌটির ঘরে যাহা কিছু আসবাব ছিল সবই বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে।

আমি দেখিয়া-শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, বাড়ির সম্মুখে একখানি মথিলিখিত সুসমাচার চার খণ্ড ছেঁড়া অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে, "প্রিয়তমা ছোটবৌকে গোলাপীদিদির স্নেহের উপহার।"

মুন্সেফবাবু উত্তেজিতভাবে স্ত্রীকে বলিতেছেন, "দেখলে তো যা বলেছিলাম তা ফলল কি না! ঘরের ঝি-বৌ বার ক'রে নিয়ে যাওয়াই ঐ মেম মাগীদের ব্যবসা। হিন্দুর বাড়ি এসে এই উৎপাত, তাতে আবার তোমরা দাও প্রশ্রয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "থাম, থাম, তোমরা আর কথা ব'লো না। ঘরের বৌ-ঝি! কি আমার ঘরের বৌয়ের উপর দরদ গো। ঐ ভোলানাথ—ও কি কম পাত্র? বৌটাকে ও-ই তো নষ্ট করলে। আর শেষকালে কিনা ও আর ওর মা দুজনে মিলে জড়ি-বুটি খাইয়ে বৌটাকে মেরে ফেলছিল, আমি বাগ্দী বুড়ীর মুখে সব শুনলাম। তাই তো বৌটা অমন ক'রে প্রাণ নিয়ে পালাল। বৌ তো মন্দ ছিল না, ছুঁড়ী দিনরাত কাঁদত। আমি তো চোখেই দেখেছি। ইদানীং কাউকে বৌয়ের ঘরেই ঢুকতে দিত না। যেমন শাশুড়ী তেমনি খাণ্ডার পিস্শাশুড়ী, বৌটার কি খোয়ারই না করেছে! হিন্দুর বাড়ি ব'লে আর লাফিও না, হিন্দুর মান-মর্যাদার তোমরা আর রেখেছ কি?"

—'দেশ,' ১ বৈশাখ ১৩৬৩

সেকালের পল্লীমানুষ

যশোহর জেলার এক গণ্ডগ্রামে একদল আধুনিক মেয়ে একবার পল্লীগ্রামের বৈচিত্র্য অনুভব করবার জন্য বেড়াতে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের সেখানে মামার বাড়ি। এককালে সে তল্লাটে সে-বাড়িটি খুব নাম-করা বাড়িই ছিল। এখন অবশ্য কালের গতিতে আরও সব জায়গায় যেমন এখানেও তেমনি—বাড়িটি জরাজীর্ণ, অধিবাসীরাও তাই। অনেকেই বিদেশে ছিটকে পড়েছেন, যাঁরা আছেন তাঁরা কোনরকমেই টিকে আছেন।

চৌধুরী-বাড়ির সীমানা গ্রামের এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো পর্যন্ত। আলাদা আলাদা শরিকের আলাদা আলাদা বাড়ি; কারও দোতলা কোঠা বাড়ি, কারও বা আটচালা, আবার কারও বা দোচালা ঘর। কিন্তু সব বাড়িই এখন লক্ষ্মীশ্রীহীন, সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ।

গরীব যদিও সব কালেই গরীব, তবুও একালের গরীব আর সেকালের গরীবের মধ্যে একটু তফাত আছে। রায়চৌধুরী-বাড়ির ছোট তরফের কর্তা ছিলেন বড় গরীব। তাঁর হাতে এমন পয়সা ছিল না যে, ঘরামী ডেকে বর্ষার আগে ঘরের চাল মেরামত করিয়ে নেবেন, কিন্তু তাঁর ঘরের চালই সকলের আগে মেরামত হয়। ঘরামীরা দড়ি কাটারি হাতে নিয়ে চৌধুরী-বাড়িতে ঢুকলেই অন্য অন্য শরিকের যাঁরা কর্তা, তাঁরা তাদের ডেকে বলতেন, "ওহে, ছোট খুড়ো মশাইয়ের বাড়ির ঘর ক'খানাই আগে সেরে দিয়ে এস, তারপর এদিকে আসবে।"

ছোট তরফের কোন নিজস্ব পুকুর ছিল না, হাটেও মাছ কেনবার মত সঙ্গতি ছিল না, তাই যার পুকুরে যেদিন জাল ফেলা হত সে-বাড়ির কর্তা মাছ ধরার পর বড় রুই-মাছের মুড়োটাই ছোট তরফের বাড়িতে পাঠাতেন, কেননা এখনও খুড়ো মশাইয়ের একটি দাঁতও পড়ে নি, চিরকাল ওঁর মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাওয়া অভ্যাস।

খুড়ো মশাই বড়ই গরীব, কিন্তু অভ্যাস তো আর গরীব-বড়মানুষের বাচ-বিচার করে না। তাই তাঁর গোয়ালে গরু নেই তবু তিনি আফিং খাওয়ার অভ্যাসটি ছাড়তে পারেন নি ব'লে সব শরিকের বাড়ি থেকেই তাদের গরু দোয়া হ'লে আগে তাঁর ঘরে কিছু দুধ পাঠানো হয়।

"আচ্ছা, খুড়ো মশাই আফিং খান, দুধ না হ'লে তাঁর চলবে কি করে?"।

খুড়ো মশাইয়ের আরও একটি অভ্যাস ছিল, গাওয়া ঘি না হ'লে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারেন না, তাই যেদিন যার বাড়িতেই সর বাটা হ'ত ঘি করবার জন্য, তারই বাড়ি থেকে অন্তত এক কটোরা ঘি যেত তাঁর বাড়ি।

এ-সব আগের দিনের কথা, এখন অবশ্য সেদিন নেই, এখন কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দেবে? নিজের নিয়েই বাঁচছে না।

তবুও অতিথি-পরিচর্যার রীতি আজও গ্রাম থেকে উঠে যায় নি। তাই রায়চৌধুরী-বাড়ির এই আগন্তুকের প্রতি-বাড়িতেই নিমন্ত্রণ হচ্ছে।

খাওয়াদাওয়ার পর যখন বিশ্রামের সময় তখন বসত মেয়েদের মজলিস। গিন্নী-বান্নি থেকে বৌ-ঝি পর্যন্ত সকলেই সেই মজলিসের সভ্য। শহরের মেয়েরা পল্লীর সেকালের কাহিনী শুনবার জন্য উৎসুক, আবার পল্লীর বৃদ্ধারা সেই সব পুরনো দিনের কথার শ্রোতা পেয়ে আনন্দিত।

সুজাতা ইতিহাসের ছাত্রী, বি. এ.-তে সে ইতিহাসে অনার্স নিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঠাকুরমা, এই যে আপনাদের রায়চৌধুরী-বংশ, এর কোন ইতিহাস আছে?"

"ইতিহাস" কথাটার অর্থ না বুঝলেও প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে বুড়া ঠাকুরানীর বিলম্ব হ'ল না। তিনি বললেন, "রায়চৌধুরীরা হ'ল ধানি পিতাম্বরের বংশ। ধানি পিতাম্বরের কথা এ তল্লাটে কে না জানে? তিনি পঞ্চ গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়িতে এনেছিলেন, আর পথে পথে ধানের জাঙ্গাল দিয়েছিলেন। যে যত পার ধান নাও। ছালা ছালা ধান নিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতেরা। সেই অবধি নাম হ'ল 'ধানি পিতাম্বর।' পণ্ডিতেরাই ঐ খেতাব দিয়েছিল। এই যে যশোর জেলা, এ হ'ল কুলীন কায়স্থের দেশ। বাগুটে, জঙ্গলেবেড়ে, বিদ্যানন্দকাটি এসব গ্রামের কায়স্থ হ'ল বড় বড় কুলীন। তাই তো কুলক্রিয়া করবার জন্যে কলকাতা থেকেও বড় বড় ঘরের মানুষ আসে যশোর। রায়চৌধুরীরা কুলীন নয়, কিন্তু গোষ্ঠিপতি, কুলীনের সভার মধ্যেও ওরাই পায় মালা চন্দন।"

একজন প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ ঠাকুরমা, 'কুলক্রিয়া' ব্যাপারটা কি? কলকাতার বড় মানুষরা কুলক্রিয়া করতে যশোরেই বা আসে কেন?"

তখন ঘোষেদের বাড়ির কর্ত্রী বললেন, "'কুলক্রিয়া' কাকে বলে দিদি, তাও তোমরা জান না? জানবেই বা কি ক'রে? বিয়েই হ'ল না এখনো, তার আবার কুলক্রিয়া! বলি শোন, কায়স্থের ভিতর নানা ঘর—কুলীন মৌলিক, বাহাত্তুরে মৌলিক, আবার আটঘরের মৌলিক। কুলীনদেরও নানান—ঘর-মুখ্যি, জন্ম-মুখ্যি, গভী-মুখ্যি, নবরঙ্গ, এই সব কত রকম আছে। ব্রাহ্মণদের হ'ল কন্যাগত কুল, আর কায়স্থের হ'ল পুত্রগত কুল। সমান ঘরে কুলীনে মেয়ে দিতে না পারলে কুলীন ব্রাহ্মণের কুল থাকে না, তাই সেকালে একটা কুলীন পাত্র পেলে—তা সে বুড়োই হোক, আর ঘাটের মড়াই হোক—গাঁয়ে তাকে কেউ নিয়ে এলে সে গাঁয়ে যত কুলীনের মেয়ে আছে তা সে বুড়ীই হোক আর আঁতুড়ে খুকীই হোক সবাইকে একসঙ্গে পাত্রস্থ ক'রে দিত। বুড়ী পিসির বিয়ে হয় নি সেই বুড়ী পিসি আর কচি ভাইঝি দুজনকেই একই পাত্রে পাত্রস্থ ক'রে দিত সেকালের কুলীন বামুনরা। একালে সে-সব আর তেমন নেই। এই গেল বামুনের ঘরের কথা।

আর কায়স্থ-ঘরের কথা আমি তো ভাল রকমই জানি। আমি হলাম, মুখ্যি কুলীন কায়স্থের মেয়ে, চার বছর বয়সে আমার বিয়ে হ'লে ঘোষেদের বাড়ি এসেছি, আর এসেছি তো আকন্দের ডাল মুড়ি দিয়ে, যাবার আর নামটি নেই।"

বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি উঠল আধুনিকাদের মধ্যে : "চার বছরে বিয়ে? সে কি ঠাকুরমা? ঠাকুরদার বয়স তখন কত ছিল?"

ওঁর বয়স ছিল তখন দশ বছর, কি যে রূপ—যেন ময়ূর-ছাড়া কার্তিক। চার বছর শুনে তোরা অবাক হচ্ছিস? তিন বছর বয়স থেকেই তো কত ঘর থেকে আমার জন্যে সম্বন্ধ আসছিল। নিজের কুল থেকে বড় কুলীন ঘরের মেয়ে আনতে হবে, তা না হ'লে কুলক্রিয়া হবে না। কুলক্রিয়া কি মুখের কথা? কুলীনের বড় ছেলের কুলক্রিয়া করাতেই যে হবে, তা না হ'লে তাদের কুলই থাকবে না, তারা বংশজ হয়ে যাবে। আমার শ্বশুর ঠাকুরের চেয়ে আমার বাবার কুল উঁচু, বাবার মত সেরা কুলীন ও-দিকে আর ছিল না, তাই শ্বশুর ঠাকুর সন্ধান পেয়েই ছেলে সংগে নিয়ে রওনা হলেন। তিনি গল্প করেছেন, 'যাত্রাসিদ্ধিকে স্মরণ ক'রে রওনা দিলাম। মনে কেবল ভাবনা—দেবে কি ওরা বিয়ে? হয়তো আর কেউ এসে মেয়ের মাকেও এক গা গয়না দেবে ব'লে বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে। আমি তো খুব বেশী কুল-মর্যাদা দিতে পারব না, আমার ভাগ্যে কি ঐ কুললক্ষ্মী ঘরে আসবেন?'—শুনছিস তো নাতনীরা, মেয়ের কত মর্যাদা! শ্বশুর বলেন যে, 'ছেলে নিয়ে গেলাম যে, ছেলে দেখে বেয়াই-বেয়ানের জামাই করবার লোভ হবে, আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাই ছেলে সংগে নিয়েই বেয়াই-বাড়ির অতিথি হলাম। ওকালতি করি যশোর সদরে, কি রকম প্যাঁচ দিতে হয়, জানা আছে তো, বললাম—ছেলে নিয়ে তোমাদের দ্বারস্থ হয়েছি, মেয়ে আমার ঘরে দেবে এ-সত্যি যদি কর তবে অন্নজল গ্রহণ করব, না হ'লে না-খেয়ে তোমাদের দোরগোড়ায় ধন্না দিয়েই প'ড়ে থাকব।' "

সুজাতার বোন অজিতা, সে বলল, "এ যে দেখছি রীতিমত সত্যাগ্রহ!"

ঘোষ-গিন্নী বললেন, "দিদিরা তোমরা গাঁয়ে এসেছ, গাঁয়ের সংগে পরিচয় করবে। গাঁকে তুচ্ছ ক'রো না। এই গাঁয়েই দেখছ ঐ মাঠ, যেখানে সারি সারি খেজুরগাছ, সেখানে যখন নীলের আমীন এসে দাগ দিয়ে গেল কি যে কাণ্ড হ'ল, সে দিনের কথা ভাবতে পার তোমরা? গাঁয়ের ছেলেরা সবাই সে দিন লাঠি ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়েছিল, তবু তো সে দাগ দেওয়া রুখতে পারে নি। হা রে কপাল! কি নীলই এসেছিল এ দেশে, দেশের একেবারে ধনপ্রাণ নিকেশ ক'রে তারপর সে আপদ বিদেয় হয়েছে।"

কলকাতাবাসীদের কলকাতা ফেরবার দিন এসে গেল। খুব ভোরেই রওনা হতে হবে। ঝিকরগাছিতে রেলওয়ে স্টেশন—অনেকটা দূর।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে দুখানা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও খুব ভোরেই উঠেছে, ওদের অবশ্য রাত থাকতেই ওঠা অভ্যাস।

মিত্রবাড়ির, ঘোষবাড়ির, দত্তবাড়ির গিন্নীরাও এসে দাঁড়িয়েছেন রায়চৌধুরী-দের বাড়ির দুয়ারের কাছে। ক'দিনেরই বা পরিচয় এই মেয়েদের সংগে! তবু মনে হচ্ছে যেন তাদের কোন পরমাত্মীয়াই বুঝি বিদেশে যাচ্ছে।

খালি হাতে কেউ আসেন নি, সকলের হাতেই মুখে-কলাপাতা-বাঁধা মাটির পাতিল আছে। রাত্রে বোধ হয় পিঠে-আটা কিছু তৈরি করেছেন সকলেই যে যার বাড়িতে। 'জামাইচিত্তহরণ' 'রসো-সরোবর-মাধুরী' 'চন্দ্রপুলি' 'চন্দ্রকান্তি' এই সব হ'ল এ দেশের পিঠের নাম।

রায়চৌধুরী-বাড়ির গিন্নী, তাঁর ছেলের বৌ এবং নাতনী ও নাতবৌরা সকলেই এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারের কাছে। কছিমুদ্দি বার বার তাড়া দিচ্ছে, "দিদি ঠাকরাণ, আর বিলম্ব করবেন না, দেরি হলি টেন ধরতি পারব না।"

চৌধুরী-বাড়ির বুড়ো গিন্নী বললেন, "সবুর কর্, ঐ যে গুড়ের নাগরি দুটো আর চারটে মানকচু নিয়ে আসছে। চারটে নাগরিই দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু ওরা দিতে পারল না, দিদিরা ঐ থিকেই সবাই ভাগ করি নিও।"

চৌধুরী-বাড়ির ভাগনী যে, প্রণাম করল প্রথমে। আর সবাইও তার দেখা-দেখি প্রণাম করল সমস্ত গুরুজনদের। ছেলেমেয়েদের একটু একটু আদরও করল।

রায়চৌধুরী-গিন্নী বললেন, "রঞ্জন কই, সে এখনো এল না যে, দিদিদের ঠিকমত গাড়িতে তুলে দিতে হবে তো!"

ঠিকমত গাড়িতে তুলে দেওয়া শুনে সুজাতা মনে মনে হাসল।

কুন্তলা বললে, "ঐ যে রঞ্জনদাদা আসছে। দেখি, হাতে কি তোমার? এক কলসী খেজুর রস? মাঠে গিয়েছিলে বুঝি, তাই এত দেরি? এস, এস, পা চালিয়ে এস।"

রঞ্জন লজ্জিতভাবে একটু হাসল, বললে, "তোরা সেদিন জিরেন রসের কথা বলেছিলি, তাই গাছটা কাটিয়ে দু দিন জিরেন দিয়েছিলাম, তারপর ভাঁড় বাঁধতে হ'ল, তাই দেরি হয়ে গিয়েছে।"

কুন্তলা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, "ওহো,—তোরা রস খেতে চেয়েছিলি। অজিতা না রসের কথা বলেছিলি!"

রায়চৌধুরী-গিন্নী অজিতার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, মনে মনে ভাবলেন, "আহা, যদি হ'ত? মানাত যেন রাধাকেষ্ট! মিত্তির-বাড়ির মেয়ে, কুলীনের মেয়েই তো। তা কি আর হবে, কলকাতার মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে।"

"দুর্গা! দুর্গা! যাত্রা সিদ্ধি!"

গাড়ি ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। শোনা যাচ্ছে, "হেট হেট, বাঁয়ে বাঁয়ে।"

রায়চৌধুরী-গিন্নীর হঠাৎ স্মরণ হ'ল যে, পাঁচ সের সোনামুগের ডালের পুঁটলিটা দিতে ভুল হয়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর ভুল হ'লেও ডালটা ঠিকই পেঁৗছে গেছে।

রায়চৌধুরী-গিন্নী ঘরে গিয়ে দেখলেন যে, কাল রাত্রে যখন ডাল ভাজছিলেন তখন রঞ্জন একবার রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছিল বটে, জিজ্ঞেসও করেছিল। তবে কি সেই পুঁটলিটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েছে, না, নাতবৌদের মধ্যে কেউ?

—'দেশ,' শারদীয় ১৩৬৩